প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬০ ।

প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল । সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন । কলিকাতা-৯

মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন । কলিকাতা-৬

কমেডি অফ সেক্সপিয়র

—ঃ এতে আছে ঃ—

টেমিং অফ দি শ্রু

এক

কোলাহল মুখর নগর থেকে দূরে বহু দূরে, এক নির্জন-নিরালা প্রান্তরে এক শুঁড়িখানা। নগর থেকে দূরে হ'লে কি হ'বে, অষ্টক্ষণ সেখানে খদ্দেরের ভিড় লেগেই রয়েছে। নগরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এই শুঁড়িখানাটির খুবই নামডাক রয়েছে। জমিদারের কাছে তো এটি একটি তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। তাঁরা ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বনে শিকার করতে এসে আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে মদের গ্লাস নিয়েই মত্ত থাকেন। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছোঁড়াগুলো তো দিনের একটি বড় ভগ্নাংশ এখানেই কাটায়। আরও একশ্রেণীর লোকের কাছে এ দোকানটি খুবই প্রিয়। তারা কারা? ঘর-সংসারের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন ভবঘুরে বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষগুলো। পকেটে যাদের শনির দশা চলছে, ঠিক এমনি হতভাগোর দল শুঁড়ির অকথ্য অশ্রাব্য গালাগালি ও ঘাড়ধাক্কা খেয়েও একটু রঙ্গীন জলের লোভে বার বার শুঁড়ির দরজায় এসে ধর্ণা দেয় (এক গ্লাস অমৃতের আশায় কাতর মিনতি জানায়।

কই, শুঁড়িখানার মালিকটিকে তো দেখা যাচ্ছে না। এমন লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে দু'হাতে টাকা লুটছে কে সেই ভাগ্যবান! ঐ তো, ঐ তো কাকে দেখা যাচ্ছে দোকানের কর্মচারীদের ওপর খবরদারী করছে। পয়সাওয়ালা খদ্দের, ওর ভাষায় যারা লক্ষ্মীর বরপুত্র তাদের আশপাশ দিয়ে ঘন ঘন চক্কর মারছে।

হ্যাঁ, দোকানের মালিকই হ'বে হয়তো। অনুমান অভ্রান্ত। তবে এ যে এক দজ্জাল মেয়েছেলে,—হ্যাঁ মেয়েছেলেই তো দেখা যাচ্ছে। দোকানের মালিকানীই সে। গলা শুনে মনে হচ্ছে খুবই তুখোড় মেয়েছেলে, মুখ দিয়ে একেবারে খই ফুটছে। মাঝে মধ্যে বখাটে ছোঁড়াগুলোর দিকে গিয়ে বাজখাঁই গলায় গালমন্দ করছে। তাদের লক্ষ্য করে, নির্দ্বিধায় অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করছে। মদের দোকান চালাতে গেলে এরকম অভিধান বহির্ভূত শব্দ সম্ভার রপ্ত থাকা দরকার, সে যোগ্যতায় এতটুকুও ঘাটতি নেই মেয়েছেলেটির! মদের দোকান খোলার আগে দোকানের মালিককে হয়তো এ বিশেষ যোগ্যতাটি আগে আয়ত্তে আনতে হয়। এ-ব্যবসায় এটাই হয়তো যোগ্যতা মাপার অন্যতম মাপকাঠি?

ঐ যে মালিকানীর কণ্ঠ, বাজখাঁই গলা শোনা যাচ্ছে। কোন এক উচ্ছন্নে যাওয়া ছোঁড়ার পিতৃপুরুষ উদ্ধার করছে।

আর মদ্যপানরত মানুষগুলো?

হ্যাঁ, সবাই নীরব সঙ্কোচে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কারো মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

মালিকানী এত হম্বিতম্বি করছে। বাপ-মা তুলে গালি-গালাজ করছে, বাপ-ঠাকুরদাকে পর্যন্ত ছেড়ে কথা কইছে না। কই কেউ তো মুখ ফুটে একটা কথাও কইছে না। সামান্যতম প্রতিবাদের লক্ষণ পর্যন্ত ওদের হাবভাব আচার-আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে না তো? এই অপদার্থগুলোর কাছে যে এটা নতুন ব্যাপার নয়। বরং প্রায়শই এমনি নীরবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। আর না করেই বা উপায় কি? সময়-অসময়ে এই মালিকানীই তো তাদের একমাত্র সহায় সম্বল, নিদানের অবলম্বন। পকেটে কানাকড়ি না থাকলেও মালিকানী সময় মত বোতল ঠিক যোগান দেবেই। তবে মদের চাটস্বরূপ দু-চারটে কু-বাক্য প্রয়োগ অবশ্য করে থাকে! দীর্ঘমেয়াদি ধারে নেশা করতে হ'লে এটুকু তো হজম করতেই হবে। তাই অনন্যোপায় হ'য়ে আজও তেমনি নীরবে তার অভ্যর্থনাটুকু হজম করে চলেছে।

দোকানের দরজা দিয়ে কে একজন যেন টলতে টলতে বেরিয়ে এসে পথের ধারে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সামান্য শক্তিও যেন কে তার শরীর থেকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। দেয়াল ধরে বার বার ধাক্কা খেতে খেতে এসে রাস্তায় নামলো কাণ্ডজ্ঞান-লুপ্ত মাতালটি। তার দিকে তাকালেই মনে হয় মদই তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছে। নেশায় একেবারে বুঁদ।

লোকটি কোনক্রমে বার বার টাল সামলে নিয়ে একবারটি মালিকানীর মুখের দিকে আড় চোখে তাকাল। যাকে বল বক্র চাহনি। চোখের তারায় বিতৃষ্ণার সুস্পষ্ট ছাপ।

মালিকানী তার ভাবসাব দেখে হঠাৎ যেন আরও বেশী রকম রেগে গেল। গরম তেলে আচমকা জলের ফোঁটা পড়ল যেন। সে চোখ মুখ বিকৃত করে তার দিকে তাকাল। গিলে খাবে যেন।

লোকটা নেশার ঝোঁকে পরম বিতৃষ্ণায় ঠোঁট টিপে হাসল। সে হাসিতে নিদারুণ অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল।

রাস্তায় নেমে যাওয়া মাতালটিকে লক্ষ্য করে মালিকানী অশ্রাব্য ভাষায় বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে,—পাজি হতচ্ছাড়া পোড়ামুখো কোথাকার! মরার আর জায়গা ছিল না এতবড় দুনিয়াটায়! শেষ পর্যন্ত এখানে মরতে আসলি! আমার ঠ্যাঙের তলায় না এলে আর চলছিল না? পকেটে একটা কানা পেনিও যদি না থাকে, তবে মদ গিলতে আসতে লজ্জা করে না? তোর বাপ কি কবরে যাওয়ার সময় তোর মদ গেলার জন্য হাজার হাজার পাউণ্ড আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে নাকি রে হতচ্ছাড়া? যেন সাত পুরুষের জমিদারী পেয়েছে। মাতাল সাহেবটির নাম শ্লাই। সে এতক্ষণ নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত ছিল। মালিকানীর কথার জবাব দেবার সুযোগ ও মন কোনটাই তার ছিল না। সিঁড়ি ভেঙে সমতল রাস্তায় পা দিয়ে পিছন ফিরে মারমুখী মালিকানীর জবাব দিতে গিয়ে প্রথম মুখ খুললো, ওরে ধুমসী, শ্লাইরা তোর মত নচ্ছার

নয়। আমাদের বংশ-পঞ্জী ঘেঁটে দেখ গে যা—আমাদের পূর্বপুরুষ বীর রিচার্ড। তাঁর সঙ্গেই আমরা এদেশের মাটিতে প্রথম পা দিই। ওরে হতচ্ছাড়ি ধূমসী, তুই তার কতটুকু খোঁজ রাখিস? নোংরা মেয়েমানুষ কোথাকার!

মালিকানী পয়সা ছাড়া আর কিছুই জানে না পয়সাই তার কাছে মানুষের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। তুচ্ছ বংশ মর্যাদার ধার সে ধারে না। কর্কশ গলায় সে আবার ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে—খুব বংশের জঞ্জাল ঘেঁটে মরছিস, বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছিস। ফুটুনি রেখে গ্লাস ভেঙেছিস তার দামটা দিয়ে যা। এতই যদি নবাবের বংশধর বলে গলা চড়িয়ে বেড়াস তবে গ্লাসের দামটা ফেলে কথা বল। বুঝবো তোর মুরোদ কত। ল্যাজ নেই কুত্তার বাঘা নাম।

মাতালটা দু'পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! দাঁড়িয়ে পড়ল বললে ভুল হবে, দাঁড়াতে বাধ্য হল। নেশার ঘোরে চলতে গিয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল, টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার মালিকানীর দিকে তাকাল। ঠোঁট টিপে হাসল। তাচ্ছিল্যের হাসি।

শ্রাই মুখ খিঁচিয়ে বললো,—রেখে দে তোর গ্লাসের দাম একটা কানা পেন্সও পাবি না। ঘ্যানর ঘ্যানর রেখে চুপ করে শুয়ে পড়গে যা। খবরদার বলছি আমাকে আর জ্বালাসনে।

ঠিক আছে, আমিও দুষ্ট গরুর পাচনের খোঁজ জানি। এক্ষুনি যাচ্ছি তিন নম্বর পাহারাওয়ালাকে ডেকে আনছি। দেখা যাবে কত ধানে কত চাল। আমার গ্লাস ভেঙে আমাকেই চোখ রাঙাবে এমন সাহস এ তল্লাটে কার আছে?

মাতালটা বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় ঘাড় ঘুরিয়ে মালিকানীর দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের রেখা ফুটিয়ে বলল—তাই নাকি!

মালিকানী পূর্বস্বর অনুসরণ করে বলে উঠল,—হ্যাঁ ঠিক তাই। সময় মত দেখিয়ে দেব—

মাতালটি মুখ বিকৃত করে তাকে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—দেখিয়ে দেবে?

—হ্যাঁ, দেখিয়েই দেব।

—হুঁ! দেখিয়ে দেব! দেখিসে দেব!

—দেবই তো। একশ' বার দেব—হাজার বার দেখিয়ে দেব। সময় আসুক মজাটা টের পাবি, হারামজাদা নচ্ছার কোথাকার। তখন দেখবি মজাটা কেমন লাগে।

—দেখিয়ে দেবেন—মজা দেখাবেন। আমার মত লোককে তিনি মজা দেখাবেন। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ওর মাথার কিছু নেই, একেবারে পাগল হয়ে গেছে দেখছি।

মালিকানী বাজখাঁই গলায় গর্জে উঠল,—কী বললি মুখপোড়া? আমি

পাগল। পাগল হয়ে গেছি আমি? তোর বাপের মুখে নুড়ো জেলে দিতে যদি না পারি তবে আমার নাম ফিরিয়ে রাখব।

মুখ বিকৃত করে মাতালটি কোন রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করল—কি বললি? নাম ফিরিয়ে নাম রাখবি? হ্যাঁ তাই ভাল—তোর নামটা ঠিক যুতসই নয়, শুনতে কানে কেমন বাধে, মিষ্টতা একটু কম বোধহয়।

মালিকানী মুখ ঝাপটা দিয়ে উঠল,—আমার নাম নিয়ে এমন খিটকাল না করে তোর বাপেরও তো একটা নাম আছে রে হতচ্ছাড়া, যা না, ওটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যা খুশি কর না গিয়ে।

—তোরই তো সাধ হয়েছে নাম ফিরিয়ে রাখার। নইলে আমার কি দায় পড়েছে। তাছাড়া এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অঢেল সময়ও আমার হাতে নেই।

মালিকানী মুখ ঝাপটা দিয়ে উঠল,—হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। ফোকটে মদ গিলে নেশা করার সময় তো খুব আছে। লজ্জা করে না, ছোট লোক নচ্ছার কোথাকার!

শ্লাই রাগত ভাব নিয়ে ঘাড় ঘোরাল। মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে মালিকানীর দিকে তাকাল।

কথা বলতে ক্রোধন্মত্তা মালিকানী থপ্‌ থপ্‌ আওয়াজ তুলে চলে গেলো।

শ্লাই কিন্তু মোটেই ঘাবড়ালো না। বরং সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পূর্ব স্বর অনুসরণ করে জবাব দিলো,—যাকেই ডাক গে, আমার কচুটাও করতে পারবে না। আমি আইন মাফিক জবাব দেবো। তোর ভয়ে তাই বলে আমি পালাচ্ছি না। দেখি কি করতে পারিস। আমি এখানে জমে গেলাম। নিয়ে আয়, তিন চার পাঁচ। তোর আর যত নম্বরকে খুশি নিয়ে আয়।

কথা বলতে বলতে শ্লাই দোকানের সামনে রাস্তার ওপরই বসে পড়লো। মদের নেশায় ঝিমুনি আসলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়ে ঘুমও জুড়ে দিলো।

শ্লাই রাস্তার ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। মাথাটা বুকের দিকে ঝুঁকে পড়েচে। হাঁটু ভেঙে সাধ্যতম পেটের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে যাকে বলে কুকুর-কুণ্ডলী ভাব।

দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। নেশাগ্রস্ত শ্লাই-র মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও লক্ষিত হল না। একই ভঙ্গিমায় শুয়ে আগের মতই বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। এদিকে রাত্রি গভীর হতে চলেছে, সে সঙ্গে শীতও বেড়ে চলেছে। তাছাড়া আজ শীতটা একটু বেশী রকমই পড়েছে যেন রেষারেষি ভাব। এত শীতেও শ্লাই-র মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন নজরে পড়ছে না কিন্তু। আগের মতই নির্বিবাদে নাক ডাকিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হাড় কাঁপানো শীত তার ঘুমের এতটুকুও ব্যাগড়া দিতে পারছে না। তবে হ্যাঁ, তার মধ্যে যে পরিবর্তনটুকু নজরে পড়ছে, তা হচ্ছে তার নাদুস-নদুস শরীরের কুণ্ডলী পাকানো ভাবটা শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু বেশী রকম কুণ্ডলী

পাকাতে শুরু করেছে। দেখে মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণ এমনিভাবে চললে সে পুরো-পুরি একটা বৃত্ত সৃষ্টি করে ফেলবে।

হঠাৎ শিঙা বেজে উঠলো। বিকট স্বরে শিঙা হুঙ্কার নিয়ে উঠলো। কিন্তু হায়! গ্রাই যে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। শিঙার তীব্র আওয়াজ তার ঘুমের এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটাতে পারলো না। সে কিন্তু রীতিমত বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

এমন সময় একজন জমিদার তার ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে দোকানের সামনে হাজির হ'লেন। তাঁদের সবার হাতেই একটি করে তীর-ধনুক এবং সুতীক্ষ্ম মসৃণ বর্শা। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে মনে হয় তাঁরা সদ্য শিকার থেকে ফিরছেন, সঙ্গে তেজী শিকারী কুকুরের দলও রয়েছে। জমিদার শুঁড়িখানার দরজার সামনে পৌঁছেই বললেন—তোরা কোথায় গেলি, কুকুরটার দিকে একটু নজর দে। বেচারা কী পরিশ্রমটাই না করেছে! সিল্‌ভারের বাহাদুরী আছে, ঝোপটার কাছে গিয়ে বেটাকে ঠিক ধরে ফেললো! এমন কুকুর কখনও বেহাত করা যায়? বিশ-ত্রিশ পাউণ্ড দিলেও না।

জমিদার কথা ক'টা ছুঁড়ে দিয়ে শিকারী সঙ্গীদের দিকে তাকালেন।

প্রথম শিকারী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে জমিদারের মুখের দিকে তাকাল।

তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি জমিদারের নজর এড়ায়নি। তিনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে ছোট্ট করে বললেন—কি গো, তোমার চোখে-মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, কিছু একটা বলতে চাচ্ছ যেন?

প্রথম শিকারী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ছোট্ট ক'রে বলল—আপনার কথাটাকে ঠিক—

জমিদার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল,—কি? আমার সঙ্গে তুমি একমত হ'তে পাচ্ছ না? এ-রকম হওয়ার কথা নয় হে? যাক, কি ব্যাপার বল তো, কি বলতে চাচ্ছ তুমি?

প্রথম শিকারী ভীত-সন্ত্রস্ত মনে জমিদারের মুখের দিকে তাকাল। হাত কচলাতে কচলাতে এমন একটা ভাব করল যেন কিছু একটা বলতে চাচ্ছে, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠছে না।

জমিদার রীতিমত ধমকের সুরে বলে উঠলেন—কি ব্যাপার! চুপ করে রইলে যে বড়। তোমার কিছু বলার থাকলে—

প্রথম শিকারী জমিদারের কথার প্রতিবাদ ক'রে বললো,—এ কথা বলছেন কেন? আপনার বেলমান? বেলমানও সিল্‌ভারের চেয়ে কমতি কিসে? ভেবে দেখুন, গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেটা ঠিক বের ক'রে ফেললো। আমার তো মনে হয় বেলমানের কৃতিত্বই বেশী।

জমিদার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন,—তুমি একটি অপদার্থ—মূর্খ। একো আর একটু হুঁশিয়ার ও তৎপর হ'লে ওর মত এক ডজন কুকুরকে বগলে রেখে দিতে পারতো। দামের দিক দিয়ে বিচার করলে একো-র দামও ওর চেয়ে বেশী। সে যাই

হোক, ওদের ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর—সকালেই আবার শিকারে বেরোতে হবে। ওদের উপযুক্ত আহার ও বিশ্রাম দরকার, নইলে সবই ভেস্তে যাবে।

প্রথম শিকারী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জমিদারের মুখের দিকে তাকাল। তার চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ।

ব্যাপারটা জমিদারের নজর এড়ায় নি। তিনি বললেন,—কি হে, এমন করে তাকাচ্ছ কেন?

শিকারীটি সভয়ে জিজ্ঞেস করল—তাই নাকি হুজুর? জমিদার জিজ্ঞেস করলেন—কি? কিসের কথা বলতে চাচ্ছ?

—কাল সকালেই আবার বেরোতে হবে?

—হ্যাঁ, সকালে তো বেরোতে হবেই।

—আজ সারাটা দিন ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়েছে, এক মিনিটের জন্যও বসার সুযোগ পাওয়া যায় নি।

শিকার ক'রতে বেরিয়ে আবার শোয়া-বসা কিসের হে? যদি এতই আরাম-আয়েস তবে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে থাকলেই পারতে, শিকারে আসার শখ হ'ল কেন?

শিকারীটি ভীত-সন্ত্রস্ত মনে আবার বলল—না, আমি ঠিক তা বলছি নে।

—বলতে বাকিই বা কি রাখলে?

হুজুর, বলছি কাল সকালে বেরোনোর ব্যাপারটা যদি—

জমিদার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'লে উঠলেন—থাক খুব হয়েছে, আর কথা বাড়িয়ে দরকার নেই। এই গভীর রাত্রে, শীতের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অযথা সময় নষ্ট ক'রে দরকার নেই। যাও, তোমাকে যা বললাম, কর গে। রাত পোহাক আগে। সকাল হ'লে যা হোক চিন্তা করা যাবে।

শুঁড়িখানার সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে জমিদারের নজরে পড়লো গ্রাই বেহুঁশ অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে। তিনি চমকে দু'পা সরে গিয়ে বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ ক'রে বলল,—আহা! বেচারী একেবারে বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছে, কে লোকটি? উঁকি মেরে লোকটিকে চেনার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়ে বললেন,—লোকটি মদের নেশায় বুঁদ হ'য়ে পড়েছে, না কি মরেই গেছে! কে এই অপদার্থটি?

একজন শিকারী কৌতূহলী হ'য়ে ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা ক'রে বললো,—না হুজুর, বেঁচে আছে লোকটা, নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মদের গরম, তা না হ'লে এই ঠাণ্ডায় কেউ এমন বেহুঁশ হয়ে ঘুমোতে পারে?

জমিদার বললেন,—জানোয়ারটা কেমন কাচুমাচু হয়ে ঘুমোচ্ছে! আমি ওকে নিয়ে একটু মজা করব। ওকে নিয়ে গিয়ে যদি তুলতুলে নরম গরম বিছানায় শুইয়ে দেওয়া যায়, যদি গরম পোষাক ঢেকে দেওয়া যায় ওর আপাদমস্তক—আর শিয়রে রেখে দেওয়া যায় উপাদেয় নানা-রকম সুখাদ্য—তবে হতচ্ছাড়া জেগে উঠেই ওর অতীত জীবনের কথা একেবারে ভুলে বসবে।

শিকারীদের মধ্যে একজন অবিশ্বাসী দৃষ্টি মেলে জমিদারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—হুজুর।

জমিদার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি হে, তুমি কিছু বলবে নাকি হে?

—হুজুর, একী কথা বলছেন? লোকটাকে নিয়ে রাজার হালে রাখবেন?

—হ্যাঁ, ঠিক তা-ই।

—বেচারা লোকটার কি অবস্থা হবে একবারটি ভেবে দেখেছেন কি হুজুর?

জমিদার কোন কথা না বলে শুধুই ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

শিকারীটা আবার বলল—হুজুর, আপনি যা করতে চাচ্ছেন, তাতে লোকটার কী অবস্থা হবে ভাবলে আমার গা শিরশির করে উঠছে।

—আরে এই জন্যই তো আমি এটা করতে চাচ্ছি।

প্রথম শিকারী আগবাড়িয়ে বলে উঠলো—হুজুর, জেগে উঠেই বেটা একেবারে ঘাবড়ে যাবে। ভাল মন্দ বুঝে ওঠাই দায় হয়ে পড়বে ওর কাছে। মনে হবে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

জমিদার বললেন,—তাহোক। মনে হোক নচ্ছারটা স্বপ্ন দেখছে—বড্ড রঙীন স্বপ্ন দেখছে—অলীক স্বপ্ন। যাও ওকে ধরাধরি করে নিয়ে যাও। সুগন্ধি তেল মাথায় দিয়ে দাও। পরিয়ে দাও মূল্যবান সুদৃশ্য পোষাক, মাথার কাছে টাঙিয়ে দাও অশ্লীল যত সব ছবি। গায়কদের ঠিক করে রাখ ও জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন গান শুরু ক'রে দেয়। আর একটি কথা, জেগে উঠে ও যখন কথা বলবে, সবাই নতজানু হয়ে ওকে 'হুজুর' সম্বোধন করে বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেবে। কেউ একজন সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াবে—কোনটা পরতে হুজুরের মর্জি হয়? আর একজন এসে অভিবাদন করে হুজুরের ঘোড়া ও শিকারী কুকুরের সমাচার দেবে। আর একজন ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে খবর দেবে—হুজুরানী তো হুজুরের অবস্থা দেখে কেঁদেই আকুল। মনে রাখবে, সে যখন ভাববে সে একজন মহাপরাক্রান্ত আমীর-বাদশা তখনই বুঝবে আমাদের রঙ্গ-তামাশা জমে উঠেছে। তারপর ওকে নিয়ে চলবে আমাদের বিদ্রুপ হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-তামাশা আনন্দ ফুর্তি'র আসর উঠবে জমে। যাও ওকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে যাও—বিছানায় শুইয়ে দাও। জমিদার ভেতরে ঢুকলেন। এমন সময় অকস্মাৎ ভেরী বেজে উঠল। জমিদার ব্যস্ত হয়ে খানসামাকে বললেন, যা দেখে আয়, কার ভেরী বাজে।

জমিদারের নির্দেশে খানসামা ব্যস্ত হয়ে ব্যাপারটা দেখার জন্য বাইরে বেরিয়ে গেল। স্বয়ং জমিদারের নির্দেশ, অমান্য করার যো নেই।

জমিদার খানসামার ওপর দায়িত্ব দিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে চোখ-কানের বিবাদ মেটাবার জন্য এক পা-দু'পা ক'রে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার বাইরে গিয়ে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ব্যাপার দেখে তো একেবারে চক্ষুস্থির ! একদল লোককে বাজনা বাজিয়ে হৈ হুল্লোড় ক'রতে ক'রতে সেই দিকেই আসতে দেখতে পেলেন।

সেই খানসামাটিও বিস্ময় ভরা হৈ হুল্লোড়রত আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত করছে না। কে বা কারা আসছে, কারা আসছে খোঁজ করা তো দূরের কথা পা দু'টোকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তি সজোরে চেপে ধরেছে।

জমিদার কয়েক মুহূর্ত নীরবে ব্যাপারটি আঁচ করার চেষ্টা করে এক সময় হতাশ ব্যঞ্জক সুরে বললেন—কি হে কিছু বুঝতে পারছ?

খানসামা আগন্তুকদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেই ছোট্ট করে জবাব দিল—না। কিছুই তো বুঝতে পারছি নে।

—আমার কি মনে হচ্ছে জান?

খানসামা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আগের মতই ছোট্ট ক'রে বলল—কি?

—মনে হচ্ছে কোন জমিদার দলবল নিয়ে এদিকে আসছে।

—জমিদার?

হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে। তবে খুব বড় জমিদার বলেই মনে হচ্ছে। ঐ দেখ, কত সব উজ্জ্বল আলো, কত সব বাজনা বাজছে—লোকজনও নেহাৎ কম নয়।

—হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছেন হুজুর। অনেক লোকজন সঙ্গে রয়েছে। খুব বড় জমিদারই হবে বোধহয়। নইলে—

জমিদার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—বোধহয়—বলছ কি হে? খুব বড় জমিদার যে এতে কোন সন্দেহই নেই। থাক, ওরা কাছে এল বলে, আমি একটু এগোলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

জমিদার ভেবেছিলেন অন্য কোন জমিদার হয়ত বা সরাইখানায় আশ্রয় নিতে এসেছেন। পরে দেখা গেলো আসলে তা নয় এক অভিনেতার দল এসেছে।

অভিনেতারা এক এক ক'রে সরাইখানার ভেতরে প্রবেশ করলো। দলে সব বয়সের লোকই রয়েছে দেখা যাচ্ছে। যুবক বৃদ্ধ; অতিবৃদ্ধ তো রয়েছেই, এমন কি দু' একজন কিশোরও তাদের সঙ্গে রয়েছে। তবে কোন নারী নেই। পুরুষই নারীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে। কোন নারীকে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে রাজা অনুমতি দেন না। তাছাড়া গীর্জার পাদ্রী মশায়ের রক্তচক্ষু তো রয়েছেই। তাই বাধ্য হ'য়ে গীর্জার নির্দেশানুযায়ী নারীবর্জিত অভিনয়ের দল গড়তে হয়।

অভিনেতাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য ক'রে জমিদার বললেন,—তোমাকে কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে? তুমিই না চাষীর বড় ছেলের অভিনয় করেছিলে? ভারী চমৎকার অভিনয় করেছিলে। তোমার নামটা তো আমি ভুলে গেছি? কি নাম তোমার? কোথায় থাক?

একজন অভিনেতা জমিদারকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ক'রে বললেন,—আপনি বোধহয় সেতোর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই হবে হয়তো। যাক, তোমরা ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছ। আমি এখন রঙ্গ তামাশা দেখতেই চাই। একটা কথা বলছি শোন, এখানে মস্ত বড় এক জমিদার রয়েছেন, তিনি আজ রাত্রে তোমাদের অভিনয় দেখবেন। তিনি কোনদিন নাটক দেখেননি। তাঁর সামনে বেশী হাসাহাসি করবে না কিন্তু রেগে যেতে পারেন।

অভিনেতাদের মধ্যে একজন বললেন,—না, হাসবো কেন? উনি যতই ভাঁড়ামি করুন, আমাদের হাসাতে পারবেন না।

জমিদার অনুচরকে অভিনেতাদের ভেতরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন? আর তাঁর ভালোলাগা ছোকরা বার্থলোমিউকে দামী মেয়ের পোষাকে সেজে মাতালের ঘরে যেতে বললেন। আর এ-ও বলে দিলেন সে মাতালের সঙ্গে একান্ত অনুগতের মত ব্যবহার করে। ভাবে আচরণ-আচরণে যেন বুঝিয়ে দেন যে, সে মাতালেরই স্ত্রী—তারই অধীনা। কৃত্রিম সোহাগের দ্বারা মাতালের মন ভরিয়ে তুলতে হবে।

ছেলেটি জমিদারমশায়কে মাতালের সঙ্গে নিখুত অভিনয় করার প্রতিশ্রুতি দিলো।

জমিদার আশ্বস্ত হলেন। মনে তাঁর রাজ্য জয়ের আনন্দ। ভাবতে লাগলেন,—ছোঁড়াটি যখন মেয়ে সেজে মাতালেন সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীর মত অভিনয় করবে কী মজাই না তখন লাগবে। কী রঙ্গ তামাসাই না তাকে নিয়ে জমে উঠবে।

মাতাল শ্লাই নেশার ঘোর কাটিয়ে চাঙ্গা হয়ে বসেছে। তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক লক্ষ্য করে অনুচররা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে কেউ জলের পাত্র, কেউ বা বিলাসের সামগ্রী নিয়ে মোতায়েন। জমিদার সাহেবও নীরবে অদূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করছেন।

শ্লাই জাত মাতাল। জেগে উঠেই অনুচরদের বললো, আমাকে একটু মদ দিতে পার?

অনুচরেরা সবাই একসঙ্গে নতজানু হয়ে শ্লাইকে অভিবাদন জানাল।

শ্লাই বাস্ত সাব্যস্ত হয়ে তাকে এমনভাবে অভিবাদন করায় সে একটু অবাকই হল বটে। কিন্তু ব্যাপারটাকে তেমন একটা গায়ে মাখল না। মাতাল লোক—মদের কাঙ্গাল, মদ দিয়ে গলাটাকে অষ্টক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট। দুনিয়ায় কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এ-নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামানোর দরকার মনে করে না। অনুচরদের নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু রাগত স্বরেই বলে ওঠে,—কি ব্যাপার, সবাই পুতুলের মত দাঁড়িয়ে যে বড়? আমি এখন মদ খাব, একটু মদ দিতে পার আমাকে?

অনুচরদের একজন হাত কচলে বলল—হুজুর এখন মদ খাবেন? সবে মাত্র ঘুম থেকে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্লাই বলে উঠল হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মদ খাব। সেই কখন মদ খেয়েছি, গলাটা একটু ভিজিয়ে না নিলে আর পারছিনে। আমার নেশা চেপেছে, মদের নেশা চেপেছে, মদের নেশা, আমি মদ খাব। যাও তাড়াতাড়ি এক বোতল যোগাড় করতে পার কিনা দেখ।

অনুচরদের মধ্যে একজন একান্ত অনুগত ভৃত্যের মত মদের গ্লাস এগিয়ে দিলো। নতুন কোন নির্দেশের অপেক্ষায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। শ্লাই ব্যাপার দেখে চমকে উঠলো। ভাবলো আমি এক নিঃস্ব মাতাল, মদের দাম দিতে না পারায় কতদিন শুঁড়ির গলাধাক্কা খেতে হয়েছে। আজ এরা কারা এমন যত্ন করে আমাকে মদ ঢেলে দিচ্ছে। সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,—কী ব্যাপার ভাই? আমি তো ক্রিস্টোফার শ্লাই, আমাকে এমন করে হুজুর টুজুর কি সব বলছো? আর তোমরা এ-সব দিচ্ছ, এ যে দামী মদ। এত সব খাবারের ব্যবস্থা, শুধু একটু মাংস দাও, যদি পার। আর এত সব দামী পোষাকের আয়োজনই বা কেন? এ-সব পোষাক মানাবে কেন? পিঠে যে শুধুমাত্র প্রকৃতিদত্ত চামড়াই শোভা পায়। আর পায়ে? প্রকৃতি-দত্ত জুতো জোড়া পরলে বুড়ো আঙুল দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ে।

জমিদারমশায় আর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি চোখে-মুখে গাম্ভীর্য আনয়ন করে কুর্ণিশ করলেন। বিনয়ের সঙ্গে বললেন,—হুজুর, এত রসিকতা করছেন কেন? আপনার মতো এমন একজন লোকের পক্ষে এ রকম রসিকতা সাজে না।

জমিদারের কথা শুনে শ্লাই যেন রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল। সে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে জমিদারের মুখের দিকে তাকাল, পর মুহূর্তেই আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে করজোড়করত পরিচালকদের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু সে যত দেখছে ততই যেন বিস্ময়ের জালে জড়িয়ে পড়ছে।

জমিদারকে নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শ্লাই আবার বলল—আমি তো ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি নে।

জমিদার হাত কচলে পূর্বস্বর অনুসরণ করে বললেন,—কিসের ব্যাপার হুজুর? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আমরাও তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

—ঘুম থেকে উঠেই।

—হ্যাঁ, হুজুর ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই আপনার মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, ঘুম থেকে ওঠার পরই হঠাৎ সব কিছু যেন কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। আমি ক্রিস্টোফার শ্লাই। মদো মাতাল লোক। সারাদিন—

—হুজুর।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, মাতাল লোক আমি, সারাদিন মদে ডুবে থাকি। মদ ছাড়া যে লোক কিছুই জানে না—

হুজুর আপনার যেন ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই কেমন—

শ্লাই রাগত স্বরে বললেন,—তোমরা কি আমাকে পাগল ঠাওরেছো? আমি কি ক্রিস্টোফার শ্লাই নই? আর কি বুড়ো বার্টনহীথের ছেলে নই? জন্ম থেকে আমি ফেরিওয়ালা, শিক্ষায় কারিগর, আর পেশায় ভেড়া-চরিয়ে—বর্তমানে রাঙ ঝালাই করে বেড়াই। ইউনকটের ধুমসী শুঁড়িবেটি মেরিয়ান হেক্টকে জিজ্ঞেস কর, সে আমাকে চেনে।

সে অস্বীকার করতে পারে না, আমি চৌদ্দ পেনি তার কাছে ধারি। তা যদি না হয় আমাকে খৃষ্টানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী বলে সম্বোধন করবে। কথা শেষ করে সশব্দে মদের পাত্রে একটা চুমুক দিয়ে নিলো।

অনুচরদের মধ্যে একজন বলে উঠলো,—তাইতো ঠাকরুণ কাঁদছেন, দাস-দাসীরা মনমরা।

জমিদার মশায় আবার বললেন,—আপনার এরকম ব্যবহারের জন্যই তো আপনার আত্মীয়রা আজ আপনার সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন। আপনার পাগলামির ভয়ে দূরে সরে থাকে। আপনার বংশগৌরবের কথা একবার ভেবে দেখুন, ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করুন। দুঃস্বপ্ন ছেড়ে একবার ভেবে দেখুন তো পরিচারকরা কিভাবে প্রাণ ঢেলে আপনার সেবায় নিযুক্ত।

শ্লাই হাতের মদের গ্লাসটা সশব্দে টেবিলে রেখে রীতিমত রাগত স্বরেই বলে উঠল —তোমরা কি আরম্ভ করেছ! আমি যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

জমিদার চোখে মুখে কৃত্রিম ভয়ের ছাপ এঁকে করজোড়ে নিবেদন করলেন—হুজুর, আপনি কেন যে এমন করছেন ভেবে পাচ্ছি না। আমি আপনার দাসানুদাস, একান্ত অনুগত্য ভৃত্য। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, অনুগ্রহ ক'রে আপনি হেঁয়ালি ত্যাগ ক'রে স্বাভাবিক হোন।

শ্লাই ক্ষুব্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ার উপক্রম হ'ল—কী সব পাগলের মত বকছ! আমার মধ্যে অস্বাভাবিকতার কী দেখলে যে, তোমরা এমন ক'রে আমাকে বিরক্ত করছ। বিরক্ত বললে কম ক'রে বলা হ'বে এ রীতিমত অত্যাচার। তোমরা আমার ওপর এমন ক'রে নির্মম অত্যাচার শুরু করেছ কেন?

জমিদার কাচুমাচু ভাব ক'রে বললেন,—হুজুর আপনি মিছেই রাগের অপব্যবহার ক'রছেন।

—রাগের অপব্যবহার করছি!

—তা নয় তো কি হুজুর। অপরাধ নেবেন না, একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো, ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আপনি কেমন ব্যবহার শুরু ক'রেছেন।

—আমার এ-রকম আচরণ কি সত্যই অহেতুক?

—তা নয়ত কি হুজুর। আপনি এতবড় একজন জমিদার। কী দোর্দণ্ড প্রতাপ আপনার। আপনার অধীনস্থ প্রজারা আপনার ভয়ে সর্বদা কুঁকড়ে থাকে। আমরা এতগুলো দাস-দাসী আপনার আজ্ঞা পালন করার জন্য সর্বদা মোতায়েন থাকি। আপনার জন্য কিছু একটু করতে পারলে জীবন ধন্য মনে করি। আর—

জমিদারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্লাই ব'লে উঠল—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। নেশা আমি করি ঠিকই। কিন্তু গলা পর্যন্ত মদ গিললেও আমি কোন দিন বেহুশ হ'য়ে পড়েছি বলে তো মনে পড়ে না। আর আজ কিনা—

জমিদার হাত কচলে খুবই বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলেন—হুজুর, ঐ যে বললাম আজ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই আপনার মধ্যে কেমন মারাত্মক অস্বাভাবিকতা

দেখতে পাচ্ছি। কাল রাত্রে সুস্থ-স্বাভাবিক লোক, কত কথা বললেন। সকাল হ'ল, ঘুম থেকে জেগেই আপনি যেন অন্য মানুষ, একটামাত্র রাতের মধ্যে কী যে হয়ে গেল ঈশ্বরই জানেন।

অকস্মাৎ বাদ্যধ্বনি শোনা গেলো। জমিদার মশায় আবার বললেন,—দেখুন, কী সুন্দর বাজনা বাজছে, আর খাঁচায় নাইটিঙ্গেল গান ধরেছে। এখনো কি ঘুমোতে চাচ্ছেন? ঘুমোতে চাইলে বলুন, আপনাকে আরও আরামদায়ক নরম বিছানায় নিয়ে যাই। আর যদি পায়চারি করতে চান তবে মেঝেয় কোমল গালিচা পেতে দিচ্ছি। তাও যদি না চান তবে কি বেড়াতে যাবেন? ঘোড়া সাজাতে বলবো প্রভু? বাজ ওড়াবেন কি? আপনার বাজ তো ভোরের চাতককেও হার মানাবে। আর যদি শিকারে যেতে চান, শিকারী কুকুরের দল তৈরী করতে বলি। বলুন এখন আপনার কি মর্জি? আপনার আদেশ পালন করতে পারলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করবো।

একজন পরিচারিকা এগিয়ে এসে বললো,—যদি হুকুম করেন তবে সেরা সেরা ছবি এনে দি, আপনি প্রাণভরে ছবি দেখুন। এডোনিসের ছবিও আনতে পারি, স্রোতস্বিনীর পাশে দাঁড়ানো কুমার আর কুমারী শৈবালদলে লুকিয়ে। আনবো? দেখবেন?

পরিচারিকা আবার মুখ খুলল—আপনার ভাগ্যাহতা স্ত্রী আয়াকে আসতে বলবো কি? আপনি আমীর। রূপসী যুবতী স্ত্রী আপনার। গায়ে তাঁর অঢেল যৌবনের ছোপ, রূপের আভায় চোখ যেন ঝলসে যায়। আপনার জন্যে অষ্টপ্রহর চোখের জলে ভাসছেন তিনি।

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ, হুজুর আপনার প্রেয়সী, আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। আপনার এ-রকম মতিচ্ছন্ন ভাব দেখলে—

—আমার বিবাহিতা স্ত্রী? আমার জন্য ও দুঃখিত?

—হ্যাঁ, হুজুর। এটাই তো আপনার নতুন রোগ। শ্লাই হাত থেকে মদের গ্লাসটা টেবিলে রাখল। হাত বাড়িয়ে মদপূর্ণ বোতলটা টেনে নিল। একগ্লাস মদ ঢেলে ঠোঁটের কাছে তুলেও আবার নামিয়ে নিয়ে আসল। ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি টেনে বলল—আমার—স্ত্রী—আমার স্ত্রী আয়া?

পরিচারিকা হাত কচলে সবিনয়ে নিবেদন করল,—হুজুর, আপনার কিছু মনে পড়ছে না? হুজুরানীর কথা কি কিছুই আপনার মনে পড়ছে না?

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—কি হুজুর! কি বলতে চাচ্ছেন দয়া ক'রে বলে আমাকে ধন্য করুন।

—আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলতো তোমরা আমাকে কি পেয়েছ, আমাকে কি সত্যি পাগল ঠাওরেছ? নেশা টেশা একটু আধটু করি মিথ্যে নয়। একটু বলতে ভুল বলা হ'বে। সব সময় মদের গ্লাস নিয়ে পড়ে থাকি, মদের মধ্যে ডুবে থাকি সত্য। মদ আমি সর্বদাই খাই বটে, কিন্তু মদ আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও কব্জা করতে পারে নি।

—তবে হুজুর আপনি কেন অহেতুক এমন ক'রছেন, বলুন দেখি? আপনি আমাদের চিনতে পারছেন না, আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন দুঃখ নেই, কিন্তু হুজুরানী? আপনার সহধর্মিনী আপনার বিবাহিতা স্ত্রী, ওনার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করলে সেটা কি তাঁর পক্ষে অসহনীয় ব্যাপার নয়?

—আমার কাছে সব কিছু কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে, কুয়াশায় ঢাকা। আমি পাঁড় মাতাল, সব সময় মদের গ্যাস সম্বল ক'রে দিন কাটাই। বিয়ে করা তো দূরের কথা কোন মেয়ে মানুষের ধারে কাছেও কোন দিন যাই নি। এমন একজন নেশাখোর ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের আবার স্ত্রী, তাও আবার বিবাহিতা স্ত্রী!

—হুজুর, আপনার মত একজন আমীর যে কি করে—

শ্লাই সোজা হ'য়ে বসে বললো—কী বললে, আমি তবে আমীর, জমিদার? রূপসী স্ত্রী রয়েছে আমার! কি বলছো তোমরা? একি স্বপ্ন—না সত্য? কিন্তু আমি তো জেগে—তোমাদের সবাইকে দেখছি, সবই শুনছি। এ কেমন হলো। তোমরা বলতে চাচ্ছ আমি একজন জাঁদরেল লর্ড, রং ঝালাইদার নই? আমার নাম ক্রিষ্টোফার শ্লাইও নয়? তা-ই যদি তবে আমার সুন্দরী প্রেয়সীকে নিয়েই এসো।

মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত বালক-ভৃত্য শ্লাইয়ের স্ত্রী সেজে একদল অনুচরী সঙ্গে নিয়ে হাজির হ'লো।

স্ত্রী-বেশধারী বালক ভৃত্য বললো প্রভু, কেমন আছেন? সব মঙ্গল তো?

শ্লাই তার ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললো, তুমি আমার স্ত্রী? আমার সহধর্মিনী? তা-ই যদি হয়, প্রভু নয়—আমাকে স্বামী সম্বোধন কর, বল—আমার স্বামী, আমার প্রভু, তুমিই ইহকাল পরকাল, তুমিই আমার সর্বস্ব—আমি, তোমার একান্ত সাধ্বী স্ত্রী। আর তোমাকে আমি কি ব'লে সম্বোধন করবো? এলেম? না কি জোয়ানা? শ্লাই কথা বলতে বলতে আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললো, ওগো আমার প্রিয়তমা পত্নী, ওদের কথায় আমি পনেরোটা বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছি আমি স্বপ্ন দেখেছি।

শ্লাইয়ের স্ত্রী-বেশী বালক-ভৃত্য বললো—এই পনেরোটা বছর আমার কাছে তো মনে হয়েছে ত্রিশ বছর। আপনার শয্যা-সুখ থেকে বঞ্চিত রয়েছি।

শ্লাই বললো,—অনেক হয়েছে আর নয়। তোমরা সবাই এখান থেকে চলে যাও। আমি আমার প্রিয়তমাকে একা পেতে চাই।

সবাই ঘর থেকে অন্যত্র চলে গেলে শ্লাই দু'বাহু প্রসারিত ক'রে বললো—প্রিয়তমে, এসো, আমার শয্যায় এসো।

বালক-ভৃত্য হঠাৎ কেমন মুষড়ে প'ড়ে বললো,—স্বামী, আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আমাকে আরো দু'রাত সময় দিতে হবে, এক রাত তো অবশ্যই। কারণ আপনার ডাক্তারেরা বলেছেন—কিছু সময় আপনার শয্যা থেকে দূরে থাকতে হবে, নতুবা আপনার রোগ আবার বেড়ে যেতে পারে।

শ্লাই হতাশার সুরে বললো—কিন্তু আমার যে সবুর সইছে না সুন্দরী। আমি আর স্বপ্নে ডুবতে চাই না, রক্ত মাংসের তীব্র দহন আমি উপেক্ষা করতেই চাই—কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? তুমি—

শ্লাইয়ের কথা থামিয়ে দিয়ে এক অনুচর ঘরে ঢুকলো, সে বললো,—প্রভু, এক নাট্যকে দল আপনাকে অভিনয় দেখাবে বলে এসেছে। ডাক্তার বলেছেন দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, তারা মিলনান্ত নাটক অভিনয় করতে চায়। এতে যে আনন্দ পাবেন তা আপনার পরমায়ু বৃদ্ধি করবে। সব দিক থেকেই নাকি আপনার মঙ্গল হবে।

শ্লাই আবেগ মিশ্রিত সুরে বললো,—তবে তাই হোক, আমি এখন নাটকই দেখি। তারপর স্ত্রী-বেশী বালক-ভৃত্যকে বললো—প্রিয়তমে, তুমি এখানে এসো। আমার পাশে এসে বসো। তোমাকে পাশে নিয়ে নাটকের আনন্দ উপভোগ করি! কাছে—একেবারে, আমার গা ঘেঁষে বসো। এখানে—এই আসনে!

ভাগাহত শ্লাই। শ্লাই ভবঘুরে বাউণ্ডুলে মাতাল। সে ধনী জমিদারের রসিকতার খোরাক। তার দারিদ্র্য ও ছন্নছাড়া মাতাল স্বভাবই জমিদারের রসিকতার সুযোগ এনে দিয়েছে।

দুই

পাঠক চলুন এবারে আসল বক্তব্যে ফিরে যাই। ইতালীর অন্যতম শহর পাদুয়া, জ্ঞান ভাণ্ডার এই খ্যাতনামা শহর পাদুয়া। জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ও শাস্ত্রকারদের পীঠস্থান এই প্রসিদ্ধ নগর পাদুয়া। পাদুয়ার এক প্রান্তে নিরালা প্রান্তরে এক সুসজ্জিত উদ্যান রয়েছে। উদ্যানের এক পাশে একটি ওক কাঠের বেঞ্চে গা এলিয়ে বসে লুসেন-সিয়ো। তার পাশেই দাঁড়িয়ে তার গৃহভৃত্য এবং কয়েকজন অনুচর। লুসেনসিয়ো প্রবাসী, সে অন্য রাজ্যের বণিক ভিনসেনসিয়োর একমাত্র পুত্র, তার অগাধ সম্পত্তি। আর তার ভৃত্যটির নাম ত্রানিয়ো। সে ভৃত্য হ'লেও বন্ধু স্থানীয়। প্রয়োজন বোধে সে প্রভুর ছদ্মবেশ ধারণ করেও রসিকতা ক'রে থাকে।

লুসেনসিয়ো ভৃত্য ত্রানিয়োকে বললেন—ত্রানিয়ো, পাদুয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার অনেক দিনের সাধ ছিলো রূপসী সুন্দরী পাদুয়াকে দেখবো! আজ আমার বাসনা পূর্ণ হ'লো। এখানে আমি বিদ্যা শিক্ষা করবো। বণিক ভিনসেনসিয়োর পুত্র হ'বে বিদ্বান বুদ্ধিমান। পিসাও শিক্ষাকেন্দ্র আমাকে যা দিতে পারে নি পাদুয়া সে অভাব পূর্ণ করবে। এখানকার জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে আমি আমার জ্ঞান-পিপাসা মেটাবো।

ত্রানিয়ো হেসে বললো,—প্রভু, আপনি দর্শনের যে গভীর জ্ঞান আয়ত্ত করার চেষ্টায়

এখানে এসেছেন তাতে আমি মহা খুশী, কিন্তু নীরবে জ্ঞান আহরণ তো সম্ভব নয়। আপনি বরং মহাজ্ঞান তপস্বী য়্যারিস্তোতলের প্রতি অনুরক্ত হোন এবং মহাজ্ঞানী ওভিডের কাব্যে অনুরক্ত হয়ে উঠুন। কিন্তু তার জন্য চাই পরিচয়। আনন্দহীন বিদ্যা নৈরাশ্য আনয়ন করে। আনন্দ ও বিদ্যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

লুসেনসিয়ো সম্মতি জানাতে গিয়ে হেসে বললেন,—আমি শুধু বিদ্যার্জন করতেই আসিনি। মানুষের সঙ্গে পরিচয় মেলামেশার আনন্দের স্বাদটুকুও পেতে চাই। তুমি এক কাজ কর ত্রানিয়ো, একটি ভাল বাড়ি ভাড়া ক'রে পাদুয়ার পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ কর।

তাঁরা যখন কথা বলছিলেন এমন সময়ে পাদুয়ার এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের দিকেই আসছিলেন। ব্যাপ্তিস্তার দুটি মেয়ে। ক্যাথেরিনা ও বিয়াংকা নামে, মেয়ে দুটি সুন্দরী বলে এ অঞ্চলে পরিচিত।

ব্যাপ্তিস্তার সঙ্গে রয়েছে গ্রেমিয়ো এবং হর্তেনসিয়ো, এরা বিয়াংকার পাণি-প্রার্থী। পাদুয়ার সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি।

লুসেনসিয়ো তাঁদের দেখে বললো,—ঐ দেখ, কারা যেন আসছে, চল আমরা ঐ ঝাঁকড়া গাছের তলায় লুকিয়ে থাকি। নীরবে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করি।

লুসেনসিয়োর কথা শুনে ভৃত্যটি অকস্মাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তাদের এখানে এ অবস্থায় দেখতে পাবে স্বপ্নেও ভাবে নি। সে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে মনিবের দিকে তাকাল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লুসেনসিয়ো তাকে সে সুযোগ না দিয়ে রাগত স্বরে বলে উঠল—তোমার মত আহাম্মক তো দ্বিতীয়টি দেখিনি হে?

ভৃত্যটি মনিবের আচমকা ধমক খেয়ে হকচকিয়ে গেল। সে হাত কচলে সবিনয়ে নিবেদন করল—হুজুর। আপনার রাগের কারণ তো বুঝতে পারলাম না। আমি কি কোন—

কারণ বুঝে আর দরকার নেই। এখন এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে বকবক করার মত সময় নেই। চল, তাড়াতাড়ি চল, কোথাও লুকিয়ে পড়ি. এখনও সময় আছে।

লুসেনসিয়ো ভৃত্যকে নিয়ে গা ঢাকা দিলে উত্তেজিত ব্যাপ্তিস্তা সেখানে পোঁছোলেন। ব্যাপ্তিস্তা বিরক্তভাবে বললেন—কেন তোমরা আমাকে চটাচ্ছো? আমি তো বলেছি আমার বড় মেয়ের একটা হিল্লে না হ'লে ছোট মেয়ের বিয়ে দেবো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমার বড় মেয়ে ক্যাথেরিনাকে বিয়ে করতে রাজি থাক তবে বলো, তা না হ'লে আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

গ্রেমিয়ো উত্তর দিলো,—ক্যাথেরিনার পাণি-প্রার্থনা করার চেয়ে নদীতে ডুবে মরা শ্রেয়। যা মুখ তার—মুখে যেন খই ফোটে।—হর্তেনসিয়োকে বললো,—কি ভাই, তোমার চলবে নাকি মুখরা এ গুণবতী ক্যাথেরিনা'কে।

ক্যাথেরিনা ওদের বাক্যালাপ শুনে রেগে অগ্নি শর্মা। সে বললো,—বাবা, তোমার

কি ইচ্ছে ওদের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে দায়মুক্ত হও! ওদের মধ্য থেকে আমাকে সঙ্গী বাছতে হবে?

হর্তেনসিয়ো বললো,—সঙ্গীর কথা বলছেন কি কুমারী। আপনার মুখটির ব্যবস্থা না করতে পারলে তো জীবনেও আপনার সঙ্গী মিলছে না। মানে আপনার ঝাঁঝালো কথাগুলোকে সবাই যমের মতো ভয় করে।

ক্যাথেরিনা বাজখাঁই গলায় আবার খেঁকিয়ে উঠলো,—মশাইরা, আপনাদের ভয়ের কোনই কারণ নেই। জীবনেও আপনারা আমার মনের নাগাল পাচ্ছেন না।

আমাদের দরকার নেই তোমার মনের খোঁজ নেওয়ার। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লুসেনসিয়ো এবং ভৃত্য ত্রানিয়ো সব কিছু প্রত্যক্ষ করছিলেন। ত্রানিয়ো ফিসফিসিয়ে বললো—প্রভু, ব্যাপারটি বেশ জমে উঠেছে। মেয়েটি হয় বিকারগ্রস্তা না হয় পয়লা নম্বরের মুখরা। তার বোনটিকে দেখুন, কেমন নীরব ধীরস্থির।

ব্যাপ্তিস্তা এবার বললেন,—বিয়াঙ্কা,এবার তুমি বিদায় হও তো,আমার ঐ এক কথা।

ব্যাপ্তিস্তার কথা শুনে বিয়াঙ্কা আচমকা ঘাড় ঘোরালো। তার মুখের দিকে বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে বলল—কি বললে?

—কি আবার যা বলা উচিত তাই বলেছি। কি বলেছি। তা আবার জিজ্ঞেস করছ? তুমি কি কানে খাটো নাকি?

—না, কানে খাটো হ'তে যাব কেন? তোমার কথাটা কেমন নতুন ঠেকল, কানে বাজল—তাই—

—খুব অবাক লাগছে, তাই না?

—হ্যাঁ, অবাক লাগছে বটে। আমি কিন্তু এর জন্য মোটেই ভাবিত নই।

ব্যাপ্তিস্তা ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি হেসে ছোট্ট ক'রে বলল—তাই নাকি?

—তা ছাড়া আবার কি? আমি নিজেকে নিয়েই আনন্দে মশগুল হ'য়ে থাকব। নিজের আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকব। দুনিয়ায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হলেও আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।

—এ কী রকম কথা হ'ল? নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে তবুও—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, ঠিক তাই। নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হ'লেও আমার আনন্দের এতটুকুও ঘাটতি পড়বে না। আমি তোমাদের কাউকে চাই না। কারো সাহচর্যই আমার দরকার নেই।

—কারোরই নয়?

বিয়াঙ্কা বললো, ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি। আমি এখন থেকে বইপত্র আর বীণা নিয়েই দিন কাটাবো।

হর্তেনসিয়ো বললো,—সিনর ব্যাপ্তিস্তা, কেন এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন? আপনার প্রতিজ্ঞা তো বিয়াঙ্কার দুঃখ বাড়িয়ে তুলবে! বিয়াঙ্কার দিকে তাকান, আপনি অনুগ্রহ ক'রে মত পরিবর্তন করুন।

গ্রেমিয়ো বললো,—এই মুখরা মেয়ের জন্য কেন সে দুঃখ পাবে ?

ব্যাপ্টিস্তা গম্ভীর স্বরে বললেন—আমার এক কথা। আর আমার কথা ও কাজ একই জেনো।

বিয়াঙ্কা সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে বিদায় নিলো। কোন কথা বললো না শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চাপা শব্দ শোনা গেল।

ব্যাপ্টিস্তা আবার বললেন—সে ভালবাসে বীণা আর পুঁথি। ক্যাথেরিনা আমি তবে এখন চললাম, বিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে। আমার করণীয় অনেক কিছুই রয়েছে যা বিলম্বে নষ্ট হয়ে যাবে। কথা বলতে বলতে ব্যাপ্টিস্তা চলে গেলেন।

ক্যাথেরিনা এতক্ষণে মুখ খুললো,—ক্যাথেরিনা তো মুখরা, তাই না। তবে তো আমিও বিদায় নিতে পারি ? আমি বিদায় নিলেই তো আপনাদের শান্তি। কথা শেষ করে সে সশব্দে পা ফেলে এগিয়ে গেলো।

গ্রেমিয়ো খেঁকিয়ে উঠলো,—তুমি জাহান্নামে যাও।

হর্তেনসিয়ো বললো,—ওর কথা ছেড়ে দাও। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওর বোনের জন্য একটি স্বামী খুঁজতে হবে।

—কি বললে ? স্বামী ? স্বামী খুঁজতে হবে ?

—হ্যাঁ, ওর বোনের জন্য একটা স্বামীর খোঁজ করা আমাদের কর্তব্য ব'লেই মনে করি।

কি ? কর্তব্য ? কার কর্তব্য ? তোমার না আমার ?

—আমার তো নিশ্চয়ই। তবে তোমার কথা যদি বলি দোষটা কোথায়, শুনি ?

—দোষ অবশ্যই। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে ওর স্বামীর খোঁজ করো। আমাকে আর এর মধ্যে জড়িও না।

—তুমি খুবই চটে গেছ মনে হচ্ছে ?

—চটে যাই, আর না-ই যাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি আর রাজি নই। অবশ্য তুমি চাইলে—

—মাথা ঠাণ্ডা কর। এত সহজে সব কাজে মাথা গরম ক'রলে কি আর চলে, বল দেখি। যা বলি শোন, চার দিকে খবরা-খবর লাগিয়ে খুব জবরদস্ত দেখে একটা পাত্রের খোঁজ কর। এই মুহূর্তে একজনকে স্বামীরূপে পাওয়া খুবই দরকার। আমার অনুরোধ—

—স্বামী না, তার চেয়ে বল শয়তান খুঁজতে হবে। ওর বাপের মত পয়সা থাকলেও যে ওকে বিয়ে করবে সে পয়লা নম্বরের বোকা ছাড়া আর কিছু নয়।

—আমরা লোকটিকে সইতে পারবো না হয়তো, কিন্তু সে টাকার ঘোরে ওকে বিয়ে করে ফেললে, কি আর করবে ?

—তা হতচ্ছাড়াটার যৌতুক নেয়াও যা আর রোজ সকালে কোরো খাওয়াও একই কথা।

—ঠিকই বলেছো ভাই। পচা আপেল বাছাই করার চেষ্টা বাতুলতা। তবে আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে ওর বড় মেয়ের জন্য একটি পাত্র ধরে আনা। তবেই পথের কাঁটা দূরে হয়ে ছোট মেয়ের বিয়ের আর কোন বাধাই থাকবে না।

—বাঃ চমৎকার মতলব বের করেছ তো?

—তা নয় তো কি?

—আমিও তো তাই বলছি। চমৎকার মতলব বের করেছ। পথের কাঁটা যখন বড় মেয়ে, আগে কাঁটা সরাবার ব্যবস্থা করা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

—কথাটা যে মিথ্যে নয়, স্বীকার করছো তো?

—অস্বীকার করার উপায়ই বা কি বল? অনেক ভেবে চিন্তে বেড়ে মতলবটা বের করেছ, যাকে বলে সুচিন্তিত মতলব।

—আরে তুমিই বল না কেন? বড় মেয়ে যত দিন পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাকে রেখে ছোট্ট মেয়েকে তো পাত্রস্থ করবে না। অতএব আগে ছোট মেয়েকে ধরে টানা হেঁচড়া না করে, বড় মেয়ের সদ্গতির জন্য চেষ্টা করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

—সবই স্বীকার করলাম। কিন্তু এমন কোন করিতকর্মা পুরুষ রয়েছে যে ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাবে?

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু ভাববারই বটে।

একটু কী হে। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে ওর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে যেচে কাঁটার খোঁচা খেতে যাবে?

—আরে চেষ্টা তো করতেই হবে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।

—ঠিক আছে আমি রাজি। যে ওর সঙ্গে প্রেম করতে পারবে তাকে আমি পাদুয়ার সেরা ঘোড়াটি পুরস্কার দেবো।

কথা বলতে বলতে হর্তেনসিয়ো আর গ্রেমিয়ো বিদায় নিল।

এদিকে লুসেনসিয়োর অবস্থা বড়ই মর্মান্তিক, সে প্রথম দর্শনেই বিয়াঙ্কার প্রেমে মজে গেছে। সে তার প্রেমে অভিভূত। বিয়াঙ্কার রূপ ও যৌবনের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

লুসেনসিয়োর আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করে ত্রানিয়ো বললো,—কী সর্বনাশ! এ যে সত্যি সত্যি প্রেম সাধনা।

আমিও তো আগে এ রকম জানতাম, এখন দেখছি সবই সম্ভব। ত্রানিয়ো ওই কুমারীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, যদি ওকে না পাই আমার জীবনধারণ নিরর্থক। তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও কি করে রূপসী কুমারীকে পাওয়া যাবে।

—বুদ্ধি?

—হ্যাঁ, ত্রানিয়ো বুদ্ধি। আমি আজ বড্ড অসহায়। তুমিই এই মুহূর্তে একমাত্র সম্বল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কেন তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ত্রানিয়ো?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়।

—তবে?

—আমি যে এর কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিনে।

—তুমি বলছ কি গ্রানিয়ো?

গ্রানিয়ো সমবেদনা প্রকাশ করে বলল,—দেখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন। অসম্ভবের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, যা হয়তো বা কোনদিনই বাস্তবরূপ নেবে না।

—তুমি আমাকে এমন ক'রে হতাশ করে দিচ্ছ, সব আশা অঙ্কুরেই নির্মমভাবে পিষে দিচ্ছ।

কথাটা নির্মম হলেও খুবই যে সত্য এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আকাশ ছোঁয়া আপনার আশা।

—কেন? তুমি এমন ক'রে—

দেখুন আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেবার আগে বড় মেয়েটায় একটা গতি করা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কোন পুরুষ মানুষ তার সঙ্গে প্রেম করা তো দূরের কথা তার কথা মুখের কাছে দাঁড়ায় সাধ্য কি? আপনি তো সবই জানেন। এই পথের কাঁটাটির কথা চিন্তা করেই আপনার প্রেমের সার্থক রূপ দেওয়া চিন্তাকে অলীক কল্পনা বলে আখ্যা দিচ্ছি।

এত সহজে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়াকে আমি অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ বলব না। অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমার অন্তরের পবিত্র প্রেম যেন সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

—এখন আর কোন চিন্তার অবকাশ নাই।

—গ্রানিয়ো আমি ওর হরিণ-চপল চোখের তারায় আমার প্রতিমূর্তি দেখেছি! লাল ঠোঁটে দেখেছি প্রেমের আভা, ওর নিঃশ্বাসে রয়েছে অস্বাভাবিক মদিরতা। সব মিলিয়ে আমি দেখছি স্বর্গচ্যুত পূর্ণ-যৌবনা কুমারীকে।

—যদি সত্যি সত্যি আপনি ওকে ভালবেসে থাকেন তবে ওকে পাবার চিন্তা করুন। তবে বড় মেয়েটিকে বিদায় না করে তো আর ছোট মেয়ের কথা ভাবছেন না।

লুসেনসিয়ো বলে উঠলো—গ্রানিয়ো! কুমারীর পিতা কী নিষ্ঠুর—পাষণ্ড। শুনেছি তিনি ছোট মেয়েকে গান-বাজনা শেখানোর জন্যে মাস্টার রাখতে চাইছেন।

গ্রানিয়ো উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠল—তাই নাকি?

—তবে আর বলছি কি? মেয়েকে গান শিখিয়ে একজন সুগায়িকা ক'রে তোলার জন্য ভদ্রলোক খুবই উঠে পড়ে লেগেছেন।

—আচ্ছা, একটা কথা—

—কি?

—তিনি যে ছোট মেয়েকে গান শেখাতে চাচ্ছেন, এখবরটা কতখানি নির্ভরযোগ্য

বলে আপনি মনে করেন—

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস কথাটা সর্বৈব সত্য, সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরযোগ্য।

—তবে তো হয়েই গেছে। আপনি হবেন কুমারীর শিক্ষক। কিন্তু কথা হচ্ছে ভিনসেনসিয়োর ছেলে লুসেনসিয়োর ভূমিকা কে নেবে। লুসেনসিয়ো বললো—আমাদের তো আর এখানে কেউ-ই চেনে না। তুমি লুসেনসিয়ো এখন এক কাজ কর। আমার জোব্বাটি গায়ে চাপাও মাথায় দাও টুপিটি। এখন তুমি বিয়েন্দেলোর মনিব।

প্রভু-ভৃত্যে পোষাক পাল্টাপাটি করে নিলো। এমন সময় লুসেনসিয়োর কিশোর ভৃত্য বিয়েন্দেলো এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললো—এ কী ব্যাপার! আমার মনিব কোথায়? বেটা ত্রানিয়ো আপনার পোষাক চুরি করে জব্বর সেজেছে দেখছি: আরে আপনিও ওর পোষাক গায়ে চাপিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। ভারী মজার ব্যাপার তো।

লুসেনসিয়ো তাকে বাধা দিয়ে বললো,—দেখ, হে, রঙ্গ-রসিকতার সময় এটা নয়। প্রাণের দায়েই আমরা পরস্পরের পোষাক বদলে নিয়েছি।

জাহাজ থেকে নেমেই একটি লোকের সঙ্গে বিবাদ বাধায় উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছি। এখন গা ঢাকা দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হচ্ছে।

ত্রানিয়ো হেসে গোপন কথা ফাঁস করতে গিয়ে বললো—কথা হচ্ছে ব্যাপ্টিস্তা নামে এক ধনীর মেয়েকে প্রভু বিয়ে করতে চাইছেন।

লুসেনসিয়ো বললো—ত্রানিয়ো আর দেরি নয়, চল, তোমাকে লুসেনসিয়োর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, বিয়াঙ্কার পাণি-প্রার্থীদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। তারা সবাই স্থান ত্যাগ করলো।

শ্লাইকে দেখা যাচ্ছে। শ্লাইয়ের পাশে বসে তার স্ত্রী-র বেসে বালক-ভৃত্যটিকে দেখা যাচ্ছে। তারা নাটক অভিনয় দেখছে। শ্লাই নাটক দেখতে দেখতে ঝিমোচ্ছে স্ত্রী-বেশী বালক-ভৃত্য বললো—প্রভু, ঝিমোচ্ছ যে, নাটকটি তো বেশ ভালো বলেই মনে হচ্ছে। আর কত বাকী বল তো?

—সবেই তো শুরু হয়েছে। এখনই শেষ হবে কি।

—চমৎকার নাটক। কিন্তু এতক্ষণে শেষ হওয়া উচিত ছিলো।

এমন সময় পেক্রোচ্চিয়ো এবং তার অনুচর তাদের কাছে এলেন। পেক্রোচ্চিয়ো হচ্ছেন ভেরেনানগরবাসী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। সে হর্তেনসিয়োর বন্ধু। এখানে এসেছে বন্ধুর খোঁজ করতে। পেক্রোচ্চিয়ো বন্ধু হর্তেনসিয়োর নাম ধরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলো। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে হর্তেনসিয়ো বেরিয়ে এসে দেখে বন্ধু দরজায় দাঁড়িয়ে। সে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললে, —আমার কী ভাগ্য পেক্রোচ্চিয়ো যে! কী ব্যাপার, হঠাৎ কি মনে করে?

—আমার বাবা আন্তোনিও হঠাৎ মারা গেছেন। এখন আমাকে বিয়ে করে ঘর সংসার পাততে হবে। বাবা প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন—তাই থলে ভর্তি টাকা নিয়ে বেরিয়েছি পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখতে!

হর্তেনসিয়ো হেসে বললো,—তোমার যখন বিয়ে করার এত ইচ্ছে, এক কাজ করো। একটি মুখরা মেয়ে আছে বিয়ে করে ফেলো। মুখরা মেয়ের কথা শুনে এমন চমকে উঠছো কেন? অঢেল টাকার মালিক ওর বাবা। রাজি হয়ে যাও, আখেরে কাজে লাগবে।

দেখো ভাই তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। আমি চাই পয়সাওয়ালা এমন একজনের মেয়ে যে বিয়েতে প্রচুর খরচ করবে। তাতে মুখরা মেয়ে তো দূরের কথা বুড়ি থুরি হলেও ক্ষতি নেই। আমি চাই ধনীর মেয়েকে স্ত্রীরূপে পেতে।

—তাই নাকি? এটা কি তোমার মনের কথা?

—হ্যাঁ, নিছক মনগড়া কথা মোটেই নয়, সম্পূর্ণ মনের কথা।

—দেখ, অর্থের প্রতি তোমার একটা আলাদা আকর্ষণ সব সময়ই লক্ষ্য করেছি।

—অস্বীকার করব না, তোমার ধারণা অভ্রান্ত।

—অর্থের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও অর্থকে এমনভাবে পরমার্থ ভাবলে কি ক'রে শুনি? তুমি যা বলছ সে তো মারাত্মক কথা। মোটা টাকা হাতে পেলে তুমি একটি ঘাটের মড়াকে পত্নীরূপে ঘরে আনতে পার।

—হ্যাঁ, এটাও খুবই সত্য কথা। তুমি এমন একটা পাত্রী যোগাড় ক'রে দিয়েই দেখ না, আমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ ক'রতে পারি কিনা।

—আমি যদিও ঠাট্টা ক'রে কথাটা জুড়েছিলাম, কিন্তু স্ত্রী একটি জুটিয়ে দিতে পারি তোমাকে। মেয়েটি সত্যি মুখরা কিন্তু দু'হাত ভরে টাকা খরচ করবে তার বাবা। ভদ্রলোকের নাম ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা। আর মেয়ের নাম ক্যাথেরিনা মিনোলা। তার শান দেওয়া গলার জন্য পাদুয়ার সবাই এক ডাকে চেনে।

পেত্রোচ্চিয়ো মুহূর্তকাল কি যেন ভেবে বললো—তার বাপকে আমি চিনি মনে হচ্ছে, তবে তাকে চিনি না। কিন্তু তাই হর্তেনসিয়ো, ক্যাথেরিনাকে না দেখা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। তুমি সব কিছু ব্যবস্থা ক'রে আমার মনকে শান্ত কর। আমার উদ্‌ভ্রান্ত মনকে শান্ত করো ভাই।

—তাতে আর অসুবিধার কি আছে? মেয়ে রত্নটি তো তার বাপের কাছেই রয়েছে। আর ছোট রত্ন বিয়াংকা আমার মানসী, ক্যাথেরিনার বিয়ে না হলে লাইন পরিষ্কার হচ্ছে না। তুমি আগে ঝুলে পড়ো তারপর আমি দেখছি।

—তুমি অভয় দিচ্ছ?

—সে কী কথা! অভয় দিচ্ছি মানে? তুমি একটু আগ্রহ ক'রে এগিয়ে যাও, তারপর আমি দেখে নিচ্ছি।

—দেখে নিচ্ছি! মানে বলতে কি বোঝাতে চাও?

—তোমার কথায় আমার বুকের ভেতরটায় কেমন যেন কামারের হাঁপর চলতে শুরু

করেছে। তুমি আবার আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে না তো? মানে গাছে তুলে দিয়ে আবার মই কেড়ে নেবে নাকি হে?

—আরে তুমি আবার উল্টো মানে করে বসলে দেখছি। কী ফ্যাসাদরে বাবা! 'দেখে নিচ্ছি' মানে কেমন করে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় তা দেখে নিচ্ছি।

—তাই বল। আমি তো একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। যাক তুমি যখন অভয় দিচ্ছ, সব দিক থেকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, তোমাকে গোপনে একটা কথা বলছি।

—গোপন কথা? কি এমন গোপন কথা? বল তো, শুনি তোমার গোপন কথাটা কি?

হর্তেনসিয়ো এবার নিজের পরিকল্পনার কথা জানালো। সে যাবে মাস্টার সেজে, তাকে গানের মাস্টার হিসেবে তার বাবার কাছে পেত্রোচ্চিয়োর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যে গ্রেমিয়ো লুসেনসিয়োর সঙ্গে এসে হাজির হলো। তার নাম এখন ক্যাম্বিয়ো হয়েছে। তাদের আসতে দেখেই হর্তেনসিয়ো বললো—চুপ, এখন আর ও প্রসঙ্গ নয়। সে আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী।

হর্তেনসিয়োর কথাটা কানে যেতেই প্রেত্রোচ্চিয়ো হকচকিয়ে তাকাল। কি একটা বলতে যাচ্ছিল, পারল না। মনের কথা মুখফুটে আর বলা হয়ে উঠল না। অকথিত শব্দগুলো মনের গোপন কন্দরে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে আগন্তুকদের দিকে তাকাল। গ্রেমিয়ো ও তার সঙ্গী-সাথীরা ঘরে ঢুকছে।

গ্রেমিয়ো বলতে বলতে ঢুকলো—প্রেমের পুঁথিগুলো সব সুগন্ধি মাখিয়ে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেবো। আপনি প্রেমের পাঠ ছাড়া আর কিছুই পড়াবেন না।

ছদ্মবেশী লুসেনসিয়ো বললো—যাই পড়ান না কেন, আমি আপনার হয়ে সুপারিশ করবো।

হর্তেনসিয়ো অন্তরাল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বললো, মহামান্য গ্রেমিয়ো, চলেছেন কোথায়?

—চলেছি ব্যাপ্তিস্তার বাড়ি। বিয়াঙ্কার জন্য মাস্টার নিয়ে যাচ্ছি।

—তাই নাকি? আমিও যে একজন মাস্টার জোগাড় করেছি, তিনি বিয়াঙ্কাকে গান শেখাবেন। দেখা যাক আমাদের দুজনের মধ্যে কে সুন্দরী বিয়াঙ্কাকে লাভ করতে পারে।

—দেখ ভাই, আমাদের ব্যাপারটি পরে দেখা যাবে। আমি বিয়াঙ্কাকে পাবার রাস্তা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করেছি। এই ভদ্রলোক প্রচুর যৌতুক পেলে মুখরা ক্যাথেরিনাকে বিয়ে করতে চান। কোন কিছু গোপন না করে পাত্রীর সব দোষের কথাই তাঁকে বলেছি।

গ্রেমিয়ো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে পেত্রোচ্চিয়োর দিকে তাকালে সে বললো—হ্যাঁ, সব শুনেছি, সবই জানি। প্রচুর সম্পত্তি রেখে বাবা মারা গেছেন, সুদিনের প্রত্যাশায়

বিদেশে বেরিয়েছি।

গ্রেমিয়ো বললো,—তাই নাকি ? কিন্তু আপনার চিন্তাধারার যে এমন জীবন ঘোর অমিল। আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভেবে দেখুন, এমন বুনো বেড়ালকে জীবনসঙ্গিনী করবেন। প্রেম নিবেদন করবেন ?

—আরে রেখেদিন মশাই বুনোবেড়াল। কত দেখলাম, আর মেয়েছেলের ঠোঁটের ঘনা পিছিয়ে যাবো।

সবাই নিঃসন্দেহ হ'লো পেক্রোচ্চিয়ো মুখরা ক্যাথেরিনাকে বিয়ে করতে পারবে।

এমন সময় গ্রানিয়ো প্রভু লুসেনসিয়োর বেশে এসে হাজির। গ্রানিয়ো জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা বলতে পারেন ব্যাপ্তিস্তা মিনোলার বাড়ি কোন্ দিকে ?

গ্রেমিয়ো বললো,—কাকে চান বলুন তো ? ব্যাপ্তিস্তাকেই চান, না কি তাঁর মেয়েকে চান ?

—বাপ-বেটি দুজনকেই চাচ্ছি ।

হর্তেনসিয়ো জিজ্ঞেস করলো,—মহামান্য মহাশয় কি একজন পাণি-প্রার্থী ?

—যদি তা-ই হয় তাতে দোষ কি ?

—উনি আমার মনোনীতা বধূ।

গ্রেমিয়ো বলে উঠল,—আর উনি সিনর গ্রেমিয়োর প্রেমিকা।

গ্রানিয়ো বললো,—মশায়, এ আর নতুন কি শোনাচ্ছেন ! সুন্দরী মেয়ে হলে তার বহু পাণিপ্রার্থী থাকবেই। আমিও না হয় তাদের একজন হ'লাম।

হর্তেনসিয়ো জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা, আপনি কি ব্যাপ্তিস্তার মেয়েটিকে দেখেছেন ?

—না, তবে শুনেছি তাঁর দুটি মেয়ে আছে, একটি মুখরা আর একটি নম্রস্বভাবা, বিনয়ী ভদ্রস্বভাবা।

পেক্রোচ্চিয়ো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো,—দেখবেন মশায়, দয়া করে প্রথমটির দিকে নজর দেবেন না। ওটি দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

গ্রানিয়ো উৎসাহে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো,—আপনি কি মশায় মনের কথা বলছেন ?

—মনের কথা আর মুখের কথার গণ্ডীটুকু আমার জানা নেই মশায়।

গ্রানিয়ো কোন কথা বলল না, কেবল ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

পেক্রোচ্চিয়ো আবার বলতে লাগলেন,—সত্যি বলছি মশায়, এতটুকুও বানিয়ে বলছি না, ব্যাপ্তিস্তার বড় মেয়েটির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা রয়েছে, খুবই মনে ধরেছে আমার।

—কী ব্যাপার বলুন তো মশায়, হঠাৎ এমন মুখরা ধানী লঙ্কাটিকে কি ক'রে এমন ক'রে স্বপ্নের ঘোরে জড়িয়ে ফেললেন ?

গ্রানিয়ো কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছিল, ঠিক পেরে উঠল না।

ত্রানিয়ো কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল—মন ছোট-বড় মানে না, জাতিভেদের গণ্ডীকেও তুচ্ছবোধ ক'রে তা জানি।' কিন্তু মশায়, আপনি কিসের মোহে ঐ দজ্জাল মেয়েটার পায়ে নিয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন, মোটেই বুঝতে পারছিনে। নির্ভেজাল প্রেমে পড়লে নাকি মানুষ এমনভাবে অন্ধ হ'য়ে যায়, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে। আপনি কেন যে এমন হাবুডুবু খাচ্ছেন, বুঝতে পারছি নে।

—অতসব ব্যাখ্যা ক'রে বুঝান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমি তাকে চাই, নিতান্ত আন্তরিকভাবেই চাই।

—হ্যাঁ, আপনার কথায়ই তা প্রমাণ হচ্ছে।

—তাই যদি হয় তবে বড় মেয়েটিকে আমাকেই ছেড়ে দিন। ছোটটিকে যে খুশী নিন, যা খুশী করুন, আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বড়টিকে—

ত্রানিয়ো আগ্রহান্বিত হ'য়ে বললো,—যদি আপনিই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মানুষটি হন, তবে বড় মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে বিয়াঙ্কাকে মুক্তি দিন। আমার পথের বাধা ঐ বড় মেয়ে। যাক সবার সঙ্গে যখন পরস্পরের পরিচয় হ'লো, আসুন এক কাজ করা যাক, আমরা বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়ে একত্রে পানাহারের মধ্য দিয়ে আজকের বিকেলটাকে স্মরণীয় ক'রে তুলি।

ত্রানিয়োর কথায় সবাই সানন্দে সম্মতি জানাল। ওরা সবাই চললো পানাহার ও আনন্দস্ফূর্তির মধ্য দিয়ে সুন্দর বিকেলটিকে উপভোগ করতে।

তিন

ব্যাপ্টিস্তার বাড়ি। সুবৃহৎ অট্টালিকার একপ্রান্তে সুপ্রশস্ত কক্ষে দু'বোন ক্যাথেরিনা ও বিয়াংকা, ক্যাথেরিনা বিয়াংকার হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে টানাটানি করছে।

বিয়াংকা সুর করে কাঁদছে—আমাকে কেন নির্যাতন করছো, কেন আমার প্রতি অবিচার করছো? আমাকে ছেড়ে দাও। আমার জামাকাপড় সবই তোমার, বড়-র সম্মান রাখতে জানি আমি।

ক্যাথেরিনা দড়ি ধরে একটি হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো,—বল, বল হারামজাদি, তোর ঐ পাণি-প্রার্থীদের মধ্যে কাকে তুই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসিস? বল নাম বল? কাকে ভালবাসিস?

বিয়াংকা কেঁদে আকুল—তুমি বিশ্বাস কর কারো প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। কাউকেই আমি বিশেষ নজরে দেখি না।

—মিথ্যাবাদী, বাজে বকিস না, হর্তেনসিয়োকে তুই ভালোবাসিস না?

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা তুমিই জান, সত্যি আমার কোন আকর্ষণ নেই তার প্রতি। তুমি যদি ভালবাস আমি তোমার হ'য়ে তাকে বলতে পারি। যদি বল সর্বতোভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

—হারামজাদি, তোর টাকার মোহ, তবে গ্রেমিয়োকে তুই ভালবাসিস, তাই না?

—তুমি আমার বাঁধন খুলে দাও, বুঝেছি সেইজন্যই তুমি আমাকে এমন হিংসে কর। তোমার ভুল ধারণা। তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।

ক্যাথেরিনা আর বাক্যব্যয় না করে তাকে আবার অনবরত মারতে লাগলো।

ব্যাপার বুঝতে পেরে ব্যাপ্তিস্তা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। তিনি ক্যাথেরিনাকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে বললেন, এ কী করছিস, ছেড়ে দে। বিয়াঙ্কা—বিয়াঙ্কা! হতভাগী এমন ক'রে মারলি ওকে? তিনি তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন,—হতচ্ছাড়ি ওকে এমন ক'রে মারলি কেন? তোর কি সর্বনাশটা করেছে শুনি?

ক্যাথেরিনা গায়েব ঝাল বাপের ওপর ঝাড়তে লাগলো—বিয়াঙ্কা তোমার অমূল্য সম্পদ। সে-ই তোমার সর্বস্ব। ওর স্বামী চাই—ওকে বিয়ে দিতে হ'বে। আর আমি? আমি তার বিয়েতে আনন্দে ধেই ধেই ক'রে নাচবো তাই না? আমার সঙ্গে তোমাদের কোন কথা নেই। আমার কথা ভাবতে হ'বে না কাউকে। আমিও ছাড়বো না, সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ তুলব।

এমন সময় ব্যাপ্তিস্তা দেখেন কারা যেন বাড়ির ভেতর ঢুকছে।

ছদ্মবেশী লুসেনসিয়ো, গ্রেমিয়ো, পেত্রোচ্চিয়ো আর ছদ্মবেশী হর্তেনসিয়োকে প্রবেশ করতে দেখলেন। তাদের সঙ্গে ত্রানিয়ো লুসেনসিয়োর বেশে আর ভৃত্য বিয়েন্দেলো। হাতে তার কয়েকটি পুঁথি ও বীণা।

ব্যাপ্তিস্তা এগিয়ে গিয়ে তাদের সম্ভাষণ ক'রে ভেতরে এনে বসালেন। পেত্রোচ্চিয়ো দু'পা এগিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলো,—মহাশয়, শুনেছি ক্যাথেরিনা নামে আপনার একটি কন্যা আছেন। আমি ভেরেনাবাসী, তাঁর গুণের কথা শুনে এখানে ছুটে এসেছি তাকে দেখে আমি আমার চঞ্চল মনকে শান্ত করতে চাই, আপনি ব্যবস্থা করুন। অনুগ্রহ করে তাকে দেখার সুযোগ করে দিন?

ব্যাপ্তিস্তা বললেন,—আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমার মেয়ে ক্যাথেরিনা তো আপনার জন্য নয়।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি কি অযোগ্য? নাকি মেয়ের বিয়ে দেবার আদৌ আপনার ইচ্ছে নেই।

—আপনি আমাকে ভুল বুঝলে দুঃখ পাবো। যাক আপনার নাম—

—আমার নাম পেত্রোচ্চিয়ো, ইতালীর বিখ্যাত আন্তোনিয়োর পুত্র।

—আমি তাঁকে চিনি, তাঁর পুত্র হিসেবেও আপনি আমার অতিথি। তাঁদের কথার ফাঁকে গ্রেমিয়ো লুসেনসিয়ো-কে দেখিয়ে বললো,—এই ভদ্রলোক একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, গ্রীক, লাতিন ও আরো কয়েকটি ভাষায় দখল রয়েছে। তাছাড়া গানও ভালই গান। এঁর নাম ক্যাম্বিও। আপনি নির্দ্বিধায় একে গ্রহণ করতে পারেন।

ব্যাপ্তিস্তা সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন। ত্রানিয়োকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার পরিচয় তো পেলাম না। আপনার উদ্দেশ্য জানতে পারি কি? কে আপনি? কি

চান আমার কাছে ?

ত্রানিয়ো বললো,—আমি বহিরাগত, এখানে অপরিচিত। আপনার কন্যার পাণি-প্রার্থী হয়ে এসেছি। আমার বংশ পরিচয় পেলে হয়তো আমার হাতে মেয়েকে তুলে দিতে আপনি আপত্তি করবেন না। আপনার কন্যার শিক্ষার জন্য গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লিখিত এই ক'খানি বই উপহার এনেছি।

লুসেন্সিয়ো নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললো—আমি পিসার ভিনসেন্সিয়োর পুত্র, আমার নাম লুসেন্সিয়ো।

ব্যাপ্তিস্তা বললেন,—তিনি তো খুবই খ্যাতনামা, ধনীও বটে। আসুন আপনি আসন গ্রহণ করুন। তারপর পরিচারিকাদের ডেকে বললেন,—কে আছিস। অভ্যাগতদের ভেতরে নিয়ে যা, আমার মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবি। এঁরা সবাই শিক্ষক ওদের শিক্ষাদান করবেন।

পরিচারক এসে হর্তেনসিয়ো এবং লুসেন্সিয়োকে ভেতরে নিয়ে গেলো। অন্যান্য অতিথিরা ঘরেই রয়ে গেলো।

পেত্রোচ্চিয়ো ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললো,—মহাশয়, আমার সময় খুবই কম। বাবার আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় ঝুঁকি আমাকেই পোহাতে হচ্ছে। অতএব আপনি যদি আপনার মেয়েকে আমার হাতে দিতে চান তবে পাকা ক'রে ফেলুন। বলুন, মেয়ের বিয়েতে কি কি যৌতুক দেবেন।

ব্যাপ্তিস্তা বললেন,—যৌতুক তো পরে, আগে মেয়ের মন পান কিনা দেখুন। তা না হ'লে—

—তার জন্য চিন্তা করবেন না, আমার স্বভাবও তাঁর মতই উগ্র। শিশুর মত ভালবাসা আমি জানি না, তাঁকেও জানাতে পারবো না।

—ঠিক আছে—ঠিক আছে, তবে-তো কথাই নেই, সাবধান কটু কথার জন্য তৈরী থাকবেন কিন্তু।

—তৈরী থাকব কী মশায়! আমি তো তৈরী হয়েই বসে রয়েছি, যাকে বলে এক পায়ে খাড়া।

—বলা তো যায় না মশায়, মানুষের মন বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।

—আপনি কি ক্ষেপেছেন মশায়। সে রকম কোন সম্ভাবনাই নেই।

—তবে তো নিশ্চিন্ত। কিন্তু বলছিলাম কি, ওর কথাগুলো নিরস, ঝাঁজালো। দু'-চারটে বাক্যবাণেই যদি কাহিল হ'য়ে—

তার জন্য ঘাবড়াবেন না। হাজার কথায়ও তিনি আমাকে টলাতে পারবেন না।

এমন সময় হর্তেনসিয়ো গোমড়া মুখে তাঁদের সামনে হাজির হ'লো। তার মাথা ফেটে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

—আপনার একী শোচনীয় অবস্থা। পড়াতে গিয়ে কি কোন বিপদে পড়েছেন? আমার মেয়ে কি আপনার চেয়ে পারদর্শিনী? কি ব্যাপার। আমি কিছুই তো বুঝতে

পারছি না।

—দেখুন তিনি সঙ্গীতে পারদর্শিনী কিনা জানা নেই, তবে অচিরেই যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী হ'বেন এতে সন্দেহ নেই। তিনি বীণাটি আমার মাথায় ভেঙ্গে হাতের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

পেক্রোচ্চিয়ো বলে উঠলেন,—বাঃ। জবাব নেই, চমৎকার কথা! তার ওপর আমার ভালবাসা শতগুণ বেড়ে গেলো। যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলার—

বেশ, চলুন আমার সঙ্গে, আর মাস্টার মশায়, আপনি আমার ছোট মেয়েকে গান শেখান।

পেক্রোচ্চিয়ো ব্যাপ্তিস্তাকে বললো—আপনি ভেতরে যান, বরং কাউকে পাঠিয়ে দিন, আমি তার সঙ্গে যাচ্ছি। ব্যাপ্তিস্তা বিদায় নিয়ে চলে গেলে তিনি আপন মনে বললেন—আমি রীতিমত জবরদস্তি করেই প্রেম নিবেদন করবো। তিনি যদি চটে যান আমি তার চেয়ে নীচু গলায় বলবো। যদি আমার দিকে ভ্রূকোঁচকায় তবে আমি বলবো—তোমার চোখ দুটো ভোরের শিশির ধোয়া গোলাপ, তিনি যদি বোবা হ'য়ে বসে থাকেন, তবুও আমি তাঁর কণ্ঠস্বরের ভূয়সী প্রশংসা করবো। আমাকে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিলেও আমি বার বার ধন্যবাদ জানাবো তাঁকে। যদি বিয়ে করতে না চান, তবুও বলবো, কবে বিয়ে হ'বে? কিন্তু ঐ তো, ঐ তো তিনি আসছেন বলেই মনে হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে ক্যাথেরিনা ঘরে ঢুকছেন দেখে পেক্রোচ্চিয়ো হঠাৎ বলে উঠলো,—তোমার আজকের দিনটি শুভময় হোক। তোমার গুণের কথা অনেক শুনেছি। তোমাকে আমি পত্নীরূপে পেতে চাই! সেইজন্য তো আমি এতটা পথ ছুটে এসেছি।

ক্যাথেরিনা আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়ার মত দপ ক'রে জ্বলে উঠলো—শুনেছো ভালোই করেছো, এবার মানে মানে কেটে পড়ো। তোমাকে দেখেই তোমার মুরোদ বুঝে গেছি।

—তার মানে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—গাধা বোঝা বয়, আমার চোখে তুমিও তা-ই।

—মেয়েরাও তো বয়, মেয়ে তো তুমিও।

—মেয়েরা বোঝা বয় সত্য, তবে তোমার মত বোকা গাধাকে।

—পেক্রোচ্চিয়ো তবুও মুখের হাসি বজায় রেখে জবাব দিলো,—তুমি এমন চটে যাচ্ছো কেন? তুমি কি বোলতা নাকি?

—হ'তে পারি। সাবধান; হুল থেকে সাবধান।

যদি তা-ই হয় সে হুল আমি উপড়ে ফেলতে চাই। তোমার হুল তো রয়েছে তোমার জিভে।

অকস্মাৎ ক্যাথেরিনা দু'পা এগিয়ে গিয়ে পেক্রোচ্চিয়োর গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিলো!

পেক্রোচ্চিয়ো রাগে গজ গজ করতে করতে বললো,—যদি আমি পাল্টা ঘুঁষি মারি?

যাক, তুমি শান্ত হও, আমাকে তোমার পাণিপ্রার্থী ক'রে নাও। তুমি অহেতুক এমন রেগে যাচ্ছো কেন?

—কাঁকড়া দেখলে আমার এমনটাই হয়।

—আমি কাঁকড়া? তুমি কি আমার মুখের কথা বলছো?

—হ্যাঁ, একটি আয়না থাকলে তোমাকে দেখাতাম। যাক, বাজে বকার সময় নেই আমার, আমি চললাম।

পেক্রোচ্চিয়ো পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললো—না, যেতে দেবো না, যেতে পারবে না তুমি। আমার চোখে তুমি বড়ই কোমল স্বভাবা। অথচ নিন্দুকেরা বলে তুমি নাকি মুখরা। কিন্তু আমার চোখে তো তুমি ভদ্র, শান্ত, খুবই আস্তে কথা কও, কৌতুকময়ী তুমি ভ্রূকুটি জান না, চোখ লাল করতে জান না, তোমার মুখে একটিও কটু কথা নেই।

—মূর্খ, খুব হয়েছে, তুমি এখান থেকে দূর হও।

পেক্রোচ্চিয়ো হাল ছাড়ার পাত্র নয়। সে ততোধিক নরম সুরে বললো,—ডায়না শোভা পায় কুঞ্জবনে, আর সুন্দরী ক্যাথেরিনা শোভা পায় এই কক্ষে—আমার পাশে। ডায়না চঞ্চল, ছলনাময়ী,—তুমি পবিত্রা। দেখ ক্যাথেরিনা এবার কাজের কথায় আসছি। তোমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। যৌতুক-সম্বন্ধীয় কথাবার্তাও হ'য়ে গেছে। অতএব তোমার ইচ্ছে থাক আর না থাক, আমি তোমাকেই বিয়ে করব। আমি ছাড়া কেউ তোমাকে পোষ মানাতে পারবে না, তোমার জন্যই আমার জন্ম ক্যাথেরিনা। তোমার মারমুখী জঙ্গলীভাব কাটিয়ে তোমাকে আমি গৃহিনী ক'রে তুলবো।

আসর ভালোই জমেছে। এই তো ক্যাথেরিনা আর পেক্রোচ্চিয়োর প্রেমের প্রথম ধাপ। ক্যাথেরিনা বুনো ওল, আর পেক্রোচ্চিয়ো বাঘা তেঁতুল। প্রেমের দরবারে এ দুটো জিনিষের পাশাপাশি অবস্থান ঘটলেই হয় তো বা প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়—অশান্তির মেঘ কেটে গিয়ে শান্তি নেমে আসে।

এমন সময়ে ব্যাপ্তিস্তা, গ্রানিয়ো এবং গ্রেমিয়ো ঘরে প্রবেশ করলেন।

ব্যাপ্তিস্তা হাল্কাভাবে হেসে পেক্রোচ্চিয়ো-কে জিজ্ঞাসা করলেন—কি মশায়, কাজ কতদূর এগোলো? আমার মেয়ের সঙ্গে কতদূর এগোলেন?

ব্যাপ্তিস্তা'র কথাটা কানে যেতেই পেক্রোচ্চিয়ো প্রথমটা কেমন হকচকিয়ে গেল; কয়েক মুহূর্তে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল,—হ্যাঁ, এগোচ্ছে বটে।

তোমার কথায় কেমন যেন একটা হেঁয়ালির গন্ধ পাচ্ছি হে!

—এর মধ্যে আবার হেঁয়ালি দেখলেনটা কোথায় বলুন দেখি।

—বুঝতে পারছি আমার মেয়ের প্রেমঘটিত ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে তুমি একটু বিমর্ষ হ'য়ে পড়ছ, বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে—

তবে কি?

—আমি যখন উপযাচক হ'য়ে জিজ্ঞেস করছি তখন আর সঙ্কোচের কি-ই বা কারণ

থাকতে পারে। তোমাদের প্রেমের ব্যাপারে নির্দ্বিধায় আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে পার।

পেক্রোচ্চিয়ো মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে বললেন,—পিছিয়ে যাওয়ার লোক আমি নই মশায় তা ছাড়া ওটা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

—আসল কথাটা তো মশায়, বার বার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। আমি জানতে চাচ্ছি। কতদূর এগোলেন।

—অনেকটা। আমি এগোতে না পারলে তা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

—কি গো ক্যাথেরিনা?

ক্যাথেরিনা দপ করে জ্বলে উঠলো—বাবা, তুমি কোত্থেকে এক আধ-পাগলা ধরে এনেছো বল দেখি? একটা বদ্ধ পাগল, হাড়ে হাড়ে পাজি! ভাবে লম্বা লম্বা কথা দিয়েই কাজ গুছিয়ে নেবে।

গ্রানিয়ো বলে উঠলো,—ও মশায় এই বুঝি আপনার এগোবার নমুনা। কি সব বলছেন উনি।

—মহাশয়রা একটু ধৈর্য ধরুন। আমি নিজে ওকে আমার প্রেমিকা রূপে পছন্দ করেছি। আমরা নিজেদের মধ্যে যা খুশি বলাবলি করবো। আপনাদের নাক গলাবার দরকার দেখছি না তো। পেক্রোচ্চিয়ো বেশ রাগত স্বরেই বললো। এবার ব্যাপ্তিস্তাকে লক্ষ্য করে আবার বলতে শুরু করলো,—দেখুন, আমাদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। অন্যের সামনে যে মুখরাই থাকবে এমন ব্যবহারই করবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাকে সে খুবই ভালবাসে, আমাকে ছুঁয়ে সে শপথ করেছে। আপনারা তো অবিবেচক, কি করে বুঝবেন, যখন সে একা থাকে, তখন কত শান্ত সে। যাক দেরী হয়ে যাচ্ছে; আবার ভেনিসে ছুটতে হবে বিয়ের পোষাক আনতে। আপনি এদিকে আমাদের বিয়ের আয়োজন করুন, অতিথিদের নিমন্ত্রণ করুন।

ব্যাপ্তিস্তা বললেন—আমার কেমন সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। কি যে বলবো বুঝতে পারছি না। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

পেক্রোচ্চিয়ো সকলকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বললো—তবে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। রবিবার শুভ লগ্ন, আর সময় নেই, আমাকে ভেনিসে গিয়ে বিয়ের আংটি ও জামাকাপড় সংগ্রহ করতে হ'বে। কথা বলতে বলতে উপস্থিত সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে দ্রুত চলে গেলো।

ব্যাপ্তিস্তা বিস্ময়ভরা চোখে পেক্রোচ্চিয়োর ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,—আজ এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে; আমি যেন সেই সওদাগর,—যে অনন্যোপায় হয়ে এক দোকান খুলে বসেছে। এখন পসরা বিক্রি হলেই সে বর্তে যায়।

গ্রেমিয়ো উৎসাহিত হয়ে বললো,—ঈশ্বর আপনার সহায় হোন! যাক, আপনার বড় মেয়ের একটা হিল্লে হতে চলেছে, এবার আমি ছোট মেয়ের পাণি-প্রার্থনা করছি। আপনার প্রতিবেশী হিসেবে আমার প্রার্থনা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

ত্রানিয়ো ব্যস্ত হয়ে বললো,—বিয়াঙ্কার প্রতি আমার ভালোবাসা তো মুখের কথায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার বাবা'র রয়েছে বিরাট কয়েকটি জাহাজ ও বাণিজ্যতরী। নগদ অর্থের পরিমাণও নেহাৎ কম নয়।

গ্রেমিয়ো বলে উঠলো,—ছোকরা তুমি এত কপচাচ্ছ কেন? ভালবাসার বোঝটা কি তুমি? ভালবাসা, ভালবাসা করে চেঁচালে তো আর ভালবাসা যায় না হে।

ত্রানিয়ো ক্রুদ্ধভাবে বললো,—আমি বুঝবো না তো তুমি বুঝবে বুড়ো হাবড়া কোথাকার?

ব্যাপ্তিস্তা দেখে ব্যাপার সুবিধের নয়। সে উপায় না দেখে বলল, তোমরা বিবাদ রাখ, যে বেশী যৌতুক দিতে পারবে সে-ই আমার মেয়ে বিয়াঙ্কাকে লাভ করবে।

গ্রেমিয়ো তাঁর ঐশ্বর্যের বিবরণ দিলো। ত্রানিয়ো লুসেনসিয়োর হ'য়ে বললো যে, সে পিসার মহাধনবান বণিকের সন্তান। জমিদারির আয়তো রয়েছেই, সে সঙ্গে দু'সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তার ভাণ্ডারে সর্বদা মজুত থাকে।

গ্রেমিয়ো হতাশ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালো। ভাবছে আমার এত সম্পত্তি কোথায়? আমার তো কিছুই নেই দেবার মত। আমি শুধু আমার মুক্ত পবিত্র মনটুকু দিতে পারি। এছাড়া আর আমার তো কিছুই নেই।

ত্রানিয়ো ব্যাপ্তিস্তার দিকে তাকিয়ে বললো,—আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিয়াঙ্কা আমার। আমিই বিয়াঙ্কার যোগ্যতম পাত্র।

ব্যাপ্তিস্তা বললেন,—তুমি যোগ্যতম পাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তুমি মরলে বিয়াঙ্কা কি পাবে? তখন তার কি উপায় হবে, কোথায় দাঁড়াবে সে? তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, আমি বাধ্য হচ্ছি এ-কথা বলতে।

ত্রানিয়ো রীতিমত হায় হায় করে উঠল—সে কী মশায়! আপনি এটা কী ক'রে বললেন?

—কেন? অযৌক্তিক কোন কথা বলেছি কি?

—আপনার মুখ থেকে এ-কথা শুনব আশা করিনি। আপনি—

ত্রানিয়োরমুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্যাপ্তিস্তা বলল,—আমি তো তোমাকে বললামই, অনন্যোপায় হ'য়েই এ-কথা আমাকে মুখ ফুটে বলতে হয়েছে। আমি মেয়ের বাবা—

—হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই।

—মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই নির্মম হলেও মুখ ফুটে আমাকে বলতেই হ'ল।

ত্রানিয়ো হতাশ সুরে বললো,—গ্রেমিয়ো বৃদ্ধ, আর আমি যুবক।

ব্যাপ্তিস্তা বললো,—মৃত্যুর কাছে বৃদ্ধ আর যুবকের তফাৎ কোথায়? সেখানে তুমি আমি সবাই সমান। একদিন সবাইকে মরতে হবে। যৌতুক সম্বন্ধে নিশ্চিত কথা দিতে পারলে তুমি পরের রবিবার বিয়াঙ্কাকে লাভ করতে পারবে। তা না হলে বিয়াঙ্কা হ'বে 'গ্রেমিয়ো'র সহধর্মিনী। কথা শেষ ক'রে ব্যাপ্তিস্তা দ্রুত পায়ে গৃহত্যাগ করলো।

ত্রানিয়ো আড়চোখে গ্রেমিয়োর দিকে তাকিয়ে দাঁতে ঠোঁট চেপে বললো,—ওরে ধূর্ত

শেয়াল, তোকে আমি জব্দ করবোই। আমি যখন ছদ্মবেশী লুসেনসিয়ো হ'তে পেরেছি ছদ্মবেশী বাপ যোগাড় করতে কতক্ষণ। তারপর দেখে নেবো তুই কত শক্তি ধরিস। এখন আমার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে একজন ছদ্মবেশী বাপ যোগাড় ক'রে ব্যাপ্তিস্তার সামনে হাজির করা। তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোনদিকে গড়ায়।

চার

শিক্ষা-পর্ব শুরু হয়ে গেছে। বিয়াঙ্কার শিক্ষকের ভূমিকায় হর্তেনসিয়ো এবং লুসেনসিয়ো। শিক্ষক তো নয়; প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী। শিক্ষাদানকে উদ্দেশ্য ক'রে প্রেম-নিবেদনের সুযোগ ক'রে নেওয়া।

লুসেনসিয়ো বললো—বীণার ঝংকার আমি অপছন্দ করি না, একটু ধীরে বাজাও।

হর্তেনসিয়ো বিরক্তভাবে জবাব দিলো,—আমি কলার সাধনা করি। আমার দাবী তো সর্বাগ্রে। বরং তোমার ব্যক্তিকেই একটু কম দিলে ভালো হয়।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে পুরোদমে বচসা শুরু হয়ে গেছে দেখে ছাত্রী বিয়াঙ্কা হেসে বললো—আপনারা কিন্তু আমার ওপর দ্বিগুন অবিচার করছেন। আমার তো আর স্কুলের ছাত্রদের মতো পড়ার জন্য সময় বাঁধাধরা নেই। আমি যখন মন চায় গান গাইবো, মন চাইলে আবার বই নিয়ে বসবো। লুসেনসিয়োকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, আপনি পড়াতে শুরু করতে পারেন, আমি তৈরী।

লুসেনসিয়ো লাতিন ভাষা পড়াতে গিয়ে বললো,—আমার সঙ্গে সঙ্গে বল,—আমি লুসেনসিয়ো, পিসায় আমার বাড়ি, তোমার ভালবাসার ভিখারী হ'য়ে ছদ্মবেশে এসেছি। ঐ যে লুসেনসিয়ো তোমাকে প্রেম নিবেদন করতে আসে, আমার অনুচর —নাম ত্রানিয়ো।

হর্তেনসিয়ো তাড়াতাড়ি বীণায় সুর বেঁধে বললে,—নাও, বাজনা শুরু কর। অনেকটা সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে, আর নয়।

বিয়াঙ্কা বীণাটির তারে কয়েকবার আঙ্গুল বুলিয়ে বলে উঠলো,—কি করলেন? এ যে একেবারেই বেসুরো হ'য়ে গেছে। আপনি আগে ভালো ক'রে সুর বাঁধুন, আমি ততক্ষণ দু'পাতা পড়ে নি। এবার আমার লুসিয়ো মাস্টার মশায়ের পালা,—আপনি পড়াতে শুরু করুন।

বিয়াঙ্কার আগ্রহে হর্তেনসিয়ো আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললো,—ওগো ক্যাম্বিয়ো মশায়, এবার আপনি একটু ঘুরে আসতে পারেন।

লুসেনসিয়ো বিড়বিড় করে বললো—মশাই দেখছি একেবারে নিয়ম মেনে চলেন। ঠিক আছে, অপেক্ষা করছি।

হর্তেনসিয়ো বিয়াঙ্কাকে বললো, আপনি আমার আঙ্গুলের সঞ্চালন দেখুন। আর

এক কাজ করুন—স্বরলিপিটা আগে পড়ে নিন।

বিয়াঙ্কা অনুচ্চস্বরে শিক্ষকের নির্দেশিত স্বরলিপি পাঠ করতে লাগলো।

এমন সময় বিয়াঙ্কার এক পরিচারক এসে বললো,—দিদিমণি,কর্তা আপনাকে ঘর সাজানোর জন্য বলে পাঠিয়েছেন, কাল আপনার বড় বোনের বিয়ে হচ্ছে।

বিয়াঙ্কা পিতার আদেশে ঘর সাজাতে চলে গেলো। লুসেনসিয়ো ভাবলো তবে আমি আর শুধু শুধু বসে থাকি কেন? আমিও বিদায় নিই। হর্তেনসিয়ো একা বসে বসে ভাবছে—পণ্ডিত বেটার পাকামো ভাঙতে হ'বে। নচ্ছারটা বড্ড বেশী রকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

ব্যাপ্তিস্তা তার বাড়ির সমনে পায়চারি করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেমিয়ো, ত্রানিয়ো, ক্যাথেরিনা, বিয়াঙ্কা, লুসেনসিয়ো এবং কয়েকজন অনুচর সেখানে হাজির হ'লো।

আজ ক্যাথেরিনা ও পেক্রোচ্চিয়োর বিয়ের দিন। কিন্তু পেক্রোচ্চিয়োর দেখা নেই। এদিকে সবাই প্রস্তুত, কিন্তু বর না এলে বিয়েটা হবে কার সঙ্গে? নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজনও সবাই এসে গেছে, পুরোহিত তাঁর পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, ব্যাপ্তিস্তা ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ ক'রে মহা সমস্যায় পড়লেন। তিনি উদ্ভ্রান্তের মত পায়চারি করতে করতে বললেন,—এ কী লজ্জার কথা! লোকের কাছে মুখ দেখাই কি করে?

বিষধর সর্পিনী ক্যাথেরিনা ফোঁস করে উঠলো—লজ্জা তো তোমাদের নয়, লজ্জা আমার। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে জুড়ে এখন লজ্জায় মাথাকাটা যেতে বসেছে ও তো একটি ক্ষ্যাপা, যেমন চট ক'রে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, পিছিয়ে যেতেও পারে যে কোন মুহূর্তে। এ ধরনের মানুষগুলো নিজেদের আমোদপ্রিয় মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে হাজারবারও প্রেম করতে পারে। এখন আমার উপায় কি? সবাই আঙ্গুল তুলে বললে ঐ—ঐ তো ক্ষ্যাপা পেক্রোচ্চিয়োর হবু বৌ। কী লজ্জা! কী লজ্জা। ক্যাথেরিনা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলো।

ব্যাপ্তিস্তার ব্যাথাতুর মন গুমরে উঠলো—বেচারী তো কাঁদবেই। এমন আঘাত পেলে কান্না তো এমনিই বেরিয়ে পড়ে।

এমন সময় বিয়েন্দেলা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো পেক্রোচ্চিয়ো এসে গেছে! কী চমৎকার তার বেশভূষা। মাথায় নয়া একটি টুপি, গায়ে পুরোনো কুর্তা, পুরানো ব্রিচেস, পায়ে চকচকে এক জোড়া দামী জুতো। এক পায়ে বকলেস আর এক পায়ে ফিতে বাঁধা। একটি মরচে ধরা তলোয়ার জোগাড় করেছেন কোত্থেকে, শহরের অস্ত্রাগার থেকে হ'বে হয়তো, তার বাঁট আবার ভাঙা। সঙ্গে একজন নফরও রয়েছে, সে প্রথমে ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিলো।

ব্যাপ্তিস্তা আশ্বস্ত হয়ে বললেন,—সে যা হোক, তবু সে এসেছে।

এমন সময় পেক্রোচ্চিয়ো আর গ্রেমিয়ো সেখানে হাজির হ'লো।

পেক্রোচ্চিয়ো এসেই বললো,—কোথায়, আমার প্রিয়তমা কোথায়? কোথায় আমার

মনের মানুষটি ?

ব্যাপ্টিস্তা বললেন—আজ তোমার বিয়ের দিন। এত দেরী করলে? তোমার আসতে দেরী দেখে আমরা তো হতাশ হয়েই পড়েছিলাম। এখন হতাশ হচ্ছি তোমার সাজ-পোষাক দেখে। ও পোষাকে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ভদ্রলোককে মানায় না, বিশেষ করে বিয়ের দিনে তো নয়-ই।

পেক্রোচ্চিয়ো গম্ভীর স্বরে জবাব দিলো—কথাটি হয় তো শুনতে খারাপ শোনাবে। আমি শুধু মাত্র আমার কথা রাখতে এসেছি। এখন ওসব কথার সময় নয়। অবসর সময়ে সব বলবো। বেশ কয়েকদিন আমার রূপসী প্রিয়তমা'কে দেখি নি। এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে; গীর্জায় যেতে হবে।

ত্রানিয়ো বললো,—ঠিক আছে, সব ব্যবস্থাই হ'বে। কিন্তু একটি কথা, পোষাকটি পাল্টে নিন তাড়াতাড়ি, এ-বেশে ভাবী স্ত্রীর সামনে যাবেন না। এ-বেশে বিয়ের আসরে যেতে ক্যাথারিনা আপত্তি জানাবে।

পেক্রোচ্চিয়ো তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো—কী বোকা আমি, শুধু শুধু আপনাদের সঙ্গে বকবক ক'রে সময়ের অপব্যয় করছি। আমি চললাম আমার প্রিয়তমার কাছে।—কথা বলতে বলতে সে ভেতরের দিকে পা বাড়ালো। গ্রেমিয়ো তাকে অনুসরণ করলো।

ব্যাপ্টিস্তা পড়লেন মহা সমস্যায়। তিনি ভাবলেন ভেতরে গিয়ে ব্যাপার লক্ষ্য করা দরকার। ক্ষ্যাপা পেক্রোচ্চিয়ো নতুন ক'রে ঝামেলা বানিয়ে দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

লুসেনসিয়ো এবং ত্রানিয়ো কেবল সেখানে রয়ে গেলো। ত্রানিয়ো বললো,—কুমারীর ভালোবাসা পেতে পারেন, কিন্তু সুন্দরীর বাবার একটি শর্ত রয়েছে, আপনাকে আগেও অবশ্য বলেছি। এমন একজন চাই যাকে আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী ক'রে নেব। সে হ'বে পিসার স্বনামধন্য ভিনসেনসিয়ো। যৌতুকের কথা পাদুয়ায়ই তিনি জানিয়ে যাবেন, তখনই আপনি বিয়াঙ্কার পাণিগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

আমার সহকর্মী গানের মাস্টারটা যেমন ছটফট করছে, দেখে ভয় হয়। কিছু একটা ঘটে যেতে কতক্ষণ! তাই বলছিলাম কি, বিয়ের ঝামেলা মিটিয়ে ফেললেই ভালো হয়। আমি চাই শুভ কাজ তাড়াতাড়ি মিটে যাক।

ত্রানিয়ো জবাব দিলো,—হ্যাঁ, আমাদের ব্যাপারটা এবার মিটিয়ে ফেলা দরকার। পাকা দাড়িওয়ালা গ্রেমিয়ো, সংকীর্ণমনা মিনোলো, আর ঐ আজব-গায়ক প্রেমিক লিসিয়ো, সবার ওপরে টেক্কা মারতেই হ'বে।

এমন সময় গ্রেমিয়ো সেখানে এসে হাজির। তিনি কৃতজ্ঞতায় নাক সিঁটকিয়ে বলতে লাগলেন,—যাচ্ছেতাই ব্যাপার! ক্যাথেরিনার তুলনায় প্রেক্রোচ্চিয়ো একটি নিরীহ ভেড়ার ছানা। শুনুন কথা, যখন পাদ্রীমশায় শুধোলেন,—আপনি কি ক্যাথেরিনাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক? অমনি সে ষাঁড়ের মত নিশ্চয় নিশ্চয় ব'লে এমন

চিৎকার করে উঠলো যে, পাদ্রীর তো কানের পর্দা ফাটার উপক্রম, তাঁর হাত থেকে বইটি খসে পড়লো। পাদ্রী বইটি তুলতে গেলে ক্ষ্যাপা বরটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে মারলো এক ঘুঁষি। ক্যাথেরিনা তো তার পাগলামি দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে এক পাশে সরে গেলো। বর কিন্তু তবুও শান্ত হ'লো না। অনবরত হাত-পা দাপাদাপি শুরু করে দিলো। চিৎকার করে মদ আনতে হুকুম দিলো। ঢক ঢক করে মদ গিললো, মদের তলানিটুকু পাদ্রীর মাথায় ঢেলে দিলো। উন্মাদের মত ক্যাথেরিনাকে জড়িয়ে ধরলো। ছুঁড়িটা লজ্জায় বাঁচে না। এমন পাগলের বিয়ে দ্বিতীয়টি আর দেখিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিয়ের পাট চুকিয়ে নতুন বর পেক্রোচ্চিয়ো, বিয়াঙ্কা, ব্যাপ্তিস্তা, গ্রেমিয়ো ও হর্তেনসিয়ো সেখানে এসে হাজির হ'লো। পেক্রোচ্চিয়ো এসেই বললো,—আজ আমার সঙ্গে আপনাদের খাবার কথা আছে। আমি আয়োজন করেছি, আমার অনেক কাজ, আজই আবার দেশে যেতে হ'বে।

ব্যাপ্তিস্তা যেন আকাশ থেকে পড়লেন,—সে কী বাবাজী, আজই যাবে কি? আজ রাত্রেই যাবে?

—রাত হবার আগেই আমাদের বিদায় নিতে হ'বে। যাক আজ আমি আপনাদের সামনে যে এক মধুরভাষিণী পরমা সুন্দরী মিষ্টস্বভাবা এক মেয়েকে সহধর্মিণী রূপে পেয়েছি তার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ক্যাথেরিনা কিন্তু বেঁকে বসলো। সে এত তাড়াতাড়ি সবাইকে ছেড়ে এমন ক'রে বিদায় নিতে মোটেই রাজী নয়।

পেক্রোচ্চিয়ো বললেন,—সুন্দরী তুমি এমন করলে চলবে কেন? তুমি শান্ত হও, আমার কথায় অমত ক'রো না। তুমি রাগ—ক্যাথেরিনা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো,—হ্যাঁ রাগ করবো। রাগ করবো না মানে। একশ বার রাগ করবো—হাজার বার রাগ করবো।

পেক্রোচ্চিয়ো নরম সুরে বললো,—প্রিয়তমা, অমন বড় বড় চোখ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ো না, আমার ভালো ঠেকে না। আজ তুমিই আমার সব, আমার যথাসর্বস্বই তোমার। তোমার দোহাই, এমন ফোঁস ক'রে উঠো না। এ-সব আমার ভাল লাগে না।

বিয়াঙ্কা স্বগতোক্তি করলো,—নিজে যেমন ক্ষ্যাপা, বিয়েও হয়েছে তেমনি এক ক্ষ্যাপার সঙ্গে। রতনে রতন খুঁজে নিয়েছে।

গ্রানিয়ো মন্তব্য করলো,—কত বিয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন ক্ষ্যাপামির বিয়ে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি, কালে কালে আরো কত কি দেখতে হবে কে জানে?

পেক্রোচ্চিয়ো দমবার পাত্র নয়, ক্যাথেরিনাকে নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলো।

পাঁচ

পেক্রোচ্চিয়ো'র গ্রামের বাড়ি। বাড়ি এবং তার চারদিকের দৃশ্য দেখলে সহজেই মনে হয় এক ধনীর বাড়িই এটি। মধ্যযুগীয় মহিমার চিহ্ন সর্বত্র বিরাজ করছে। মধ্যযুগের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্রেমিয়ো রাগে গজ গজ করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। ক্ষ্যাপা প্রভুর ওপর মনের ঝাল মেটাচ্ছে গজ গজ করতে করতে। পাগলা প্রভু বিয়ে বাড়ি সাজানোর ভার তার ওপর দিয়েছে। এত ঝক্কি একা সে সইবে কি করে? তাই তার এই রাগ—এত গজগজানি। রাগ তো হ'বারই কথা।

সে পেক্রোচ্চিয়োর অপর এক ভৃত্যকে ডেকে মনিব ও তার নব-বিবাহিতা স্ত্রীর আগমনবার্তা দিলো। সে সঙ্গে তাড়াতাড়ি ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাতে, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে বললো। আর দেরী নেই. প্রভু চলে এলেন বলে!

চারিদিকে সাজ সাজ রব প'ড়ে গেলো। মনিব আসছেন বিয়ে ক'রে বৌ সঙ্গে নিয়ে, সে কী কম কথা!

পেক্রোচ্চিয়ো নববিবাহিতা ক্যাথেরিনাকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। সে চিৎকার ক'রে উঠলো,—ওরে তোরা সব গেলি কোথায় রে? মনিবের চিৎকার শুনে দাসদাসী চাকর চাকরানি সবাই ছুটোছুটি ক'রে এসে প্রভু-পত্নীকে অভিবাদন জানাল।

পেক্রোচ্চিয়ো ক্যাথেরিনাকে নিয়ে তার শোবার ঘরে প্রবেশ ক'রে বললো,—এই তোমার ঘর, বসো প্রিয়তমা। প্রিয়তমা এই বাড়িঘর, বাগান, পুকুর, দাস-দাসী যা দেখছো, সবই তোমার। তোমার হুকুম তামিল করতে তারা সদা ব্যস্ত থাকবে। তোমার এক অঙ্গুলি হেলনে বাড়িসুদ্ধ সবাই ওঠাবসা করবে।

একজন অনুচর ব্যস্ত হয়ে প্রভুর জুতো খুলতে লেগে গেলো। পেক্রোচ্চিয়ো খেঁকিয়ে উঠলো,—হারামজাদা, এত জোরে টানাটানি করছিস কেন? পা'টা ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছে? কথা বলতে বলতে তার গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দিলো। তারপর ক্যাথেরিনার দিকে ফিরে বললো,—ওগো প্রিয়তমা, তুমি এমন মনমরা হ'য়ে রয়েছো কেন? বিশ্রাম ক'রে একটু চাঙ্গা হ'য়ে নাও। কথা বলতে বলতে সে নতুনতর পাগলামি জুড়ে দিলো। দাস-দাসীদের সামনেই ক্যাথেরিনকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শুরু ক'রে দিলো। পরমুহূর্তেই অপর আর একটি অনুচরের পিঠে সজোরে এক কিল মেরে বললো,—বেটা হতচ্ছাড়া গাধা কোথাকার। কাজে মন বসে না—না?

ক্যাথেরিনা স্বামীর রকম-সকম দেখে তো অবাক। সে মৃদুস্বরে বললো,—তুমি এমন উত্তেজিত হচ্ছো কেন? সংযত হও?

গৃহকর্তা অধিকতর গর্জে উঠলো,—না, না প্রিয়া, তুমি জান না, ও বেটা একটি

পয়লা নম্বরের নচ্ছার, তার গাঁটে গাঁটে দুর্বুদ্ধি ! তুমি এখানে বসো সুন্দরী, তোমার বিশ্রাম দরকার। তুমি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত।

বারান্দায় পরিচারিকাদের মধ্যে কয়েকজনের ফিসফিসানি শোনা গেলো। একজন বললো,—এমন তিড়িক্কি মেজাজ দেখাচ্ছেন প্রভু, নতুন বৌ আবার বিগড়ে না যান। কি করবেন, কি কি বলবেন নিজেই জানেন না।

এমন সময় তার অপর আর এক চাকর কার্টিস এদের সঙ্গে যোগ দিল। সে বললো,—প্রভুর ব্যাপারটি লক্ষ্য করছো? বদরাগী মুখরা বৌ'কে বশে আনার জন্য আগে থাকতেই আসর তৈরী করছেন। তাকে কোনক্রমেই মাথা তুলতে দেবেন না। অষ্টক্ষণ এমনি হৈ হুল্লুত বাধিয়ে বৌয়ের মুখরা স্বভাবকে দাবিয়ে রাখার জন্যই তার এরকম আচরণ। বুনো ওলকে কি করে বাগে আনতে হয় বাঘা তেঁতুল আমার মনিবের ভালো জানা রয়েছে।

ব্যাপ্তিস্তা'র বাড়ি। লুসেনসিয়ো এবং ছদ্মবেশী ত্রানিয়ো আলাপরত। তাদের পাশে ছদ্মবেশী হর্তেনসিয়োও রয়েছে। ত্রানিয়ো কথা প্রসঙ্গে বললো,—শোন বন্ধুরা, আমার মনে হয় বিয়াঙ্কা আমাকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ ক'রে। তাই—

হর্তেনসিয়ো বললো,—তাই নাকি? একবার লক্ষ্য করবেন মশায়, মাস্টারটি কেমন পড়ান। আরে তারা যে এদিকেই আসছেন। চলুন আমরা একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই, দেখি ওদের ক্রিয়াকাণ্ড।

তারা অন্তরালে চলে গেলে বিয়াঙ্কা একা ছদ্মবেশী লুসেনসিয়ো গল্প করতে করতে সেখানে এসে হাজির হ'লো।

লুসেনসিরো জিজ্ঞেস করলো—পড়লে তো, কিছু শিখলে কি?

—কিসের কথা বলছো? তোমাকে পুঁথি-পড়া ক'রে?

—হ্যাঁ, ভালবাসার পুঁথি, সে-পুঁথির কথাই বলছি।

—তুমি যে ভালবাসার পণ্ডিত শিরোমণি প্রমাণ দিতে পারি।

লুসেনসিয়ো ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বিয়াঙ্কার ডান হাতটি নিজের দু' হাতের মুঠোয় নিয়ে সশব্দে চুমু খেয়ে বললো,—বিয়াঙ্কা, সুন্দরী বিয়াঙ্কা. তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হ'লে আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।—কথা বলতে বলতে কপোত-কপোতিদ্বয় অন্তরালে গা ঢাকা দিলো।

ওদের অন্তরালে যেতে দেখে হর্তেনসিয়ো এবং ত্রানিয়ো আবার সামনে এগিয়ে আসলো। হর্তেনসিয়ো বললো,—কি বুঝলেন মশায়? খুব তো গলা বাড়িয়ে বলেছিলেন আপনার মানস-সুন্দরী বিয়াঙ্কা লুসেনসিবোকে ছাড়া কাউকে ভালবাসতে পারে না। এবার কেমন হ'লো?

—সত্যি আমাকে অবাক ক'রে দিলো মেয়েটি। কী ঘৃণিত অবিশ্বাসিনী এই নারী!

হর্তেন্‌সিয়ো আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। সে নিজের আসল পরিচয় দিতে গিয়ে বললো,—এ ছদ্মবেশে আমার ঘৃণা ধরে গেছে, আমার আসল পরিচয় হর্তেন্‌সিয়ো।

—আপনিই হর্তেন্‌সিয়ো? বিয়াঙ্কার প্রেমিক? আপনার জন্য বিয়াঙ্কার পথ থেকে আমি চিরদিনের জন্য সরে দাঁড়াচ্ছি। চিরদিনের মতো বিয়াঙ্কার প্রতি আমার ভালবাসা বিসর্জন দিচ্ছি।

—আর কি লাভ? সবই তো নিজের চোখে দেখলেন? ওরা পরস্পর জড়াজড়ি করলো! আরো কত কি। আর আমি বিয়াঙ্কার পাণিপ্রার্থী থাকবো ভাবছেন? আমি অন্যপথ ধরবো। এক ধনবানের বিধবা মেয়েকে আমি বিয়ে করবো, মহিলাটি খুবই ভালবাসেন আমাকে। আজ এই মুহূর্তে নারীর সৌন্দর্যের চেয়ে সহৃদয় স্বভাবের মূল্যবোধ বেশী। কথা শেষ ক'রে হর্তেন্‌সিয়ো এক মুহূর্তেও সেখানে দাঁড়ালো না।

হর্তেন্‌সিয়ো চলে গেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিয়াঙ্কা ও লুসেনসিয়ো অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসলো। ত্রানিয়ো বললো,—সুন্দরী, আমি ও হর্তেন্‌সিয়োআর তোমাদের প্রেমের প্রতিবন্ধকতা করবো না। হর্তেন্‌সিয়ো চলে গেলো, আমিও বিদায় নিচ্ছি।

ত্রানিয়োর মুখ থেকে দু' দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিদায়ের কথা শুনে লুসেনসিয়ো আশ্বস্ত হ'লো।

পেক্রোচ্চিয়োর সেই শান্ত সৌম্য আশ্রমিক পরিবেশের গ্রামের কথায় ফিরে যাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, পেক্রোচ্চিয়োর বাড়িই বটে। ঐ তো ক্যাথেরিনা আর সর্দার খানসামা গ্রেমিয়োকে দেখা যাচ্ছে।

পেক্রোচ্চিয়ো সঙ্গে করে হর্তেন্‌সিয়োকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই হর্তেন্‌সিয়ো ক্যাথেরিনাকে বললো,—কেমন আছেন? নতুন পরিবেশ। নতুন লোক আর নতুন পরিবেশ কেমন লাগছে? একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্যাথেরিনা জবাব দিলো,—আর আমার কেন হর্তেন্‌সিয়ো, আমি ফুরিয়ে গেছি। ক্যাথেরিনা আজ নিঃশেষ হ'তে চলেছে—জুড়িয়ে হিম-শীতল হয়ে যাচ্ছে হর্তেন্‌সিয়ো।

পেক্রোচ্চিয়ো ব্যস্ত হ'য়ে বললে,—এ কথা বলছ কেন প্রিয়তমা! এই দেখো, আমি নিজে হাতে তোমার জন্য মাংস রান্না ক'রে এনেছি। তোমাকে কত ভালবাসি, নিজের হৃৎপিণ্ডের চেয়েও। আর তুমি কিনা—

ক্যাথেরিনা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো।

পেক্রোচ্চিয়ো একটি কাগজের প্যাকেট ক্যাথেরিনার সামনে রেখে বললো,—এই নাও তোমার গাউন, দর্জি দিয়ে দিলো, হ'য়ে গেছে।

—ক্যাথেরিনা প্যাকেটটি খুলেই বলে উঠলো,—এটা কি একটি গাউন হ'ল নাকি গাউন না ব'লে আস্তিন বললে ঠিক হ'তো।

পেক্রোচ্চিয়ো বললো,—দরজী'র কাজ দেখেছো; সত্যিই তো কি করেছে এটা।

বেটার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, মোটেই কাজ জানে না।

—আমাকে কি তোমরা পুতুল সাজিয়ে রাখতে চাও।

—ক্যাথেরিনা'র নির্দেশে দরজীকে ডাকিয়ে আনানো হলো। ক্যাথেরিনা তাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠলো—কি করেছো এটা? আমি কি পুতুল?

আমাকে কি পুতুল সাজিয়ে—

দরজী ক্যাথেরিনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো,—আমার কি দোষ বলুন তো? কর্তা মশায় যে আমাকে বললেন তিনি আপনাকে রীতিমত পুতুল বানিয়ে রাখবেন।

পেক্রোচিয়ো ধরা পড়ে গিয়ে দরজীর ওপর ক্ষেপে গিয়ে বললো,—কী! এত বড় স্পর্ধা তোর? পাজী হতচ্ছাড়া গাধা কোথাকার! তুই এতবড় মিথ্যাবাদী। আমার সংসারে অশান্তি বাধাতে চাস?

দরজী তবুও দমবার পাত্র নয়। সে-ও গলা চড়িয়ে বললো,—আমার কি দোষ? আপনার ফরমায়েস মতই কাজ করেছি তাতে আপনার গৃহবিবাদ হবে, কি শান্তিআসবে আমার সে চিন্তা করার দরকার কি?

গ্রেমিয়ো বললো,—আমি বলেছি বটে, কিন্তু এমন টুকরো টুকরো ক'রে কাটতে বলেছি কি?

পেক্রোচিয়ো দরজীর টাকা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় দিলো। দরজী বিদায় নিলে সে ক্যাথেরিনাকে বললে,—রেখে দাও, এটা নিয়ে মাথা গরম করার দরকার নেই! আমার টাকার তো আর অভাব নেই, আর একটা করে দেওয়া যাবে। যাক, তোমার বাবার ওখানে যাওয়ার কথা ছিলো না? চল দেরী না ক'রে বেরিয়ে পড়ি। তোমার বাবার উৎসবে যোগ দিতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার।

ক্যাথেরিনা বেশ ঝাঁঝাল গলায় উত্তর দিলো,—আর কি হবে। দুটো বেজে গেছে: এখন রওনা দিলে সেখানে পেঁছোতে পেঁছোতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হয়ে যাবে।

পেক্রোচিয়ো বললো,—আমি লক্ষ্য করেছি তুমি এখনো আমার বিরুদ্ধাচারণ ক'রে চলছো, আমি যা-ই বলি না কেন, তুমি তার বিপরীত পথে চলবেই। যাও, দেরী না ক'রে তৈরী হয়ে নাও, যত তাড়াতাড়ি পারি বেরিয়ে পড়তে হবে।

পেক্রোচিয়ো ক্যাথেরিনাকে নিয়ে পাদুয়ায় ব্যাপ্তিস্তার বাড়ি পেঁছলো। ত্রানিয়ো এখনো লুসেনসিয়োর ছদ্মবেশেই এখানে অবস্থান করছে। আর মান্তুয়ার এক পণ্ডিতকে তার বাপ ভিনসেনসিয়ো সাজিয়ে নিয়েছে। পেক্রোচিয়ো ক্যাথেরিনাকে নিয়ে এসেছে শুনে ব্যাপ্তিস্তা তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসলো।

ত্রানিয়ো ব্যাপ্তিস্তাকে দেখেই বলে উঠলো,—যাক আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হয়েছে। তারপর ছদ্মবেশী ভিনসেনসিয়োকে দেখিয়ে বললো,—ইনি আমার বাবা, দেশ থেকে এসেছেন বিয়াঙ্কার বিয়ের যৌতুক স্থির করবেন।

পণ্ডিত বললো,—যাক, ভালোই হলো আপনার মতো একজন সদাশয় পুরুষের দেখা

পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। পাদুয়ার কয়েক জন খাতকের কাছে টাকা আদায় করতে এসেছিলাম। আমার ছেলের মুখে বিয়াঙ্কার প্রণয়কাহিনী শুনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আপনি কোন শর্তের উল্লেখ করতে চাইলেও আমার আপত্তি নেই।

আপনার সহজ সরল কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনার ছেলে লুসেনসিয়ো আমার মেয়েকে ভালবাসে সত্যি, আমার মেয়েও তাকে ভালবাসে। এখন আপনি বরের বাবা হিসেবে যৌতুকের ব্যবস্থা করলেই শুভকাজ সম্পন্ন হ'য়ে যায়। তবে লেখাপড়া আমার বাড়িতে হ'বে না। গোপনে কাজ সারতে হ'বে, কারণ গ্রেমিয়ো এখনো পিছন ছাড়েনি।

ব্যাপ্তিস্তা ছদ্মবেশী লুসেনসিয়োকে বললো, যাও, ভেতরে গিয়ে বিয়াঙ্কাকে তৈরী হ'তে বল তো। আর একটি কথা জিজ্ঞেস করবে সে লুসেনসিয়োকে বিয়ে করতে সম্মত কিনা।

ছয়

পাদুয়া। লুসেনসিয়োর প্রাসাদ। প্রাসাদের সদর দরজা খুলে লুসেনসিয়ো আর বিয়াঙ্কা বেরিয়ে আসল। গ্রেমিয়ো বাড়ির সম্মুখের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছিলো। বাড়ি থেকে ওদের বেরিয়ে আসতে দেখেই গ্রেমিয়ো অতর্কিতে সরে পড়লো. পাশের একটি বাড়ির আড়ালে সে গা ঢাকা দিলো।

বিয়াঙ্কা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বললো,—এত ঢিলেমি করলে চলবে না, একটু তাড়াতাড়ি কর। ওদিকে পাদ্রী মশাই তৈরী হয়ে রয়েছেন।

লুসেনসিয়ো সহসা পিছন ফিরলেন। বিয়াঙ্কার দিকে তাকিয়ে বললো,—বিয়েন্দেলা আমরা তবে চলি। তুই বাড়ী থাক, দরকার হ'তে পারে। আর একটি কথা সাবধানে থাকবি কিন্তু। বিয়েন্দেলা অসম্মতি জানাতে গিয়ে বললো, না, তা হয় না। আমিও আপনাদের সঙ্গে গীর্জা পর্যন্ত যাবো। আমি দাঁড়িয়ে তা দেখবো! তারপর আমি ফিরে আসবো পাতানো মনিবের কাছে।

বিয়েন্দেলাকে যখন নিরস্ত্র করা যাবেই না, অনন্যোপায় হয়ে লুসেনসিয়ো তাকে সঙ্গে নিলো।

লুসেনসিয়ো, বিয়াঙ্কা এবং বিয়েন্দেলা গীর্জার উদ্দেশে পা বাড়ালো।

লুসেনসিয়ো ওদের নিয়ে চলে গেলে গ্রেমিয়ো অন্তরাল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলো।

গ্রেমিয়ো লুসেনসিয়োর বাড়ির দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে আপন মনে বলে উঠলো কী ব্যাপার! ক্যাম্বিয়ো গেল কোথায়? সেই কখন বাড়ির ভেতর ঢুকেছে, বেরোচ্ছে না কেন? ভেতরে গিয়ে লোকটা একেবারে সেঁটে গেলো যে, তাজ্জব ব্যাপার দেখছি।

পেক্রোশ্চিয়ো, ক্যাথেরিন, ভিনসেনসিয়ো এবং গ্রেমিয়ো হাঁটতে হাঁটতে লুসেনসিয়োর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। পেক্রোশ্চিয়ো বলল, এটাই লুসেনসিয়োর বাড়ি। এ বাড়িতেই আমার শ্বশুরমশায় থাকেন ভাববেন না। তিনি থাকেন এখান থেকে কয়েক পা দূরে, বাজারের কাছে। আপনারা তো লুসেনসিয়োর বাড়ি আসবেন বলছিলেন।

ক্যাথেরিনা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ, আমরা লুসেনসিয়োর বাড়িই খুঁজছিলাম।

পোক্রাশ্চিয়ো বললো, যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন, এবার আমাকে বিদায় দিন। আমাকে শ্বশুরমশায়ের কাছে যেতে হবে।

ভিনসেনসিয়ো বললো, যাবেনই যখন আপনাকে ধরে রাখতে চাই না। তবে অনুরোধ করছি, মাত্র কয়েক মিনিট সময় অপেক্ষা করে একটু পানাহার করে গেলে আনন্দিত হবো। আশা করি এ-কাজ আমার পক্ষে অসঙ্গত হ'বে না। এ বাড়িতে এটুকু দাবী আমার রয়েছে।

কথা ক'টা শেষ ক'রে নিয়ে ভিনসেনসিয়ো সামান্য এগিয়ে দরজায় টোকা মারতে লাগলো।

গ্রেমিয়ো রাস্তার অপর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। এবার সে এগিয়ে এসে ভিনসেনসিয়োকে বললো, ওরা ভেতরে ব্যস্ত আছে। একটু জোরে, এভাবে ঘা মারলে ওরা শুনতে পাবে না। একটু জোরে জোরে দরজায় ঘা মারুন, তবে যদি কাজ হয়।

অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাধাক্কি, চেঁচামেচির পরে ওপরের জানালা খোলার শব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঐ জানালা দিয়ে একটা মুখ উঁকি মারলো। পণ্ডিত মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে চিৎকার করে বললো—কে? এমন করে দরজা ধাক্কাচ্ছে কে? এমন ষাঁড়ের মত চিৎকার চেঁচামেচিই বা কেন?

ভিনসেনসিয়ো অনুরূপ স্বরে জবাব দিলো, মশায়, আমি লুসেনসিয়োর খোঁজ করছিলাম। তিনি কি বাড়ি আছেন? আমার খুব দরকার একবারটি দেখা করতে চাই।

পণ্ডিত পূর্বস্বর অনুসরণ করে বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন, তিনি বাড়ি আছেন, কিন্তু এখন তার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব না।

হতাশ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ভিনসেনসিয়ো বললো, সম্ভব নয়? কিন্তু আমার যে খুবই দরকার, দেখা আমাকে করতেই হ'বে।

আমি তো বলেছি সম্ভব নয়, তার পরেও যদি আপনাদের কিছু করার থাকে করতে পারেন। রীতিমত রাগত স্বরেই পণ্ডিত তার দিকে কথা ক'টা ছুঁড়ে দিলো।

ভিনসেনসিয়ো হেসে বললো, তিনি ব্যস্ত স্বীকার করছি। কিন্তু এমন কি ব্যস্ততা রয়েছে যে, দু'টো মুখের কথা বলার সময় পর্যন্ত নেই? আচ্ছা তা না হয় হ'লো, কিন্তু এখন যদি কেউ একশ' কি দুশ' মোহর নিয়ে তাঁর আমোদ-প্রমোদের খরচ যোগাতে আসে কি হবে?

পণ্ডিত উত্তেজিত স্বরে জবাব দিলেন, আপনার মোহর আপনার কাছেই রেখে দিন মশায়, আপনার মোহর তার দরকার নেই। আমি যতদিন রয়েছি কারো মোরহরে দরকার হবে না।

পেক্রোচ্চিয়ো আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো শুনছেন মশাই, লোকটার কথা শুনছেন। আপনার ছেলে পাদুয়ার লোকের কাছে কেমন প্রিয় এবার পরখ ক'রে দেখলেন তো? নিজের চোখেই দেখুন পাদুয়ার লোক তাঁকে কত ভালবাসে। কথা ক'টা বলে সে এবার ওপরের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা পণ্ডিতকে লক্ষ্য ক'রে বললো, মশায় আমার কথা একবারটি শুনুন, লুসেনসিয়ো মশায়কে একবারটি বলুন, তাঁর বাবা পিসা থেকে এসেছেন, দরজায় দাঁড়িয়ে। তিনি তার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চান। তিনি—পণ্ডিত তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন—থাম, মিথ্যাবাদী কোথাকার! কে তার পিতা? তার পিতা পাদুয়া থেকে কয়েক দিন আগেই এখানে এসেছেন। তিনি এ-বাড়ীতেই থাকেন।

পেক্রোচ্চিয়ো হতভম্বের মত তাকিয়ে বললো,—সেকি, তিনি ক'দিন আগেই এসেছেন! এ-বাড়িতেই আছেন?

—হ্যাঁ, তিনিই জানালা দিয়ে তাকিয়ে স্বয়ং কথা বলছেন।

ভিনসেনসিয়ো বললো,—তবে কি আপনিই সেই ব্যক্তি? আপনিই তাঁর পিতা ঠাকুর নাকি?

—হ্যাঁ, আমিই সেই হতভাগা। তার মা তো একথাই বলে, অবশ্য তার মা-র কথা যদি বিশ্বাস করা যায়।

পেক্রোচ্চিয়ো এবার ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠে ভিনসেনসিয়োর দিকে তাকিয়ে বললো,—সে কী মশায়! এ কী রকম কথা হ'ল! এ কী রকম জোচ্চরি কাণ্ড মশায়! আর একজনের নাম নিয়ে এ কী প্রবঞ্চনা শুরু করেছেন!

পণ্ডিত জানালা দিয়ে আরও সামান্য ঝুঁকে চিৎকার ক'রে বললেন,—ঐ পাজী—বদমাশটাকে ধরুন, ছাড়বেন না। মনে হচ্ছে বদমাশটা আমার নাম ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে। আমার নাম নিয়ে এখানে কাউকে ঠকাতে এসেছে। জুয়াচ্চোর কোথাকার, এবার তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।

এমন সময় গীর্জা থেকে বিয়েন্দেলা ঘটনাস্থলে এসে হাজির। দূর থেকে বচসা শুনছিলো, কারণ কিছুই অনুমান করতে পারেনি সে! কাছে এসেই দরজার কাছে ভিনসেনসিয়োকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর চক্ষু চড়ক গাছ। কী ব্যাপার। এ যে তার মনিব দাঁড়িয়ে। মনিবকে দেখেই তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবার উপক্রম। প্রমাদ গণল সে। সর্বনাশ, এত পরিশ্রম, এত কারসাজি সবই যে পণ্ড হতে চলেছে।

বিয়েন্দেলা কাছে আসতেই ভিনসেনসিয়ো তাকে কাছে ডাকলেন,—আয়, এদিকে আয়!

বিয়েন্দেলা না চেনার ভান করে বলে উঠলো,—কেন? আমি আপনার কথায় কাছে

যাবো ? আমি যাবো না, দরকার মনে করি না।

ভিনসেনসিয়ো ভৃত্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে রীতিমত স্তম্ভিত হলেন। তিনি ধমকের সুরে বললেন পাজি হতভাগা গাধা কোথাকার। আয় এদিকে আয় বলছি বদমাশ। বিয়েন্দেলা, সবাই আমাকে ভুলে যেতে পারে, তুইও আমাকে ভুলে গেলি ?

বিয়েন্দেলা পাকা অভিনেতার মত চোখ টেনে কপাল কুঁচকে বললো,—কি বলছেন যা তা! আমার তো মনে হচ্ছে আপনাকে চেনা তো দূরের কথা, কোনদিন দেখিও নি ?

ভিনসেনসিয়ো ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে ধমক দিয়ে উঠলেন, পাজি হারামজাদা কোথাকার। তুই এত বড় কথাটা বলতে পারলি ? তুই আমাকে দেখিস নি কোন দিন ? তোর মনিবের বাপকে দেখিসনি ? বিয়েন্দেলা বললো, কে আমার মনিবের বাপ ? কে আমার বৃদ্ধ প্রভু ? ঐ তো তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি জানালা দিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে।

ভিনসেনসিয়ো আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। ক্রোধোন্মত্ত সিংহের মত গর্জন করে বিয়েন্দেলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাই নাকি হারামজাদা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বিয়েন্দেলাকে অনবরত কিল চড় ঘুঁষি মারতে লাগলো।

বিয়েন্দেলা ভিনসেনসিয়োর অতর্কিত আক্রমণে উচ্চৈস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো—মেরে ফেললো—আমাকে মেরে ফেললো ! কে কোথায় আছ বাঁচাও ! আমাকে বাঁচাও ! বাঁচাও।

বিয়েন্দেলা কোন রকমে বৃদ্ধ ভিনসেনসিয়োর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চীৎকার করতে করতে ছুটতে লাগলো।

বিয়েন্দেলার শোচনীয় অবস্থা দেখে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা পণ্ডিতও উচ্চৈস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলো,—কী সর্বনাশ। মেরে ফেললো লোকটাকে। রক্ষা কর। রক্ষা কর। সিনর ব্যাপ্তিস্তা—তাড়াতাড়ি এদিকে আসুন। মেরে ফেললো—মেরে ফেললো।

পেক্রোচ্চিয়ো বললো,—আসুন আমরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই। দূরে দাঁড়িয়ে বিবাদটা দেখি।

পেক্রোচ্চিয়োর কথায় সম্মত হয়ে অন্যান্য সবাই সেখান থেকে সরে পড়ল। তারা পাশের একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে মজার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে লাগলো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পণ্ডিত, ব্যাপ্তিস্তা, গ্রানিয়ো এবং অন্যান্য কয়েক জন ভৃত্য বাইরে বেরিয়ে আসেন।

গ্রানিয়ো বাইরে এসেই ভিনসেনসিয়োকে বললো—আপনি এটা কি করলেন ? আমাদের চাকরকে আপনি এভাবে মারলেন কেন ?

আমাদের চাকরের গায়ে হাত তোলার মত ক্ষমতা কে দিয়েছে আপনাকে ? কে আপনি ? এখানে কেনই বা এসেছেন ?

ভিনসেনসিয়ো তখনও রাগে কাঁপছে। ক্রোধোন্মত্ত স্বরেই সে গর্জে উঠলো,—আমি কে সে কথা থাক। তার আগে বলুন, আপনারা কারা ? কথা ক'টা শেষ ক'রে

সে ওপরের দিকে হাত দুটো তুলে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলো—হায় দেবতারা দেখ! হতচ্ছাড়াটা কী চমৎকার সেজেছে?

আহা। সাজের বাহার দেখে মরে যাই। গায়ে চাপিয়েছে সিল্কের দোপাট্টা ফতুয়া, মখমলের মোজা, পায়ে লাল জোব্বা আর মাথায় দিয়েছে বাহারে টুপি।

হায়! হায়! আমার সবই গেছে—একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি আমি। যখন আমি বাড়িতে বসেছিলাম, আমার ছেলে আর চাকরটা আমার সর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে একেবারে ফৌত হ'য়ে বসে আছে।

ত্রানিয়ো আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে বললো,—কি ব্যাপার? কি ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপ্তিস্তা হঠাৎ বলে উঠলো,—লোকটি পাগল। মাথায় কিছুই নেই দেখছি।

ত্রানিয়ো কয়েক মুহূর্ত বৃদ্ধ ভিনসেনসিয়োর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,—মশায়, আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই নিরীহ গোবেচারা গোছের কোন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পোশাক-পরিচ্ছেদেও যথেষ্ট ভদ্রতার চিহ্ন নজরে পড়ছে। কিন্তু আপনার কথা শুনলে তো মোটেই সুস্থ মস্তিকের লোক বলে মনে হয় না আপনাকে। একজন বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আপনাকে। আছা, আমি যদি মুক্তো আর সোনার জিনিস পরি বা দামী পোষাক-পরিচ্ছদ গায়ে চাপাই তাতে আপনার কি মশাই। আমার এ কাজের জন্য আমার পিতাকে ধন্যবাদ। তাকে সহস্রবার ধন্যবাদ জানাছি।

ভিনসেনসিয়ো তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গর্জে উঠলো,—তোর বাপ? হতচ্ছাড়া, তোর বাপ তো বার্গেমাতো জাহাজে পাল তৈরী করে।

ব্যাপ্তিস্তা প্রতিবাদের সুরে বললো,—মশায়, আপনি ভুল করছেন। আমার বাপকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন না মনে হচ্ছে। যদি চিনেই থাকেন, বলুন তো তাঁর নাম কি?

কি পাগলের মত বকছো? ওর নাম আমি জানি না কি হে! ওকে যে আমি তিন বছর বয়স থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আর তুমি বলছো, আমি ওর নামই জানি না? ওর নাম হচ্ছে ত্রানিয়ো।

পণ্ডিত এতক্ষণ চুপ করেই ছিলো। এবার আর মুখ না খুলে পারলেন না। তিনি এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, ক্ষিপ্ত গর্দভ কোথাকার, দূর হ এখান থেকে। ওর নাম লুসেনসিয়ো। আমার একমাত্র পুত্র ভিনসেনসিয়োর ওয়ারিশ।

বৃদ্ধ ভিনসেনসিয়ো অবাক বিস্ময়ে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বললো, লুসেনসিয়ো—বৃদ্ধ চীৎকার করে উঠলো,—ও ওর পিতাকে হত্যা করেছে। ওকে ধর ধর। আমার পুত্র! আমার পুত্র! আমার পুত্র লুসেনসিয়ো কোথায়? কোথায় আমার পুত্র?

ত্রানিয়ো দেখে ব্যাপার সুবিধার নয়। অনন্যোপায় হয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো—ওরে কে আছিস? কে কোথায় আছিস, ছুটে যা। ছুটে গিয়ে পুলিশে খবর দে। পুলিশ ডেকে আন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গ্রানিয়ো ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসল। সঙ্গে তার পুলিশ। গ্রানিয়ো তার দিকে তাকিয়ে বললো—যাও, আর নয়, এই পাগলাটাকে ধরে নিয়ে যাও —গারদে ঢুকিয়ে বেশ করে ঘা কতক দিয়ে একটু শায়েস্তা করে দাও।

ব্যাপার দেখে ভিনসেনসিয়োর তো চক্ষুস্থির। অবাক হ'য়ে বললো—কী ব্যাপার ? আমাকে কি শেষ পর্যন্ত জেলে নিয়ে যাবে ?

গ্রেমিয়ো এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলো। সে পরিস্থিতি ঘোলাটে আন্দাজ করে এগিয়ে এসে বললো, দাঁড়াও। কি ব্যাপার ? কাকে থানায় নিয়ে যেতে চাও ? উনি গারদে যাবেন না।

ব্যাপ্টিস্তা রীতিমত খেঁকিয়ে উঠলো—আঃ উনি গারদে যাবেন বইকি। তুমি চুপ করতো গ্রেমিয়ো। তোমার এ ব্যাপারে মাথা গলাবার দরকার নেই।

গ্রেমিয়ো তাঁকে সতর্ক করতে গিয়ে বললো,—ভদ্র ব্যাপ্টিস্তা, সাবধান, দেখবেন আপনি যেন আবার এ ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়েন। আপনি নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে অন্তত একটু সতর্ক হবার চেষ্টা করুন। তাছাড়া আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি—ইনিই আসল ভিনসেনসিয়ো। আমার ভিনসেনসিয়োকে গারদে পাঠাবার চেষ্টা করলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে একবার চিন্তা ক'রে একটু সতর্ক হও—ভেবে দেখো।

পণ্ডিত এগিয়ে এসে বললেন,—ঠিক আছে, সাহস থাকে তো ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে প্রমাণ কর।

গ্রানিয়ো বলে উঠলো,—তবে কি আপনারা আমাকেও অস্বীকার করছেন ? তবে কি বলতে চাইছেন আমিও লুসেনসিয়ো নই ?

গ্রেমিয়ো বললো,—আমি তা বলতে যাব কেন ? আপনি যে লুসেনসিয়ো নন, এ-কথা আমি বলতে যাব কেন ? আপনি যে লুসেনসিয়ো তা আমি খুব ভালভাবেই জানি।

ব্যাপ্টিস্তা তবুও ক্ষান্ত হবার নয়। সে বলেই চলেছে—কি ব্যাপার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যাও বুড়োটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দাও !

ভিনসেনসিয়ো অনন্যোপায় হ'য়ে বলে উঠলো, বাঃ চমৎকার। চমৎকার ব্যবস্থা। পাদুয়া বুঝি এমনি ক'রেই অতিথিকে সম্মান দেখায় ?—স্বাগত সম্ভাষণ দেখায় ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়েন্দেলা আর লুসেনসিয়ো বিয়াঙ্কাকে নিয়ে ফিরে আসলো।

বিয়েন্দেলা ভিনসেনসিয়োকে দেখিয়ে বললো—কর্তা, সব ভেস্তে যাবার উপক্রম—সব মাটি হ'ল। ঐ—ঐ যে উনি দাঁড়িয়ে। ওনাকে আপনি অস্বীকার করুন। সামনা-সামনি অস্বীকার করা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। ধরা পড়ে গিয়ে কৃতকর্মের—

বিয়েন্দেলার কথা শেষ হতে না হতেই লুসেনসিয়োর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো। সে করজোড়ে মিনতি জানালো—

পিতা, আমি আপনার অধম পুত্র, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

ভিনসেনসিয়ো পুত্রের চিবুক ধরে সম্ভাষণ করলো। পুত্রের মাথায় সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে বললো,—বেঁচে থাক বাবা—দীর্ঘজীবী হও।

বিয়াংকাও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলো না। সে-ও ব্যাপ্তিস্তার সম্মানে হাঁটু গেড়ে প্রণাম জানিয়ে বললো,—আমি আপনার শ্রীচরণে শত অপরাধে অপরাধী—আমাকে ক্ষমা করুন। ব্যাপ্তিস্তা জিজ্ঞেস করলো,—তুমি কি অপরাধ করলে? আচ্ছা লুসেনসিয়োকে তো দেখছি না—সে কোথায়?

লুসেনসিয়ো এগিয়ে এসে বললো,—এই তো আমি—এই তো আপনার লুসেনসিয়ো। আসল ভিনসেনসিয়োর পুত্র আসল লুসেনসিয়ো আপনার কন্যাকে এইমাত্র পবিত্র গীর্জা থেকে বিয়ে করে ফিরলো। আর নকল আপনার চোখ ধাঁধিয়ে রাখল—তা নিয়েই ব্যস্ত।

ভিনসেনসিয়ো ক্রোধ প্রকাশ ক'রে বললো, সেই বদমাশটা কোথায়? সেই ত্রানিয়ো গেলো কোথায়? ব্যাটা নচ্ছারটা আমার মুখের ওপর কথা বলেছে।

ব্যাপ্তিস্তার মুখে আর একটিও কথা নেই। তার মুখ যেন কে সুচ-সুতো দিয়ে একেবারে সেলাই করে দিয়েছে। তার বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সে দ্বিধাজড়িত কাঁপা কাঁপা গলায় বললো,—তুমি কি ক্যাম্বিয়ো নও?

বিয়াংকা মিষ্টি-মধুর-সুরেলাকণ্ঠে বললেন,—ক্যাম্বিয়ো?

ক্যাম্বিয়ো বদলে গেছেন,—তিনি হয়েছেন লুসেনসিয়ো।

লুসেনসিয়ো বলে উঠলো—ভালবাসায় পট পরিবর্তন করে দিয়েছে।

বিয়াঙ্কার প্রেমে আমি পাগল হয়েছিলাম, ত্রানিয়োর সঙ্গে আমি নিজেকে বদলাবদলি ক'রে নিয়েছিলাম। আমার পরিচয় দিয়ে সে যখন শহরময় ঘুরে বেড়াত, তখন আমি বিয়াংকাকে নিয়ে মত্ত থাকতাম। শেষে আমার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের সন্ধান পেলাম। আমার ইচ্ছাতেই ত্রানিয়ো এমনটা করেছে। পিতা, আমার কথা ভেবে, আমার অনুরোধে তাকে ক্ষমা করুন। ত্রানিয়োর বিন্দুমাত্র দোষ নেই, সে নিরপরাধ।

ভিনসেনসিয়ো কিন্তু তবুও স্বাভাবিক হ'তে পারলো না। তখনও রাগে গজ গজ করতে লাগলো। ক্রোধোন্মত্ত ভিনসেনসিয়ো গর্জন ক'রে উঠল,—না, আমি ওকে ছেড়ে দেবো না। আমাকে গারদে ভরতে চেয়েছে, আর আমি ওকে ছেড়ে কথা বলবো! আমি ওর নাক কেটে ছাড়বো!

ব্যাপ্তিস্তা মুখ খুললেন,—আমার কথা শোন। একটা কথার জবাব দাও, আমার আশীর্বাদ না নিয়েই কি আমার মেয়েকে বিয়ে করেছো?

ভিনসেনসিয়ো তাঁর কথার জবাবে বললো, সিনর ব্যাপ্তিস্তা আমরা আপনাকে হতাশ করব না, আপনাকে তুষ্ট করব। কিন্তু এই পাজি হতচ্ছাড়া, বদমায়েশটাকে ছাড়ব না। তার প্রতিশোধ নেব, উপযুক্ত শাস্তি দেব ওকে। তার প্রতিশোধ আমি নেবই। কথা ক'টা বলে রাগে গজ গজ করতে করতে চলে গেলো।

ভিনসেনসিয়ো চলে গেলে ব্যাপ্টিস্তাও সেখানে আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ছলনা রীতিমত প্রবঞ্চনামূলক ঘটনা। এ প্রবঞ্চনার বিষয় আমাকে অনুসন্ধান করতে হবে। খোঁজ ক'রে দেখতে হবে এর পিছনে কি গূঢ় রহস্য জড়িয়ে রয়েছে।

ব্যাপার দেখে বিয়াংকা অকস্মাৎ কেমন মিইয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে তার মন-প্রাণ বিষিয়ে উঠলো, সে বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে লুসেনসিয়ো বললো—প্রিয়তমে বিয়াংকা, তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছো। এই দুর্যোগের মেঘ ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই এই মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হ'বে, আশার আলো দেখা যাবে আমাদের মণের কোণে। মুছে যাবে সবার মনের গ্লানি সব। চল, লক্ষ্মীটি, এমন মনমরা হ'য়ে থেকো না। চল, আমরা ভেতরে যাই।

লুসেনসিয়ো তার প্রেমিকা বিয়াংকা'কে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেলে প্রেমিকা পথের ধারে একাই দাঁড়িয়ে থাকলো!

সে হতাশ দৃষ্টি মেলে ওদের ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে শ্লেষ্মা জড়িত ভাঙাভাঙা গলায় বলে উঠলো, যা বাবা, সবই গেল! আমার পিঠের বোঝা কেমন ছিল ঠিক তেমনি রয়ে গেল। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ উৎসব করার আশা আমাকে ত্যাগ করতে হলো। আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারলেও ভোজের আশা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, ভোজের বখরা পুরোপুরিই নিতে হবে।

গ্রেমিয়ো স্থান ত্যাগ করলে অদূরে আত্মগোপনকারী ক্যাথেরিনা এবং পেক্রোচ্চিয়ো বেরিয়ে আসলো।

ক্যাথেরিনা পেক্রোচ্চিয়োকে লক্ষ্য ক'রে বললো, ওগো দাঁড়িয়ে থেকে এমন সুযোগটা হাতছাড়া করা যায় না। চল এগিয়ে যাই, বিভ্রাটের শেষ পরিণতি কি হয় প্রত্যক্ষ করি গিয়ে। এমন রহস্যজনক ব্যাপার থেকে দূরে সরে থাকা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পেক্রোচ্চিয়ো মুচকি হেসে ক্যাথেরিনার প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে বললো,— তোমার কৌতূহল যখন হয়েছে, তুমি কি আর না গিয়ে ছাড়বে। চল, দেখাই যাক, এ নাটকের শেষ কোথায়। কথা ক'টা শেষ ক'রে সে পেক্রোচ্চিয়োর হাত ধরে এগিয়ে গেলো।

লুসেনসিয়োর বাড়ি। উৎসব-মুখর বাড়ি। চারিদিকে বাহারি ফুলের জৌলুস। রং-বেরং-এর ফুল দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো হয়েছে প্রাসাদ সদৃশ বিরাটকৃতি সুদৃশ্য বাড়িটা। আলোকমালা বাড়িটির সৌন্দর্য-অধিকতর বৃদ্ধি ক'রে এক অতুলনীয় স্বর্গ শোভায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছে। বাড়ির এখানে-ওখানে চেয়ার টেবিল পেতে রাখা হয়েছে অতিথি-অভ্যাগতদের বসার জন্য। ব্যাপ্টিস্তা, গ্রেমিয়ো, ভিনসেনসিয়ো, বিয়াংকা, লুসেনসিয়ো, হর্তেনসিয়ো এবং ক্যাথেরিনা আনন্দমুখর। ওরা পাশাপাশি গা-ঘেষাঘেষী ক'রে বসে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে আনন্দানুষ্ঠানটিকে পুরোপুরি

উপভোগে মত্ত। অদূরবর্তী কয়েকটি চেয়ার দখল ক'রে বসে গ্রোমিয়ো, গ্রানিয়ো এবং বিয়েন্দেলা একের পর এক রঙ্গীন মদের গ্লাস শূন্য ক'রে উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দটুকু নিঃশেষে উপভোগ করছে। আর থেকে থেকে সরবে হেসে উঠে মনের বাঁধনহারা আনন্দের বহিঃপ্রকাশে মেতে উঠেছে ওরা।

লুসেনসিয়ো এক চুমুকে হাতের পাত্রটি শূন্য ক'রে বলে উঠলো,—আজ আর কোন কথা নয়, আজ আনন্দের দিন। আজ শুধুই আনন্দ। এতদিন সুর ছিল বেসুরো, বেতালা, ছন্দহীন। এবার পাওয়া গেছে সুর ও ছন্দের সন্ধান। দুর্দিনের মেঘ কেটে গেছে, যুদ্ধ গেছে থেমে। আজ আকাশ পরিষ্কার—আয়নার মত স্বচ্ছ। ওগো বিয়াংকা আজকের এই আনন্দমুখর দিনে বাবাকে দূরে সরিয়ে রেখো না, তাঁকে হাত ধরে নিয়ে এসো। উৎসব প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে এনে তাঁকে বসাও। উৎসবের আনন্দস্ফূর্তির তাঁর প্রাপ্য ভাগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করো না। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এসো আর আমি ক্যাথেরিনা ও পেক্রোচ্চিয়োকে এনে বসাচ্ছি।

সে কথা বলতে বলতে পেক্রোচ্চিয়োর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে হাত বাড়িয়ে বললো—এসো! এসো, ভাই পেক্রোচ্চিয়ো, এসো বোন ক্যাথেরিনা! আর হর্তেনসিয়ো তুমিও এসো। এই আনন্দানুষ্ঠানে তোমাকেও প্রয়োজন। তোমাদের মিলিত প্রয়াসে আজকের আনন্দযজ্ঞ শুভময় হ'য়ে উঠুক! পরিপূর্ণতা লাভ করুক! আমার গৃহে আপনাদের সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, আপনারা আসুন! পানাহার করুন!

সবাই উৎফুল্ল চিত্তে টেবিলে এসে বসলো। পান পাত্র হাতে তুলে আনন্দানুষ্ঠানকে সানন্দে গ্রহণ করলো।

ব্যাপ্তিস্তা মুখ থেকে পানপাত্র নামিয়ে সোল্লাসে বললো—শুধু বসে থাকা আর খাওয়া পাদুয়ার এই তো নিয়ম। পাদুয়া তো সবাইকে চিরদিনই অনুগ্রহ দেখিয়ে থাকে।

হর্তেনসিয়ো একগাল হেসে বললো—আহা! আহা তাই যেন চিরদিন হয়। পাদুয়া যেন চিরদিন এমনি করেই অনুগ্রহ দেখিয়ে যেতে পারে।

পেক্রোচ্চিয়ো বললো,—আমার হর্তেনসিয়ো বিধবাটিকে বড়ই সমীহ ক'রে, যমের মত ভয় পায়।

বিধবাটি পাশেই বসে পানাহার করছিলো। সে অকস্মাৎ ফোঁস ক'রে উঠল,—ঠিক আছে, যদি ভয়ই পায় তবে আমাকে বিশ্বাস করো না।

পেক্রোচ্চিয়ো বিধবাটির কথায় কেমন ভড়কে গেলো। সে তাকে নিতে গিয়ে বললো,—না, না, আমি সে কথা বলছি না, চাচ্ছি আপনাকে খুবই মান্য ক'রে, ভয়ে ভয়ে চলে, বিধবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেটে কেটে উচ্চারণ করলো—তার মাথা ঘুরছে, তার ধারণা সারা দুনিয়াটাই বুঝি বা ঘুরছে।

পেক্রোচ্চিয়ো হেসে জবাব দিলো,—উত্তরটা কেমন প্যাঁচালো হ'ল। উত্তরটা তো ঘুরিয়ে দিলেন।

ক্যাথেরিনা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বললো,—কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?

বিধবা ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ক্যাথেরিনার প্রশ্নের জবাব দিলেন,—কী আবার হ'বে? উনি আমাকে ভয়ের ব্যাপার করে তুলতে চাচ্ছেন।

পেক্রোচ্চিয়ো সোজা হ'য়ে বসলো। সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, আমি? হর্তেনসিয়ো, এ ব্যাপারে আপনার কি মত?

হর্তেনসিয়ো মুখ খুললো,—আমার বিধবাটি বলতে চাচ্ছেন তাঁর নিজের কাহিনী তিনি নিজেই তৈরী করছেন। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির হাত নেই।

পেক্রোচ্চিয়ো বললো,—চমৎকার! চমৎকার জবাব! ক্যাথেরিনা কিন্তু এত সহজে দমবার পাত্র নয়। সে পূর্ব প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে বললো,—সে না হয় হলো। কিন্তু আপনি যে বললেন, তার মাথা ঘোরে তার ধারণা সম্পূর্ণ পৃথিবীটাই ঘুরছে। এ কথার তাৎপর্য আমার ঠিক বোধগম্য হ'লো না। আপনি অনুগ্রহ ক'রে কথাটা ব্যাখ্যা ক'রে দিয়ে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

বিধবা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—শুনুন তবে বলছি। আমার স্বামী এমন একজন লোকের হাতে পড়েছিলেন, সে হচ্ছে রীতিমত মুখরা। তিনি নিজের ভাগ্যাহত অবস্থা ও দুঃখের ছবি আমার মধ্যে দেখতে চেষ্টা করেছেন। এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। কিন্তু তিনি যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন তা বিন্দুমাত্র চিন্তা করলেন না।

ক্যাথেরিনা মুহূর্তকাল কি যেন ভেবে বললেন—মানেটা খুবই জঘন্য। এ রকম চিন্তা করাটাই হীন মনোবৃত্তির পরিচয়। ব্যাপ্তিস্তা বললো,—গ্রেমিয়ো, কেমন বুঝছো? বুদ্ধির খেলা সম্বন্ধে তোমার মত কি?

গ্রেমিয়ো জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেললো—ভালই তো, রীতিমত গুঁতো-গুঁতি শুরু হয়ে গেছে। কারবার জমেছে খুবই বিয়াঙ্কা রসিকতার সুরে বললো। গুঁতো-গুঁতি? হ্যাঁ, গুঁতো-গুঁতিই বটে। খোঁচা খোঁচা শিং আর মাথায় ঠোকাঠুকি। শক্তি পরীক্ষার লড়াই!

কথা বলতে বলতে বিয়াঙ্কা, ক্যাথেরিনা ও বিধবাটি সেখান থেকে বিদায় নিলো। এখন উৎসব প্রাঙ্গণে যারা রইলো তারা সবাই পুরুষ।

পেক্রোচ্চিয়ো বললো—বিয়াঙ্কা আমাকে থামিয়ে দিলো।—বাধা দিলো ওগো ত্রানিয়ো তুমি যে সুন্দর পাখীটিকে লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়েছিলে, কই তাকে তো গাঁথতে পারলে না। যারা তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, ব্যর্থতার জ্বালায় ভুগছে তাদের সবার স্বাস্থ্যপান করছি।

ত্রানিয়ো বেশ ঝাঁঝালো গলায় বললো,—আমার মনিব তাঁর শিকারী কুকুরের মত লুসেনসিয়োকে আমার দিকে লেলিয়ে দিয়েছে। কুকুর নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে শিকার ধরে এ-কথা সত্যি। কিন্তু সে কার জন্য। সে মনিবের জন্য শিকার ধরে।

আপনার কথা স্বতন্ত্র, আপনি নিজেই ধরেছেন। সবাই ধরেই নিয়েছিল, আপনার সাধের সোনার হরিণ আপনাকে একগংতো দিয়ে দূরে সরিয়ে দেবে। আপনি হতাশায় হায় হায় করবেন। ব্যাপ্তিস্তা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। সে উচ্চৈস্বরে হেসে বললো,—এবার উচিত জবাব হয়েছে। আপনি আপনার যোগ্য পাত্রীকেই লাভ করেছেন। সবচেয়ে মুখরাই আপনার কপালে জুটেছে।

—একথা আমি বিশ্বাস করি না। আসুন আমরা সবাই আমাদের নিজের নিজের স্ত্রীকে ডেকে পাঠাই। যিনি আগে এসে এখানে পৌঁছাবেন, তিনিই বাজি জিতবেন। পেক্রোচ্চিয়ো বললো।

হর্তেনসিয়ো তার কথায় সম্মত জানাতে গিয়ে বললো,—ঠিক আছে, আমি রাজি। কিন্তু কত বাজী আগে বলুন।

লুসেনসিয়ো হেসে বললো—বাজী থাকবে বিশ মোহর।

হর্তেনসিয়ো তাচ্ছিল্যের সুরে বললো,—বিশ মোহর কি বলছেন। বিশ মোহর আবার একটা বাজী হলো নাকি! বিশ মোহর একটা শিকারী কুকুরের ওপর বাজী রাখা চলতে পারে, স্ত্রীর ওপর অবশ্যই নয়। নিজের স্ত্রীর ওপর ওর বিশগুণ রাখবো।

লুসেনসিয়ো এবার বললো—ঠিক আছে, তবে বাজী থাকবে একশ' মোহর। এবার ঠিক হলো তো?

লুসেনসিয়োর কথা সবাই সমর্থন করল।

লুসেনসিয়োই প্রথম বাজীর কাজ শুরু করল। সে বিয়েন্দেলাকে নির্দেশ করলো—এক কাজ কর। তোর মনিবাণীকে বলবি একবারটি এখানে আসতে। বলবি আমি ডাকছি।

বিয়েন্দেলা চলে গেলে ব্যাপ্তিস্তা বললেন—এ ব্যাপারে আমি তোর সঙ্গে আধা-আধি বাজী রাখতে সম্মত।

লুসেনসিয়ো বাধা দিয়ে বললে,—না, তা হয় না। আধা-আধি আবার কি? আমি পুরো লাভ বা ক্ষতি স্বীকার করতে সম্মত আছি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিয়েন্দেলা ফিরে এসে লুসেনসিয়োর মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ করে দিয়ে বললো—হুজুর, মনিবাণী এলেন না। তিনি বললেন—তোর মনিবকে বলগে যা আমি এখন ব্যস্ত, যেতে পারছি না, পরে যাচ্ছি।

গ্রেমিয়ো এবং পেক্রোচ্চিয়ো তার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমায় বললো,—বাঃ কী চমৎকার কথা নিয়ে ফিরে এল, এখন ব্যস্ত—পরে আসছি। থাক এক কাজ কর বিয়েন্দেলা—এবার গিয়ে আমাদের স্ত্রীকে খবর দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়েন্দেলা আবার ঘরে ঢুকলো।

হর্তেনসিয়ো ব্যস্ত হয়ে শুধালো—কি ব্যাপার বিয়েন্দেলা, আমার স্ত্রীকে কিছু বলেছিলে? সে যে এল না?

বিয়েন্দেলা জবাব দিলো—আমি তো বলেছি, তিনি এলেন না, তার আমি কি

করব? তিনি বলে পাঠালেন—এখন যত সব রঙ্গ-তামাসা হচ্ছে। এর মধ্যে তিনি নিজেকে জড়াতে রাজী নন। তিনি আসবেন না।

হর্তেনসিয়ো একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পেত্রোচ্চিয়ো উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো—তিনিও এলেন না? তবে তো খুব খারাপ। খুব খারাপ! চমৎকার অর্ধাঙ্গিনী জোগাড় করেছেন মশায়!

সে এবার বলল—তুই এক কাজ কর গ্রেমিয়ো, তোর মনিব ঠাকরুণের কাছে গিয়ে বল আমি তাঁকে এখানে ডাকছি—জরুরী দরকার, তিনি যেন এক্ষুনি এখানে আসেন। এ আমার হুকুম—তিনি যেন অন্যথা না করেন।

গ্রেমিয়ো প্রভুর নির্দেশে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সুসংবাদ নিয়ে গ্রেমিয়ো ফিরে এসে জানাল,—প্রভু, তিনি আসছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাথেরিনা হাসি মুখে ঘরে ঢুকলেন।

ক্যাথেরিনাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই পেত্রোচ্চিয়ো জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার বল তো! তোমার বোন আর হর্তেনসিয়োর স্ত্রীকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছিলাম।—তাঁরা তো এলেন না, কোথায় তাঁরা?

লুসেনসিয়ো ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে ছোট্ট ক'রে বলল,—দেখলে তো ব্যাপারটা? এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, লোকে বলে তাজ্জব ব্যাপার।

ব্যাপ্তিস্তা হতাশ স্বরে বলল,—তুমিই বাজী জিতলে, জয়মাল্য তোমার গলায়ই উঠল, তোমার মঙ্গল হোক, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক, আমি তাদের বাজীর হারের সঙ্গে আরও অতিরিক্ত বিশ হাজার মোহর দেব।

পেত্রোচ্চিয়ো বলল,—আমি তার বাধ্যতার আরও প্রমাণ দেব। তিনি—বিয়াঙ্কা আর বিধবাকে নিয়ে তার কথা থামিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাথেরিনা। তাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই পেত্রোচ্চিয়ো বলে উঠল,—ঐ—ঐ দেখুন ও এসে গেছে। আর আপনাদের প্রতিবাদিনী স্ত্রী-রাও ওর সঙ্গে রয়েছেন। ও সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে এসেছে। পেত্রোচ্চিয়ো এবার ক্যাথেরিনাকে লক্ষ্য করে বলল,—ক্যাথেরিনা, তোমার মাথার টুপিটা খুলে ফেল, ওটা তোমাকে মানায় না। ওটা পায়ে দুমড়ে পিষে ঘরের বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।

ক্যাথেরিনা টুপিটা খুলে স্বামীর আদেশ পালন করলেন।

ক্যাথেরিনার কাজ দেখে বিধবা বলে উঠল—এরকম কাজ যেন অন্ততঃ আমাকে করতে না হয়।

লুসেনসিয়ো এতক্ষণ রেগে ফোঁস ফোঁস করছিল। সে সুযোগ পেয়ে ফোঁস করে উঠল—এ কি করলে বিয়াঙ্কা, তোমার বোকামীর জন্য আমাকে এতগুলো লোকের সামনে অপদস্থ হ'তে হ'ল, একশ মোহর।

পেত্রোচ্চিয়ো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিজের স্ত্রীর জন্য সব প্রকাশ করতে গিয়ে বলল

—ক্যাথারিনা, এক কাজ কর, এ-সব উদ্ধত স্বাধীনচেতা ও কর্তব্য বিমুখ স্ত্রীদের বুঝিয়ে দাও স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের কর্তব্য কি। তোমার আনুগত্য আজ আমাকে সম্মানিত করেছে।

লুসেনসিয়ো বলল—মেয়েদের স্বভাব নম্র ও বিনয়ী হওয়া দরকার। স্বামীর প্রতি আনুগত্য সংসারে শান্তি ও সুখ আনয়ন করে। স্ত্রীর কাছ থেকেই তার সন্তানেরা শিক্ষালাভ করে।

ভিনসেনসিয়ো বলল—নিশ্চয়ই, ছেলে-মেয়েদের সব চেয়ে প্রধান নির্ভর হচ্ছে তাদের মা। মা-ই সন্তানদের সুশিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলায় সাহায্য ক'রে যাবেন। অতএব সব দিক বিচার করে বলতে হয় স্ত্রীই সংসারকে শান্তি-সুখের নীড়ে পরিণত করতে পারেন।

লুসেনসিয়ো বলল,—কিন্তু এই স্ত্রী যদি উড়নচণ্ডী হয়? তখন সংসার হয় একটি শয়তানের আস্তাকুড়।

পেক্রোচ্চিয়ো বলল,—আমি আপনাদের কথা সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নিচ্ছি।

লুসেনসিয়ো পেক্রোচ্চিয়োকে লক্ষ্য ক'রে বলল,—আচ্ছা, এ প্রসঙ্গ এখন থাক। কিন্তু কথা হচ্ছে—আমি সর্বজনসমক্ষে বাজী জিতেছি—একথা আশা করি তোমাদের মধ্যে কেউ অস্বীকার করবে না। যদি তাই স্বীকার কর, তবে তোমরা হেরে গেছ। আমি বিজয়ী, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের শুভরাত্রি কামনা করছি। এখন রাত্রি অনেক হয়েছে, তোমরা শুতে যাও। তোমাদের আগামী সকাল শুভময় হোক, ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা রইল।

লুসেনসিয়ো হেসে বলল,—সত্যি আমি অবাক মানছি! এমন একজন মুখরাকে যে কেউ পোষ মানিয়ে বশ করতে পারবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

উইণ্টার্স টেল

এক

বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিস আর সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্তিস। দু'জনে দু'জনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই বন্ধুত্ব ছোটোবেলা থেকে গড়ে উঠেছে। দুজনে একসঙ্গে লেখাপড়া করেছেন, দু'জনে খেলা করেছেন। কেউ কাউকে দীর্ঘদিন না দেখে একা থাকা পরস্পরের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পলিক্সেনিস যেখানে লিয়ন্তিস সেখানে। আত্মীয় স্বজনেরা ছোটোবেলা ওদের দেখে বলত—একই বৃন্তে যেন দু'টি ফুল। লোকেরা ঠাট্টা করে অগোচরে বলত মানিক-জোড়!

ছেলেবেলার সেই গভীর ভালোবাসা সিংহাসনে আরোহন করার পরও দু'জনের মধ্যে অটুট ছিল। দু'জনে দু'দেশের রাজা। দূরত্বও কম নয়। পারস্পরিক ঘন ঘন দেখাসাক্ষাত আর ছোটবেলার মতো সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে দুই রাজার মধ্যে যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। এমনিই প্রাণের ভালবাসা পরস্পরের মধ্যে—সম্ভবতঃ একজন আর একজনের জন্য প্রাণত্যাগ করতেও দ্বিধা করত না। বোহেমিয়ার রাজদূত দামী দামী উপহার আর চিঠিপত্র নিয়ে মাঝেমাঝেই সিসিলিয়ায় ছুটে যেত, আবার সিসিলিয়ার রাজদূতও রাজার নির্দেশে মূল্যবান উপহারাদি আর চিঠি-পত্রাদি নিয়ে মাঝে মাঝেই বোহেমিয়ার রাজদরবারে চলে আসত। এ ব্যাপারে দুই রাজার মধ্যে চলছিল ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বীতা। ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পারস্পরিক আদান প্রদানের ব্যাপারে দু'জনেই সমান।

পলিক্সেনিস ও লিয়ন্তিস দু'জনেই যথাসময়ে বিয়ে করেছেন। বিয়ের ব্যাপারে বা স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের ব্যাপারে পলিক্সেনিসের ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন নয়। কারণ বিয়ের কয়েক বছর পরে, পলিক্সেনিসের রাণী একটি পুত্রসন্তান রেখে মারা যান। পলিক্সেনিস স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতেন, বলতে গেলে তাঁর ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। তিনি রাণীকে এতই ভালোবাসতেন যে—রাণীর মৃত্যুর পর আর বিয়ে করেননি। একমাত্র ছেলে ফ্লোরিজলই পলিক্সেনিসের জীবনের একমাত্র আশা-ভরসা। ছেলেকে কেন্দ্র করেই পলিক্সেনিসের যতো সুখের কল্পনা। ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

অবশ্য সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্তিসের একটি ছেলে হয়েছে। ছেলেটির নাম রাখা হয়েছে ম্যাসিলিয়াস। পুত্রসন্তান লাভের সংবাদ দু'জনেই দু'জনকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন। অভিনন্দনও জানিয়েছেন উভয়ে উভয়কে। উপহারও পাঠিয়েছেন দু'জনে দু'জনের পুত্রের জন্য।

লিয়ন্তিস বারবারই বন্ধুকে চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছেন—কয়েকদিনের জন্য সিসিলিয়ায় এসে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু পলিক্সেনিসের পক্ষে সিসিলিয়ায় যাওয়া এতাবৎকাল সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রাজকার্যের ঝামেলাতো আর কম নয়, রাজার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। নিজের রাজ্য ছেড়ে পররাজ্যে অনেকেই যেতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘদিন নিজ রাজ্য ছেড়ে কোনো রাজার পক্ষেই অন্যরাজ্যে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

তাই লিয়ন্তিসের চিঠির উত্তরে পলিক্সেনিস বারবারই জানিয়েছেন: ভাই আমি যদি বোহেমিয়ার রাজা না হতাম তা হলেই ভালো হ'তো। আমি দীর্ঘদিন তোমার সান্নিধ্যে সিসিলিয়ায় গিয়ে অবস্থান করতে পারতুম। কিন্তু বন্ধু, তুমি নিজে যখন রাজা, রাজার দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই অবহিত। রাজকর্তব্যের দায়ে আমার হাত-পা বাঁধা। তাই ইচ্ছে থাকলেও উপায় করে উঠতে পারি না—আমার অক্ষমতার জন্য আমায় ক্ষমা করো।

এভাবেই লিয়ন্তিসের আমন্ত্রণের উত্তরে পলিক্সেনিস নিজের অক্ষমতার কথা বারবার বন্ধুকে জানিয়েছেন, আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। আর লিয়ন্তিসের পক্ষে পলিক্সেনিসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। কারণ তিনিও একটি রাজ্যের রাজা।

কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুর পর, পলিক্সেনিস নিজেকে বড়ো একা মনে করতে লাগলেন। এরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাজকার্যের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাছে দুর্বিষহ মনে হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হ'তে লাগল এ দায়িত্ব কারো হাতে অর্পণ করে দূরে কোথায় গিয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করবেন। কিন্তু একমাত্র পুত্রের কথা ভেবেই তাঁকে এধরনের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হ'ল। কিন্তু রাজকার্যে মন বসাতে পারলেন না, বলা বাহুল্য ফলে রাজ্যশাসন ব্যাহত হতে লাগল।

মন্ত্রীরা বললেন: হুজুর, আপনি আবার বিয়ে করুন।

: না, তা হয় না। আমি অন্য কোনো মেয়েকে আর স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারব না। আপনারা আমাকে বিয়ের কথা আর বলবেন না।

রাজার মনোভাব বুঝতে পেরে মন্ত্রীরা চুপ করে রইলেন, কিন্তু গুরুতর রাজকার্যাদি দিনের পর দিন ব্যাহত হ'তে লাগল।

মন্ত্রীরা কোনো গুরুতর কাজ রাজার কাছে নিয়ে গেলে, রাজা পলিক্সেনিস বলতেন: আজ থাক্ কাল হবে।

আবার পরের দিন গুরুতর ব্যাপারে মন্ত্রীরা রাজার পরামর্শ নিতে গেলে, উনি বলতেন: আজ আমার কোনো কিছুই ভালো লাগছে না, এ ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করে যা হোক কিছু করুন।

কিন্তু এভাবে তো আর রাজকার্য চলে না। মন্ত্রীরা মনে মনে ভাবেন—একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু ভেবেচিন্তে তারা কোনো কিছুই স্থির করতে পারেন না।

ইতিমধ্যে সিসিলিয়ার রাজদূত এলো রাজা লিয়ন্তিসের সাদর অনুরোধ নিয়ে:

বন্ধু যদি সম্ভব হয়—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হ'লেও সিসিলিয়া এসো। আমার একান্ত অনুরোধ।

চিঠিটি হাতে নিয়ে রাজা পলিক্সেনিস বিমর্ষ মনে ভাবতে লাগলেন, আর সিসিলিয়ার রাজদূতকে বললেন : আমি দু' তিন দিনের মধ্যেই এ চিঠির উত্তর দিচ্ছি। আশা করি আপনার পক্ষে ২।৩ দিন বোহেমিয়ায় অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

রাজদূত বললেন : কোনো অসুবিধা নেই মহারাজ, আপনার নির্দেশে আমি মাসাধিক কালও এখানে অপেক্ষা করতে পারি।

পরদিনই রাজা পলিক্সেনিস মন্ত্রীগণকে একান্তে ডেকে বললেন : আমি ভাবছি—কিছুদিনের জন্য একবার সিসিলিয়া থেকে ঘুরে আসি, আপনারা কি বলেন ?

মন্ত্রীগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে বললেন : কিন্তু আপনার অবর্তমানে রাজার দায়িত্ব কে পালন করবেন ?

রাজা পলিক্সেনিস কিছুক্ষণ ভাবলেন : একজনের ওপর রাজ-দায়িত্ব অর্পণ করলে, তার অবর্তমানে তিনিই হয়তো বা রাজা হয়ে বসবেন, তবে তার একমাত্র ছেলের ভবিষ্যত কি হবে ? রাজপদের লোভ বড়ো সাংঘাতিক ? একজনের হাতে সব ক্ষমতা অর্পিত হ'লে—তাঁর ক্ষমতা বেড়ে যাবে অতএব রাজা পলিক্সেনিস মন্ত্রীগণকে বললেন : আমার অবর্তমানে মন্ত্রীপরিষদ সম্মিলিতভাবে রাজদায়িত্ব পালন করুন। এই হো'ল আমার নির্দেশ।

মন্ত্রীগণ বললেন : কিন্তু হুজুর, আমরা যদি কোনো ব্যাপারে একমত হতে না পারি ?

আপনারা পাঁচজন সুযোগ্য মন্ত্রী রয়েছেন, তা নিয়েই তো আমার এই মন্ত্রী-পরিষদ—আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ অন্ততঃ তিনজন যে মত পোষণ করবেন—সেই মতটাই বলবৎ হবে।

মন্ত্রীগণ বললেন : সেই ভালো।

তবু শেষবারের মতো রাজা পলিক্সেনিস মন্ত্রীগণকে জিগ্যেস করলেন : আপনারা আমার সিসিলিয়া যাওয়ার ব্যাপারটা অনুমোদন করছেন তো ?

মন্ত্রীগণ পরামর্শ করে বললেন : আপনার যা মানসিক অবস্থা—তাতে ক'রে সিসিলিয়ায় গিয়ে কয়েকদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আনন্দে কাটালে আপনার এই নিঃসঙ্গভাব বা একঘেয়েমি দূর হবে হুজুর। আমরা সকলে একযোগে আপনার সিসিলিয়া ভ্রমণের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে ভ্রমণের সপক্ষে মতদান করছি।

মন্ত্রীগণের অনুমোদন লাভ করে রাজা পলিক্সেনিস সিসিলিয়া রাজদূতকে ডেকে বললেন : আপনি আগে সিসিলিয়া চলে যান—আর আপনার রাজাকে বলুন আমি তিনদিন পরেই সিসিলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি।

যথাজ্ঞা হুজুর।

অবশ্য সিসিলিয়ার রাজদূতের কাছে রাজা পলিক্সেনিস বন্ধু লিয়ন্তিসের উদ্দেশ্যে

একখানা চিঠিও লিখেছিলেন।

বন্ধু,

বহুবার তোমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছি। সেই উপেক্ষা যদিও আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না, তবুও আগে ভাগে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তোমার এবারকার আমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করলুম না, তিনদিন পরেই আমি সিসিলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। দীর্ঘদিন পরে তোমার নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করব—একথা ভেবে এখন থেকেই আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠছে! আমি আসছি।

বহু লোকজন নিয়ে বোহেমিয়ার জাহাজ তিনদিন পরে সিসিলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হল। জাহাজের প্রধান আরোহী রাজা পলিক্সেনিস। জাহাজখানাও রাজকীয় জাহাজ। তাছাড়া রাজা কোথাও একা যান না, তাঁর সঙ্গে বহু লোকজনও যায়। জাহাজঘাটায় বোহেমিয়ার মন্ত্রীগণ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ রাজাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন: আপনার যাত্রা নিরাপদ হোক। সুস্থ শরীরে ও প্রফুল্ল মনে আপনি আবার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করুন।

রাজদূতের মারফত বন্ধু পলিক্সেনিসের পত্রখানা পেয়ে সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্তিস বলতে গেলে আনন্দে নেচে উঠলেন। তিনি মন্ত্রীগণ আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে সতর্ক করে বলতে লাগলেন: দীর্ঘদিন পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আসছেন। তাঁর সমাদরের যেন কোনো ত্রুটি না হয়। সারা রাজ্য উৎসবের সাজে সাজাতে হবে। আপনারা আমার বন্ধু ও আমাকে এক এবং অভিন্ন বলেই মেনে নেবেন।

হাসিমুখে অন্তঃপুরে ফিরে গিয়ে রাজা লিয়ন্তিস রাণী হার্মিয়োনকে বন্ধুর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে বললেন: এতদিন পরে তাঁর কাছ থেকে সাড়া পেয়েছি, সে আসছে। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব!

রাণী সব জেনেও না জানার ভান করে বললেন: কে আসছে মহারাজ?

কে আবার? আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু পলিক্সেনিস আসছে। আমি যে কি করব, তাই ভাবছি?

রাজার অস্থিরতা ও আনন্দ লক্ষ্য করে রাণী হার্মিয়োন হেসে বললেন: মহারাজ, আপনার যা অবস্থা, তাতে অপনি বন্ধুকে কাছে পেয়ে হয়তো আমাদের কথা, এমনকি রাজ্যশাসনের কথা ভুলে যাবেন।

ভুলে যাওয়া বিচিত্র নয়, আমার যে বন্ধুটি আসছে, তাঁকে অদেয় আমার কাছে কিছু নেই—আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!

বন্ধু সবারই থাকে, তাই বলে বন্ধুর জন্য কেউ এমন অস্থির হয়ে ওঠে না। রাজার হাবভাব লক্ষ্য করে রাণী হার্মিয়োন বেশ অবাক হয়ে গেলেন। দু'জনের মধ্যে কি প্রগাঢ় বন্ধুত্বই না বিদ্যমান।

যথাসময়ে জাহাজঘাটায় হাজির হোলেন রাজা লিয়ন্তিস, রাণী হার্মিয়োন, মন্ত্রীগণ ও পারিষদবর্গ ও বান্ধবগণ—সকলেই এসেছেন বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিসকে

অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। জাহাজঘাটের চারিদিকে 'সুস্বাগতম' লেখা, পুরো শহরটাকেই নূতন সাজে সাজানো হয়েছে।

জাহাজ থেকে নামতেই লিয়ন্তিস পলিক্সেনিসকে জড়িয়ে ধরলেন। পলিক্সেনিস বলল : তুমি রাজা না হলে আমি তোমায় চিনতেই পারতুম না, সেই কতকাল আগে দেখা—কিন্তু কিছু মিল আছে।

লিয়ন্তিস বলল : তোমার ছোটো বেলার মুখের আদল ঠিক আছে। সহজ, সরল, হাসিমাখা সেই মুখের ছবি আজও আমি আমার বুকে এঁকে রেখেছি। যদি বলো বুক চিরে দেখাতে পারি···

পলিক্সেনিস হেসে বললেন ? থাক্, আর বুক চিরে দেখাতে হবে না, তোমার মনের কথা আমি মুখ দেখেই টের পেয়েছি।

তারপর লিয়ন্তিস একে একে তাঁর রাণী, মন্ত্রিগণ, পারিষদবর্গ ও অন্যান্য গণ্য-মান্যদের সঙ্গে পলিক্সেনিসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দু'টি কিশোর মন পরিণত বয়েসেও আবার যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

দু'জনের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা, কত আলোচনা—কথা যেন আর শেষ হতেই চায় না। রাজা লিয়ন্তিস বন্ধুকে নিয়ে মেতে উঠলেন। রাজকার্য অবশ্য ব্যাহত হতে লাগল।

মন্ত্রীরা বিশেষ কাজে রাজার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলে লিয়ন্তিস বলতেন : এখন আর সময় হবে না, আপনারাই ভেবেচিন্তে যাহো'ক করুন। এতদিন পরে এতদূরে থেকে আমার বন্ধু এসেছেন। অতএব—

রাজপ্রাসাদে চলতে লাগল এক নাগাড়ে ভোজ, উৎসব, নাচ—সে এক হইহই ব্যাপার। কখনও দু'জনে বসে দাবা খেলছেন, কখনও হাসি গল্প করছেন।

স্বয়ং রাণী পর্যন্ত রাজার সঙ্গে কথা বলার সময় পাচ্ছেন না।

কখনও দুই বন্ধু লোকজন নিয়ে শিকারে রত, কখনও বা হাসি খুশী আর হুল্লোড়ে ব্যস্ত। রাণী পর্যন্ত একদিন ঠাট্টা করে বললেন : বন্ধু তো অনেকেই হয়, কিন্তু তোমাদের মতো এরকম অন্তরঙ্গ বন্ধু চোখে দেখা যায় না।

মন্ত্রীরা ভাবেন পলিক্সেনিস রাজকার্য ফেলে এখানে এতদিন কি করেই বা কাটাচ্ছেন। আর রাজা লিয়ন্তিস মন্ত্রী আর পারিষদবর্গের হাতে রাজ্য প্রশাসনের ভার দিয়ে বন্ধুকে নিয়ে দিব্যি মেতে রয়েছেন।

এভাবে কতদিন চলে গেল, কয়েক মাসও অতিবাহিত হোল। বারবার বোহেমিয়া থেকে চিঠি আসতে লাগল। পরিশেষে রাজা পলিক্সেনিস বললেন : অনেকদিন তোমার এখানে রইলাম, আর নয় বন্ধু, এবার আমায় বিদায় দাও।

কিন্তু লিয়ন্তিস কোনো কথা শুনতে চান না, যতবারই পলিক্সেনিস বিদায় গ্রহণ করতে চায়, ততবারই তিনি বলেন : আর কটা দিন মাত্র থেকে যাও, মাত্র কটা দিন। আর তোমায় অনুরোধ করব না। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে।

কিন্তু লিয়ন্তিসের শেষ অনুরোধ আর শেষ হয় না।

পরিশেষে পলিক্সেনিস স্থির প্রতিজ্ঞা করেন, এবার তিনি যাবেনই, বন্ধুর শত অনুরোধেও আর যাত্রা স্থগিত রাখবেন না।

তিনি তাঁর কর্মচারী ও জাহাজের লোকদের তৈরি হতে বলে বন্ধু লিয়ন্তিসকে বললেন ঃ আমি আগামীকাল বোহেমিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হতে চাই, আর তুমি আমায় বাধা দিও না।

শেষবারের মতো মিনতি জানিয়ে লিয়ন্তিস বললেন ঃ অন্ততঃ কালকের দিনটা থেকে যাও বন্ধু, এই আমার শেষ অনুরোধ।

পলিক্সেনিস গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ তোমার কাল আর ফুরোবে না। অতএব তোমার অনুরোধ আমি আর রাখতে পারছি না বলে আমায় ক্ষমা করো, আমি আগামীকালই রওনা হচ্ছি। আর আমায় থাকতে বলো না।

পলিক্সেনিসের যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে লিয়ন্তিস রাণী হার্মিয়োনকে বললেন ঃ তুমি একবার পলিক্সেনিসকে অনুরোধ করে দেখো—আরও দু'টো দিন যেন এখানে থেকে যায়। আমার অনুরোধ আর সে শুনছে না।

তোমার অনুরোধ যখন তোমার বন্ধু প্রত্যাখ্যান করেছেন, তখন কি তিনি আমার অনুরোধ রাখবেন ?

একবার চেষ্টা করে দেখোই না, আমার অনুরোধ না রাখলেও হয়তো বা তোমার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রাখবেন। জানোতো সুন্দরী নারীদের অনুরোধ সচরাচর অনেকেই প্রত্যাখ্যান করে না।

কি আজে বাজে বকছ ?

একবার ওর কাছে যাও না, লক্ষ্মীটি। যদি তোমার অনুরোধে অন্ততঃ আরও দুটো দিন এখানে থেকে যায়।

রাজা বার বার অনুরোধ করায়, পরিশেষে রাণী হার্মিয়োন হেসে বললেন ঃ যখন এতো করে বলছ—তখন দেখি একবার চেষ্টা করে।

অতএব রাণী রাজা পলিক্সেনিসের নির্দিষ্ট কক্ষে ঢুকলেন। পলিক্সেনিস অবাক ঃ আরে আপনি ? বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি ?

আমার একটা অনুরোধ কি রাখবেন ?

যদি অসাধ্য না হয়, নিশ্চয়ই রাখব।

আরও দুটো দিন এখানে থেকে যান না।

পলিক্সেনিস হেসে বললেন ঃ লিয়ন্তিসের অনুরেধ আর রাখতে পারিনি বলে, ও নিশ্চয়ই আপনাকে পীড়াপীড়ি করে আমার কাছে পাঠিয়েছে ?

ও কথা বলছেন কেন ? আমি নিজেওতো আপনাকে দুটো দিন থাকবার জন্যে অনুরোধ করতে পারি।

তা নিশ্চয়ই পারেন।

আর দুটো দিন এখানে থাকলে—আপনার এমন কি ক্ষতি হবে ?

বেশ আপনার অনুরোধে, আমি দুটো দিন থেকে যাব, তার বেশি নয় কিন্তু।

রাণী হাসি মুখে ফিরে গেলেন, রাজা নিজের কক্ষে রাণীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

রাণী ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, কি হ'লো ?

রাণী হেসে বললেন ঃ কেল্লা ফতে।

লিয়ন্তিস গম্ভীর মুখে বললেন ঃ সুন্দরী মুখের জয় দেখছি সর্ব্বত্র।

ব্যাপারটা দুই বন্ধু কিন্তু দু'ভাবে গ্রহণ করলেন। রাজা পলিক্সেনিস সৌজন্য রক্ষার্থে বন্ধুপত্নীর এই সামান্য অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন না। কারণ এর আগে রাণী হার্মিয়োন তাঁকে কোনো অনুরোধ করেন নি, এই প্রথম বন্ধুপত্নী অনুরোধ জানালেন। অতএব রাজা পলিক্সেনিস সেই অনুরোধ রক্ষার্থে আরও দু'দিন সিসিলিয়া থেকে যেতে রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু রাজা লিয়ন্তিস ব্যাপারটা গ্রহণ করলেন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। কেন পলিক্সেনিস তাঁর অনুরোধের চেয়ে রাণী হার্মিয়োনের অনুরোধের বেশি মূল্য দিল ? অ্যাদ্দিন ধরে বন্ধু রাজপ্রাসাদে বাস করছেন, তবে কি বন্ধুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রাণীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই তাই। নইলে এমনটাতো হওয়ার কথা নয়। রাজা লিয়ন্তিস সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপারটা গ্রহণ করলেন না, গ্রহণ করলেন কুটিল দৃষ্টিভঙ্গির পরিপেক্ষিতে। এলে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব মুহূর্তে মধ্যে পরিণত হোল জঘন্য ঘৃণায় ও শত্রুতায় এবং বলা বাহুল্য রাজা লিয়ন্তিসের মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেল বিরাট। সন্দেহ এমনই জিনিস—যা প্রতিমুহূর্তে হৃদয়কে কুরে কুরে খায়—আর মানসিক দিক থেকে কাণ্ডজ্ঞান রহিত করে তোলে। সহজ সাধারণ বিষয়টিকে আর সহজ সাধারণ বলে ভাবা যায় না—সব কিছুই জঘন্য ও হীন আচরণ বলে মনে হয়। তাঁর মনে হোল একই জায়গায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার বন্ধুর নিশ্চয়ই অবৈধ ভালোবাসা এবং সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রাণী হার্মিয়োন—কুলটা, বিশ্বাসঘাতিনী। আর বন্ধু পলিক্সেনিস দুশ্চরিত্র, লম্পট। স্ত্রী ও বন্ধুর এই জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে রাজা লিয়ন্তিস একপ্রকার নিশ্চিত হোলেন। ফলে তিনি কথাবার্তায় ও অচরণে উম্মত্ত প্রায় হয়ে উঠলেন। বন্ধুর প্রতি এবং স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা মুহূর্তে মধ্যে রূপান্তরিত হোল প্রবল ঘৃণায়।

যে বন্ধুকে বার বার মিনতি করে থাকতে বলেছিলেন, সেই বন্ধুর অবস্থানই তাঁর পক্ষে এখন অসহনীয় হয়ে উঠল। বেইমান, চরিত্রহীন ও বিশ্বাসঘাতক আবার বন্ধু কি ? যে বন্ধু বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়—সে আবার বন্ধু কেমন ?

ঐ মুহূর্তে থেকে রাজা লিয়ন্তিস পলিক্সেনিসের প্রতি সাধারণ,ভদ্র ব্যবহারটুকু বিসর্জন দিলেন।

আর ব্যাপারটা নিয়ে তিনি যত বেশি চিন্তা করেন, তত বেশি উম্মত্ত হয়ে ওঠেন।

তাঁর বন্ধু বিশ্বাসঘাতক ! নরাধম ! যাকে তিনি এত ভালবাসতেন, এত সমাদর করতেন—সেই বন্ধুই কিনা এমন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হোল, পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দিল। যাকে সমাদর করে অতিথিশালায় না রেখে অন্তঃপুরে ঠাঁই দিয়েছিলেন—সেই বন্ধুই কিনা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে—তাঁর বুকে শেল হানল !

এত বড়ো পাষণ্ড সে দীর্ঘদিনের আন্তরিক বন্ধুত্বের কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে এমন হীন কর্মে লিপ্ত হোল। হায় হায় এ ধরনের লোকেরাই পৃথিবীটাকে নরক করে তোলে। এদের সান্নিধ্য বিষতুল্য। এঁরা মহাপাপিষ্ঠ। বন্ধুত্বের ভান করে—বন্ধুরই চরম সর্বনাশ করে। রাজা লিয়ন্তিস নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বারবার নিজেকেই ধিক্কার জানাতে লাগলেন। না, না—এ রকম বন্ধুর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে—এমন লোককে বেঁচে স্বদেশে ফিরতে দেওয়া অনুচিত হবে, অধর্ম হবে। রাজা লিয়ন্তিস নিজের মনে মনেই ঠিক করে ফেললেন ঃ না-না। ক্ষমা নয়। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, দোষীকে দণ্ড দিতেই হবে।

ক্যামিলো—রাজা লিয়ন্তিসের একজন অতি বিশ্বাসী পারিষদ ; রাজা তাঁকে গোপন কক্ষে ডেকে পাঠালেন। রাজার নির্দেশ পেয়ে ক্যামিলো অনতিবিলম্বে রাজার গোপন কক্ষে উপস্থিত হোল।

হুজুর নাকি আমায় জরুরী তলব করেছেন ?

হ্যাঁ। তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পারবে। আমার বন্ধু আমার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বলেন কী হুজুর—এতো ভাবাই যায় না।

আমিও কি একথা কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিলাম যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হবে।

এতো ভয়ানক কথা, হুজুর। আপনি ঠিকমতো জেনেছেন তো ?

হ্যাঁ—আমি নিশ্চিত ভাবেই জেনেছি। আমার ধারণা কখনও ভুল হ'তে পারে না ক্যামিলো। আমি খাল কেটে কুমীর এনেছিলাম। বন্ধুকে অতিথিশালায় না রেখে অন্তঃপুরে ঠাঁই দিয়েছিলাম, সে তাঁর উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।

আপনার বন্ধু না হয় চরিত্রহীন, লম্পট হ'তে পারে, তাই বলে রাণীমা ?

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না। আমার স্ত্রী কুলটা, অসতী। তা নইলে—আমি এত বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও একটি দিন মাত্র বন্ধু থাকতে চাইল না। আর তোমাদের রাণীর অনুরোধে অনায়াসেই দু'দিন থেকে যেতে রাজী হয়ে গেল। বলি এর থেকে কি প্রমাণিত হয় ?

কিন্তু হুজুর, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে নাতো ?

না-না। আমার ভুল হ'তে পারে না।

আমায় কি করতে বলেন হুজুর ?

প্রাণে বেঁচে যাতে পলিক্সেনিস আর বোহেমিয়ায় ফিরে যেতে না পারে—তোমাকে

অবিলম্বে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলাই ভালো—এতে বাইরের কেউ টের পাবে না। বোহেমিয়ার রাজকর্মচারীরাও টের পাবে না। ভাববে তাঁদের রাজা অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। তোমাকে এ কাজটা করতেই হবে ক্যামিলো।

ক্যামিলো উঁচু বংশের মানী লোক। রাজা এ সব কথা বললেও তিনি কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবু রাজার মানসিক অবস্থা যেন ক্ষ্যাপা বাঘের মতো, ঠিক এই মুহূর্তে যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারাও তাঁকে টলানো যাবে না। সন্দেহ তাঁর মনের মধ্যে এমন বিষই সঞ্চার করেছে—এখন তাঁর সব কিছুই বিষময় মনে হচ্ছে। অথচ ক্যামিলো রাজা পলিক্সেনিসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করেছেন। তিনি মৃতা স্ত্রীকে এমনই ভালোবাসেন যে—দ্বিতীয়বার পর্যন্ত দ্বার পরিগ্রহ করেননি—সেই তিনি এমন হীনকর্মে কখনই লিপ্ত হ'তে পারেন না। কিন্তু রাজার যা মানসিক অবস্থা এখন তাঁকে কিছু বোঝাতে চাইলেও বুঝবেন না, বরং উল্টো ফল হবে। আর সে রাজা পলিক্সেনিসকে হত্যা করতে না চাইলে—রাজার তো আর লোকের বা ঘাতকের অভাব নেই—অন্য কোনো ঘাতক দিয়ে রাজা পলিক্সেনিসকে হত্যা করবেন। তাই ক্যামিলো রাজার প্রস্তাবে রাজী হয়ে বলল ঃ বেশ, আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখলে পারতেন।

না। এ ব্যাপারে আর ভাবাভাবি নয়, আমি নিশ্চিত। আগামীকাল রাতেই তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা চাই। পরশু জাহাজে করে তাঁর লাশটাই যাবে শুধু বোহেমিয়ায়। আমাদের শুধু লোক দেখানো শোক প্রকাশ করতে হবে।

ক্যামিলো ফিরে যেতে যেতে ভাবলেন—এ কাজ করা ঠিক হবে না। অতিথির রক্তে সিসিলিয়ার রাজবংশের ইতিহাস এমন ভাবে কলঙ্কিত করতে দেওয়া ঠিক হবে না। সন্দেহ বশে রাজা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন।

তাই ক্যামিলো গোপনে রাজা পলিক্সেনিসের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললেন। রাজা পলিক্সেনিস প্রথমে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বললেন ঃ আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

না। মহারাজ, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনার পরমবন্ধু সন্দেহবশে এখন আপনার পরমশত্রু। তাই আপনাকে আজ রাতেই গোপনে সিসিলিয়ায় রওনা হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু লিয়ন্তিসের ব্যবহারে আমি এখনও পর্যন্ত কোনো অসৌজন্যের পরিচয় পাইনি তো! শুধু সে কিছুটা নীরব, উচ্ছ্বাস কম—অথচ আমি চলে যাব বলেই তাঁর মনোভাব এরকমটি হয়েছে।

না, মহারাজ, না। তিনি আপনাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার জন্য আমার ওপরই ভার দিয়েছেন। আমি জানি তাঁর কোথায়ও ভুল হচ্ছে—কিন্তু এখন তাঁকে বোঝাতে চাইলেও তিনি বুঝবেন না, তাই আপনাকে পালিয়ে যেতে হবে। আমি এই রাজ-

বংশের হিতকামী। আমি চাইনা—সিসিলিয়া রাজবংশের ইতিহাস অতিথির রক্তে কলঙ্কিত হোক। মহারাজ, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন। ভবিষ্যতই একদিন আমার কথার সততা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করবে।

রাজা পলিক্সেনিস প্রথমে ক্যামিলোর কথা বিশ্বাস করলেন না, কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর নিশ্চিত হয়েছিলেন ; ক্যামিলোর মতো মান্যগণ্য ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে পারে না, তাঁর কথার মধ্যে যে আন্তরিকতা, তার মধ্যে সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব তিনি গোপনে ক্যামিলোর সহায়তায় রাতের অন্ধকারে বোহেমিয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন।

জাহাজ রয়েছে জাহাজ ঘাটায়। ক্যামিলো শুধু বুদ্ধিমানই নন, পলিক্সেনিসের নিরাপদে পালাবার ব্যবস্থা পাকাও করেছেন তিনি। অতিথিশালায় বোহেমিয়ার যে রাজকর্মচারীরা ছিল—তারা রাজা পলিক্সেনিসের ও ক্যামিলোর নির্দেশে দু' তিন জন করে জাহাজে গিয়ে উঠল। একসঙ্গে গেলে একটা আলোড়ন ও হইচই হবে—তাই দলে দলে ভাগ হয়ে যাওয়ার এই ব্যবস্থা করলেন।

শহরের সব প্রবেশ পথ বা বহির্নির্গমনের ভার ছিল ক্যামিলোর ওপর—তাই তিনি পরিকল্পনা মাফিক নিখুঁতভাবে কাজ হাসিল করতে সক্ষম হোলেন। কেউ কিছুমাত্র টেরও পেল না। ক্যামিলো আগে ভাগেই রক্ষীদের ওপর হুকুম জারী করে রেখেছিলেন ঃ বোহেমিয়ার রাজকর্মচারীগণ জাহাজ ঘাটায় যত রাতেই যান, তাঁদের যাত্রায়তে যেন বাধা না দেওয়া হয়।

রক্ষীরা তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, রক্ষীরাতো আর জানত না—ভেতরকার সেই হীন চক্রান্তের ব্যাপার। একমাত্র জানতেন স্বয়ং রাজা লিয়ন্তিস এবং তাঁর বিশ্বস্ত পার্ষদ ক্যামিলো।

পরিশেষে রাজা পলিক্সেনিসও সাধারণ গরীবের মতো পোষাক পরে রাজপ্রাসাদ থেকে গোপনে বেরিয়ে পড়লেন। ক্যামিলো এই ব্যবস্থাটি পাকা করেছিলেন, তিনি রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের বললেন ঃ এটি হচ্ছে রাজা পলিক্সেনিসের চাকর। রাজার হুকুমে জাহাজ থেকে কি একটা আনতে যাচ্ছে।

রক্ষীরা অবশ্য বলেছিল ঃ তাই বলে এত রাতে ?

ক্যামিলো গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ রাজা-রাজড়ার ব্যাপারই আলাদা—তাঁদের হুকুমের আবার রাত-বিরেত বলে কিছু আছে নাকি !

অতএব রক্ষীরা আর বাধা দেয় নি, যখন খোদ ক্যামিলোই একথা বলছেন, তখন বাধা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অতএব রাজা পলিক্সেনিস নিরাপদেই তাঁর জাহাজে আরোহণ করতে সক্ষম হোলেন। তিনি ক্যামিলোকে সঙ্গে নিলেন। কারণ রাজা লিয়ন্তিস যখন জানতে পারবেন—ক্যামিলোই রাজা পলিক্সেনিসকে নিরাপদে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছে—তখন তিনি ক্যামিলোকে আর আস্ত রাখবেন না। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়বে

ক্যামিলোর ওপর। এবং তিনি জানতেও পারবেন এবং ক্যামিলোকে মৃত্যুদণ্ড দান করবেন। অতএব ক্যামিলো দেশের মাটিকে শেষ প্রণাম জানিয়ে রাজা পলিক্সিনিসের সঙ্গে বোহেমিয়ার জাহাজে আরোহণ করলেন।

জাহাজও ছেড়ে দিল। এই পালিয়ে যাওয়া সিসিলিয়ার অন্য কেউ টেরও পেল না।

পরের দিন রাজা লিয়ন্তিস পলিক্সেনিসের পালিয়ে যাওয়া সংবাদ পেলেন। প্রচণ্ড রাগে তিনি নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগলেন। ঐ মুহূর্তে যদি তিনি ক্যামিলোকে হাতের কাছে পেতেন—তবে সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতেন।

কিন্তু ক্যামিলো তাঁর নাগালের বাইরে, রাজা পলিক্সেনিসের জাহাজও ততক্ষণে তাঁর রাজ্যের সীমানার বাইরে চলে গেছে।

রাজা লিয়ন্তিস প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য বলতে গেলে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলতে লাগলেন: সব বেইমান, সব বিশ্বাসঘাতক।

সেই মুহূর্তে রাজা লিয়ন্তিস হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। প্রতিহিংসার আগুন এমনই এক আগুন—যা ভালোভাবে নির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকে। রাজা লিয়ন্তিসের সব রাগ গিয়ে পড়ল নিরপরাধা রাণী হার্মিয়োনের ওপর। কারণ অন্য দু'জন তাঁর নাগালের বাইরে, একমাত্র রাণীই তাঁর হাতের কাছে।

প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে তিনি রাণীকে যা ইচ্ছে তাই বলতে লাগলেন: পাপীয়সী, কুলটা, চরিত্রহীনা—তোর মুখ দেখাও পাপ, শয়তানী, দাঁড়া তোকে এখুনি যমের বাড়ি পাঠাচ্ছি। তুই নরকের দ্বার। সব নষ্টের গোড়া তুই—বিশ্বাসঘাতিনী।

রাজার কথা শুনে রাণী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন: এ তুমি কি বলছ?

কিছু বুঝতে পারছিস না, বিশ্বাসঘাতিনী, কুলটা—এখন তুই কারাগারে গিয়ে পচে মর। তোর উপযুক্ত স্থান রাজপ্রসাদ নয়, কারাগারের কালো কুঠরী।

বলা বাহুল্য, রাজার হুকুমে নিরপরাধা রাণী হার্মিয়োনকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হোল। রাণী বুঝতেও পারলেন না—কি অপরাধে তিনি রাজার বিশ নজরে পড়েছেন, কারাগারেই বা তাঁকে পাঠানো হোলো কেন? রাণী বুঝতেই পারলেন না—কেন আকস্মিকভাবে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল? কেনই বা রাজা পলিক্সেনিস আর ক্যামিলো রাতের অন্ধকারে এভাবে পালিয়ে গেলেন। কারাগারের কালো কুঠরীতে বসে হতভাগিনী রাণী নিজের চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা ভেবে কেবল চোখের জল ফেলেন, আর করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। এছাড়া আর কীই-বা করতে পারেন তিনি।

রাজা যাই বলুন, রাজ্যের গণ্যমান্য এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা কিন্তু বিশ্বাস করেন না যে তাঁদের রাণী চরিত্রহীনা। অথবা তাঁর কোনো দোষ রয়েছে। রাণীর মুখাবয়বে একটা পবিত্রতার ছাপ পরিস্ফুট—তবু সাহস করে তাঁরা রাজাকে কিছু বলতে পারেন না, পাছে রাজার বিষ নজরে পড়ে যান।

তাঁরা রাজাকে কিছু সাহস করে বলতে না পারলেও তাঁরা পরামর্শ করে দু'জন অতি বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত লোককে পাঠালেন ডেলফি নগরে সূর্য্যদেবতা অ্যাপেলোর মন্দিরে। তখনকার দিনের লোকেদের ধারণা ছিল সূর্য্যদেবতার মন্দিরে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকলে—দৈববাণী উচ্চারিত হয় এবং দৈববাণী কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না, তাতেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে।

রাণী তাঁদের চরিত্রহীনা কিংবা সতীসাধ্বী একমাত্র দৈববাণীর মাধ্যমেই সঠিকভাবে জানা যেতে পারে, তাই রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে দু'জন বিশ্বস্ত লোককে পাঠালেন ডেলফি নগরে সূর্য্যদেবের মন্দিরে। ঐ দুজন লোক শুধু বিশ্বাসীই নয়, সম্ভ্রান্তও বটে; তারা রাণীর চরিত্র সম্পর্কে দৈববাণী নিয়ে যথা সময়েই হাজির হবেন।

কিন্তু রাজা লিয়ন্তিসের দৃঢ় বিশ্বাস—রাণী হার্মিয়োন পাপীয়সী, চরিত্রহীনা এবং বিশ্বাসঘাতিনী।

সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজাকে বলল: হুজুর, আমরা দু'জন বিশ্বস্ত লোককে ডেলফি নগরে সূর্য্য মন্দিরে পাঠিয়েছি, তারা ফিরে আসার পর আপনি রাণীমার যথাযথ বিচার করুন।

কিন্তু রাজা লিয়ন্তিসের সেই এক গোঁ: আমি ওসব দৈববাণীতে বিশ্বাস করি না, আমি কাউকেই আর বিশ্বাস করি না, দৈববাণীর জন্য অপেক্ষা করে আমি রাণীর বিচারের দিন বিলম্বিত করতে চাই না। দৈববাণী আসুক বা না আসুক নির্দিষ্ট দিনেই রাণীর বিচার হবে। পাপীয়সীকে চরম দণ্ড দিয়ে আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। প্রকাশ্য সভায় রাণীর বিচার হবে এবং আমিই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব—এই আমার অটল সিদ্ধান্ত।

মনে মনে তাঁরা বিরক্ত হ'লেও রাজার মুখের ওপর মান্যগণ্য লোকেরা কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে যে যার বাড়িতে ফিরে গেলেন।

কিন্তু বিচারের নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই রাণী কারাগারে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। এতে রাজার সন্দেহ ও রাগ আরও শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন: কন্যা নয়, কন্যা নয়—পাপীয়সীর চরম পাপের ফসল।

তিনি ঘৃণায় নিজের প্রতি ধিক্কার জানাতে লাগলেন, এমনকি কন্যাকে দেখতে কারাগারে যাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী অবশ্য বলেছিলেন: হুজুর, আপনি কারাগারে গিয়ে একবার মেয়েটিকে দেখুন, যদি তাঁর মুখের আদল আপনার মতোই হয়ে থাকে।

হতে পারে না। ওটি পাপের ফসল। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না। চাই না।

রাজার অন্যতম পার্ষদ ছিলেন, অ্যান্টিগোনাস। অ্যান্টিগোনাসের স্ত্রী পলিনা রাণী হার্মিয়োনকে খুবই ভালোবাসতেন। রাণীও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন।

দু'জনেই ছিলেন দু'জনের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। সুদিনে রাণীর ভালোবাসার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে এখনও পলিনা স্মরণ করেন। তাঁর বার বারই মনে হ'তে লাগল—রাণী পুরো-পুরো নির্দোষ। তাঁর মতো সাধ্বী মহিলা—কখনই কোনো অবৈধ জঘন্য কর্মে লিপ্ত হ'তে পারে না। রাজার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি, বন্ধুত্বের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি—আবার শত্রুতার ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি। রাণীর এই চরম দুর্দিনে অ্যান্টিগোনাসের স্ত্রী পলিনা তাই স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কারাগারে রাণীর সঙ্গে দেখা করে সদ্যোজাত শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। তাঁর আশা ছিল মেয়ের চাঁদপানা মুখখানা দেখলে রাজা হয়তো বা তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। মেয়ের মুখের আদলও অনেকাংশে রাজা লিয়ন্টিসের মতোই। এ যে রাজারই ঔরসজাত ও ব্যাপারে পলিনা একরকম নিশ্চিত। হয়তো বা মেয়ের সুন্দর কচি মুখখানা দেখলে রাজার কঠিন প্রাণও গলে জল হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েকে দেখে রাজা আরও তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন: এ মেয়ে আমার নয়, এ আমার মেয়েই হ'তে পারে না। এর মুখে আমি ওর ছায়া দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্টিগোনাস, তুমি এই পাপকে অবিলম্বে বিদেয় করো। আমার নির্দেশ তুমি অবিলম্বে একে হত্যা করো।

রাজার এরূপ নির্দেশ শুনে রাজসভার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

তাঁরা সকলে মিলে রাজাকে বললেন: হুজুর, এভাবে কন্যা সন্তানটি হত্যা করার আদেশ দেবেন না। তাছাড়া এখনও রাণীর বিচার সম্পূর্ণ হয় নি।

রাজা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন: অ্যান্টিগোনাস, তবে ঐ শিশুটিকে তুমি নির্জন কোনো দ্বীপে ফেলে দিয়ে এসো। হত্যা করার ব্যাপারে তোমাদের সকলের যখন এতো আপত্তি।

অ্যান্টিগোনাসের স্ত্রী পলিনা রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুনয় জানালেন: নির্জন দ্বীপে নির্বাসনও মৃত্যুর সামিল। আপনি একবার ভেবে দেখুন, ঐ শিশুটির কি দোষ?

রাজা চীৎকার করে বললেন: আমি এসব শুনতে চাই না। আমি যদি ওর জনক হতাম—তবে ওর প্রতি আমার দরদ থাকত। আমি নিশ্চিত জানি ও আমার মেয়ে নয়। আপনি কেন আমাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করতে এসেছেন? বেরিয়ে যান এখান থেকে।

পলিনা তিরস্কৃত হয়েই ফিরে এলেন রাজার কাছ থেকে—অ্যান্টিগোনাস স্ত্রীর প্রতি কোনো দরদ দেখালেন না।

তিনি বরং স্ত্রীকে বললেন: যাঁর মেয়ে তাঁর দরদ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। তুমি কেন ঐ পাপের ফসলের জন্যে রাজার কাছে আবেদন জানাতে গিয়েছিলে?

পলিনা স্বামীকে জিগ্যেস করলেন: তুমি কি করে জানলে ঐ শিশু পাপের

ফসল ?

এ আবার আলাদা করে জানবার দরকার হয় নাকি ? মেয়ের বাপই যখন এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত, তখন আমাদের দরদ দেখানোর কোনো মানে হয় না। বরং দরদ দেখানোটা অন্যায় ও অশোভন। যদি রাজার নিজের মেয়ে হোত—তবে মেয়ের প্রতি সামান্য দরদও থাকত না কি ?

যাকগে আমি তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। যদি রাজা মেয়ের সামনে কয়েকদিন থাকত তবে মায়া পড়ত। এভাবে এক ঝলক দেখে মেয়ের প্রতি কোনো পিতার মায়া হয় না, আর যে পিতা সন্দেহ রোগে ভুগছে।

যাকগে, আমি এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে।

অ্যান্টিগোনাস স্ত্রীর কোল থেকে শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন, রাজার নির্দেশ মতো কোনো নির্জন দ্বীপে ফেলে আসার জন্য।

কারাগারে বসে রাণী হার্মিয়োন পলিনার কাছ থেকে সব কথাই শুনলেন।

পলিনা কাঁদতে কাঁদতে বলল : বহু চেষ্টা করেও আমি তোমার মেয়েটিকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারলাম না। তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। এখন বুঝতে পারলুম—পুরুষদের হৃদয় বলে কিছু থাকে না। তবে আমিও বলে যাই রাজাকে এর জন্য একদিন পস্তাতে হবে।

রাণী হার্মিয়োন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর নিজের এই শোচনীয় অবস্থা সদ্যোজাতা কোলের মেয়েটি আজ নির্জন দ্বীপে, হয়তো বা বাঘ, ভালুকে বা হায়নায় তার নরম কোমল দেহটি এতক্ষণে ছিঁড়ে খুড়ে খেয়ে ফেলেছে।

হায় হায় করতে করতে রাণী হার্মিয়োন কারাগারের মেঝেতে আছড়ে পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন—রাণীর এমন শোচনীয় অবস্থা দেখে কারাগারের রক্ষীদেরও চোখে জল এল। কিন্তু তাঁরা নিরুপায়। হুকুমের গোলাম। রাণী আছড়ে আছড়ে কাঁদতে কাঁদতে শোকে দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

পলিনা নিরুপায়। কি করবেন তিনি ? তিনি অসহায়। কাউকে রক্ষা করার মতো তাঁর যে সামার্থ্য নেই।

অবশেষে এল রাণীর বিচারের সেই নির্দিষ্ট দিনটি। প্রকাশ্য আদালতে হাজির হয়ে স্বয়ং রাজা বিচারকদের কাছে রাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বললেন। রাণী ভ্রষ্টা, কুলটা, ব্যাভিচারে লিপ্তা। এমন রাণী দেশের ও রাজ্যের কলঙ্ক, প্রাণদণ্ডই তাঁর একমাত্র প্রাপ্য।

রাণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন : ঈশ্বর সাক্ষী, আকাশের সূর্য্য-চন্দ্র সাক্ষী—আমি জ্ঞানতঃ কোনো অবৈধ কর্মে লিপ্ত হইনি। রাজার অনুরোধেই আমি পলিক্সেনিসকে এখানে দুটো দিন থাকতে অনুরোধ করেছিলাম।

রাজা হেসে বললেন : তবেই বুঝুন ব্যাপারখানা, বন্ধুর অনুরোধে যিনি একদিনও থাকতে রাজী হোলেন না, বন্ধুপত্নীর একবার অনুরোধেই তিনি পুরো

দু'দিন এরাজ্যে কাটাতে রাজী হোলেন কেন? আর রাণী যে মেয়েটিকে জন্ম দিয়েছেন—ওটি কার সন্তান? ওটি পাপের ফসল ছাড়া আর কি?

রাজার অভিযোগ শুনে রাণী আদালতেই মূর্ছিতা হলেন।

রাজা বিচারকদের বললেন: স্ত্রীলোকগণ সচরাচর অভিনয়ে পটু হয়ে থাকেন, এর কান্না, মূর্ছা দ্বারা আশা করি আপনারা মোটেই প্রভাবিত হবেন না।

বিচারকগণ মিলিতভাবে রাণীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে উদ্যত হোলেন—কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে সূর্য্য মন্দির থেকে দৈববাণী নিয়ে আদালতে হাজির সেই দু'জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

তাঁরা বিচারকদের উদ্দেশ্যে বললেন: মাননীয় বিচারকগণ রাণীমার বিচারের রায় দানের পূর্বে আগে দৈববাণীর বক্তব্য দয়া করে শুনন এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের এই পত্রটি পাঠ করলেই আপনাদের সবার দ্বিধা চলে যাবে।

প্রধান পুরোহিতের সই ও শীল মোহরযুক্ত চিঠিটি তারা বিচারকদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

শীলমোহর খুলে চিঠিটি বের করে ফেলা হোল, একজন বিচারক উচ্চকণ্ঠে চিঠির বিষয়বস্তু পাঠ করলেন।

"রাণী হার্মিয়োন সতী সাধ্বী, তিনি নিষ্পাপ। সদ্যোজাত শিশু কন্যাটি রাজা লিয়ন্তিসেরই ঔরসজাত কন্যা এবং ঐ মেয়েটি নির্বাসিত করার পর—যদি আর তাঁকে পুনরায় না ফিরে পাওয়া যায়—তবে রাজা লিয়ন্তিসের মৃত্যুর পর এ রাজ্যের সিংহাসনে—অপর কারো বসার আর ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকবে না। এটি হ'লো দৈববাণী।"

দৈববাণীর বক্তব্য শুনে আদালতে উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তিই খুশী হোল—দেশের অধিকাংশ লোকই রাণী হার্মিয়োনকে মনে মনে শ্রদ্ধা করত।

রাজা লিয়ন্তিস কিন্তু দৈববাণীর বিরোধিতা করে বললেন: দৈববানী পুরোহিত বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এসব মোটেই বিশ্বাস করি না। তাছাড়া এ চিঠিটা জাল, মিথ্যা। আর দৈববাণীর বক্তব্যও মিথ্যা। দৈব্যবাণী বলেছে ঐ মেয়েটিকে খুঁজে না পেলে আমার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে বসার আর কারও কোনো ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকবে না। কিন্তু আমার তো ছেলে আছে—যুবরাজ ম্যামিলিয়াস। আমার সিংহাসনের একমাত্র সেই তো অধিকারী। অতএব এ দৈব্যবাণী মিথ্যা। এই দৈববাণীর কোনো উক্তিই আমি বিশ্বাস করিনি। যিনি জাল দৈববাণী পাঠিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন না আমার একটি ছেলে আছে, তাই এই মারাত্মক ভুল। কারচুপি করে কোন মিথ্যাকেই সত্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। এমনকি কোনো দৈববাণীর কথা উল্লেখ করেও নয়, আসল সত্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, তা কোনো কারচুপি করা দৈববাণীর ওপর নির্ভর করে না।

রাজার কথা শুনে কিছু কিছু লোকের মনে দৈববাণী সম্বন্ধে অবিশ্বাস জেগে উঠল। রাজাতো অযৌক্তিক কিছু বলছেন না। তাঁর ছেলে যুবরাজ ম্যামিলিয়াসই

সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী।

কিন্তু রাজার বক্তব্য শেষ না হতেই রাজবাড়ির একজন প্রধান পরিচারক আদালতে দ্রুতবেগে প্রবেশ করে আর্তনাদ করে বলল: মহারাজ সর্বনাশ হয়ে গেছে, চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে—মহারাজ!

মহারাজ পরিচারককে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: কি হয়েছে—বলবি তো?

একথা আমি কি মুখে বলি হুজুর, বলতে যে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। যুবরাজ ম্যামিলিয়াস হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। রাণীমাকে কারাগারে আটক করার পর এমনিতেই নিরালায় বসে 'মা' 'মা' বলে কাঁদত আর চোখের জল ফেলত—মহারাজ আজ সব শেষ। আমাদের প্রিয় যুবরাজ আর বেঁচে নেই। আর বেঁচে নেই।

পরিচারকের মুখে একথা শুনে রাণী আদালত কক্ষেই আর্তচিৎকার করে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। পুত্রহারা জননীর শোকে অনেকেই মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। রাণীকে কারাগারে পাঠানোর পর থেকেই যুবরাজের শরীর ও মন ভালো যাচ্ছিল না, অসুখে ভুগছিলেন বটে—তবে সে অসুখ তেমন মারাত্মক নয়। আজ এই মুহূর্তে দৈববাণীর সত্যতা ও রাণীর চরিত্রের পবিত্রতা প্রকাশের জন্য—সূর্য দেবতা যুবরাজের প্রাণ কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য যুবরাজের প্রাণ নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণীর প্রতি রাজার অবিশ্বাস ও অহংকারকে নিমেষের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে গেল।

রাজার অহংকার, ঔদ্ধত্য, সন্দেহ ও অবিশ্বাস মুহূর্ত মধ্যে মিলিয়ে গেল। অনুতাপে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এল। তিনি বুঝতে পারলেন—রাণী হার্মিয়োন নির্দোষ, পলিক্সেনিস কোনো বিশ্বাসঘাতকতাই করেননি—তিনি নিষ্কলঙ্ক। অকারণ সন্দেহবশেই তিনি রাণীকে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছেন।

রাণী সেই যে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন—তাঁর জ্ঞান আর সহসা ফিরে এল না।

পলিনা রাজাকে বললেন: রাণীকে আমি নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। এই চরম দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাই—সেবা করে তাকে সারিয়ে তুলতে চাই।

রাজা তখন শোকে দুঃখে এতই বিচলিত যে তিনি মুখে কোনো কথাই বলতে পারলেন না। শুধুমাত্র ইশারায় পলিনার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

অর্থাৎ আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করুন। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। আমি লজ্জিত, দুঃখিত ও মর্মাহত। আমি হতভাগ্য। রাজা পরে বিলাপ করে বলতে লাগলেন: আমি নিজের দোষে নিজের সর্বনাশ করেছি, আমার একমাত্র পুত্র আজ মৃত। কুসুমকোমল কন্যাটিও হয়তো আর বেঁচে নেই। রাণী হয়তো এই শোক সহ্য করতে পারবেন না। হায়! হায়। এ আমি কি করলাম। ভুল বুঝে অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারালাম, সব কিছু হারালাম।

রাজা নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বিলাপ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন: আমার মৃত্যুর পর আমার সিংহাসনে বসার আর কেউ রইল না। হায় আমি এ কী করলাম!

রাজার অবস্থা শোচনীয়, তিনি মাঝে মাঝে আকাশের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকেন আর বিলাপ করেন। আগে প্রতিহিংসার আগুনে তাঁর বুক জ্বলে পুড়ে যেত, এখন শোক আর অনুতাপের আগুনে দগ্ধ বিদগ্ধ হ'তে লাগলেন। প্রতিহিংসার আগুনে দাহ থাকে, শোকের আগুনে দাহ থাকে না বটে—কিন্তু তা অতি দুঃসহ মর্ম ব্যথা বয়ে আনে।

অ্যান্টিগোনাস শিশু রাজকন্যাটিকে নির্বাসন দিতে নৌকো করে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তিনি মনে ভাবলেন বোহেমিয়ার রাজ্যের কোনো নির্জন স্থানে একে নির্বাসন দেবেন। কারণ তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, এই শিশুকন্যাটি বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনিসেরই অবৈধ সন্তান। অতএব বোহেমিয়া রাজ্যেই মেয়েটিকে ফেলে আসা সঙ্গত। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পিতার রাজ্যেই মেয়েটি করুক।

বোহেমিয়ার কোনো একটি নির্জন উপকূলে নৌকোটি পেঁছিতেই—চারদিকের আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এল। অ্যান্টিগোনাস তাড়াতাড়ি তীরে নামলেন, মেয়েটিকে ঝোপের আড়ালে ফেলে রাখলেন। যদি মেয়েটির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, এই নির্জন স্থানে যদি কারও আগমন ঘটে—এবং কোনো সদাশয় ব্যক্তি যদি এই শিশু কন্যাটির লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে—তবে মেয়েটি বেঁচে থাকবে। অ্যান্টি-গোনাস একটি পুটুলিতে একগাদা সোনার মোহরও মেয়েটির পাশে রাখলেন।

জনমানবহীন এই নির্জন উপকূলে মেয়েটিকে শুইয়ে রেখে—অ্যান্টিগোনাস নৌকার কাছাকাছি ফিরে এলেন বটে, কিন্তু নৌকোয় ওঠা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। নৌকোয় ওঠার আগেই অতর্কিতে এক হিংস্র ভালুক অ্যান্টিগোনাসকে আক্রমণ করল। অ্যান্টিগোনাস নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না, ভালুকের হাতেই তাঁর প্রাণ গেল।

আর ঐ সময়েই উঠল এক দারুণ ঝড়। অ্যান্টিগোনাস যে নৌকোটি চড়ে এই নির্জন উপকূলে এসেছিলেন, ঝড়ের দাপটে সেই নৌকোটিও মুহূর্তে মধ্যে ডুবে গেল। নৌকোর অন্যান্য মাঝিরাও সমুদ্রে ডুবে মারা গেল। তারা কেউ আর সিসিলিয়ায় ফিরে আসতে পারল না।

দীর্ঘদিন পরেও অ্যান্টিগোনাস আর সিসিলিয়ায় ফিরে এলেন না দেখে রাজা লিয়ন্টিস মনে মনে ভাবলেন: অ্যান্টিগোনাস তাঁর কৃতকর্মের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছে। দেবতার রোষ তাঁর ওপরও পতিত হয়েছে।

রাজা নিজেও তাঁর নিজের মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন।

পলিনাও মূর্ছিতা রাণীকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পর রাজার কাছে দুঃসংবাদ পাঠিয়েছেন: রাণীর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি মারা গেলেন।

রাজা লিয়ন্টিস মনে মনে ভাবতে লাগলেন তাঁর নিজের দোষেই তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। রাণী নেই, পুত্র নেই, কন্যাটিও সম্ভবতঃ আর বেঁচে নেই। শোকে

দুঃখে জর্জরিত হয়ে তাঁকে তিলে তিলে শুধু মৃত্যুবরণ করে নিতে হবে। তাঁর দুঃখে কাঁদবার জন্যও কেউ আর রইল না। তিনি চুপচাপ বসে থাকেন, আর মাঝে মাঝে বিলাপ করেন।

সেই নির্জন উপকূলে অ্যান্টিগোনাস যে শিশু কন্যাটিকে ফেলে রেখে এসেছিলেন—সেই শিশুকন্যাটি কিন্তু দিব্যি বেঁচে-বর্তে রইল, অথচ অ্যান্টিগোনাস নৌকায় ওঠার আগেই ভালুকের হাতে প্রাণ দিলেন।

ঝড় থেমে গেলে হারানো ভেড়ার খোঁজ করতে এসে এক মেষপালক সেই শিশু কন্যাটিকে দেখতে পেল। আর মেয়েটির পাশেই দেখতে পেল—পুঁটলি ভর্তি একগাদা সোনার মোহর। সোনা ও শিশুকন্যা—একসঙ্গে দু'টি মূল্যবান জিনিস নিয়েই মেষপালক তাঁর নিজের ঘরে ফিরে এল।

সমুদ্র উপকূলে গিয়ে পরদিন সে অ্যান্টিগোনাসের ক্ষতবিক্ষত প্রাণহীন দেহ দেখতে পেয়ে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

সেই একগাদা মোহর পেয়ে মেষপালক আর গরীব রইল না। সে প্রচুর জমি-জমা কিনে ফেলল। আর শিশুকন্যাটিকে সে নিজের মেয়ের মতোই লালন-পালন করতে লাগল। মেয়েটির নাম রাখল পার্ডিটা। অনন্যা সুন্দরী পার্ডিটা। হবে নাই বা কেন? আসলে সে তো রাজকন্যা।

দুই

তারপর কেটে গেল দীর্ঘ ষোল বছর। ক্যামিলো এখন বোহেমিয়ার একজন অত্যন্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি।

পলিক্সেনিস ক্যামিলোকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন, তাছাড়া ক্যামিলোর কাছে তিনি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞও বটে। ক্যামিলোর সহায়তা ব্যতীত—তার পক্ষে সেবার প্রাণ নিয়ে সিসিলিয়া থেকে কোনক্রমেই বোহেমিয়ায় ফিরে আসা সম্ভব হোত না। ক্যামিলো শুধু তাঁদেরই রক্ষা করেন নি, সিসিলিয়ার রাজবংশকে অতিথির রক্তপাতজনিত কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

পলিক্সেনিস ক্যামিলোর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত ক্যামিলোকে সম্মানে, পদগৌরবে এবং আর্থিক দিক থেকে বিশেষভাবে উন্নীত করেছেন। মূলতঃ ক্যামিলো এখন একজন সিসিলিয়ার অধিবাসী। এর আগে কোনো বিদেশী বা সিসিলিয়া অধিবাসীকে এত উচ্চপদও দেওয়া হয়নি। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যামিলোর মনেও স্বদেশের প্রতি টান বেড়ে যেতে লাগল।

সিসিলিয়ায় ফিরে যাবার জন্যে ক্যামিলোর মন আনচান করতে লাগল। বিদেশে যিনি যতই সম্মানিত হোন বা আর্থিক কৌলিন্যে উন্নীত হোন দেশের প্রতি টান থাকবেই। আর ক্যামিলো তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন। নেহাৎ নিরুপায় হয়েই তাঁকে

দেশত্যাগ করে বোহেরিয়ায় আসতে হয়েছে। তখন তিনি না এলে অনেক আগেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হোত। কারণ সিসিলিয়ার রাজা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিলেন, তাঁর মাথার ঠিক ছিল না।

কিছুদিন হোল তিনি বারবার রাজা পলিক্সেনিসের কাছে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু বারবার রাজা পলিক্সেনিস তাকে বাধা দিয়ে বলেছেন: ওখানে গিয়ে আর কি করবেন? ইতিমধ্যে ষোলো বছর পেরিয়ে গেছে। আপনি এখানেই থেকে যান। আপনার কোনো অসুবিধা হ'লে বলুন—আমি আন্তরিকভাবে আপনার অসুবিধাগুলি দূর করার অবশ্যই চেষ্টা করব।

—না—না। মহারাজ আপনি আমার কোনো সাধই অপূর্ণ রাখেননি। বরং সিসিলিয়ায় থাকলে আমি এত সম্মান ও অর্থের অধিকারী হতুম না। আমি না চাইতেই আপনি আমাকে সব কিছু দিয়েছেন। তবু স্বদেশের জন্য আমার মন মাঝে মাঝেই কেমন যেন আনচান করে ওঠে মহারাজ। দেশের মাটি যেন হাতছানি দিয়ে আমায় বারবার কাছে টানে।

রাজা হেসে বললেন: কিন্তু আপনি চলে গেলে আপনার অভাব যে পূর্ণ হবার নয়। আপনার সঙ্গ, চিন্তা ও পরামর্শ পেয়ে আমি বারবার লাভবান হয়েছি। ভবিষ্যতে আপনার পরামর্শ ফ্লোরিজিলের প্রয়োজন হবে। তাই আপনাকে ছাড়তে মন চায় না। তাছাড়া সিসিলিয়ার পুরোপুরি অবস্থা এখনও জানা যায় নি। যত-দূর খবরাখবর পেয়েছি রাজা লিয়ন্তিস এখন প্রায় শোকে দুঃখে উন্মাদপ্রায়। তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্যও কেউ নেই। রাণীতো আগেই মারা গেছেন, রাজপুত্রও বেঁচে নেই—রাজকন্যা বেপাত্তা। রাজা লিয়ন্তিস তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করে চলেছেন সেই দুঃখপূর্ণ পরিবেশে ফিরে গেলে আপনিও দুঃখ শোকে মুহ্যমান হবেন।

ইতিমধ্যে অনুতপ্ত রাজা লিয়ন্তিস পত্রের মাধ্যমে বারবার ক্যামিলোকে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন। তার শেষ পত্রখানা এরূপ।

প্রিয় বন্ধু ক্যামিলো,

আমি নিজের কৃতকর্মের ফল দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে চলেছি। তোমার ওপর আর আমার কোনো রাগ নেই—বরং আমি তোমার প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। তুমি যদি সেদিন গোপনে পলিক্সেনিসকে সরিয়ে নিয়ে না যেতে—তবে সিসিলিয়ার রাজ-বংশের ইতিহাস অতিথিহত্যার দ্বারা কলঙ্কিত হোত। সেই কলঙ্ক থেকে তুমি সিসিলিয়ার রাজবংশকে মুক্ত করেছো বন্ধু।

আজ আমার পাশে কেউ নেই। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই—আমি নিঃসঙ্গ ও একাকী। রাজা পলিক্সেনিসের কাছে কোনো চিঠি লেখার বা প্রলাপ করার যোগ্যতা বা অধিকার আজ আর আমার নেই। জানি রাজা পলিক্সেনিস তোমাকে নানাভাবে সম্মানিত করেছেন, আর্থিক কৌলিন্যেও উন্নত করেছেন। আমি তোমার জন্য এতটা করতে সক্ষম হতাম না।

তব্‌ শেষ অন্‌রোধ জানাই। যদি সম্ভব হয় আমার এই দ্‌র্দিনে সিসিলিয়ায় ফিরে এসো! তুমি সিসিলিয়াকে ভালোবাসো বলেই তোমার এর্‌প অন্‌রোধ জানাবার অধিকার রাখি। তুমি যদি সিসিলিয়া এবং সিসিলিয়ার রাজবংশকে ভালো না বাসতে—তবে সেদিন দ্‌ঢ়তার সঙ্গে পলিক্সেনিসকে গোপনে এভাবে স্‌রক্ষিত করে নিয়ে যেতে না। তাই বন্ধ্‌ আমার শেষ অন্‌রোধ, ফিরে এসো।

ইতি—

হতভাগ্য লিয়ন্তিস

রাজা লিয়ন্তিসের শেষ চিঠি পেয়ে ক্যামিলো স্থির সংকল্প করলেন যদি রাজা পলিক্সেনিস তাঁকে দেশে ফিরতে দিতে সম্মত না হন—তিনি স্‌যোগ ও স্‌বিধা ব্‌ঝে গোপনে সিসিলিয়ায় চলে যাবেন। তবে ক্যামিলোর বিশ্বাস, রাজা পলিক্সেনিস তেমন লোক নন—দেশে যাওয়ার জন্য তেমন জেদ ধরলে তিনি অবশ্যই তাঁকে দেশে ফেরার অন্‌মতি দেবেন।

* * *

বোহেমিয়ার য্‌বরাজ, রাজা পলিক্সেনিসের একমাত্র সন্তান ফ্লোরিজিল আর ছোটোটি নেই। তিনি এখন প্‌র্ণবয়স্ক য্‌বক।

য্‌বরাজ ফ্লোরিজিল বাজপাখি শিকার করতে করতে সম্‌দ্র উপকূলের এক গ্রামে গিয়ে হাজির হোলেন।

মেষপালকের খামার বাড়িতে অপর্‌প কন্যাকে দেখে—তিনি খ্‌ব ম্‌গ্ধ হলেন; মনে মনে ভাবলেন যদি বিয়ে করতেই হয় এমন অপর্‌পাকেই বিয়ে করবেন।

আশে পাশের চাষীদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলতে পাবো ঐ মেয়েটির নাম কি?

চাষীদের একজন বলল ঃ কেন বলতে পারব না হ্‌জ্‌র। ওঁর নাম হচ্ছে পার্ডিটা। এ তল্লাসের সেরা স্‌ন্দরী। মেষপালকের মেয়ে। অথচ মেষপালক কিন্তু স্‌ন্দর নয় মোটেই—কিন্তু মেয়েটি যেন ডানা কাটা পরী। দ্‌পাশে দ্‌টি ডানা বসিয়ে দিন না পরী বলেই মনে হবে। কোনো মেষপালকের ঘরেই এমন স্‌ন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। তা আপনি কে বটেন? আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে রাজপ্‌ত্রের মতোই।

রাজপ্‌ত্রের এক সঙ্গী চাষীকে ধমক লাগিয়ে বললেন ঃ উনি রাজপ্‌ত্রের মতো নন, রাজপ্‌ত্র বটে।

বটে তা কোথাকার রাজকুমার?

আরে এই দেশেরই—বোহেমিয়ার রাজকুমার ফ্লোরিজিল।

চাষী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঃ আমাদের কি সৌভাগ্য? অ্যাদ্দিন বাদে একজন রাজপ্‌ত্রের দর্শন পেলাম। আমাদের এদিকে রাজা বা রাজপ্‌ত্র কেউ তো আসেন না; আমরা কাউকে খ্‌ব স্‌ন্দর দেখলে বলি—আহা কি স্‌ন্দর ঠিক যেন রাজপ্‌ত্রের মতো। হ্‌জ্‌র অপরাধ নেবেন না।

না—না। এতে তোমার কোনো অপরাধ হয়নি।

জানেন হুজুর, ঐ মেয়েটি জন্মানোর পর থেকেই মেষপালকের ভাগ্য ঘুরে গেছে। আগে আমাদের মতোই গরীব ছিল। এখন মস্ত বড় লোক। বহু জমি জমা কিনেছে।

আর একজন রাজপুত্র ফ্লোরিজিলের দিকে তাকিয়ে বলল : হুজুরকে দেইখে খুবই ক্লান্ত মনে হতেছে। তা চলেন না ঐ খামার বাড়িতে গিইয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন।

অবশ্য রাজপুত্র ফ্লোরিজিল সত্যিই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাছাড়া তাঁর জল তৃষ্ণা পেয়েছিল ভীষণ। তাছাড়া একটি অদম্য বাসনাও তাঁর মনে জেগে উঠেছিল—তিনি পার্ডিটাকে দূর থেকেই দেখেছেন খুব সামনে থেকে দেখেননি। পার্ডিটাকে কাছাকাছি দেখার ইচ্ছাটা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

অতএব চাষীটি খামার বাড়ীতে যাওয়ার প্রস্তাব করতেই, তিনি এক কথায় রাজী হয়ে সঙ্গীদের বললেন : চলো খামার বাড়িতেই যাওয়া যাক্ আমার জলতেষ্টাও পেয়েছে ভীষণ। তাছাড়া খিদেও লেগেছে প্রচণ্ড।

একজন সঙ্গী আপত্তি জানিয়ে বলল : আপনি রাজপুত্র যেখানে-সেখানে খাওয়া কি আপনার ঠিক। নৌকোতে খাদ্য ও পানীয় দুই-ই রয়েছে যখন। আর এখান থেকে সমুদ্র উপকুল তেমন দূরেও নয়।

রাজপুত্র ফ্লোরিজিল সঙ্গীটিকে ধমক লাগিয়ে বললেন : না। আমি মেষপালকের খামার বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করব। মেষপালক বলে কি তারা মানুষ নন।

রাজপুত্রের ধমক খেয়ে সঙ্গীটি চুপসে গেল। রাজপুত্র খামারবাড়িতে যেতেই চারদিকে হইচই পড়ে গেল। স্বয়ং মেষপালক ছুটে এলেন। স্বয়ং রাজপুত্র অতিথি! এতো ভাবাই যায় না। পার্ডিটা রুটি পনীর ও ভেড়ার মাংস পরিবেশন করল। রাজপুত্র দিব্যি চেটেপুটে খেলেন। পার্ডিটার সঙ্গে কথা বললেন। পরস্পরের মধ্যে আলাপ হলো। দূর থেকে পার্ডিটাকে সুন্দরী মনে হয়েছিল শুধু—কিন্তু কাছা-কাছি এসে দেখলেন পার্ডিটা শুধু সুন্দরীই নয়, অনন্যা। তাঁর হাসি যেন সংগীতের সুর ঝংকার, তার গমন যেন নৃত্য, তাঁর কথা যেন গান।

প্রথম দর্শনেই রাজপুত্র ফ্লোরিজিল পার্ডিটাকে ভালবেসে ফেললেন। পার্ডিটার নিবিড় সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁর শরীর ও মন আকুল হয়ে উঠল।

আর শিকারও ভাল লাগল না। তিনি কেবল পার্ডিটার কথা ভাবতে ভাবতে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। তাঁর হৃদয় ও মন জুড়ে রইল শুধু একজন পার্ডিটা। পার্ডিটা ছাড়া রাজপুত্র ফ্লোরিজিলের আর অন্য কোনো চিন্তা নেই।

অবশ্য রাজা পলিক্সেনিসও ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাজার সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ চলছিল, ঘটকও লাগানো হয়েছিল। একজন ঘটক ফিরে এসে এক রাজকন্যার এমন সুখ্যাতি করতে লাগল যে, রাজা

পলিক্লেনিস—সেই রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্র ফ্লোরিজিলের বিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন এবং নিজের কক্ষে রাজপুত্র ফ্লোরিজিলকে ডেকে পাঠালেন। পিতার আহ্বান পেয়ে রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন।

রাজা জিগ্যেস করলেন, তোমার শরীর ভালো তো।

হ্যাঁ।

তুমি নাকি শিকার থেকে ফিরে এসে কয়েকদিন ধরে মনমরা রয়েছো। সময় মতো খাচ্ছ না, পেট ভরেও খাচ্ছ না, কি ব্যাপার ?

কই না তো—আমিতো ঠিকই আছি।

তোমাকে দেখে আমার ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মনে হচ্ছে।

শিকার করার ধকল আছে তো, ক্লান্তিতো একটু আসবেই।

শোনো, অচিরেই আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করছি। ধরতে গেলে তোমার বিয়ে একরকম পাকাপাকি করে ফেলেছি রাজকন্যা অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে।

আমার অনুরোধ—এ বিয়ে আপনি পাকাপাকি করবেন না।

কেন ?

আমি রাজকন্যা অ্যাঞ্জেলাকে বিয়ে করব না।

কেন ?

আমার অপরাধ নেবেন না, আমি অন্য একটি মেয়েকে ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছি।

ঠিক আছে। ভালবাসা কোনো অপরাধ নয় আমি শুধু জানতে চাই—তিনি কোন্ রাজ্যের রাজকন্যা ?

তিনি কোনো রাজ্যের রাজকন্যা নন।

রাজবংশীয়াতো বটেই ?

না। তিনি কোনো রাজবংশেও জন্মগ্রহণ করেন নি।

তবে ? বংশটি নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত ?

না। তা'ও নয়।

তবে ?

তিনি একজন মেষপালকের মেয়ে।

মেষপালকের মেয়ে ?

তুমি রাজপুত্র হয়ে কিনা বিয়ে করবে বংশমর্যাদাহীন এক মেষপালকের মেয়েকে ?

তাইতো ঠিক করেছি আমি।

কিন্তু এ বিয়ে তো হতে পারে না।

কেন হ'তে পারে না ?

রাজা পলিক্সেনিস নানাভাবে ছেলেকে বোঝাতে লাগলেন, এ বিয়ে হ'লে মান্যগণ্য সমাজে মুখ দেখানো যাবে না।

বিয়ের জন্য সামাজিক মান্যগণ্যতার দরকারই বা কি, পিতা ?

কিন্তু অন্যান্য রাজপরিবারের লোকেরা বোহেমিয়ার রাজপরিবার সম্পর্কে কি ভাববে বলোতো ?

তাঁরা যা খুশী ভাবতে পারে তাতে আমাদের বয়ে গেল।

একবার ভাবো তোমার পাশে রাণীর সিংহাসনে বসবে কি না এক চাষার মেয়ে। এ যে আমি ভাবতেই পারি না, কল্পনা করতে গিয়ে বার বার শিউরে উঠি।

তা আপনার মনের ভুল।

বলো কি, একজন চাষার মেয়ে কি করে রাণীর মতো আচরণ করবে ? চাষাদের কথাবার্তা চলন-চালন সব কিছুই যে আলাদা পুত্র।

চাষারা কি মানুষ নয়, পিতা ?

তাঁরাও মানুষ, তবে তাঁরা রাজা বা রাণী হওয়ার উপযুক্ত নয়। সে শিক্ষা তাঁরা পায়নি, সৌজন্যমূলক রাজকীয় মর্যাদাযুক্ত ব্যবহার তাঁরা শিখবে কোত্থেকে ?

না শিখে থাকে—আমি আমার স্ত্রীকে প্রশিক্ষণ দেব।

বংশগত সৌজন্যমূলক আচরণ তো একজন্মের ব্যাপার নয়—বহু জন্মের ব্যাপার কিছুকাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া চাষীর মেয়ের পরিবেশ। ছোটোবেলা থেকেই আলাদা, আর রাজার মেয়ের পরিবেশ ছোট বেলা থেকেই আলাদা।

তা হ'তে পারে। তবু আমি পার্ডিটাকেই বিয়ে করব।

এই তোমার শেষ কথা ?

তা ধরে নিতে পারেন।

ছেলের কথাবার্তা শুনে রাজা পলিক্সেনিসের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর যদি আর একটি ছেলে থাকত, তবে তিনি ফ্লোরিজিলকে অবশ্যই ত্যাজ্য পুত্র করতেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। ফ্লোরিজিল তাঁর একমাত্র সন্তান। নয়নের মণি। তিনি একাধারে বাবা ও মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করে ফ্লোরিজিলকে বড় করে তুলেছেন। তাঁকে মায়ের অভাব পর্যন্ত বুঝতে দেননি। এতদিনে তিনি বুঝতে পারলেন—বেশী আদর দেওয়ার ফলেই রাজপুত্র ফ্লোরিজিল অত্যন্ত জেদী হয়ে উঠেছেন। যা মনে করে, তাই করে। কোনো বাধার ধার ধারেন না। কিন্তু বিয়ের মতো একটা ব্যাপারে যেখানে রাজবংশের মান-মর্যাদা জড়িত—সেখানে এই জেদ কি করে মেনে নেওয়া সম্ভব ?

এমন বিপদের দিন—সুপরামর্শ একমাত্র দিতে পারেন ক্যামিলো। রাজা ক্যামিলোকে তার গোপন কক্ষে ডেকে পাঠালেন। ক্যামিলোর কাছে রাজপুত্রের সব কথা খুলে বললেন। খুলে বললেন রাজপুত্রের অসম্ভব জেদের কথাও।

বলো ক্যামিলো, আমি এখন কি করি ?

হুজুর আগে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, আগে রাজপুত্রকে গোপনে অনুসরণ করে আমরা দু'জনে মেষপালকের খামার বাড়িতে গিয়ে মেয়েটিকে দেখি।

তুমি যখন বলছ ক্যামিলো তখন তাই যাব।

আপনাকে ছদ্মবেশে যেতে হবে, যাতে কেউ আপনাকে না চিনতে পারে, আমিও অবশ্য ছদ্মবেশেই আপনার সঙ্গে যাব। তারপর দেখে-শুনে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

ঠিক আছে, তবে তাই হো'ক।

বসন্ত ঋতু মেষপালকদের উৎসব ও আনন্দের ঋতু। শীতকালে ভেড়াদের গায়ের লোমগুলো বেশ লম্বা ও বড়ো হয়ে থাকে। বসন্তকালে মেষপালকেরা ভেড়ার লোমগুলো কেটে নিয়ে থাকেন। পশম হ'লো মেষপালকদের কাছে ফসলের সমতুল্য। ভেড়ার লোম একটি বিশেষ দিনে কাটা হয়। সেদিন মেষপালকদের মহল্লায় একটি বিশেষ উৎসব হয়। একে বসন্তোৎসব বা আনন্দ উৎসব বলা যায়। বন্ধু-বান্ধবও আত্মীয়-পরিজনদের একত্রে মিলে মিশে খাওয়া-দাওয়া, নাচ, হই-হুল্লোড় ইত্যাদি সারারাত চলতে থাকে।

সেদিন ঐ মেষপালকের বাড়ির উৎসবটা বেশ একটু বড়ো ধরনেরই হচ্ছিল। রাজপুত্র ফ্লোরিজিল আরও তিন-চারবার মেষপালকের বাড়িতে এসেছিল। ফলে পার্ডিটার সঙ্গে তার পক্ষে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠা অসম্ভব হয় নি। মেষপালক প্রথম প্রথম সামান্য আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু রাজপুত্র ফ্লোরিজিল বলেছিলেন: আমি শপথ করে বলছি, আমি পার্ডিটা ছাড়া আর অন্য কাউকে বিয়ে করব না। বলুনতো আমি প্রকাশ্যেই বাগদান পর্ব সেরে নিতে রাজী আছি।

রাজার ছেলের কথা শুনে মেষপালক যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেয়ে গেলেন। পার্ডিটার বিয়ে নিয়ে তাঁর অনেক ভাবনা ছিল—

এমন ঘর আলো করা সুন্দরী মেয়ের তো সাধারণ মেষপালকের ঘরে বিয়ে দেওয়া যায় না। উচিতও নয়। আর বলা বাহুল্য এই মেয়েটির জন্যই আজ তাঁর এই রমরমা অবস্থা। নইলে এই বুড়ো বয়েসে—তাঁকে মাঠে মাঠে ভেড়া চরিয়ে বেড়াতে হোত। এখন ভেড়া চরানোর জন্য তাঁর অনেক কর্মচারী—তাছাড়া জমিজমাও প্রচুর। বলতে গেলে একজন ছোটো খাটো জমিদার। কিন্তু জমিদার হয়েও তিনি পৈত্রিক ব্যবসা ছেড়ে দেননি। ওটাও বজায় রেখেছেন। পার্ডিটার বিয়ে নিয়ে যে ভাবনা ছিল, রাজপুত্রের উক্তিতে সে ভাবনা তার দূর হয়ে গেল। এমন মেয়েকে রাজার ঘরেই মানায়, কোনো মেষপালকের ঘরে নয়।

অতএব মেষপালক রাজপুত্রকে বলেছিলেন তবে ঐ বসন্তোৎসবের দিনই আসুন—ঐদিন আপনার সঙ্গে পার্ডিটার বাগদান পর্ব সেরে ফেলব।

রাজপুত্র বললেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। পার্ডিটা বলল, আমার আপত্তি আছে।

রাজপুত্র অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, কেন? আপত্তি কেন?

আপনি রাজপুত্র, আমি সাধারণ মেষপালকের মেয়ে, এখনও আপনি ভালোভাবে ভেবে দেখুন।

আমি খুব ভালোভাবে ভেবে দেখেছি, আর ভাবনার কোনো অবকাশ নেই।

এ নিয়ে আমি আমার পিতার সঙ্গেও খোলাখুলি কথা বলেছি।

তিনি কি বললেন ? তিনি কি এ বিয়েতে রাজী হয়েছেন ?

না। তিনি রাজী হননি। তবে আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল। তিনি অবশ্য পরে মেনে নিতে বাধ্য হবেন। আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান, বোহেমিয়ার রাজ-সিংহাসনে একমাত্র উত্তরাধিকারী।

কিন্তু ধরুন, তিনি এ বিয়ে যদি না মেনে নেন। আপনাকে যদি ত্যাজ্যপুত্র করেন ?

তাতেও কোন ক্ষতি নেই, পার্ডিটা। তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমি এক কথায় সিংহাসনের দাবীও ছেড়ে দিতে রাজী আছি।

বুদ্ধিমতী পার্ডিটা যদিও এ বিয়ের জন্য পা বাড়িয়ে বসেছিল, তবু একবার রাজ-পুত্রকে বাজিয়ে নিল। এ কি ভালবাসা, না সাময়িক মোহ ? পরে মিষ্টি হেসে রাজপুত্রকে বলল, তবে আর এ বিয়েতে আমার আপত্তি নেই।

অতএব মেষপালক বহু খরচ করেই এবার বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন তাঁর খামার বাড়িতে।

আশেপাশের গাঁয়ের বহু লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কেনই বা করবেন না ? দেশের রাজপুত্র তাঁর জামাই হতে চলেছে। সে কি আর সাধারণ মেষপালক ? সমাজের উঁচু মাথাদের মধ্যে একজনই বলা যায়। দেশের যুবরাজের হবু শ্বশুর বলে কথা ! এই উৎসবে যোগদান করতে এবং রাজপুত্রকে দর্শনের জন্য বহু দূর থেকে মেষপালকেরা খামারবাড়িতে এসে হাজির। মেষপালকও দরাজ দিল। পান ভোজনের যাকে বলে—একেবারে ঢালাও ব্যবস্থা।

এই উৎসবের কেন্দ্রমণিই পার্ডিটা। যাকে বিয়ে করার জন্য রাজপুত্র ফ্লোরিজিল সব কিছু পরিত্যাগ করতেও রাজী। রাজী পলিক্সেনিস ও ক্যামিলোও বিনা নিমন্ত্রণেই ছদ্মবেশে উৎসব মণ্ডপে হাজির হয়েছেন। পার্ডিটার সঙ্গে তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তাও বলেছেন। এই উৎসবে পার্ডিটাকে রাণীর বেশেই সাজানো, তাঁকে দেখতেও লাগছে অতি সুন্দর। কে বলবে এই মেয়েটি সাধারণ মেষপালকের মেয়ে। বহু চাষী চীৎকার করেই বলল, এমন সুন্দরী না হলে কি আর দেশের রাণী হওয়া যায় ! ভবিষ্যতে দেশের রাণী হবে বলেই বুঝি ঈশ্বর ওকে এতো সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। রাজা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। ছদ্মবেশেই পান ভোজনে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু উৎসবের শেষ পর্যায়ে পার্ডিটার সঙ্গে রাজপুত্র ফ্লোরিজিলের বাগদান পর্বের কথা অর্থাৎ বিয়ে পাকাপাকির কথা ঘোষণা করা হো'ল। তখন রাজা পলিক্সেনিস আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে স্বমূর্তিতে প্রকাশ পেলেন এবং সবার সামনেই রাজপুত্র ফ্লোরিজিলকে তিরস্কার করে বললেন : তুমি যুবরাজ হ'লেও দেশের রাজা নও, আমি রাজা সারাদেশের দন্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। মেয়েটি সুন্দরী হ'লেও একজন সাধারণ মেষপালকের মেয়ে। এ বিয়ে হতে পারে না, আমি

হ'তে দেব না। মেয়েটি যদি রাজবংশীয়া হ'তো আমি নিজেই একে পুত্রবধূরূপে বরণ করে নিতুম।

রাজপুত্র : কিন্তু আমি পার্ডিটাকেই বিয়ে করব। এতে রাজসিংহাসন হারাতে হ'লেও আমি কুণ্ঠিত নই।

তুমিও শুনে রাখো, আমি এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেব না।

মেষপালককে কাছে ডেকে রাজা বললেন : ওহে শোনো, নিজের মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দেওয়ার মতলব ত্যাগ করো—নইলে তোমার মেয়ের তো সর্বনাশ হবেই—তোমাকেও আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব। মোট কথা—এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। হতে দিতে পারি না। যেখানে বোহেমিয়ার রাজবংশের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত।

রাজার তর্জনে-গর্জনে উৎসব মণ্ডপের পরিবেশ বিষাদ-ক্লিষ্ট হয়ে পড়ল। পার্ডিটার চোখে জল।

রাজা তর্জন-গর্জন করেই উৎসব মণ্ডপ থেকে চলে গেলেন। কিন্তু ক্যামিলো উৎসব মণ্ডপেই রয়ে গেলেন। ক্যামিলো নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে রাজপুত্র ফ্লোরিজিলকে কাছে ডাকলেন; রাজপুত্রের প্রকৃত মনোভাব যাচাই করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

রাজপুত্র কাছে আসতেই ক্যামিলো বললেন, দেশের রাজার পক্ষে বুড়ো মেষপালকের গর্দান নেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার।

তাতো বটেই।

তাই বলে কি তুমি এ বিয়ে বন্ধ করবে? বেশ ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে উত্তর দাও।

এতে আর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই—আমি পার্ডিটাকে বিয়ে করবই।

বিপদ বুঝলে পার্ডিটাকে ত্যাগ করে আবার পালিয়ে যাবে না তো?

কক্ষনো না।

রাজার রাগ দেখে ভয় পাওনি তো।

না।

তিনি যদি তোমাকে সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন?

তবু আমি পার্ডিটাকেই বিয়ে করব।

ক্যামিলো ফ্লোরিজিলকে একান্তে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বললেন : বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলো। বিয়ে করেই তুমি পার্ডিটাকে নিয়ে সিসিলিয়ায় চলে যাও। রাজা লিয়ন্তিসকে আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওখানে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, বরং রাজা লিয়ন্তিসের আশ্রয়ে সুখেই থাকবে। দরকার হ'লে তোমার শ্বশুরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো।

আপনার পরামর্শ আমি মেনে নিলাম। বিয়েটা আমরা আগামী কালের মধ্যেই সেরে নিয়ে সিসিলিয়ায় রওনা হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পার্ডিটাকে দেখে পার্ডিটার সঙ্গে কথা বলে আপনার কি মনে হয়—আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

মোটেও না। ওকে দেখে আমার কি মনে হয় জানো? এ মেয়ে কোনো সাধারণ মেষপালকের মেয়ে হতে পারে না।

তবে?

এ নিশ্চয়ই কোনো রাজবংশেরই মেয়ে। নইলে ওমন রূপ পেতে পারে না। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হ'তে পারে—কিন্তু ভবিষ্যতেই প্রমাণ করবে—আমার ধারণা ভুল—কি ভুল নয়। তবে এটুকু বলতে পারি যে, পার্ডিটাকে বিয়ে করে তোমাকে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে না।

ক্যামিলোর পরামর্শ মতোই রাজকুমার ফ্লোরিজিল বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে নিলেন। বলতে গেলে বাগদান আর বিয়ে একসঙ্গেই হয়ে গেল। তারপর পার্ডিটাকে নিয়ে রাজপুত্র ফ্লোরিজিল গোপনে সিসিলিয়ায় রওনা হয়ে গেলেন।

ফ্লোরিজিল পার্ডিটাকে নিয়ে নিরাপদে সিসিলিয়ায় রওনা হয়ে গেছে—এরূপ সংবাদ পেয়ে ক্যামিলো নিজের কারুকাজ শুরু করলেন। তিনি রাজা পলিক্সেনিসের কাছে গিয়ে বললেন: মহারাজ সর্বনাশ হয়ে গেছে। আপনাকে সংবাদটা দেব কিনা ভাবছি।

কি হয়েছে তাই বলো, ক্যামিলো। ফ্লোরিজিল আমার একমাত্র পুত্র। হয়তো তাঁর বিয়ের ব্যাপারে আমার এতটা কড়া হওয়া উচিত হয় নি। যুবরাজের কি হয়েছে, তাই বলো, ক্যামিলো? ও বুঝল না—আমি যে একাধারে ওর বাবা-মা।

যুবরাজ বেঁচে আছেন, তবে···

তবে কি, ক্যামিলো?

আর বোধ হয় আমরা কোনো দিনই যুবরাজের দেখা পাব না মহারাজ।

কেন? যুবরাজ কোথায় গেছে?

যুবরাজ দেশত্যাগ করে পার্ডিটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, মহারাজ।

রাজা পলিক্সেনিস ক্যামিলোকে আঁকড়ে ধরে জিগ্যেস করলেন: তাঁরা কোথায় গেছে বলতে পারো?

মহারাজ, সেই মেষপালক এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই কোথায় তারা গেছেন—কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে।

সবটাই অবশ্য ক্যামিলোর সাজানো ব্যাপার, বুড়ো মেষপালককে তিনি আগেই শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন? মেষপালক রাজ-প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, রাজার নির্দেশে একজন রাজকর্মচারী গিয়ে মেষপালককে ভেতরে ডেকে নিয়ে এল। বুড়ো মেষপালক ক্যামিলোর শেখানো অনুযায়ী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল: হুজুর আমার কোনো দোষ নেই।

রাজা ধমক দিয়ে বললেন: কি হয়েছে তাই বলো।

হুজুর আপনি সেদিন বলে আসায় এ বিয়েতে আমি গররাজী হই। আমার তো

একটাই মাথা, হুজুর আপনি আমার গর্দান নিয়ে নেবেন, তাই মেয়েকে ডেকে বললাম,—এ বিয়ে হতে পারে না, এ বিয়েতে আমার মত নেই।

তারপর?

আপনার ছেলে যা জেদী, সে আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

কোথায়, কোন্ দিকে গেছে বলতে পারো?

যতদূর মনে হয়, ওরা সিসিলিয়ায় গেছে?

কি করে বুঝলে?

সিসিলিয়া থেকে সেদিন মাত্র একখানা নৌকোই পশম কিনতে এসেছিল তাছাড়া সমুদ্রতীরে আর কোনো নৌকো ছিল না। অতএব ঐ নৌকো চড়েই তারা সিসিলিয়ায় চলে গেছে।

এ ব্যাপারে ক্যামিলো বললেন: মহারাজ, ওদের ধরতে হ'লে আর বেশী দেরী করা উচিত হবে না।

মেষপালক বললেন: তাতো বটেই, যুবরাজের যা মনোভাব দেখলাম—সিসিলিয়া থেকে না দূরে বিদেশের অন্য কোনো জাহাজে উঠে পড়েন।

ক্যামিলোও সুযোগ বুঝে বললেন: মহারাজা, অবিলম্বে আমাদের সিসিলিয়ায় যাওয়া উচিত। নইলে হয়তো বা এ জীবনে আর তাঁর দেখা পাবেন না।

ঠিকই বলেছো ক্যামিলো। অবিলম্বে জাহাজ প্রস্তুত করতে বলো, কিছুক্ষণ পরেই আমি সিসিলিয়ায় রওনা হতে চাই।

এমন সময় বুড়ো মেষপালক হাত জোড় করে বললেন: হুজুর আমার একটি নিবেদন আছে।

বলো, বলো।

আমি কি আপনার সঙ্গে ঐ জাহাজে সিসিলিয়া যেতে পারি?

কেন?

ধরুন, আপনি আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে আনলেন, আর আমি আমার মেয়ে পার্ডিটাকে ফিরিয়ে আনলাম।

বেশ, চলো।

ক্যামিলো যা চেয়েছিলেন, বলতে গেলে তাই হ'লো। ক্যামিলো স্বদেশে সিসিলিয়ার ফিরতে চেয়েছিলেন, রাজা পলিক্সেনিস কিছুতেই তাঁকে সিসিলিয়াতে যেতে দিতে রাজী হন নি। এখন রাজা যখন নিজেই যাচ্ছেন, একবার সিসিলিয়ার মাটিতে পা রাখতে পারলে—ক্যামিলো ওখানেই থেকে যাবেন। আর বোহেমিয়ায় ফিরবেন না। কতদিন পরে দেশে ফিরে যাচ্ছেন, ক্যামিলোর মনে আনন্দ আর ধরে না।

আর বুড়ো মেষপালক সঙ্গে এই জন্য গেলেন যে, সব জেনে শুনে রাজা যদি তাঁকে মৃত্যুদণ্ডই দেন—তখন তিনি আসল কথাটি খুলে বলবেন। খুলে বলবেন যে—পার্ডিটা তাঁর নিজের মেয়ে নয়—কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। শিশু অবস্থায় পার্ডিটার পরনে যে

পোষাক ছিল—সেই পোষাক আর মোহরগুলি যে কাপড়ে বাঁধা ছিল, সেই কাপড়টাও বুড়ো মেষপালক সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজন হ'লে প্রামাণগুলো দেখাবেন। গ্রামের লোকেরা তাঁর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, তাঁরা বলেছে : বিষয়টাতো চুকিয়ে দিলে। রাজার লোক অর্থাৎ ক্যামিলো যাই বলুন, রাজা যেদিন আসল কথাটা টের পাবেন—তখন তোমার গর্দানটি যাবেই। অতএব সময় বুঝে ব্যবস্থা করো। তাছাড়া পার্ডিটা যখন তোমার নিজের মেয়ে নয়—তখন সে রকম বুঝলে আসল কথাটা বলে ফেলো বাপু, অযথা কেন এই বুড়ো বয়েসে গর্দানটি যাবে।

তাই বুড়ো মেষপালক ভয়ে ভয়ে রাজা এবং ক্যামিলোর সঙ্গে একই জাহাজে সিসিলিয়া রওনা হোলেন। বুড়ো মেষপালন জানে – প্রমাণ যখন তাঁর সঙ্গেই রয়েছে— তখন রাজাকে বোঝানো কষ্ট হবে না। তিনি পার্ডিটার পালক পিতা মাত্র। যে-লোকটা মেয়েটিকে ঝোপের আড়ালে ফেলে রেখে গিয়েছিল—সে ছিল একজন বিদেশী লোক।

এদিকে পার্ডিটাকে নিয়ে যখন ফ্লোরিজিল রাজা লিয়ন্তিসের কাছে হাজির হোল, তখন আগের সেই লিয়ন্তিস আর নেই। নিজের পূর্বকৃত কৃতকর্মের জন্য তিনি এখন অনুতপ্ত ও মর্মাহত।

মাঝে মাঝে তিনি প্রলাপ বকেন আর চোখের জল ফেলেন। অতএব ক্যামিলোর চিঠি হাতে পেয়ে—তিনি আনন্দে কেঁদে ফেললেন। ফ্লোরিজিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছেলে। তিনি সিংহাসন থেকে নেমে এসে ফ্লোরিজিলকে জড়িয়ে ধরলেন আর পার্ডিটাকে দেখে যেন মনে হোল তাঁর—এ মুখ তিনি যেন দেখেছেন, অনেকটা রাণী হার্মিয়োনের মতোই মুখের আদল।

চিঠি পড়ে তিনি ফ্লোরিজিলকে বললেন : তুমি আমার আশ্রয়ে স্ত্রীকে নিরাপদে জেনে যতদিন ইচ্ছে থাকো। তোমার বাবা তোমার খোঁজে এখানে এলেও তোমাদের এ বিয়ে যাতে ভাঙতে না পারে—সে ব্যবস্থা আমি করব।

একদিন পলিক্সেনিসের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করেছিলাম—সেই কারণে আমি অনুতপ্ত। আমার পুত্র নেই, তুমি আমার পুত্রসম—তোমাকে আদেয় আমার কিছুই নেই।

অতএব ফ্লোরিজিল ও পার্ডিটা রাজা লিয়ন্তিসের আশ্রয় পেয়ে ধন্য হোলেন। তাদের ভয়ও অনেকাংশে দূর হোল। আর তাছাড়া রাজা লিয়ন্তিস যখন কথা দিয়েছেন—এ বিয়ে তিনি ভাঙতে দেবেন না তখন আর ভয় কি।

পরের দিনই এলেন রাজা পলিক্সেনিস ও ক্যামিলো। অনুতপ্ত রাজা লিয়ন্তিস বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : আমায় তুমি ক্ষমা করো বন্ধু, তোমার প্রতি অবিচার করে আজ আমি সর্বহারা। আমার স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই—কেউ নেই। চারদিকে শুধু অন্ধকার…

কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর রাজা পলিক্সেনিস বললেন : আমার পুত্র ফ্লোরিজিল নাকি এখানে এসেছে।

হ্যাঁ, তাঁরা এখানেই আমার আশ্রয়ে সুখে আছে।

আমার ছেলেকে আমার হাতে তুলে দিতে হবে।

রাজা লিয়স্তিস এ ব্যাপারে আগে আগেই ক্যামিলোর সঙ্গে আলোচনা করে রেখে-ছিলেন, তাই তিনি স্মিত হেসে বললেন : তোমার ছেলেকে কেবল মাত্র একটি শর্তেই তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।

তা তোমার শর্তটা কি শুনি ?

ওদের বিয়েটা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

অসম্ভব লিয়স্তিস, তোমার এই শর্ত আমি বেঁচে থাকতে মেনে নিতে পারি না। একটা সাধারণ চাষীর মেয়ে কিনা—বোহেমিয়ার রাজরাণী হবে! তোমার এই শর্ত আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। মানবও না।

আমিও তা হ'লে তোমার ছেলেকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না।

এই কি তোমার শেষ কথা ?

তা ধরে নিতে পারো।

এর অর্থ কি জানো ?

অনুমান করতে পারি শুধু।

তবে শুনে নাও, তুমি যদি এই মুহূর্তে আমার ছেলেকে আমায় ফিরিয়ে না দাও, তোমাকে আমি আমার শত্রু বলে বিবেচনা করব।

তা করতে পারো। তবে যে ভুল আমি একবার করেছি, সে ভুল আমি তোমাকে করতে দেব না।

তোমার বেলা, সেটা ভুল ছিল—তার জন্য তুমি সব হারিয়ে এখন অনুতপ্ত হচ্ছ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ভুল নয়। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এ বিয়ের সঙ্গে আমার মান ও মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। বোহেমিয়ার রাজবংশের মান মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। অতএব এ বিয়ে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না এবং তুমি যদি রাজপুত্র ফ্লোরিজিলকে আমার হাতে তুলে না দাও—তবে তাঁর ভবিষ্যত কি হবে একবার ভেবে দেখেছো। আমি তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

দেখো, আমার উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই—তুমি যদি রাজপুত্র ফ্লোরিজিলকে ত্যাজ্যপুত্র করো—আমি তাঁকে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে যাব।

তবু, তাঁকে আমার হাতে দেবে না ?

না, শর্ত না মেনে নেওয়া পর্য্যন্ত আমি যুবরাজ ফ্লোরিজিলকে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না।

আজ থেকে তুমি আমার শত্রু হ'লে—এবং আমি বোহেমিয়ায় ফিরে গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব! এতে বহু লোকক্ষয় হবে।

তোমার যেমন অভিরুচি।

এমন সময় ক্যামিলো মেষপালককে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন : আপনাদের দু'-জনেরই আবার ভুল হচ্ছে।

দু'জন রাজাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন : কি রকম ?

ক্যামিলো সেই বুড়ো মেষ পালককে তাঁর পুটলিটি খুলতে বলল। পুটলি থেকে একটি বাচ্চা মেয়ের পোষাক বেরুল, আর অ্যান্টিগোনাসের নামাঙ্কিত একটি রেশমী রুমাল।

রাজা পলিক্সেনিস জিজ্ঞেস করলেন : এর মানে কি ? ক্যামিলো মেষপালককে ইশারা করতেই মেষপালক বলল : পার্ডিটা আমার নিজের মেয়ে নয়।

তবে ?

আজ থেকে ষোল বছর আগে সমুদ্র উপকূল থেকে কিছুটা দূরে একটি ঝোপের আড়ালে আমি মেয়েটিকে কুড়িয়ে পাই। তখন এই পোষাকটি মেয়েটির পরণে ছিল, আর এই রুমালে বাধা ছিল এক গাদা মোহর।

রাজা লিয়ন্তিস আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন : এ যে আমি ভাবতেই পারি না। আমি কি স্বপ্ন দেখছি—না যা শুনছি তা সত্যি—পার্ডিটা তবে কি আমার মেয়ে। আমার মেয়ে ! আমার মেয়ে ! সেই দৈববাণী ! আমার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমার মেয়ে !

কিন্তু রাজা পলিক্সেনিস তখনও ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেন নি। তিনি বললেন : শুনেছি অ্যান্টিগোনাসের স্ত্রী পলিনা দেবীই সঠিক ভাবে বলতে পারবেন এ রুমাল অ্যান্টিগোনাসের কিনা। আর বাচ্চাকে অ্যান্টিগোনাস নিয়ে যাওয়ার সময় এই পোষাকটি তার পরণে ছিল কিনা ?

ক্যামিলো বলল : আমি তাঁকে খবর দিয়েছি, উনি এলেন বলে।

কিছু পরেই অ্যান্টিগোনাসের স্ত্রী পলিনা এলেন, তিনি রুমালটি হাতে নিয়ে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বললেন : এ রুমাল তাঁরই। নামের অক্ষরগুলো আমিই রুমালে বানিয়ে ছিলাম। এ আমার হাতেরই কাজ। আর পোষাকটি দেখে বলল : মহারাজ দেখুন, পোষাকের এক কোণে রাজ-বাড়ির চিহ্ন রয়েছে।

অতএব কারো আর কোনো দ্বিধা রইল না।

পার্ডিটা রাজা লিয়ন্তিসেরই মেয়ে। রাজা লিয়ন্তিস সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন, যেখানে যুবরাজ ফ্লোরিজিল আর পার্ডিটা ছিল। পেছন পেছন ছুটে গেলেন আর সকলে। সে এক দৃশ্য বটে।

রাজা লিয়ন্তিস পার্ডিটাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : মা, তুই আমায় ক্ষমা কর। তোর এই হতভাগ্য বাবাকে ক্ষমা কর মা।

পার্ডিটা অবাক। একবার সে মেষপালকের দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার লিয়ন্তিসের দিকে। বুড়ো মেষপালক কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন : মা ইনিই তোমার

জনক। আমি তোকে লালন-পালন করেছি মাত্র, মা।

কিন্তু আমি তো আপনাকে বাবা বলে জানতুম। মেষপালক বললেন : যা সত্য, তা স্বীকার করে নেওয়া সঙ্গত।

রাজা লিয়ন্তিস চিৎকার করে বললেন : সারা রাজ্যে উৎসব হবে—ঘোষণা করে দাও। আমি আমার মেয়েকে ফিরে পেয়েছি। ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করেছেন—আমি হয়তো বা এই দিনটির অপেক্ষায় বেঁচে ছিলাম। আমি নিজ হাতে আমার মেয়ে পার্ডিটার সঙ্গে যুবরাজ ফ্লোরিজিলির বিয়ে দেব। দেখি কে বাধা দেয়।

রাজা পলিক্সেনিস বললেন : আর বোধহয় বাধা দেবারও কেউ নেই।

অতএব ধুমধামের সঙ্গে বিয়ের আয়োজনের হুকুম দিলেন রাজা লিয়ন্তিস।

পরমুহূর্তে আবার আক্ষেপ করে বললেন : তবু আমার মনে পুরো শান্তি নেই। একজনের কাছ থেকে আমি আমার অপরাধের ক্ষমা পেলুম না। সে আমায় ক্ষমা করার আগেই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। তরি ক্ষমা না পেলে আমি যে মরেও শান্তি পাব না।

রাজা লিয়ন্তিসের দু'চোখ জলে ভরে এল। সেই মুহূর্তে পলিনা বলল : আজ রাণী হার্মিয়োন বেঁচে থাকলে—তিনি সবার চেয়ে বেশি খুশী হতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ রাণী হার্মিয়োন অর্থাৎ পার্ডিটার মা আমাদের মধ্যে নেই।

পার্ডিটা জিজ্ঞেস করল : কোথায় আমার মা, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন আমি মাকে শুধু একবার দেখতে চাই। আমারও তাহ'লে মা আছেন?

পলিনা বললেন : সবারই মা থাকে বাছা, তিনি ছিলেন, এখন আর নেই। তবে আমার বাড়িতে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি আমি গড়িয়েছি। মূর্তিটি আমার কাছে জীবন্তই মনে হয়—। দেখবে চলো, মহারাজ দেখবেন চলুন, আপনারা সকলেই চলুন না—যদি অবশ্য আপনাদের মনে মূর্তিটি দেখার ইচ্ছে থাকে—আমি জোর করে কাউকে মূর্তিটি দেখার জন্যে বলছি না।

পার্ডিটা বলল : আমিতো মাকে দেখতে পাইনি, তবু মার মূর্তি আমি দেখবই।

পলিনা বললেন : চলো দেখবে চলো, তোমার মা তোমার মতোই অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।

অতএব আগে পলিনা, পয়ে পার্ডিটা—তার পরে আর সবাই—মৃত রাণীর প্রতিমূর্তি দেখার জন্য রীতিমত মিছিল করেই চলল।

পলিনা বাড়ি গিয়ে একটা পর্দা সরিয়ে দিতেই একটা দণ্ডায়মান প্রতিমূর্তি দেখা গেল।

পলিনা বাড়িয়ে কিছু বলেনি—প্রতিমূর্তিটি সত্যই প্রাণবন্ত মনে হয়। নিশ্চয়ই এক মহান শিল্পী এই প্রতিমূর্তি গড়ে তুলেছেন—

সকলেই বললেন : এমন জীবন্ত মূর্তি এর আগে দেখিনি, দয়া করে বলবেন কোন্ মহান শিল্পী এই মূর্তি গড়েছেন?

পলিনা হেসে বললেন ঃ আমি নিজেই শিল্পী। কতবছর আগে রাণী হার্মিয়োনকে দেখেছিলাম, এখন তিনি বেঁচে থাকলে কেমন হতেন সে কথা মনে মনে কল্পনা করেই আমি তিলে তিলে এই মূর্তিটি গড়ে তুলেছি।

সকলে অবাক, হতভম্ভ!

প্রতিমূর্তির সামনে রাজা লিয়ন্তিস নতজানু হয়ে বললেন ঃ হার্মিয়োন তুমি আমার ক্ষমা করো। তোমার ওপর যে অন্যায় ও অবিচার করেছি—জানি তা ক্ষমার যোগ্য নয়। তবু আমি বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করি। আজ আমি অনুতপ্ত ও মর্মাহত। দেখো, চেয়ে দেখো তোমার মেয়ে ফিরে এসেছে—সে মরেনি, সে মরেনি। সে আমায় ক্ষমা করেছে, এবার তুমি আমায় ক্ষমা করো হার্মিয়োন—নাইলে আমি মৃত্যুর অপর পারে গিয়েও শান্তি পাব না।

হঠাৎ প্রতিমূর্তিটি যেন বেদী থেকে ধীরপদে নেমে আসতে লাগল, সকলের চোখে অবাক বিস্ময়—এও কি কখনও সম্ভব?

পার্ডিটা আনন্দে চীৎকার করে উঠে বলল ঃ মা, মা তুমি বেঁচে আছো!

প্রতিমূর্তিটি এগিয়ে এসে রাজা লিয়ন্তিসকে ধরে তুলে বললেন ঃ আমি যে এমন একটি দিনের জন্যই এই দীর্ঘ ষোল বছর প্রতিটি মুহূর্ত গুণেছি, মহারাজ।

সকলের চোখেই আনন্দের অশ্রু। এমন অভাবিত ঘটনার কথা কেউ আগেভাগে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেন নি।

দুঃখে, শোকে ও অনুতাপে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়ে রাজা লিয়ন্তিস পরিশুদ্ধ হয়েছেন—তাই দেবতার ক্ষমা লাভ করে রাণী হার্মিয়োনকেও পুনরায় লাভ করলেন।

আসলে পলিনাই রাণী হার্মিয়োনকে তাঁর নিজের বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতে পরামর্শ দিয়েছিল—আর বাইরে প্রচার করেছিল তিনি মারা গেছেন। আজকের এই সুখের দিনে, শুভ মুহূর্তে—আরতো আত্মগোপনের কোনো প্রয়োজন নেই।

পার্ডিটা ছুটে গিয়ে শিশুকন্যার মতোই মায়ের কোলে আশ্রয় নিল ঃ মা, মা, একথা ভাবতেও সুখ—আমি তোমারই মেয়ে।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে ফেললেন।

মার্চেণ্ট অফ ভেনিস

এক

ভেনিসের একটি প্রশস্ত রাজপথ। সন্ধ্যা আগত প্রায়। বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু পশ্চিম আকাশের গায়ে নিঃশেষে ছড়িয়ে দিয়ে দূরের আকাশছোঁয়া গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। সন্ধ্যার হাল্কা অন্ধকার ভেনিস শহরের বুকে একটু একটু করে নেমে আসছে। আকাশ জুড়ে চলেছে আলো-আঁধারীর খেলা।

রাজপথের এক নির্জন-নিরালা প্রান্তে হাল্কা অন্ধকারে তিনটি যুবক পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে।

ওরা কারা? কেনই বা ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে? এমনি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ওরা এমন কি গোপন শলাপরামর্শে লিপ্ত?

চলুন না আমরা দু'পা এগিয়ে যাই, দেখি ওরা কারা। কেনই বা এই ভর সন্ধ্যায় ওখানে দাঁড়িয়ে, আর এমন কি জটিল সমস্যার সমাধানে লিপ্ত?

হ্যাঁ। যুবক তিনটি পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। ওদের একজনের নাম অ্যাণ্টনিও। ভেনিসের সর্বজন পরিচিত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বণিক অ্যাণ্টনিও। ওরই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু সালারিণো আর সালানিও।

বণিক অ্যাণ্টনিও-র চোখে-মুখে হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। মনে ও'র অবাঞ্ছিত বিষাদের কালো ছায়া। মুখে হাসি নেই, সদাহাস্য আনন্দপ্রিয় অ্যাণ্টনিও আজ বিষাদক্লিষ্ট, মনের অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা আজ কোথায় উবে গেছে।

সন্ধ্যার হাল্কা বাতাসে চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অ্যাণ্টনিও বন্ধুদের লক্ষ্য করে বললে,—তোমরা বিশ্বাস কর, আমার মন-প্রাণ আজ গভীর বিষাদে ভরপুর। কিন্তু যদি তোমরা আমায় প্রশ্ন কর কেন আমার এই বিষণ্ণতা? আমি নিরুপায়। এর কোন সদুত্তর আমার জানা নেই। আমার মনের এই বিষণ্ণতার স্বরূপই বা কি? এই অবাঞ্ছিত বিষণ্ণতা কখন, কিভাবে আর কোন্ পথেই বা আমার মনের গভীরে ভর করছে তাও আমার অজ্ঞাত।

সালারিণো বন্ধু অ্যাণ্টনিও-র দিকে তাকিয়ে বললেন,—আচ্ছা বন্ধু, এটাই কি আমাদের বিশ্বাস করতে বলছ, তোমার মনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত!

অ্যাণ্টনিও হতাশার সুরে বললেন,—বন্ধু, আমি অসহায়, আর তা যদি হয় তবে এটাই আমার দুর্ভাগ্য। তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করলে আমার কিছু করার নেই, আশ্চর্য হবারও কোন কারণ দেখছিনে। সত্যিকথা বলতে কি—আমার এই আকস্মিক মানসিক ভাবান্তর লক্ষ্য করে নিজেকেই অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে। এই বিষণ্ণতাই আমাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে তুলেছে, বুদ্ধিভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

সালারিণো মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে এক সময় বললেন, আমার বিশ্বাস এটা তোমার ভ্রান্ত ধারণা, মনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। সমুদ্রে ভাসমান তোমার বাণিজ্য-জাহাজগুলোর সঙ্গে তোমার মনও বিপদাশঙ্কায় আন্দোলিত হচ্ছে।

সালানিও ম্লান হেসে বললেন,—বন্ধু, তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সমুদ্রে আমাকে এমনি ঝুঁকি নিতে হ'লে আমার একমাত্র চিন্তা হ'ত আশা-নিরাশাকে ঘিরে। আমি একমুঠো ঘাস বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে জাহাজের গতিবিধি-নিরীক্ষণ করতে চেষ্টা করতাম। জেটি আর নোঙর ফেলার জাহাজগুলোই বা কোথায় এবং কোন্ দিকে রয়েছে তাও খুঁজে বের করতাম। তাছাড়া—

সালারিণো তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—আমি বালি ঘড়ির দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করব না। ওদিকে তাকালেই সুগভীর সমুদ্রের তলদেশের বালির চড়া এবং বালিতটের কথা আমার মনে ভেসে উঠবে, আর আমার কল্পনার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠবে পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ জাহাজগুলো যেন বালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। গির্জায় গেলে পাথরের কাঠামোটির দিকে দৃষ্টি যেতেই মনে হবে জাহাজ বোঝাই মসলাপাতি সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সিল্কের কাপড়গুলো যেন সমুদ্রকে ঢেকে দিয়েছে। মোদ্দা কথা মুহূর্তকাল আগে যে জাহাজকে অতীব মূল্যবান মনে হয়েছে দুর্ঘটনার পর তার মূল্য আর এক কড়িও থাকবে না।—আমি জানি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মূল্যবান পণ্যসম্ভারের জন্য দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনাই অ্যান্টনিও-র এই বিষণ্ণতার কারণ।

অ্যান্টনিও বন্ধুর কথায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেন,—এ তোমার ভুল ধারণা সালারিণো। তুমি বিশ্বাস কর প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আমার অদৃষ্ট দেবতাকে আজ ধন্যবাদ যে, আমার যাবতীয় পণ্যসম্ভার অনেকগুলো জাহাজে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, জাহাজডুবি হলেও সর্বস্ব বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা অন্ততঃ নেই। তাছাড়া বাণিজ্য স্থলও বিস্তীর্ণ প্রান্ত জুড়ে। আর একটি কথা তোমার অবশ্যই জানা রয়েছে যে, এ-বছরের ব্যবসার ওপরই আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে না। অতএব তোমরা নিঃসংশয় হ'তে পার আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাণিজ্য-জাহাজগুলোকে মোটেই দায়ী করা যায় না।

সালারিণো অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভেবে বন্ধুর বিষণ্ণতার নতুনতর কারণ উদ্ভাবন করতে গিয়ে বললেন,—যদি সত্যিই আমার ধারণা ভ্রান্ত হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই প্রেমঘটিত ব্যাপার হয়ে থাকবে। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই কারো না কারো প্রেমে পড়ে থাকবে।

অ্যান্টনিও চোখে-মুখে বিতৃষ্ণতার ছাপ এঁকে বললেন, ছিঃ ছিঃ বন্ধু একী লজ্জার কথা বলছ তুমি!

—বন্ধু, তবে তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি প্রেমের ফাঁদেও ধরা দাও নি? তবে কি আমরা এটাই মনে করব যেহেতু তোমার মনে আনন্দ-স্ফূর্তি নেই সেহেতু তোমার মনের

এই আকস্মিক বিষণ্ণতা? আমার মত তুমিও তো বলতে পার আমি সুখী, আমি হাসতে পারি, নাচতে পারি, পারি আনন্দ-স্ফূর্তি করতে। একথা বলতে পারাও তোমার পক্ষে কঠিন নয়। কারণ তুমি যে বিষণ্ণ নও। একটা কথা অবশ্যই তোমার জানা রয়েছে, দু'মাথাওয়ালা রোমান দেবতা ভেনাসের নির্দেশে প্রকৃতি দেবী দু'রকম মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে এক রকমের মানুষ হচ্ছে সদানন্দময় হাসিখুশি, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গম্ভীর প্রকৃতির। কোন অবস্থাতেই ওরা হাসতে জানে না।

ঐ যে—কারা যেন এদিকে আসছে—হাল্কা অন্ধকার ভেদ করে কারা এদিকেই এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ ওরা সংখ্যায় তিনজন—এদিকেই আসছে।

আগন্তুক তিনজন ধীর মন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় অ্যাণ্টনিও-র পাশে এসে দাঁড়ালেন। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে বাসানিও। অ্যাণ্টনিও-র নিটকতম বন্ধু যুবক বাসানিও। আর অপর দু'জন আগন্তুক হচ্ছেন লরেঞ্জো ও গ্রাসিয়ানো। ও'দের দু'জনের সঙ্গেও অ্যাণ্টনিও-র যথেষ্ট আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা রয়েছে।

নবাগতদের উপস্থিতিতে সালানিও সোল্লাসে অ্যাণ্টনিওকে বললেন—এই যে তোমার সবচেয়ে উদার ও ঘনিষ্ট প্রাণের বন্ধু বাসানিও এসে গেছে, সঙ্গে রয়েছে গ্রাসিয়ানো ও লরেঞ্জো। বন্ধু, এবার আমরা বিদায় নিতে পারি? আমাদের চেয়ে ঘনিষ্ট ও অন্তরঙ্গদের কাছে তোমাকে রেখে যাচ্ছি যাদের সঙ্গ তোমার অধিকতর কাম্য।

সালারিণো এক গাল হেসে বললেন,—প্রিয় বন্ধু, তোমার চেয়ে অন্তরঙ্গ ও যোগ্যতর বন্ধুর আগমন না হ'লে আমি অবশ্যই সঙ্গদান করে তোমাকে আনন্দ দান করতে চেষ্টা করতাম।

অ্যাণ্টনিও ঠোঁটের কোণে অনুরূপ হাসির রেখা টেনে বললেন—বন্ধু, তোমারা এ-কথা বলছ কেন? তোমার কি আমার কাছে কম প্রিয়। অন্যান্য বন্ধুদের মত তোমাদেরও আমি একাসনে বসিয়ে থাকি। আমার প্রতি তোমার এরকম ধারণা পোষণ করলে খুব দুঃখ পাব। আমার মনে হচ্ছে কোন বিশেষ জরুরী কাজের জন্যই তোমাদের আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

বাসানিয়ো এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াতেই সালারিণো তাতে অভ্যর্থনা করে সংবাদ জানতে চাইল।

বাসানিও করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—আপনাদের সব সংবাদ শুভ তো? তারপর বলুন কখন ও কোথায় আমরা একসঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্যে কিছুটা সময় কাটাতে পারব? দীর্ঘ অসাক্ষাতে আমাদের বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার বন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে।

সালারিণো বললেন—সে তো ভালো প্রস্তাব। আপনাদের সুবিধামত ও আপনাদের অবসর সময় বুঝে ব্যবস্থা করবেন। আমার কোন আপত্তি নেই—আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

সালারিণো ও সালানিও বিদায় নিয়ে চলে গেলে লরেঞ্জো বললেন,—ভদ্র বাসানিও

অ্যাণ্টনিও-র সঙ্গে যখন তোমাদের দেখা হয়ে গেল, এখন আর আমাদের থাকার দরকার আছে কি ? আমরা কি এখন বিদায় নিতে পারি ? আর একটা কথা—নৈশ ভোজনে আমাদের কোথায় এবং কখন মিলিত হবার কথা যেন ভুলে যেও না।

বাসানিও তাকে আশ্বাস দিতে গিয়ে বললেন—না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমি যথাসময়ে উপস্থিত থাকব, তোমাদের হতাশ করব না।

গ্রাসিয়ানো বললেন—ভদ্র অ্যাণ্টনিও, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়! সংসারের সবার মতামতকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়াই তোমার স্বভাবের বড় দোষ। আর এ-কারণেই হয়ত তোমার বর্তমান মানসিক অবস্থার কারণ। কিন্তু এরই ফলে যে একদিন তোমাকে সংসারের সর্বস্ব হারিয়ে বসতে হবে বন্ধু। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি বন্ধু, তুমি ইদানিং বিস্ময়করভাবে বদলে যাচ্ছ।

অ্যাণ্টনিও ম্লান হেসে জবাব দিলেন,—কিন্তু বন্ধু, সংসার যেমন আমিও তাকে ঠিক সে রকম চোখেই দেখে থাকি। তুমি তো জান সংসার একটি নাট মঞ্চ। এখানে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে। আমার ভূমিকা হচ্ছে—বিষণ্ণতার ভূমিকা!

তাই যদি বল তবে তো আমার ভূমিকা হচ্ছে ভাঁড়ের। আর এই হাসি আনন্দের মধ্য দিয়েই আমার জীবনের যবনিকা নেমে আসুক, এটাই আমার কাম্য। শুষ্ক নিরস আর নিরুত্তাপ হৃদয়ে ব্যথা-বেদনা যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে উচ্চ পানীয়তে পেট ভরে থাক। জেগে থেকে তন্দ্রা রোগে ভোগের কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। আর তিক্ততার জন্য তুমিই বা এমনি পাণ্ডুরোগে ভূগতে যাবে কেন বন্ধু ? অ্যাণ্টনিও, তুমি বিশ্বাস কর বন্ধু আমি যথার্থই আন্তরিক ভালবাসি তোমাকে। সেই ভালবাসার খাতিরেই তোমাকে বলছি—জলাশয়ের স্থির জলের উপরিভাগে যেমন একটি ময়লার আস্তরণ জমে উঠে ঠিক তেমনি স্বভাবের কিছু লোক হয়েছে যারা নিরবতার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখে। আর এমনি হাস্যকর ভাবেই ওরা নিজেদের জ্ঞানী, গম্ভীর আর চিন্তাবিদ বলে সমাজে জাহির করে মর্যাদালাভের চেষ্টা করে। দেখো অ্যাণ্টনিও এমন কিছু লোক আমার জানা রয়েছে যারা কোন পরিস্থিতিতেই মুখ খোলে না। আর এ-জন্যই লোক সমাজে জ্ঞানী বিবেচিত হয়। আমি নিঃসন্দেহ ওরা মুখ খুললেই মুখোস খুলে মূর্খতা প্রমাণিত হবে। যাক আজ এ পর্যন্তই থাক, পরে সুযোগ মত তোমাকে এ ব্যাপারে আলোকপাত করব। তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ থাকল বন্ধু—অহেতুক গাম্ভীর্যের মুখোস পরে মর্যাদা লাভের ব্যথ প্রকাশ থেকে বিরত হও। এখন আমাকে বিদায় দাও, নৈশভোজকালে আমার বক্তব্যের অবশিষ্টাংশ রক্ষা করব।

অ্যাণ্টনিও-চোখে মুখে শুষ্ক হাসির রেখা ফুটিয়ে বন্ধুর কথার জবাব দিলেন—আচ্ছা, বিদায় বন্ধু, তোমার উপদেশ স্মরণ রাখতে চেষ্টা করব।

গ্রাসিয়ানো বললেন—এ ব্যাপারে আমি নিজেকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

প্রাতরাশের সময় শুষ্ক নিরস মৎস্যজিহ্বা পরিবেশিত হ'লে এবং বিয়ের ব্যাপারে একটু চালাক চতুর না হ'লে তো কোন তরুণীর পক্ষে নীরব থাকাই স্বাভাবিক।

কথা শেষ ক'রে গ্রাসিয়ানো ও লরেঞ্জো বিদায় নিয়ে চলে গেলে অ্যান্টনিও প্রসঙ্গান্তরে যেতে গিয়ে বাসানিওকে বললেন,—আচ্ছা বাসানিও তুমি যে মহিলাটির সঙ্গে গোপন সাক্ষাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ ওর পরিচয় আমার কাছে ব্যক্ত করার আপত্তি আছে কিন্তু। আমি এ-ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে—

বন্ধু, তুমি তো জান আমি আমার সামর্থের সীমা অতিক্রম করে সাধ্যাতীত বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে আজ আমি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছি। আজ আমি নিঃস্ব——পথের ভিখারী। অবশ্য এই বিলাস-বাহুল্য বর্জন করতে আজ আমি মোটেই কুণ্ঠিত নই। অতীত জীবনে আমার দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েছি তা থেকে মুক্তি লাভই আজ আমার একমাত্র কাম্য। অ্যান্টনিও তোমার বন্ধুপ্রীতি ও তোমার অর্থ সাহায্যের জন্য আমি সর্বতোভাবে তোমার কাছে ঋণী। তোমার প্রেম-প্রীতি আন্তরিক ভালবাসার জন্যই আজ আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি তোমার কাছে আমার কোন কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। আর ঋণভার থেকে মুক্তি পেতে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অবশ্যই তোমার জানা দরকার।

—আমি তোমার কথায় একমত। তোমার কোন কিছু আমার কাছে গোপন রাখা হয়তো সঙ্গত হবে না। সব খুলে বল। তুমি আজ পর্যন্ত সমাজে আত্মসম্মান বজায় রেখে চলে আসছ। ভবিষ্যতে সমাজে তোমার মানসম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখতে আমার সাহায্য সহযোগিতা পাবে।

বন্ধু অ্যান্টনিও-র কথার আশ্বস্ত হয়ে বাসানিও এবার বললেন, আমার বাল্যকালের একটি গল্প বলছি শোন। আমি তখন স্কুলে পড়ি। একদিন একটি তীর হারিয়ে ফেলেছিলাম। তীরটি যেদিকে ছুটে গিয়েছিল সে দিকেই আর একটি তীর ছুঁড়লাম। যদিও দু'টো তীরই হারাবার সম্ভাবনা ছিল তবুও আমি কিন্তু দুটো তীরই ফিরে পেয়েছিলাম। এ-ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে আমি অনেক ব্যাপারেই তোমার কাছে ঋণী। তাছাড়া আমার যৌবনের বেপরোয়া স্বভাবের জন্য তোমার কাছ থেকে যা লাভ করেছি তার সবই নষ্ট করে বসেছি। আর একটিবার তুমি তোমার সাহায্যের হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দাও বন্ধু। তুমি বিশ্বাস করতে পার আমি এবার অন্ততঃ ব্যয় করার ব্যাপারে সতর্ক হ'ব। তাছাড়া আমি আশা রাখছি তোমার অতীত ও বর্তমানের সব ঋণভার থেকে এবার মুক্ত হতে পারব।

অ্যান্টনিও বলল—বন্ধু, তুমি তো আমাকে জান। তোমার আমার প্রীতি ও আন্তরিকতা জাগিয়ে তুলতে তুমি এত করে চেষ্টা করছ কেন? তুমি আমাকে অন্ততঃ ভুল ভেব না, তবে আমি আমার সর্বস্ব খোয়ানোর চেয়েও শতগুণ বেশী আঘাত পাব। তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা আমাকে

খুলে বল—যদি তোমার জন্য করতে পারি।

বন্ধুর কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বাসানিও বললেন,—বেলমণ্ট শহরে এক ধনী উত্তরাধিকারিণী মহিলা আছেন। তিনি যথার্থ সুন্দরী তাছাড়া তাঁর চরিত্রের গুণাবলী তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের চেয়েও সুন্দর। তাঁর নীরব চোখের ভাষায় আমার প্রতি তাঁর প্রেমের সন্ধান পেয়েছি। নাম তাঁর পোর্শিয়া। ক্যাটোর কন্যা। ব্রুটাসের স্ত্রী ঐতিহাসিক রূপসীর চেয়ে কোন অংশে কম নন তিনি। তাঁর গুণাবলীর কথা পৃথিবীর কোন অংশের মানুষেরই অজানা নয়। পৃথিবীর সব দেশ থেকে বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী ও গুণবান ব্যক্তিরা তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে বেলমণ্টে এসে জড়ো হয়েছেন। বন্ধু, আমার প্রচুর অর্থ থাকলে আমিও সুন্দরীর পাণিপ্রার্থী হয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সেখানে হাজির হতাম। আমি নিঃসন্দেহে যে ওই রূপসী যুবতীর পাণি গ্রহণের সৌভাগ্য আমারই ঘটবে। আমার মন বলছে আমার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সন্ধ্যার হাল্কা বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে অ্যাণ্টনিও বললেন—বন্ধু, তুমি তো জান আমার সমস্ত সম্পদ এখন সমুদ্রবক্ষে। আমি এখন নিঃস্ব-রিক্ত কপর্দক-শূন্য। আমার কাছে এমন কোন জিনিসও নেই যা দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। অতএব খুঁজে দেখ ভেনিসের কোন বণিকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ স্বরূপ সংগ্রহ কবা যেতে পারে কি না। আমি তোমার হয়ে জামিন থাকতে রাজি আছি।

দুই

বেলমণ্ট শহরের এক সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রাসাদকক্ষে রূপসী যুবতী পোর্শিয়া তার শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সময় কাটাচ্ছেন। মনে তাঁর বিষণ্ণতার ছাপ। চোখে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা আর হতাশা। পোর্শিয়া অপলক দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে দূরের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে।

পোর্শিয়ার পরিচারিকা নেরিসা খাটের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। পোর্শিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নেরিসাকে বলল,—নেরিসা আজ আমি হেরে গিয়েছি ভাই। এই পৃথিবীর ভার সহ্য করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমি হতাশা আর ব্যর্থতায় জর্জরিত—ক্লান্ত—অবসন্ন।

—তোমার কথা মেনে নিতে পারতাম যদি ঐশ্বর্যের মত দুঃখও সমপরিমাণ হ'ত। এমনও দেখা যায় প্রভূত বিত্তবান হয়েও মানুষ প্রকৃত সুখী হ'তে পারে না। সব দিক বিচার করে বলতে গেলে মধ্য পন্থাই সুখ লাভের প্রকৃত উপায়। যাদের অনেক রয়েছে তারাই শীঘ্র বুড়িয়ে যায়, আর যাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর রয়েছে তারাই সুখী ও দীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে।

পোর্শিয়া ম্লান হেসে বললেন,—তোর কথাগুলো সত্যি ভারি সুন্দর ও অত্যন্ত সুন্দর।

—তা হ'তে পারে। তবে যদি তা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হয় তবে তার গুরুত্ব

অধিকতর হ'ত সন্দেহ নেই।

—একটা কথা কি জানিস?—কোন ব্যাপারে জ্ঞান থাকা আর তার বাস্তব রূপ দেয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। যা কিছু প্রকৃতই ভাল তার সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে মেনে চললে চ্যাপেলগুলো গীর্জায় পরিণত হয়ে যেত, আর গরীবের কুঁড়ে ঘর হয়ে উঠত রাজপ্রাসাদ। যাঁরা নিজে ধর্মের উপদেশাবলী মেনে চলেন, তাঁরাই তো সৎ ধর্মশিক্ষক বলে বিবেচিত হন। সখী তোমার অজানা নেই যে, প্রেম ও যৌবন অস্থিরচিত্ত খরগোসের মত—হিতোপদেশ ও বিধি-নিষেধের বেপ্রা টপকাতেই তার যত আনন্দ। কিন্তু ভাই, কি হবে নীতিজ্ঞানে। এতো তো আর আমার বর মিলবে না। হয়ে সখী! নির্বাচন কথাটি আজ কী মর্মান্তিক রূপ নিয়ে আমার সামনে দেখা দিয়েছে! কি নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবস্থা, আমি যাকে চাই, যাকে পছন্দ করি তাকে জীবন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। আর যাকে আমি অপছন্দ করি—যাকে গ্রহণ করতে মনের দিক থেকে কোন রকম উৎসাহ পাইনে তাকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতাই বা কোথায় আমার। এমনি করেই মৃত পিতার ইচ্ছা তাঁর জীবিত কন্যার বাসনাকে ক্ষুন্ন করতে চলেছে। সখী, আমার পোড়া কপালের কথা ভেবে দেখ তো, আজ আমি নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বামী নির্বাচন করতে অক্ষম—এটা কি আমার পক্ষে কম কষ্টদায়ক ব্যাপার?

নেরিসা প্রভু কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল—তোমার বাবা চিরদিনই ধর্ম-অন্তঃপ্রাণ ছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাধু পুরুষদের কখনো দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ হতে দেখা যায়। সে কারণেই সোনা-রূপা আর সীসার কৌটা তিনটির যথার্থ মর্ম যিনি উদ্ধার করতে পারবেন তিনিই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন—লাভ করবেন তোমাকে। যে পেটিকার মধ্যে তোমার ছবি রয়েছে সেই সৌভাগ্যবানকে সেই পেটিকাটি নির্বাচন করতে হ'বে। আর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সময় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অঙ্গীকার করতে হ'বে নির্বাচন ব্যর্থ হ'লে তোমার ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ তিনি জীবনে আর কোনদিন দ্বিতীয় মহিলার প্রেমভিক্ষা করতে পারবেন না। তাঁদের আরও প্রতিশ্রুতি দিতে হ'বে তিনি যে পেটিকাটি নির্বাচন করেছেন তা ভুলেও কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না!

দলে দলে প্রতিযোগী এসে হাজির হ'তে লাগল। পোর্শিয়া প্রতিযোগিদের দেখেই সঙ্গত কারণেই শঙ্কিত হ'তে লাগলেন। উপস্থিত প্রতিযোগীদের মধ্যে কাউকেই সর্ব-গুণান্বিতা পোর্শিয়া মনে-প্রাণে গ্রহণের কথাও চিন্তা করতে পারেন না।

পোর্শিয়া সকালে তাঁর শোবার ঘরে বসেছিলেন। পরিচারিকা নেরিসা এসে জানাল নির্বাচন প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন। পোর্শিয়া তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে নেরিসা এক এক করে উপস্থিত অতিথি ও নির্বাচন-প্রার্থীদের নাম ও পরিচয় জানতে লাগল। পোর্শিয়া এক এক করে সবাইকে খারিজ করতে লাগলেন। পোর্শিয়ার মতে নেপল্‌স্-এর রাজপুত্র এক অশ্ববিদ্যা ছাড়া আর কোন গুণের অধিকারী

নয়। কাউণ্টপ্যালাটিন হচ্ছেন একজন বিষণ্ণ দার্শনিক—অষ্টক্ষণ গোমড়া মুখ করে বসে থাকেন,—হাসি কাকে বলে তাঁর জানা নেই। আর ফরাসী দেশের জমিদার ম'সিয়ে লা ব' তো একজন অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি একজন ভ্রূকুটি বিশারদ—আর একটা বড় দোষ হচ্ছে ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু নেই। আর ইংলণ্ডের ব্যারণ ফালকনবিজ? লোকটা সত্যি অদ্ভুত বিচিত্র স্বভাবের। হাস্যকর পোষাকের প্রতিই তাঁর সবচেয়ে বেশী ঝোঁক প্রবণতা, তাছাড়া ভাষার দুরতিক্রমণীয় বাধা তাঁকে জড়বৎ করে রাখে। তিনি ইটালীয়, ল্যাটিন বা ফরাসী ভাষার কোনটিই বিন্দু বিসর্গ জানেন না। ইংরেজী ভাষাই তাঁর একমাত্র হাতিয়ার। অথচ পোর্শিয়ার ইংরাজী ভাষার পরে দখল খুবই সামান্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে পোর্শিয়ার মন খুলে কথাবার্তা বলাই সবচেয়ে বড় সমস্যার ব্যাপার। এ-চারজন ছাড়া আরো যে দু'জন উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে পোর্শিয়ার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তাদেয় মধ্যে একজন হচ্ছেন স্কটল্যাণ্ডবাসী জমিদার। ভদ্রলোক অত্যন্ত ঢিলেঢালা নরম প্রকৃতির। পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে কোন ব্যাপারেই ভদ্রলোকের খেয়ালমাত্র নেই। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছেন ডিউক অব স্যাক্সনীর ভ্রাতুষ্পত্র জার্মান তরুণ। তিনি সব সময় মদের ঘোরে চলেন—মদে একেবারে ডুবে থাকেন। এমন মদ্যপ প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না। তাকে নিয়ে সারাজীবন ঘর-সংসার করা তো দূরের কথা, কোন রুচিশীলা মেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হ'বে।

পেটিকা নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে এই সব আগন্তুক যখন দেশে ফিরে গেলেন তা দেখে পোর্শিয়া কেবলমাত্র সান্ত্বনাই লাভ করলেন তা নয়, তিনি বরং রীতিমত জোরের সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে তাঁর বাবার উইল বা ইচ্ছানুযায়ী বিয়ের কাজ করতে আগ্রহী।

পোর্শিয়া পাণিপ্রার্থীদের প্রসঙ্গে নেরিসার সঙ্গে যখন কথোপকথন করছিলেন তখন তাঁর কথায় ও আচরণে আগন্তুক বাসানিও-র প্রতি বিশেষ অনুরাগ রক্ষা করা গেছে।

বাসানিও কার্যক্ষেত্রে কি করবেন কে জানেন? তিনি কি পেটিকা নির্বাচন করতে গিয়ে পোর্শিয়ার বাসনাপূর্ণ করতে পারবেন? অর্থাৎ যে পেটিকার মধ্যে পোর্শিয়ার ছবি রয়েছে, যে পেটিকার ওপর পোর্শিয়ার বিয়ের ব্যাপারে নির্ভর করছে সেটিকে নির্বাচন করে তিনি কি পোর্শিয়াকে জীবন সঙ্গিনী করার অধিকারী হবেন?

কথাবার্তার ফাঁকে এক সময় নেরিসা পোর্শিয়াকে লক্ষ্য করে বলল ভদ্রে, পণ্ডিত ও সুযোদ্ধা এক ভেনিসীয় সুদর্শন যুবকের কথা তোমার মনে পড়ে কি? তোমার বাবার জীবিতকালে যিনি মাঁফোরার মার্কুইসের দলের সঙ্গে আমাদের এই প্রসাদে এসেছিলেন—তাঁকে মনে আছে? কয়েক দিন তো আমাদের অতিথি হয়ে এখানে ছিলেন পোর্শিয়া চিন্তার জট থেকে নিজেকে মুক্ত করে আগ্রহান্বিত হয়ে জবাব দিলেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই মনে আছে। মনে আছে বৈকি, তার নাম বাসানিও না? আমার মনে হচ্ছে তাঁর নাম বাসানিও-ই। নেরিসা অধিকতর উৎসাহ প্রকাশ করে বলল—হ্যাঁ,

আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন পর্যন্ত ক'জন পাণিপ্রার্থী হয়ে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বরমাল্য পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই—

পোর্শিয়া তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ ভাই, তোমার ধারণা অভ্রান্ত। তার কথা আমার বেশ মনে আছে—তাঁর ছবি যেন আজও আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ভাসছে। তাছাড়া তিনি যে প্রশংসাবাণীর উপযুক্ত পাত্র তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

কথা শেষ করে পোর্শিয়া কার পায়ের শব্দে ফিরে তাকাতেই দেখেন ভৃত্য দরজায় প্রবেশাধিকারের অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পোর্শিয়া'র প্রশ্নের উত্তরে ভৃত্য নিবেদন করল যে, চারজন বিদেশী প্রতিযোগী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করেই বিদায় নিতে ইচ্ছুক। তারা পোর্শিয়ার অনুমতির অপেক্ষায় বসে। ভৃত্যের মুখে সংবাদটা শুনে পোর্শিয়া খুশী হয়ে সম্মতি প্রদান করতে ও তাঁদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে নীচে নেমে গেলেন।

তিন

ভেনিস নগরীর রাজপথের ধারে এক সুন্দর অট্টালিকার মালিক এক অর্থবান সুদের কারবারী—নাম তাঁর শাইলক। পথের ধারে এক সুসজ্জিত ঘরে বাসানিও-র সঙ্গে গৃহকর্তা শাইলক কথোপকথনে রত। অর্থের প্রয়োজনে বাসানিও শাইলকের দ্বারস্থ হয়েছেন। শাইলকের প্রশ্নের উত্তরে বাসানিও জানালেন—আমি আপনার কাছে তিন হাজার ডাক্যাট্ ঋণ স্বরূপ প্রার্থনা করছি। আমি কথা দিচ্ছি, তিন মাসের মধ্যে সুদসমেত আপনার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

বহু অভিজ্ঞ সুদের কারবারী শাইলক তামাটে দাঁত বের করে হেসে বললেন,—বলছেন কি মশায়, তিন হাজার ডাক্যাট্। এতগুলো ডাক্যাট্ কি এমনি এমনি হাতছাড়া করা যায়?

বাসানিও আশাহত সুরে বললেন—আমি তো স্বীকার করছি আপনার প্রদত্ত অর্থের জন্য সুদ দেব।

—সুদ দেবেন তা তো বুঝলাম। কিন্তু এমনও তো হতে পারে আমার আসল টাকাই আদায় করা সম্ভব হ'ল না, সুদ তো দূরের কথা। যা দিনকাল পড়েছে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করা যে কী ঝকমারী ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া জানে না। তা ছাড়া তিন মাস পরে যে আপনার টাকা শোধ করার মত অবস্থা ফিরবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? যদি—

বাসানিও শাইলকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—যদি কোন সুপ্রতিষ্ঠিত

ব্যক্তি আমার জামিন স্বরূপ থাকে ?

—জামিন ? শহরের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ? কার কথা বলছেন আপনি ?

—অ্যান্টনিও। ধনী বণিক অ্যান্টনিও যদি আমার জামিন থাকে তবে কি আপনি আমার প্রার্থিত অর্থ ঋণ দিতে প্রস্তুত।

অ্যান্টনিও-র কথায় সুদখোর শাইলক সোজা হয়ে বসলেন। অ্যান্টনিও-র সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের মন কষাকষি চলছে। লোকটিকে সে কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারে না। কারণে অকারণে লোকটি তার অনিষ্ট কামনা করে থাকে। নানা অপপ্রচার করে তার অবাধ সুদের ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা করছে। এই সুযোগে লোকটিকে একবার ফাঁদে ফেলার আশায় মন তার চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

শাইলক বাসানিও-র কথায় সম্মত হ'লে বাসানিও তাঁকে তাঁর বাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, সেখানেই অ্যান্টনিওকে ডেকে এনে উভয়ের সামনাসামনি করিয়ে দেবেন। তখন শাইলক অ্যান্টনিও-কে টাকা ধার দেওয়ার সপক্ষে শর্তাবলীর উল্লেখ করবেন।

বাসানিও-র বাড়ি নিমন্ত্রণের কথা শুনে শাইলক চমকে উঠলেন। এক কথায় তিনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ শাইলক ইহুদী আর বাসানিও খৃষ্টান। কোন খৃষ্টানের বাড়ি শাইলকের মত নিষ্ঠাবান ইহুদীর ভোজন কখনই সম্ভব নয়।

শাইলক আরো বললেন, আমি তোমার সহিত টাকাকড়ি লেনদেন করতে পারি—দরকার বশতঃ কোথাও যেতেও পারি। তাই বলে ভোজসভায় যেতে পারি না।

বাসানিও হতাশ হয়ে ফিরে যাবার পাত্র নন। হাজার তিনেক ডাক্যাট্ তার খুবই দরকার। জাত্যাভিমান ও আত্মসম্মানের চেয়ে ডাক্যাট্গুলোর মূল্য এই মুহূর্তে তাঁর কাছে ঢের বেশী। তাই বাধ্য হয়েই তিনি অ্যান্টনিও-কে শাইলকের বাড়ি নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

বুড়ো ইহুদী শাইলক, চিরশত্রু অ্যান্টনিও-কে ফাঁদে ফেলে একটু নাজেহাল করার আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন।

এক সকালে শাইলক যখন হিসাবের খাতা নিয়ে ব্যবসার পরিস্থিতি নিরীক্ষণে ব্যস্ত এমন সময় বাসানিও বন্ধু অ্যান্টনিও-কে নিয়ে হাজির হ'লেন ? বাসানিও শাইলককে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—আমি আমার জামিন যে ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম, এই সেই বণিক অ্যান্টনিও।

শাইলক তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে অভ্যাগতদের বসার ব্যবস্থা করলেন। অ্যান্টনিও আসন গ্রহণ করলে শাইলক আড় চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন কী চাটুকার শুল্ক আদায়কারীর মত চাউনি লোকটার। খৃষ্টান বলেই লোকটাকে আমি সবচেয়ে বেশী করে ঘৃণা করি। তাছাড়া লোকটা বিনা সুদে টাকা ধার দিয়ে ভেনিসে আমার সুদের ব্যবসার সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি একবার সুযোগ মত লোকটাকে বাগে পাই. তবে আমার বহু দিনের জমানো আক্রোশের

শোধ তুলে ছাড়ব। আমাদের মহান ইহুদী জাতটাকে লোকটা ভীষণ ঘৃণা করে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, হতচ্ছাড়াটা ব্যবসায়ীর সমাবেশেও আমার ব্যবসায়ে সদুপায়ে লাভ প্রভৃতিকে যাচ্ছে তাই করে গালাগাল দেয়। এই চির শত্রুটাকে যদি আমি ছেড়ে দি, তবে যেন আমার ইহুদী জাতটা জাহান্নমে যায়।

শাইলক যখন নিজের মনে বিড়বিড় করে অ্যান্টানিও-র বংশ উদ্ধার করছিলেন তখন বাসানিও টাকাটার প্রয়োজনে ছট্‌ফট করছিল। সে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাগাদা দিলেন।

সম্বিত ফিরে পেয়ে শাইলক থতমত খেয়ে প্রকৃত ব্যাপারটি চাপা দিতে গিয়ে বললেন যে, তিনি তাঁর নিজের হাতে জমা টাকার হিসাব করছিলেন। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—দেখুন, আমার নিজের হাতে এতগুলো টাকা এই মুহূর্তে নেই। আপনাকে যদি টাকা দিতেই হয় তবে আমাকে আমার বন্ধু ইহুদী ট্যুবালের কাছ থেকে ধার করে আনতে হবে।

অ্যান্টনিও কথা প্রসঙ্গে জানালেন যে, সুদে টাকা দেয়া ও নেয়া উভয় কাজকেই তিনি সমান ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। তবু তিনি এই মুহূর্তে নিরুপায়, বন্ধুর জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে এ-কাজে রাজী হ'তে হয়েছে। এমনিভাবেই তো পৃথিবীতে সুদের প্রথম জন্ম হয়। কারও না কারও অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতেই মানুষ মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। তার বিনিময়ে মানুষ মানুষের কাছ থেকে উপরি পাওনা আদায় করে থাকে।

শাইলক সুচতুর—অত্যন্ত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি কৌশলে কথার মার প্যাঁচের দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, সুদের ব্যবসা শাস্ত্র ও ধর্মসম্মত। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে জেকবের ভেড়ার পালের ভেড়াও লাভজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় শাইলকের যুক্তি অভ্রান্ত। অ্যান্টনিও-র ব্যবসায়ের লাভ এবং শাইলকের সুদের ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দুজন তো একই নৌকোর যাত্রী।

শাইলকের কথা শুনে অ্যান্টনিও অস্পষ্ট স্বরে বললেন,—দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা নিজেদের অপকর্ম চাপা দিতে ধর্মের দোহাই দিয়ে থাকে। তবে তার মধ্য দিয়ে অসৎ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় আপেলের বাইরের দিকটা অতি লোভনীয় রং-এ ঢাকা থাকলেও তার ভেতরটা থাকে পচা। অ্যান্টনিও-র আচরণেও অনেক সময় এরকম ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বহুবার শাইলককে অবিশ্বাসী, পিশাচ, খুনী, নীচ, কুকুর প্রভৃতি মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা করেছেন। তাঁর ইহুদী পোশাক লক্ষ্য করে পরম বিতৃষ্ণাভরে গায়ে থুথু ছুঁড়ে ছিটিয়ে দিতেও ইতস্তত করেন নি।

অথচ আজ টাকার প্রয়োজনে সেই শাইলকের কাছেই হাত পাততেও দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু পথের কুকুর টাকা দিতে পারে, এ-তো হাস্যকর অবিশ্বাস্য ব্যাপার ? তাই সুযোগসন্ধানী সুচতুর শাইলক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে বললেন,—ওগো মহামানব, গত বুধবার আপনি বিতৃষ্ণা ভরে আমার গায়ে থুথু ছিটিয়েছিলেন, আর একদিন মেরেছিলেন লাথি। আমাকে পথের কুকুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছিলেন আর একদিন। যার কাছ থেকে এমন সৌজন্য ও আপ্যায়ন লাভে ধন্য হয়েছি, তাঁকে কি ভাবে সরল বিশ্বাসে এক কথায় তিন হাজার ডাক্যাট্ হাতে তুলে দিতে পারি ?

শাইলকের কথায় অ্যান্টনিও এতটুকুও নরম হ'লেন না। তিনি কোন রকম বিনয়ের ব্যবহার না করেই বললেন,—প্রয়োজন বোধে আমি আবারও আপনাকে পিশাচ ও পথের কুকুর প্রভৃতি সম্বোধন করব। গায়ে থুথু ছিটাতেও এতটুকু দ্বিধা করব না। আপনি যে টাকা আমাকে ধার দেবেন তার বিনিময়ে তো কড়াক্রান্তি সুদ হিসাব করে নেবেন। অতএব টাকা ধার করতে এসে আমি নিজেকে আপনার কৃপাপ্রার্থী ভেবে ছোট মনে করতে পারি না।

অকস্মাৎ শাইলকের কথার সুর পাল্টে গেল। তিনি বন্ধুত্বের ভান করে সহানুভূতির সুরে বললেন,—দেখুন অ্যান্টনিও, আপনার কাছ থেকে সুদ নিয়ে আমাদের আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বকে আমি ছোট করতে পারি না। তাছাড়া আপনার কাছ থেকে এতদিনে যা কিছু অপমান গায়ে মেখে নিয়েছি তা-ও আমি অবশ্যই ভুলে যাব। আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ বিনা সুদে ধার দিয়ে আমি আমাদের বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করতে চাই—আমাদের প্রীতি ও সৌহার্দকে স্থায়ী করাই আজ আমার একমাত্র কাম্য। আপনার কাছ থেকে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণই আমি আজ বিশেষ করে আশা করছি।

বুড়ো ইহুদী শাইলক সম্বন্ধে বাসানিও-র মনে এতকাল যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল আজ তার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। বুড়োর সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার দিকটাই তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

শাইলক সবিনয়ে নিবেদন করলেন,—দেখুন অ্যান্টনিও, মানুষের ব্যবহারটাই বড় কথা, টাকা তো আজ আছে কাল জোয়ারের জলের মত নাও থাকতে পারে। অতএব আমি যা বলছি কার্যতও তাই করব। বিনা সুদেই আপনার প্রার্থিত তিন হাজার ডাক্যাট্ আমি দিতে সম্মত তবুও নিছক খেলার ছলে একটা শর্ত প্রয়োগ করতে চাচ্ছি, আপনাকেও চুক্তি-পত্রে সই করে দিতে হ'বে। চুক্তি-পত্রে উল্লেখ থাকবে যে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে আমার প্রাপ্য টাকা শোধ করে দিতে না পারলে আমার ইচ্ছানুসারে আপনার শরীর থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে দিতে হ'বে। অবশ্য ব্যাপারটাকে আপনি রসিকতা মনে করে হাল্কাভাবে বিচার করে নির্দ্ধিধায় চুক্তিপত্রে সই দিতে পারেন।

সুদখোর বুড়ো শাইলকের কথায় বাসানিও চমকে উঠলেন। তিনি এহেন জঘন্য প্রস্তাবে প্রবল বাধা দিলেন।

বুড়ো অত্যন্ত চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে বললেন,—দেখুন মহাশয়, এতে ভয় পাবার কি এমন কারণ থাকতে পারে তা তো আমার মাথায় আসছে না। সত্যি কথা বলতে কি এক পাউণ্ড মাংস তো ধরতে গেলে মূল্যহীন। মানুষের মাংসের চেয়ে মেষ, ছাগ বা গো-মাংসের মূল্য বরং বেশীই। আর অ্যাণ্টনিও-র বন্ধুত্ব লাভের জন্যই আমি এ টাকা দিতে সম্মত হচ্ছি।

অ্যাণ্টনিও রসিকতার সুরে অথচ অস্পষ্ট উচ্চারণ করলেন—এই ইহুদীটা দেখছি একেবারে দয়ার অবতার হয়ে গেছে। এখন দেখছি ওর মধ্যে সদগুণের অভাব নেই। দয়া-ধর্ম গুণ যেমন বেড়ে চলেছে বুড়ো ইহুদীটা আবার খৃষ্টান না হয়ে যায়।

বাসানিও বন্ধু অ্যাণ্টনিও-র কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন,—ইহুদী বুড়ো কপটচিত্ত। ওর এই আপাতনিরীহ প্রস্তাবটা কিন্তু আমার কাছে খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। অ্যাণ্টনিও তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন। এতে এমন মুষড়ে পড়ার কি আছে। টাকা শোধ করার নির্দিষ্ট দিনের একমাস আগেই আমার বাণিজ্য জাহাজ পেঁছে যাচ্ছে। অতএব শাইলকের মনে যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকেও, বা নিষ্ঠুর হত্যার চিন্তা মনে পোষণ করে থাকে তবুও এতটা অসহায় ভাবার কোনই কারণ নেই। বুড়ো ইহুদী সুদখোর শাইলক আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

চার

এদিকে শাইলকের বাড়িতে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে চলেছে। শাইলকের বাড়ির বাইরের দিকের একটি ঘরে শাইলকের একমাত্র মেয়ে জেসিকা বিষণ্নমুখে বসে। পাশেই তার বাবার গৃহভৃত্য ল্যান্সলট দাঁড়িয়ে। ল্যান্সলট কাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইছে। তাই আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় মনিবকন্যা জেসিকা ব্যথিত, মর্মাহত। ল্যান্সলটের ভাষায় অর্থপিশাচ ইহুদী শাইলকের এই বাড়ি দ্বিতীয় নরক—নিরানন্দে যক্ষপুরী। জেসিকাও এ-ব্যাপারে একই মত পোষণ করে। তবে ল্যান্সলট ছিল বলে সে নরকপুরী গুলজার করে রাখত—নরকও আনন্দ-স্ফূর্তির কেন্দ্র হয়েছিল এতকাল। তাছাড়া ল্যান্সলট ছিল তার প্রেমের মাধ্যম। লরেঞ্জার সঙ্গে তার প্রেমের প্রধান হোতাই হচ্ছে এই সুচতুর ভৃত্য ল্যান্সলট। উভয়ের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদানে প্রথম থেকেই দূতের ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রভুকন্যাকে ছেড়ে যেতে ভৃত্য ল্যান্সলটের মনও মুষড়ে পড়েনি। তবু তাকে যেতেই হবে—নিরুপায়।

ল্যান্সলট বিদায় নিল। ল্যান্সলট বিদায় নিয়ে চলে গেলে শাইলকের কন্যা জেসিকা তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে ভবেতে লাগলেন।

অর্থপিশাচ হৃদয়হীন কঠিন-কঠোর পিতা শাইলকের কন্যা বলে মেনে নিতেও

জেসিকার লজ্জা হয়। হায়! এমন বাবার কন্যা হয়ে সংসারে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু বরং শতগুণ শ্রেয়। অস্থিরচিত্তে মর্মাহত হয়ে জেসিকা জামার তলা থেকে লরেঞ্জোর চিঠিটা বের করে বার বার চিঠিটা পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে আপন মনে বলতে লাগল—লরেঞ্জো, যদি তুমি তোমার কথা ঠিক রাখ, যদি প্রতিশ্রুতিচ্যুত না হও তবে অচিরেই এই নরক-যন্ত্রণার হাত থেকে আমি মুক্তি পাব—পাব স্বাধীন মুক্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব—পারব তোমার প্রেমময়ী পত্নীর সম্মান লাভ করে জীবন সার্থক করতে। ঈশ্বর যেন সেই শুভ মুহূর্ত ত্বরান্বিত করে আমাকে স্বপ্ন-সাধের জীবন দান করেন।

ভেনিসের সুপ্রশস্ত রাজপথে গ্রাসিয়ানো, লরেঞ্জো, সালারিণো এবং সালানিও কথোপকথনে ব্যস্ত। লরেঞ্জো গ্রাসিয়ানোকে জানালেন যে, নৈশভোজের সময় সবাই যখন পানাহারে ব্যস্ত থাকবে তখন সুযোগ বুঝে তিনি আর গ্রাসিয়ানো এক ফাঁকে সরে পড়বেন। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে আবার ভোজের আসরে এসে চুপিচুপি বসে পড়বেন।

তারা যখন এমনি যুক্তি পরামর্শে ব্যস্ত ঠিক অমনি সময়ে ল্যান্সলট সেখানে হাজির হ'ল। হাতে তার একটি পত্র। পত্রটি লরেঞ্জার হাতে দিয়ে সে জানাল যে এক্ষুনি তার পুরাণো প্রভু শাইলকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। শাইলকের কাজ যে সে ছেড়ে দেবে সে কথা তাঁকে বলার সুযোগ হয় নি। এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে কর্তব্য সম্পাদন করে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চিরদিনের মত সম্পর্ক ছিন্ন করে আসবে। তারপর তাকে যেতে হবে বাসানিও-বাড়ি। এখন থেকে তাঁর কাছেই কাজ করবে—সেখানেই থাকবে। লরেঞ্জো ল্যান্সলটকে নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। তিনি বললেন—তুমি যখন শাইলকের বাড়ি যাচ্ছ তবে এক কাজ করবে, জেসিকাকে আমার কথা বলবে, আর বলবে কথা অনুসারেই কাজ হ'বে। সে যেন প্রস্তুত থাকে! আমি পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত থাকব।

ল্যান্সলট পুরস্কার নিয়ে বিদায় নিলে, গ্রাসিয়ানো লরেঞ্জার দিকে এগিয়ে এসে কৌতূকহলোদ্দীপক দৃষ্টিতে তার হাতের পত্রটি নির্দেশ করে বললেন—মনে হচ্ছে রূপসী জেসিকার সুন্দর হাতের লেখা এ পত্র। কি লিখেছেন সুন্দরী?

লরেঞ্জা তাঁকে আগে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন—বন্ধু ধৈর্য হারিও না। আমি অবশ্যই পত্রের বক্তব্য তোমার কাছে ব্যক্ত করব। কিছুই গোপন করব না। তুমি ধৈর্য ধরে শোন।—সে জানিয়েছে তার পিতৃগৃহ থেকে আমি কি করে উদ্ধার করব। সে আসার সময় কি কি সোনাদানা মণিমুক্ত সঙ্গে নিয়ে আসছে। অন্য জানিয়েছে সে বালক ভৃত্যের পোষাক পরে থাকবে, আমি যেন দেখে ভুল না করি।—একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লরেঞ্জো আবার বলতে শুরু করল,—জান বন্ধু, এই ইহুদীটা যদি

কোন স্বর্গের অধিকারী হয় তবে তার মেয়ের পুণ্য ফলেই তা সম্ভব হ'বে। আর ভবিষ্যতে যদি এই মেয়েটির এতটুকুও অকল্যাণ হয় তবে তার বাবার আজীবন অর্জিত পাপের জন্যই—অবিশ্বাসী ইহুদীটাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

শাইলকের বাড়ি। জেসিকা তার শোবার ঘরে একাকী এটা-ওটা করে সময় কাটাচ্ছে। মনে তার লরেঞ্জোর কথা। ভাবছে কখন কিভাবে পিতার চোখে ধূলো দিয়ে প্রিয়তম লরেঞ্জোর সঙ্গে মিলিত হ'বে।

পাশের ঘরে শাইলক হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত। তিনি খাতাটি বন্ধ করে জেসিকাকে ডাকলেন। পিতার হাঁক ডাকে জেসিকা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। জেসিকা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালে শাইলক বললেন—জেসিকা, একটা ভোজের নিমন্ত্রণে আমাকে এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হচ্ছে। ফিরতে একটু রাত্রি হবে। চাবিটা রেখে দে। খুব সাবধানে থাকবি। দিনকালের অবস্থা ভাল নয়, কিছু একটা ঘটে যেতে কতক্ষণ। তা ছাড়া, কাল রাত্রে টাকার স্বপ্ন দেখেছি—মনটা কেমন বিষিয়ে রয়েছে। একটা অজানা বিপদাশঙ্কায় মন দুর্বল ; দেখিস যেন কিছু না ঘটে যায়।

ল্যান্সলট পাশেই দাঁড়িয়েছিল। গৃহত্যাগে প্রভুর অনিচ্ছা আশঙ্কায় সে উদ্বিগ্ন হ'ল। সে নানা ভাবে তাকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাইলক বন্ধুর বাড়ি যাওয়াই স্থির করলেন। যাবার আগে মেয়ে জেসিকাকে বার বার সতর্ক করে দিলেন যেন দরজা-জানালা সর্বদা বন্ধ করে রাখে। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন অবশ্যই সজাগ থাকে। তাছাড়া ঐ খৃষ্টান লম্পট ছোঁড়াগুলো যখন রং চং মেখে রাস্তায় ঢং করতে বেরোবে তখন যেন জানালায় মুখ বাড়িয়ে তাদের উৎসাহিত না করে।

শাইলক ল্যান্সলটকে তাড়াতাড়ি বাসানিও-র বাড়ি গিয়ে তাঁকে তাঁর আগমনবার্তা জানাতে বলল। প্রভুর নির্দেশে ল্যান্সলট যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগল। বাসানিওর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবার পূর্বে জেসিকার কাছে গিয়ে কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল,—এমন একজন খৃষ্টান তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবে, তাঁকে দেখতে পাওয়াটা যে কোন ইহুদী তরুণীর পক্ষে দুঃখজনক ব্যাপার। জেসিকাকে গোপন নির্দেশ দিয়ে ল্যান্সলট বিদায় নিল। ল্যান্সলট চলে গেলে শাইলক আর কাল বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। তিনি সুদৃশ্য ও মূল্যবান ইহুদী পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে খৃষ্টান বাসানিও-র বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

শাইলক বিদায় নিলে, তাঁর একমাত্র কন্যা জেসিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মন তার সেই শুভ মুহূর্তের জন্য উদ্বিগ্ন—কখন তার প্রেমিক—প্রাণেশ্বর লরেঞ্জোর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।

জেসিকা যখন লরেঞ্জার আগমনের জন্য অধীর অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছিল, এমন সময় রাস্তায় লরেঞ্জার সংকেত ধ্বনি কানে যেতেই ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে রাস্তায় ছুটে

গেল। হাতে তার একটি পেটিকা। সে আবছা অন্ধকারে ছুটে লরেঞ্জোর কাছে গিয়ে হাতের পেটিকাটি লরেঞ্জোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—পেটিকাটি ধর। আর দেরী নয়, চল, যত শীঘ্র সম্ভব এখন দূরে সরে পড়ি। পেটিকার মধ্যে দামী জিনিস রয়েছে। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাবে না বলে কিছুটা নিশ্চিন্ত। কারণ, আমার বালক বেশ তোমাকে বিচলিত করবে।

লরেঞ্জো উৎফুল্ল হয়ে বললেন—ঠিক আছে, চল পালিয়ে যাই আর অহেতুক দেরী করার দরকার কি? জেসিকা তুমিই হবে আমার মশালবাহিকা।

—তা হয় না প্রাণাধিক। মশালের আলোয় আমার পুরুষ বেশ সবার নজরে পড়বে।

—তোমার ধারণা ভুল জেসিকা। তোমাকে পুরুষ বেশে চিনতে পারা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অন্য তো দূরের কথা, আমি তোমার এত কাছের মানুষ, আমারই মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছে সত্যি তুমি আমার জেসিকা কিনা—তুমি আমার সেই প্রাণেশ্বরী ভাবতে কেমন কুণ্ঠা বোধ করছি। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার—পুরুষবেশী তোমাকে চিনতে পারা স্বয়ং ঈশ্বরের সাধ্যের বাইরে।

জেসিকা ব্যস্ত হয়ে বললেন—যাক, সে-সব কথা পরে হ'বে। এখানে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে না। চল যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে সরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই।

রাত্রির আবছা অন্ধকারে লরেঞ্জো তার প্রিয়তমা জেসিকার হাত ধরে এগিয়ে চললেন।

পাঁচ

বেলমেণ্ট শহর। পোর্শিয়ার সেই সুদৃশ্য প্রাসাদ। পেটিকা নির্বাচন পর্ব। পোর্শিয়ার বাবা'র পরিকল্পনা ছিল যে সত্যিকারের প্রেমিক, যার প্রেম নিষ্কলুষ, যার প্রেমে এতটুকুও ফাঁক নেই যে প্রেমিকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেই প্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব হ'বে উপযুক্ত পেটিকা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রূপসী যুবতী পোর্শিয়াকে লাভ করা। সেই শুভ মুহূর্ত আগত প্রায়।

মরক্কোর রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে পোর্শিয়া পেটিকা-রক্ষিত ঘরে উপস্থিত হলেন। পোর্শিয়া রাজকুমারকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও সীসক—এই তিনটি পেটিকা থেকে সঠিক পেটিকাটি তুলে নিতে অনুরোধ করলেন। সঠিক পেটিকাটির মধ্যেই থাকবে পোর্শিয়ার ছোট্ট একটি ছবি।

পোর্শিয়ার নির্দেশে মরক্কোর রাজকুমার পেটিকাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। পেটিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন—প্রথম পেটিকাটি দেখা যাচ্ছে সোনার,

আর তার ওপরে লেখা রয়েছে 'আমাকে যে বাছাই করবে সে বহুগুণ বাঞ্ছিত ফল পাবে।' দ্বিতীয় পেটিকাটি রূপোর তৈরী। তার গায়ে লেখা রয়েছে 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার পাবে।' আর তৃতীয়টি হচ্ছে বর্ণহীন—সীসার তৈরী। এই পেটিকাটির গায়ে দেখা যাচ্ছে লেখা রয়েছে 'আমাকে যে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসর্বস্ব ঝুঁকি নিতে হবে।'

রাজকুমার পেটিকাটির গায়ে লিখিত বিবরণী পাঠ করে ভাবলেন, সামান্য সীসার জন্য সব কিছু হারাবার ঝুঁকি নেওয়া সঙ্গত হবে না। তাই তিনি ওটা স্পর্শ করলেন না। দ্বিতীয় পেটিকাটির কথা ভাবলেন—রূপোর পেটিকা এটি। তিনি এটিও বাতিল করলেন। তিনি নিঃসন্দেহ যে, পোর্শিয়ার মত এমন সুন্দরীর ছবি রূপোর পেটিকার মধ্যে থাকতে পারে বলে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। এবার অবশিষ্ট পেটিকাটি হচ্ছে সোনার তৈরী। তিনি পেটিকাটির গায়ের লেখাটি বারবার পড়লেন—যে আমাকে বাছাই করবে সে বহুগুণ বাঞ্ছিত ধন পাবে। মুহূর্ত কাল নীরবে কি যেন ভেবে তিনি সোনার পেটিকাটি হাতে তুলে নিয়ে পোর্শিয়ার কাছে চাবি চাইলেন।

রাজকুমার নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন করেছেন দেখে পোর্শিয়া তাড়াতাড়ি পেটিকার চাবিটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। রাজকুমার ব্যস্ত হয়ে পেটিকাটি খুলে দেখেন, ভেতরে একটি মড়ার মাথার খুলি আর তার চোখের কোঠরে এক টুকরো কাগজে কি লেখা—

'চক্‌চক্‌ করিলেই নাহি সোনা হয়;
বহুবার এ-কথাটি শুনেছ নিশ্চয়ই।
বহুজন করে লোভে জীবনের ক্ষয়।
শুধু দেখ বাহিরের চাকচিক্যের জয়।
সাহস সমান বুদ্ধি যদি তোমার হ'ত,
পাকা মাথা নবীন কাঁধের পর র'ত,
ভাগ্যলিপি অন্যভাবে লেখা হ'ত তবেঃ
বিদায় এখন, তব ব্যর্থ প্রেম ভবে।'

মরক্কোর রাজকুমার হতাশায় জর্জরিত। পোর্শিয়াকে লাভ করার বৃথা চেষ্টায় মনে তাঁর অফুরন্ত হতাশা আর হাহাকার। ব্যর্থ প্রেমিক-প্রবর রাজকুমার রূপসী যুবতী পোর্শিয়াকে লাভ করার আশা চিরতরে জলাঞ্জলী দিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে বিদায় নিলেন। রাজকুমার বিদায় নিলে পোর্শিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, অন্তত এমন একজন অপদার্থকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে লাভ করতে হবে না জেনে তাঁর মনে খুশীর আমেজ।

এদিকে ইহুদী বণিকের মাথায় বজ্রাঘাত হবার উপক্রম। তাঁর একমাত্র মেয়ে জেসিকা মণিমুক্তোখচিত বহু মূল্যবান গহনাগাটি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। অনেক খোঁজ খবরের পর তিনি জানতে পেরেছেন, হতচ্ছাড়া খৃষ্টান লম্পট লরেঞ্জোর হাত

ধরে তাঁর মেয়ে দেশত্যাগ করেছে। মা-মরা মেয়ে জেসিকার আকস্মিক পলায়নে তাঁর বুড়ো বাপ শাইলক ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ও উদ্বেগে উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। বাসানিও-র বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে শূন্য ঘর দেখেই তিনি অনুমান করেছিলেন এমনই কিছু একটা ঘটেছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে ডিউকের কাছে নালিশ জানাতে গেলেন, ভেবেছিলেন সেখানে কেউ হয়তো খোঁজ দিতেও পারে। হতাশ হয়েই ফিরে আসতে হয়েছে। লাভ যেটুকু হয়েছে তা হচ্ছে, সেখানে সালারিণো ও সালানিও-র সঙ্গে দেখা। তাঁরা তাঁকে 'ভিলেন জিউ' অর্থাৎ শয়তান ইহুদী আখ্যায় আপ্যায়িত করেছেন। সেইখানেই জানতে পেরেছেন তাঁর মেয়ে জেসিকা ও খৃষ্টান লরেঞ্জো প্রমোদতরীতে ভেসে চলে গেছে। তিনি তার মা-মরা একমাত্র মেয়েকে নিজের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, সুরুচিবর্জিত খৃষ্টানদের অশালীন আচার-আচরণ ও ঢং ঢাং থেকে দূরে রাখতে। যে মেয়েকে বিশ্বাস করে তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির দায়িত্বভার অর্পণ করে চাবির গোছা হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই আজ পেলেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

একদিকে মা-মরা মেয়ের অপত্য স্নেহ অন্যদিকে আজীবনের কষ্টোপার্জিত সোনা-দানার শোকে মুহ্যমান হয়ে উন্মত্তপ্রায় সুদখোর শাইলক ভেনিসের পথে পথে পলাতকা কন্যার খোঁজ করে বেড়াতে লাগলেন—কোথায় আমার মেয়ে, খৃষ্টান কুকুরটা আমার মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়েছে, আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে; খৃষ্টানটার প্ররোচনায় আমার মেয়ে বিপথগামী হয়েছে। উন্মত্তপ্রায় শাইলক ডিউককে ডেকে বুকফাটা আর্তনাদের স্বরে বলতে লাগলেন—'তোমরা ধর, ওদের ধর,—খোঁজ করে ওদের ধরে দাও। ওদের চিনতে পারা খুব কঠিন হ'বে না—সহজেই ধরতে পারবে এত সোনা-দানা মণিমুক্তো খোচিত গহনাগাটি আর কারো কাছেই পাওয়া যাবে না। তোমরা আমার একমাত্র মেয়েকে ধরে নিয়ে এই বুড়ো বাপকে বাঁচাও—আমার বহু কষ্টোপার্জিত সম্পত্তিগুলো উদ্ধার করে দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কর। আরও কত কথা বলতে বলতে শাইলক উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করে বেড়াল ভেনিসের পথে পথে। শাইলকের অভাবনীয় শোচনীয় অবস্থা দেখে পাষাণও গলে যায়। কিন্তু ভেনিসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে একটা মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালেন বুড়ো শাইলক। তারা পাগল ভেবে তার পিছন ধাওয়া করল, ঢিল ছুঁড়তে লাগল। সুযোগ বুঝে তার লম্বা হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসা ইহুদী পোষাক ধরে আচমকা টানাটানি করে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি এমন মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখলে চোখের জল রাখা দায় হয়ে পড়ে।

এদিকে সালারিণো ও সালানিও ভেনিসের পথের ধারে একটি ঝাঁকড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শাইলকের আকস্মিক শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনারত। তারা হঠাৎ খবর পেল সমুদ্রে একটি জাহাজডুবি হয়েছে। তাদের মনের আশঙ্কা দেখা দিল যদি জাহাজটি অ্যাণ্টনিও-র হয়ে থাকে তবে সর্বনাশের চূড়ান্ত হ'বে। অর্থপিশাচ শাইলকের কাছ থেকে যে টাকাটা ধার করেছে যথাসময়ে শোধ করা সম্ভব হ'বে না। এই সুযোগে

নরপিশাচটা তার দুরভিসন্ধি পূরণ করতে উঠে পড়ে লাগবে। অ্যান্টনিও-কে পড়তে হ'বে এক মহা সমস্যায়।

বাসানিও এ-সময়ে ভেনিসের বাইরে। তিনি গ্রাসিয়ানো-কে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে বেলমণ্টের পথে শাইলকের আবেদনে ডিউক লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন বাসানিও-র জাহাজে লরেঞ্জো এবং শাইলক কন্যা জেসিকা পালাচ্ছে কিনা। না, সেই জাহাজে লরেঞ্জো নেই—জেসিকাকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে ডিউক জানতে পেরেছেন জেসিকাকে নিয়ে লরেঞ্জো মাঝ রাত্রে প্রমোদতরী ভাসিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন।

শাইলকের প্রসঙ্গ উঠতেই সালানিও চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে কথা কটা ছুঁড়ে দিলেন—ইহুদী কুকুর হতচ্ছাড়া শাইলকটা রাস্তায় রাস্তায় যেমন চীৎকার করে বেড়াচ্ছিল, সেরকম মিশ্র আবেগের প্রকাশ আমি আগে কখনো শুনি নি। কী বীভৎস বন্য অপ্রকৃতিস্থ মূর্তি মানুষরূপী জানোয়ারটার। বিচার চাই! আইন চাই। খৃষ্টান ছোঁড়া আমার মেয়েকে ফুসলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে। বিচার চাই —খৃষ্টান নচ্ছারটার উপযুক্ত শাস্তি চাই! বিচার! আমার মা-মরা মেয়ে। আমার মেয়েকে চাই! ডাকাত ছোঁড়াটা আমার জেসিকাকে পাতালের ভেতর লুকিয়ে রাখলেও আমি তাকে চাই।

—আর একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ? ভেনিসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওকে পাগল ঠাওরে ওর সুর অনুকরণ করে মুখ ভেঙচিয়ে চিৎকার করে বেড়াচ্ছিল, হায় আমার জেসিকা, আমার মেয়ে, আমার হাজার হাজার ডাক্যাটের সোনা দানা, আমার, মণিমুক্তো হায়! আমার সর্বস্ব গেল।

—কিন্তু বন্ধু আমাদের আসল চিন্তা হচ্ছে ঐ জাহাজ ডুবির ঘটনাটি। যদি সত্যি সত্যি ওটি অ্যান্টনিও-র জাহাজ হয়ে থাকে তবে তো শিরে বজ্রাঘাত।

—সত্যি খুবই চিন্তার ব্যাপার। অ্যান্টনিও-র মত বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় না। তার যদি কোন বিপদ হয় তা হ'বে আমাদের পক্ষে খুবই দুঃসহনীয়। ঈশ্বর করুন ওটি যেন অ্যান্টনিও-র না হয়ে অন্য কারো হয়। আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে বন্ধু অ্যান্টনিও-কে এ খবরটি জানতে না দেয়া এবং তাকে যথা সম্ভব প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করা। চল আমরা অ্যান্টনিও-র সন্ধানে যাই, তাকে সঙ্গদান করি।

ছয়

আবার ভেনিসের সেই সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত অট্টালিকা। পোর্শিয়ার প্রাসাদ। পেটিকা নির্বাচন কক্ষ। সুমিষ্ট স্বরে করনেট বেজে উঠল। রূপসী যুবতী পোর্শিয়া পেটিকা রক্ষিত কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাকে অনুসরণ করলেন সপারিষদ আরাগনের যুবরাজ।

পোর্শিয়া এ-যুবরাজের ব্যাপারেও নিরুৎসাহ। অথচ নিরুপায় যুবরাজ নির্বাচন

পর্বে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন, তাঁকে সুযোগ দিতেই হ'বে।

পোর্শিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেটিকাগুলোর কাছে গিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যুবরাজকে বললেন,—দেখুন এখানে তিনটি পেটিকা রয়েছে। এদের মধ্যে যেটিতে আমার ছবি রয়েছে সে পেটিকাটি বেছে নিতে পারলে আমাকে, আর প্রতিশ্রুতি দিতে হ'বে যদি ব্যর্থ হন তবে দ্বিতীয় কোন মহিলার প্রাণিগ্রহণ করব না। আর শেষ শর্তটি হচ্ছে পেটিকা-নির্বাচনে ব্যর্থ হ'লে অনতিবিলম্বে স্থান ত্যাগ করতে হ'বে।

আরাগনের যুবরাজ জেসিকার উল্লিখিত শর্তাবলী পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধীরে ধীরে পেটিকাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জঘন্যতম সীসক-পেটিকাটি প্রথমেই ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিলেন। এবারে তাকালেন সোনার পেটিকাটির দিকে। তার গায়ে লেখা ছিল—'আমাকে যে পছন্দ করবে সে বহুজন বাঞ্ছিত ফল লাভ করবে।' 'বহুজনবাঞ্ছিত' শব্দটি যুবরাজের মনঃপূত হ'ল না। 'বহুজনবাঞ্ছিত' শব্দের তাৎপর্য করতে গিয়ে তিনি ভাবলেন সাধারণ মানুষের দলভুক্ত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এ-রকম চিন্তা করে তিনি স্বর্ণ পেটিকাটিও দূরে সরিয়ে রাখলেন। এখন শুধু মাত্র একটি পেটিকা থাকল, সেটি হ'ল রৌপ্য-পেটিকা। তার গায়ে লেখা ছিল—'আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার প্রাপ্য পাবে।' কথাটি যুবরাজের খুবই মনে ধরল। তিনি ভাবলেন উপযুক্ত যোগ্যতা না নিয়ে কে আর সৌভাগ্য করতে সক্ষম হয়? এ-রকম চিন্তা করে তিনি শেষ পর্যন্ত রৌপ্য-পেটিকাটিই নির্বাচন করলেন। তিনি পেটিকাটি হাতে তুলে নিয়ে খুলে দেখেন তার ভেতরে পোর্শিয়ার ছবির পরিবর্তে রক্ষিত রয়েছে একটি বোকা ব্যক্তির ছবি, আর এক টুকরো কাগজ। কাগজটিতে লেখা—

> সাতবার রৌপ্য-পাত্র হয় অগ্নিদগ্ধ
> বারবার পোড় খেলে বুদ্ধি পরিশুদ্ধ ;
> সহজে তাহলে কেহ হয় নাকো বোকা
> (যারা) মায়াকে মেনেছে সার, শুধু খায় ধোঁকা।
> মূর্খ আছে এইরূপ জানিও নিশ্চয়,
> ঢেকে রাখে মূঢ়তাকে মিথ্যা পরিচয়ে।
> আমি যথা ঢাকা ছিনু রুপোর মায়ায়,
> সেইরূপ রব আমি তোমার মাথায়
> ফিরে যাও ঘরে তুমি, তোমাকে বিদায়।

যুবরাজ কাগজে লেখা কবিতাটি পাঠ করে বিদায় দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন এখানে আর এক মুহূর্ত থাকার অর্থই হচ্ছে নিজের বোকামি অধিক সংখ্যক লোকের সামনে তুলে ধরা। উপায়ান্তর না দেখে যুবরাজ পোর্শিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সপারিষদ দ্রুত প্রস্থান করলেন।

যুবরাজ বিদায় নিলে পোর্শিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন সময় একজন পরিচারিকা এসে খবর দিল ভেনিস থেকে একজন যুবক শীঘ্রই আসছেন। তার দূতে

বহুমূল্যবান উপহার সহ খবরটি নিয়ে এসেছে।

এদিকে শাইলকের অবস্থা বড়ই মর্মন্তুদ। একদিকে মা-মরা কন্যার শোক, অপর দিকে আজীবন কষ্টোপার্জিত সোনাদানা হীরে মণিমুক্তোর শোক। সে সঙ্গে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অপমান তো রয়েছেই। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ভাগ্যাহত শাইলক দাঁতে দাঁতে চেপে রাগে দুঃখে ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কত কথাই না বলে চলেছেন, হাঁ, আমি ইহুদী, ইহুদীরা কি মানুষ নয়? ইহুদীদের কি রক্ত মাংসের দেহ নয়? অত্যাচারে, অপমানে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় সবাই জাতিটাকে একেবারে কোণঠাসা করে পিষে মারবার ব্যবস্থা করেছে। নচ্ছারগুলো কি তার ফল কিছুই পাবে না? অনেক সয়েছি যুগ-যুগান্ত ধরে, অত্যাচার আর অবিচার মুখ বুজে অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। এবারে সুদে-আসলে ফিরে পাবার জন্য তৈরী হও।

শাইলকের অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ ক'রে উত্থিত হ'ল এ দীর্ঘশ্বাস। বিশ্বের অপমানিত লাঞ্ছিত আত্মার প্রতিনিধি এই শাইলক। শাইলক নিজের প্রয়োজনে বন্ধু ট্যুবল্-কে কাছে টেনে নিলেন। ট্যুবল্ই এক সময় অ্যাণ্টনিওর—প্রার্থিত তিন হাজার ডাক্যাট পূরণ করতে শাইলককে অর্থ সাহায্য করে ঘাতটি পূরণ করে দিয়েছিলেন। এই টুবল্কেই শাইলক টাকা দিয়ে মেয়ের খোঁজ করতে পাঠালেন। টাকার ওপর টাকা খরচ হচ্ছে, ক্ষতির ওপর ক্ষতি। এ যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। শাইলকের জীবন আজ দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমানবিক অপমান, বল্গাহীন নৃশংস অত্যাচার, অপহরণ আর পলায়ন সব মিলিয়ে তাঁকে একেবারে মুষড়ে ফেলেছে—জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। হতবুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন,—এ কী হ'ল? কেন এমনটা হ'ল? মেয়েটাকে যদি মৃত অবস্থায়ও পেতাম, ওর কানে আমার বহুমূল্যবান দুল-গুলো দুলতো, স্বর্ণমুদ্রাগুলো থাকতো ওর কফিনে। শাইলক কখন যে কী বলছেন, তিনি হয়তো নিজেই তা জানেন না। তিনি আপন মনে বলেই চলেছেন—এ দুনিয়ায় আমার মত ভাগ্যহত দ্বিতীয় কেউ নেই।

ট্যুবল তখন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শাইলকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না, না আছে। আর এক ভাগ্যাহতের কথা আমার জানা আছে। তার অদৃষ্ট আরো শতগুণ মন্দ।

শাইলক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—আছে? কে সে?

—তার নাম অ্যাণ্টনিও। টিপোলিস থেকে তার যে জাহাজ বাণিজ্য করে ফিরছিল তা সমুদ্রে কোথায় হারিয়ে গেছে।

—কী-কী বললে তুমি? তুমি কি সত্যি বলছো? হায় ঈশ্বর! এতদিনে তুমি বুঝি মুখ তুলে চাইলে। সত্যি তুমি আছ—তোমার বিচার আছে।

—তা না হয় হ'ল। কিন্তু এদিকে তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ একবার। শুনেছি সে নাকি এক রাত্রে জেনোয়ায় বলে আশি ডাক্যাট খরচ করে ফেলেছে। দু'হাতে

ডাক্যাট ওপ্পাচ্ছে।

ডাক্যাট খরচের কথা শুনে আবার মুষড়ে পড়লেন। তিনি তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন—ট্যুবল্, তুমি আর বলো না, বরং আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দাও।

—এদিকে অ্যাণ্টনিও-র দুরবস্থার কথা একবার চিন্তা করুন। তাঁর পাওনাদারেরা একজোটে ভেনিসে এসে জড়ো হয়েছে। জাহাজডুবির খবর পেয়ে সবাই দ্রুত ছুটে এসেছে।

—ঠিক আছে, কাজ শুরু হোক। আমিও ছেড়ে কথা কইব না। কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে ছাড়বো।

শাইলক'কে উত্তেজিত করার জন্য ট্যুবল্ আবার তার মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন—কাল একজন আমাকে একটি আংটি দেখাল। জিজ্ঞেস করে জানলাম, একটি বানরের পরিবর্তে কে নাকি তাকে আংটিটি দিয়েছে। তোমার মেয়ের আংটি সেটি।

—ট্যুবল্ তোমাকে অনুরোধ করছি—তোমাকে একটু একা থাকতে দাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এই আংটি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

ট্যুবল্ বার বার জেসিকা-অ্যাণ্টনিও-র কাহিনীকে উত্থান করে শাইলককে অধিকতর উত্তেজিত ও প্ররোচিত করতে গিয়ে বলল,—অ্যাণ্টনিও-র সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার তিন হাজার ডাক্যাট এবার বুঝি মাঠে মারা গেল। তার ওপর জেসিকা তোমার সিন্দুক নিগড়ে নিয়ে গেছে।

শাইলক বাক্শক্তি হারিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে ভবিষ্যৎ কর্তব্য-কর্ম সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন।

সাত

বাসানিও ভেনিসের এই সুপরিচিত কক্ষে উপস্থিত হ'লেন। সঙ্গে তাঁর গৃহকর্ত্রী ও বহুজন আকাঙ্ক্ষিতা রূপসী যুবতী পোর্শিয়া। সদ্য স্নাতা পোর্শিয়া। উন্মুক্ত কেশরাশি বাদলের ঘন মেঘের মত তাঁর পৃষ্ঠ-দেশে এলায়িত। রূপের আভায় চোখ যেন ঝলসে যায়। বাসানিও চলেছেন পেটিকা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে।

পোর্শিয়া তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন,—আমার অনুরোধে একটু অপেক্ষা করুন, ভাগ্য পরীক্ষার আগে একটু অপেক্ষা করুন। কাল ভুল নির্বাচন করলে আমি যে আপনার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হ'ব। যদি ব্যর্থ হন, আপনাকে এ প্রাসাদ ত্যাগ করে বিদায় নিতে হ'বে। সাধ থাকলেও আপনাকে আটকে রাখবার সাধ্য আমার থাকবে না। তবে ভালবাসার মোহ কিনা জানি না, তবে কে যেন আমার বুকের মধ্যে অবস্থান করে বলছে, আপনাকে আমি হারাব না। কুমারী মনের ভাবনা প্রকাশের কোন বিশেষ ভাষা থাকলে আমাকে উজাড় করে দেখতাম, আমাকে লাভ করার এই

কঠিন নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বে আপনাকে কয়েক মাস এখানে আটক রাখতাম। ভাগ্য পরীক্ষায় আপনি আমাকে হারাতেও পারেন, যদি তা-ই হয় সে জন্য মোহের বশে আজ আমার শপথ ভাঙ্গার পাপ করতেও ইচ্ছে হচ্ছে। মন আমাকে প্রলোভিত করছে আপনাকে সঠিক নির্বাচনের ইঙ্গিত দিতে—আপনাকে নিশ্চিত সাফল্য লাভের পথ নির্দেশ দিতে। কিন্তু আমার পক্ষে পাপের ভাগী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনার আয়ত চোখ দু'টো যাদু জানে, রয়েছে সর্বনাশের ইশারা, আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে পীড়া দিচ্ছে। আমার বলতে যা কিছু রয়েছে সবই আপনার করে দিতে আমার মন উন্মুখ। আমার ও আপনার মাঝখানে রয়েছে পেটিকা নির্বাচনরূপ বাধার প্রাচীর। সেই জন্যই তো আপনাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েও আমি আপনার হয়ে উঠতে পারছি না। আমি—

বাসানিও পোর্শিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—আমাকে বাধা দেবেন না। আমার মন খুবই চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। আমি যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হ'য়ে টিকে আছি।

—যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে? তবে আপনি বলতে চাইছেন আপনার প্রেমের সঙ্গে অবিশ্বাস মিশে রয়েছে?

—সংশয়! আমার প্রেমকে হারানোর ভয় থেকেই তার জন্ম। তুষার আর অগ্নির মধ্যে যেমন বন্ধুত্ব কল্পনা করা ভিত্তিহীন, ঠিক তেমনি আমার তার প্রেমিকার মধ্যে অবিশ্বাস কল্পনা করা। যাক, এখন আমাকে অনুমতি দিন, দেখি আমার ভাগ্যদেবতা আমার কপালে কি লিখে রেখেছেন।

পোর্শিয়া নিরুপায় হ'য়ে বাসানিও-কে পেটিকাগুলোর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন দেখুন, এই পেটিকা তিনটির মধ্যে এটিতে আমার ছবি রয়েছে। যদি আপনি অন্তর থেকে আমাকে ভালবেসে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজে বের করে ভালবাসার প্রমাণ দেবেন। যান এগিয়ে যান—এগিয়ে যান বীর, আপনি জয়ী হোন, আমি ফিরে পাই জীবনের স্বাদ, বেঁচে থাকার আনন্দ। আমার ভালবাসা সার্থক হোক আপনার ভালবাসার সঙ্গে একাকার হ'য়ে! আপনার মধ্যে সার্থক হ'য়ে উঠুক আমার নারী জন্ম।

বাসানিও দু'পা এগিয়ে পেটিকাগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলে চললেন—বাইরের চাকচিক্য চিরকালই পৃথিবীকে প্রতারিত করেছে। কোন কিছুর রূপ সৌন্দর্যে ভুললে ভবিষ্যতে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়। বাইরের চাকচিক্য হচ্ছে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে চোরাবালির মত। অতএব, হে নয়নলোভন স্বর্ণ তুমি মিডাসের ক্ষুধা মেটাতে পারনি, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। নিষ্প্রভ এবং মানুষের সঙ্গে বিনিময় মাধ্যম হচ্ছে রৌপ্য, তোমাকে আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। আর তুমি? হ্যাঁ, তুমি অতি সাধারণ সীসামাত্র যা কোন আশ্বাসের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে বরং কোন সাবধানবাণী বহন করছ। আড়ম্বরের পরিবর্তে তোমার ফ্যাকাশে বিবর্ণ রূপই আমার মনকে বেশী করে প্রলোভিত করছে। অতএব তোমাকেই আমি সাদরে বরণ

করলাম, কথা ক'টা শেষ করা মাত্র বাসানিও সীসক পেটিকাটি হাতে তুলে নিলেন।

পোর্শিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—হে প্রেম! ধৈর্য ধর, উল্লাসকে সংযত কর, অতিরিক্তকে সীমিত কর, তোমার অকৃপণ দাক্ষিণ্য আমাকে অভিভূত করেছে। একে সহনক্ষম কর, নইলে অতি প্রাপ্তিতে পীড়িত হয়ে পড়ার সম্ভবনা রয়েছে।

বাসানিও পেটিকাটি হাতে নিয়ে ঢাকনাটি খুলে চমকে উঠলেন,—এ কী স্বপ্ন না সত্যি? এ কার ছবি—পোর্শিয়ার? কোন দেবতুল্য শিল্পীর তুলির টানে একে প্রায় জীবন্ত ক'রে তুলেছেন? আর এই কাগজের মোড়কটি যাতে আমার ভাগ্যফল নির্দেশিত হয়েছে। বাসানিও কাগজের মোড়কটি খুলে পড়লেন—

করোনি বাছাই তারে দেখে চেকনাই
অনকুল তব ভাগ্য সন্দেহ তো নাই।
যবে করায়ত্ব হ'ল সৌভাগ্য তোমার
এতেই তুষ্ট থেকো, চেয়ো, নাক আর;
খুশী যদি হয়ে থাক এ বাছাইয়ে তায়,
ধরে থাক তারে তবে সুখের আশায়।
যাও তবে যেথা তব প্রিয়া আছেন দাঁড়িয়ে
কর চুম্বন তারে তব অধিকারে।

কবিতাটি পাঠ ক'রে বাসানিও বললেন—ভদ্রে, আমি কি কবিতার নির্দেশ অনুযায়ী প্রেম নিবেদন ও প্রেম গ্রহণ করতে পারি? তোমার সম্মতি, অনুমোদন ও স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিঃসংশয় হ'তে পারছি না। একি স্বপ্ন না সত্য?

পোর্শিয়া আবেগভরে বললেন প্রভু বাসানিও, আমি যা তার চেয়ে বেশী করে তোমাকে দেখতে চাইনে। তবুও বলছি—তোমার জন্য আমার সৌন্দর্য শত সহস্রগুণ বেশী হ'লে খুশী হ'তাম। গুণে, সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে ও ভালবাসায় যদি আমি হিসেবকে অতিক্রম করতে পারতাম তবে হয়তো তোমাকে আরো বেশী দিতে পারতাম। আজ এই মুহূর্তে আমি আমার লজ্জাবনত হৃদয়কে আমার প্রাণেশ্বরকে অর্পণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি—আজ সার্থক আমার নারী জন্ম—আমার জীবন-যৌবন। আমার বলতে যা ছিল সবই তোমাতে অর্পিত হ'ল। আর আমার ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই আংটি তোমার হাতে পরিয়ে দিয়ে নিজেকে তোমার মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে দিলাম। একটা কথা মনে রেখো—এই আংটি যদি তুমি খুলে ফেল, হারাও অথবা কাউকে দিয়ে দাও তা হ'লে সেটা হবে তোমার প্রেমের ভাঙন ধরার লক্ষণ।

বাসানিও হাত বাড়িয়ে প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বললেন—ভদ্রে, আমাকে ভাষার অতীত ক'রে তুলেছে তোমার প্রেম। এই আঙুল থেকে এই আংটি খুলে নেয়া আর আমার জীবন নেয়া সমতুল্য। তাই যদি হয় সেদিন জানবে বাসানিওরও মৃত্যু হয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাসিয়ানো সোল্লাসে বলে উঠল,—প্রভু বাসানিও এবং প্রভুপত্নী,

আপনাদের কাম্য আনন্দপূর্ণ হোক—ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনারা যখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, তখন আমার বিয়ের ব্যাপারটাও একটু ভেবে দেখবেন।

বাসানিও সানন্দে ঘোষণা করলেন তোমার প্রস্তাব ভেবে দেখবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি গ্রাসিয়ানো। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাকে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে হ'বে—একটি স্ত্রী খুঁজে নিতে হবে।

গ্রাসিয়ানো নেরিসার দিকে তাকিয়ে দুষ্টামি ভরা হাসি হেসে বলল,—কর্তা সে জন্য চিন্তা নেই। এখানে এসে আমিও আমার কাজ গুছিয়ে ফেলেছি। আপনি যখন গৃহকর্ত্রীকে প্রেম নিবেদনে ব্যস্ত আমি তখন তাঁর পরিচারিকা নেরিসার প্রেম-সাগরে বড়শি ফেলছিলাম। তবে সুচতুরা মৎসকন্যা অনেক ল্যাজে খেলিয়ে তবে টোপ গিলেছে। সত্যি কথা বলতে কি তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে আমার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত প্রাণেশ্বরীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি—আপনি যদি তার কর্ত্রীটিকে গ্রহণ করায় সমর্থন করেন—তবেই আমি তাকে পাব। পোর্শিয়া তাঁর পরিচারিকার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—যা শুনছি সত্যি? গ্রাসিয়ানো-কে তুই ভালবাসিস?

নেরিসা লজ্জাবনত মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—হ্যাঁ। সত্যি তবে আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হন।

পোর্শিয়া ম্লান হেসে নেরিসা-কে আশ্বস্ত করলেন।

পোর্শিয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় লরেঞ্জো ও ইহুদী কন্যা জেসিকা সেখানে উপস্থিত হলেন।

নব দম্পতি ঘরে ঢুকতেই বাসানিও আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে বললেন,—প্রিয়তমে পোর্শিয়া আমার নবলব্ধ অধিকার বলে যদি আমার বন্ধু ও তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে স্বাগত জানাবার অধিকার থাকে তবে আমি এখানে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

সালারিও একটি চিঠি বাসানিও-র দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—মহাশয়, অ্যান্টনিও আপনাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাসানিও ব্যস্ত হ'য়ে চিঠিটি নিতে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—বন্ধু, অ্যান্টনিও কেমন আছে?

সালারিও শুকনো গলায় উত্তর দিলেন—শারীরিক সুস্থ, কিন্তু মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলা চলে না।

পোর্শিয়া বাসানিও-র হাতের চিঠিটির দিকে সামান্য ঝুঁকে বললেন,—চিঠিতে নিশ্চয়ই কোন সুসংবাদ রয়েছে। কি ব্যাপার, কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ? তবে কি তার চেয়ে খারাপ খবর কিছু?

বাসানিও চিঠি পড়া শেষ করে শ্লেষ্মাজড়িত গলায় অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন,—প্রিয়তমে পোর্শিয়া, তোমাকে প্রেম নিবদনের পূর্বেই আমি খোলাখুলি জানিয়েছিলাম

যে, কুল গৌরবই আমার একমাত্র সম্পদ। নিজেকে আমি কপর্দকশূন্য বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। তার চেয়ে সেই মুহূর্তে আমার বলা উচিত ছিল আমার আর্থিক অবস্থা কিছু না থাকার চেয়েও খারাপ। কারণ, আমাকে বন্ধক রাখতে হয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় এক বন্ধুর কাছে। তার চেয়েও যা মর্মান্তিক তা হচ্ছে আমার সেই বন্ধুকে বন্ধক রাখতে হয়েছে এক অর্থপিশাচ নরকের কীট জঘন্যতম শত্রুর কাছে। এ কাগজের টুকরোটি হচ্ছে আমার সেই বন্ধুর দেহ, আর এ প্রতিটি শব্দকে তার একটি ক্ষত মনে করতে পার।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললেন,—তুমি সত্য বলছ সালারিও—তার সব অভিযানই ব্যর্থ হয়েছে? একটিও রক্ষা পায়নি? ইংল্যান্ড, ট্রিপোলিস, ইন্ডিয়া, বারবেরি, মেক্সিকো,—বণিক বিধ্বংসী চোরা পাহাড়ের হাত থেকে কোন দেশ থেকেই জাহাজ ফিরে আসতে পারেনি?

সালারিও পূর্বস্বর অনুসরণ ক'রে বললেন—না—একটিও না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি যদি ইহুদীটির টাকা শোধ দিতে চানও, সে তো নিতে রাজী নয়। সে অহর্নিশি ডিউক-কে উত্ত্যক্ত ক'রে তুলছে। কুড়িজন ব্যবসায়ী, ডিউক নিজে এবং উচ্চ-পদস্থ সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা সবাই তাকে নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কেউই তাঁকে অঙ্গীকার পত্রে উল্লিখিত এক পাউন্ড মাংস আদায়ের দাবী থেকে নিবৃত্ত করতে পারছেন না।

জেসিকা এতক্ষণে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন,—আমি তার বন্ধু টুবলের কাছে বলতে শুনেছি। চুক্তিপত্রের সময় উত্তীর্ণ হ'লে তিনি অ্যান্টনিওর কাছ থেকে উপযুক্ত কুড়িগুণ বেশী টাকা পেলেও অ্যান্টনিও-র মাংস বেশী পছন্দ করেন। মহাশয় আমি তাঁর কন্যা তাঁকে ভালভাবেই জানি, আইন, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা যদি রেহাই দেয় তবে ভাগ্যাহত অ্যান্টনিও-কে বাঁচানো দায় হ'বে।

পোর্শিয়া হতাশার সুরে বললেন—প্রিয়তম, তোমার সেই প্রিয় বন্ধুটিই কি এখন দুর্ভাগ্যের জালে জড়িয়ে পড়েছেন? আচ্ছা, ইহুদীটির কাছে তিনি কত ধার করেছিলেন?

ম্লান মুখে বাসানিও জবাব দিলেন—তিন হাজার ডাক্যাট।

পোর্শিয়া মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে বললেন—তাই যদি হয়, ছয় হাজার ডাক্যাট নিয়ে বন্ধুকে মুক্ত ক'রে নাও। আমি ডাক্যাটের ব্যবস্থা করছি। চল আজই আমরা চার্চে যাই। তুমি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। তারপর কালই তুমি বন্ধুর উদ্ধারের জন্য যাত্রা কর। মানসিক অস্বস্তি নিয়ে আমার পাশে পাশে থেকে আমাদের আনন্দের চেয়ে নিরানন্দই বেশী হ'বে। আমার জন্য চিন্তার কারণ নেই। অনেক মূল্য দিয়ে তোমাকে পেয়েছি—আমার আন্তরিক ভালবাসা অম্লান থাকবে। তুমি চিঠিটি একবার পড়ে শোনাবে কি?

বাসানিও হাতের কাগজটির ভাঁজ খুলে উচ্চস্বরে পড়তে শুরু করলেন—প্রিয় বন্ধু বাসানিও, আমার সবকটি জাহাজই ধ্বংস হ'য়ে গেছে। উত্তমর্ণেরা অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়েছে। আজ আমার সম্বল খুবই সীমিত। ইহুদীর কাছে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ

তার দায় মিটিয়ে আমার বাঁচা অসম্ভব। মৃত্যুর আগে তোমাকে একবার স্বচক্ষে দেখতে পেলে তোমার ও আমার মধ্যের ঋণ শোধ হ'য়ে যাবে। আমার ভালবাসা যদি তোমাকে আমার কাছে টেনে না আনে তবে নিছক চিঠির খাতিরে আসবে না কিন্তু।"

চিঠি পড়া শেষ ক'রে বাসানিও পোর্শিয়ার দিকে ফিরে বললেন—প্রিয়তমে, তোমার অনুমতি যখন পেয়েছি, আমি যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা করতে ইচ্ছুক। তোমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত মন আমার অবাঞ্ছিত অস্বস্তিতে ভরে থাকবে।

পোর্শিয়া প্রিয়তম বাসানিও-র হাত দুটি আবেগভরে চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন—প্রিয়তম, তুমি বন্ধুর মুক্তির জন্য যাত্রা কর। তোমার পোর্শিয়া—তোমার প্রেয়সী তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত পথ চেয়ে বসে থাকবে।

আট

আর মাত্র একটি রাত্রি মাঝখানে রয়েছে তার পরেই অ্যান্টনিও-র বিচার হ'বে। হ্যাঁ ন্যায় বিচারই হ'বে। অ্যান্টনিও-র অনুরোধে শাইলক কর্ণপাত করেন নি। অলৌকিক কোন ঘটনা ব্যতীত তাঁর জীবনের কোন আশাই নেই। শাইলক কারাধ্যক্ষকে বললেন—যেন অ্যান্টনিও-র প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়, কোন দয়া ভিক্ষাই চলবে না। কারণ লোকটি দাম্ভিক আত্মঅহংকারী—বিনা সুদে টাকা ধার দিত। তাছাড়া কথায় কথায় আমাকে পথের কুকুর বলে গালমন্দ করেছে। যদি আমি কুকুরই হ'য়ে থাকি তবে আমার ধারালো দাঁত ও নখ সম্বন্ধে আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কোন অনুরোধ উপরোধই আমার মন গলাতে পারবে না।

অ্যান্টনিও শাইলককে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ প্রয়াস। তিনি কোন কথাই শুনতে রাজী নন—ডিউকের কাছে ন্যায়বিচার চান, শুধুমাত্র এই। তবে তা দলিলের শর্তানুসারে। চুক্তিভঙ্গের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই আমার কাম্য নয়।

অ্যান্টনিও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। তিনি ভালভাবেই জানেন আইন তার নিজস্ব পথ ধরেই চলবে। ডিউক নতুন কিছু করতে পারবেন না। অতএব অ্যান্টনিওর থেকে এক পাউন্ড মাংস—যা শাইলকের প্রাপ্য তা তাঁকে দিতেই হবে। তার ফল মৃত্যু। অ্যান্টনিও-র অন্তিম কামনা বাসানিও-র সঙ্গে শেষবারের মত সাক্ষাৎকার। তিনি স্বচক্ষে দেখুন যে তাঁর ঋণ শোধ করা হয়েছে।

বাসানিও এবং গ্রাসিয়ানো ভেনিসে রওনা হ'য়ে গেছেন। পোর্শিয়া একটি ব্যাপারে লরেঞ্জোর সাহায্য চাইলেন, তা হচ্ছে, যতদিন বাসানিও ফিরে না আসেন ততদিন তিনি নেরিসা'কে নিয়ে দু'মাইল দূরবর্তী মঠে সাধন-ভজনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাবেন। তাঁদের অবর্তমানে তিনি যেন বাড়ি-ঘর দেখাশুনা করেন। লরেঞ্জো ও জেসিকা পোর্শিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে আশ্বাস দিলেন।

পোর্শিয়া নিশ্চিন্ত হ'লেন। তিনি পরিচারক বালথাজার'কে ডেকে তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন—যত শীঘ্র পার পদুয়ায় গিয়ে আমার খুড়তুতো ভাই ডাক্তার বেলারিওকে এটি পেঁছে দাও। তিনি কোন কাপড়চোপড় ও কাগজপত্র দিলে সেগুলো নিয়ে সোজা ভেনিসে যাবার জাহাজ ঘাটে চলে যাবে।

বালথাজার রওনা হ'য়ে গেলে পোর্শিয়া পরিচারিকা নেরিসাকে তাঁর গোপন পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে জানালেন শীঘ্রই তাঁদের স্ব-স্ব স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'বে। পুরুষের ছদ্মবেশে তাঁরা ভেনিসে গিয়ে হাজির হ'বেন।

পুরুষবেশী পোর্শিয়া ও নেরিসা ভেনিসে পেঁছোলেন।

ভেনিসের বিচারালয়। অ্যান্টনিও-র বিচার শুরু হয়ে গেছে। ডিউক অ্যান্টনিও-র প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে গিয়ে বললেন, আপনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আপনাকে এমন একজন পাষাণ হৃদয়, মানুষ নামধারী জঘন্যতম জীবের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, যার মধ্যে মানবিক করুণার সামান্যতম ছোঁয়া পর্যন্ত নেই।

অ্যান্টনিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বললেন—ধর্মাবতার আপনি তাকে এই পৈশাচিক একগুঁয়েমি ও নিষ্ঠুরতার পথ থেকে ফেরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ। নরকের কীট ইহুদীটির একগুঁয়েমি ও প্রতিহিংসা থেকে আমাকে রক্ষা করার আইনসঙ্গত কোন পথই যখন নেই, আমি অবিচলিত চিত্তে তাঁর এই জঘন্যতম বর্বরতা সহ্য করতে প্রস্তুত। ডিউক শাইলকের দিকে চোখ তুলে তাকালে শাইলক নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করলেন,—ধর্মাবতার! আমার প্রার্থনা আমি তো আগেই জানিয়েছি। আমার দলিলে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ ছাড়া সম্ভব না। আপনি যদি আমার প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তবে বুঝবো আইনের অপমৃত্যু ঘটছে। আপনি যদি প্রশ্ন করেন, আমি শুধু বলবো অ্যান্টনিও-র প্রতি এক বদ্ধমূল ঘৃণা তীব্র বিতৃষ্ণাবশতঃই আমি এত ত্যাগ স্বীকার করেও এপথ বেছে নিয়েছি।

বাসানিও বিচারালয়ের এক পার্শ্বে বসেছিলেন। তিনি মুখ বিকৃত ক'রে বলে উঠলেন,—ও সহানুভূতিশূন্য অমানুষ, কারো প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলেই কি এমন নিষ্ঠুর-ভাবে তাকে হত্যা করে! তোমার তিন হাজার ডাক্যাটের পরিবর্তে এই নাও ছ'হাজার ডাক্যাট।

—শর্তানুযায়ী প্রাপ্যই আমার দাবী। ডাক্যাট নয়, অ্যান্টনিও-র এক পাউণ্ড মাংস।

ডিউক বললেন,—তুমি যদি অপরকে করুণা করতে না পার তবে, ঈশ্বরের প্রত্যাশা করবে কি করে?

শাইলক প্রতিবাদ করলেন—অন্যায় করিনি, তাই শাস্তির ভয় করি না। এটা তো সত্যি যে, এক পাউণ্ড মাংস উচ্চ মূল্যে কেনা, ওটা আমার সম্পত্তি আমাকে পেতেই হ'বে। আপনি বিধান দিন—আমি বিচারপ্রার্থী—আমার প্রাপ্য আমাকে কি দেবেন না?

ডিউক নিরুপায়। তিনি হতাশ সুরে ব্যক্ত করলেন। এই মামলা পরিচালনার

জন্য বেলারিও নামে এক অভিজ্ঞ আইনজীবীকেই ডেকে পাঠিয়েছি, তিনি না আসা পর্যন্ত মামলার কাজ স্থগিত থাকবে।

এমন সময় এক পত্রবাহক ডিউকের হাতে একটি পত্র দিয়ে বলল—ধর্মাবতার পদুয়ার আইনজীবীর কাছ থেকে এই পত্রবাহক এই পত্র নিয়ে এসেছেন। তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন।

ডিউকের নির্দেশে উকীলের মুহুরীর বেশে নেরিসা বিচারালয়ে প্রবেশ করে জানাল যে, সে পদুয়ার বেলারিও-র কাছ থেকে এসেছে।

এই অবসরে শাইলক তার প্রাপ্য এক পাউন্ড মাংস আদায় করার জন্য জুতোর তলায় ছুরি শান দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে অস্পষ্ট উচ্চারণ করছে—আমি চাই বিচার—ন্যায় বিচার।

ডিউক ব্যস্ত হ'য়ে চিঠিটি পাঠ করতে লাগলেন—আমি খুবই অসুস্থ, তাই সাধ থাকলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করার সাধ্য নেই। রোমের এক অভিজ্ঞ আইনজীবী —নাম তার বালথাজার। তাকে আমি ইহুদী শাইলক ও বণিক অ্যান্টনিও-র মামলা সম্বন্ধে বলেছি। দু'জনে অনেক পরামর্শ করেছি, অনেক বই ঘাটাঘাটি ক'রে একটা সিদ্ধান্তে পেঁছেছি। আমার মতামত বালথাজার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। এ বয়সে বাল-থাজারের মত গভীর জ্ঞান আমার নজরে পড়েনি—কার্যক্ষেত্রেও আশাকরি প্রমাণ পাবেন।

ডিউকের নির্দেশে আইনজীবী'র পোষাকে সজ্জিতা পোর্শিয়াকে ভেতরে নিয়ে আসা হ'ল।

পোর্শিয়া বিচার শুরু করতে গিয়ে শাইলক'কে লক্ষ্য ক'রে বললেন—মহাশয়, অস্বাভাবিক এক মামলা রুজু করেছেন আপনি। তবে আপনি চাইলে ভেনিসের আইন আপনার প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে একটি কথা কি জানেন ? ক্ষমা হচ্ছে এক মহৎ ধর্ম, যা কাউকে বাধ্য করানো যায় না। যে ক্ষমা করে ও ক্ষমা পায় উভয়েই উপকৃত হয় এই ক্ষমার দ্বারা, আর এ হচ্ছে শক্তিমানের সবচেয়ে বড় শক্তি। কাজেই ইহুদী শাইলক যদি ন্যায়-বিচারই আপনার কাম্য হয়, তবে ভেবে দেখুন। আক্ষরিক আইনের বলে আপনাদের মধ্যে কারো-ই মুক্তিলাভ হ'বে না।

—আমি ন্যায় বিচার চাই। ওরা আমাকে দ্বিগুণ তিনগুণ ডাক্যাট দিতে চাইছে। কিন্তু সমগ্র ভেনিসের পরিবর্তেও আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব না।

আইনজীবী-বেশী পোর্শিয়া অ্যান্টনিও-র দিকে ফিরে বললে, তাই যদি হয় তবে আপনি আপনার বক্ষদেশ উন্মুক্ত করুন। আর শাইলক আপনার খরচে ওর রক্তবন্ধ করার জন্য একজন অস্ত্রচিকিৎসক আনুন, অন্যথায় রক্তপাতে ও'র মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই বণিকের এক পাউন্ড মাংস আপনার প্রাপ্য, বিচার সভা তা মেনে নিচ্ছে। তবে ভাল করে চুক্তি পত্রটি আবার পড়ুন। চুক্তিপত্রের নির্দেশে একবিন্দু রক্তও আপনার প্রাপ্য নয়। কাজেই দেখবেন রক্তপাত যেন না হয়। আর একটি কথা, চুক্তি-পত্রে এক পাউন্ড

মাংসের উল্লেখ রয়েছে,—দেখবেন চুল পরিমাণ ওজনের মাংসও যেন বেশী কাটা না হয় —তবে আপনার মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী, আর আপনার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'বে।

শাইলক ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ফ্যাকাশে মুখে আইনজীবী-বেশী পোর্শিয়ার দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—কিন্তু আমার আসল টাকাটা পাব তো? মাংসের সাধ মিটে গেছে আমার।

—তাও আপনার নিজের বিপদকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'বে। কারণ আপনার বিরুদ্ধে একটি আইনগত অভিযোগ রয়েছে। ভেনিসের আইনে আছে যদি কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন নাগরিকের প্রাণনাশের চেষ্টা করে, তবে যার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করছে তাকে তার সম্পত্তির অর্ধেকটা দিয়ে দেওয়া হ'বে। অবশিষ্টাংশ যাবে রাজকোষে।

আর অপরাধীর জীবন? হ্যাঁ, অপরাধীর জীবন নির্ভর করবে মহামান্য ডিউকের ওপর। তিনি মার্জনা করলেই তাঁর জীবন রক্ষা সম্ভব। আর এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তির কাছে মার্জনা ভিক্ষা ক'রে জীবন রক্ষার জন্য আবেদন করলে তা গ্রাহ্য হ'বে না। আমি আপনাকে অভিযুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি শাইলক। সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা একটা জিনিস পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে যে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আপনি আপনার বিবাদী অ্যাণ্টনিও'র জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং আমার পূর্ববর্ণিত আইন অনুযায়ী আপনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন। অতএব আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, নতজানু হ'য়ে ডিউকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

গ্রাসিয়ানো, উৎসাহ প্রকাশ ক'রে এগিয়ে এসে শাইলক'কে লক্ষ্য ক'রে বললেন,— প্রার্থনা কর যাতে শীঘ্র নিজেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পার। তাছাড়া রাষ্ট্র তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে। কাজেই একগাছি দড়ি কেনার মত সামর্থও তোমার নেই, তাই রাষ্ট্রের খরচেই তোমার দুর্ভাগ্যের গলার হারটি কিনতে হবে।

ডিউক এতক্ষণ নীরবে বসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরে আবার মুখ খুললেন,—শাইলক, আমাদের অন্তঃকরণের পার্থক্য যাতে স্পষ্ট বুঝতে পার, একমাত্র একারণেই তুমি ক্ষমা চাইবার আগেই আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে ক্ষমা করলাম তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম। তবে তোমার সম্পত্তির অর্ধেকটা তোমার বিবাদী অ্যাণ্টনিও'র প্রাপ্য। আর বাকী অর্ধেকটা যাবে সাধারণ কোষাগারে। অবশ্য তুমি যদি তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও, তবে তোমার দণ্ড হ্রাস করা যেতে পারে। তোমার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে সামান্য জরিমানা ধার্য ক'রে শাস্তি লাঘব করা যেতে পারে। পোর্শিয়া বললেন—মহামান্য ডিউক ঠিক বলেছেন। তবে ঐ ব্যবস্থা কেবল-মাত্র রাষ্ট্রের অংশ সম্বন্ধেই নেওয়া সম্ভব, অ্যাণ্টনি-ও সম্পর্কে অবশ্যই নয়।

শাইলক রাগে-দুঃখে অপমানে কাঁদতে লাগল। সে ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে বলে উঠল,—চাই না, আমি কোন দয়ার প্রত্যাশী নই। আমার জীবন-ধন-মান যথা সর্বস্ব আপনি নিয়ে নিন। আর মিছে ক্ষমা ক'রে কি হ'বে? যে খুঁটির ওপর ভর

দিয়ে আমি এতদিন ছিলাম সেটাই যখন ছিনিয়ে নিলেন, তবে আর সামান্য দয়া প্রদর্শন ক'রে কি হ'বে? আমার বাড়িটাও নিয়ে নিন। জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথটুকু যখন বন্ধ করে দিতে পেরেছেন, তবে আর জীবনটারই বা কি মূল্য থাকল? আমার জীবনটাকে নিয়ে আমাকে মুক্ত করুন—আমাকে মরে বাঁচতে দিন।

পোর্শিয়া বললেন, অ্যান্টনিও আপনার কাছে আমার একটি জিজ্ঞাসা রয়েছে, ইহুদী শাইলক'কে আপনি কি ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। গ্রাসিয়ানো আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলে না, সে উল্লসিত হয়ে বক্রোক্তি করল,—বলুন শুধুমাত্র এক গাছি দড়ি যোগান দিয়ে, তার বেশী কিছু মোটেই নয়।

উকিলবেশী পোর্শিয়া বললেন,—ইহুদী শাইলক, সবই তো শুনলেন, এবার আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করুন! বলুন আপনি কি এ সব প্রস্তাবে রাজী আছেন?

শাইলক অনন্যোপায় হয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে বাধ্য হলেন, হ্যাঁ আমি সম্মত। মহামান্য ডিউকের আদেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

পোর্শিয়া এবার মুহুরীবেশী নেরিসাকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—মুহুরী, একটি দানপত্র লিখে ফেল।

শাইলক আদালতের সামনে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন,—আমি প্রার্থনা করছি, এবার আমাকে আদালত কক্ষ পরিত্যাগ করার অনুমতি দিন। আমি অসুস্থ বোধ করছি, এখানে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনারা দানপত্রের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। দানপত্র তৈরী হয়ে গেলে ওটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি স্বাক্ষর ক'রে দেব।

ডিউক হাসিমুখে শাইলকের দিকে গিয়ে বললেন,—শাইলক, তুমি এখন যেতে পার। তবে একটা কথা, পরে যেন আর ঝামেলা বাধিও না দানপত্রটা ভালোয় ভালোয় সই ক'রে দিও।

বাসানিও উকিলবেশী পোর্শিয়ার প্রস্তাবে চমকে উঠলেন। তাঁর স্ত্রীর দেওয়া এ আংটিটা তার ভালবাসা ও স্বামীত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রদত্ত উপহার। এ হেন আংটি তিনি কি করে অন্যের হাতে তুলে দেবেন। তাছাড়া তিনি যে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পোর্শিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বাসানিও-র কথার জবাব দিতে গিয়ে বললেন,—তবে থাক, আপনাকে দিতে হবে না। এ-আংটিটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে—তাই বলছিলাম। আপনার যখন অসুবিধা তবে আর আমার কিছু বলার নেই।

বাসানিও এবার তার আসল ঘটনা ফাঁস না ক'রে পারলেন না। বাধ্য হয়েই তিনি বললেন,—মাননীয় মহাশয়, এ আংটি আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছি। তিনি এ আংটি আমার হাতে পরিয়ে দেবার সময় আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, আমি কোন পরিস্থিতিতেই এটা বিক্রি করতে, কাউকে দিতে এবং হারাতে পারব না।

পোর্শিয়া এবার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য আনয়ন ক'রে রাগতভাবেই বললেন—দেখুন, নিজের উপঢৌকন পাওয়া জিনিস বাঁচাতে গিয়ে অনেকেই এরকম বলে থাকেন, আপনার ক্ষেত্রেও এটা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে একটা কথা, যদি আপনার স্ত্রীর মস্তিষ্কবিকৃতি না ঘটে থাকে, এবং তিনি যদি জানতে পারেন কি করে এবং কেন এ আংটি পাওয়ার হক আমি অর্জন করেছি, তবে আশা করি আমাকে এটা দেওয়ার জন্য তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে চিরকাল আপনার সঙ্গে শত্রুতাচারণ করবেন না। যাক, আপনার স্ত্রীর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের মধ্য দিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক। আমার প্রার্থনা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

পোর্শিয়া কথা বলতে বলতে তাঁর সহকারী মুহুরীবেশী নেরিসা-কে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

বাসানিও নিরুপায়। উপায়ান্তর না দেখে তিনি গ্রাসিয়ানোকে বললেন,—যাও, দৌড়ে আইনজীবী'কে ধ'রে এ আংটিটা ও'কে দাও। আর একটা কথা যদি পার ওকে একবারটি অ্যান্টনিও-র বাড়ি আসতে অনুরোধ করবে। যাও তাড়াতাড়ি দৌড়ে তাঁকে ধর।

বাসানিও-র নির্দেশে গ্রাসিয়ানো স্থান ত্যাগ করলে বাসানিও অ্যান্টনিও-কে বললেন,—বন্ধু, চল তুমি আর আমি সেখানে যাই। আমি বেশ কয়েকদিন বেলমণ্ট ছাড়া, কাল সকালেই আমি তোমাকে নিয়ে রওনা হ'ব। চল বন্ধু, এখন আর দেরী নয়—চল।

গ্রাসিয়ানো বাসানিও-র প্রদত্ত আংটিটি পোর্শিয়াকে দিতে গেলে এই সুযোগে পোর্শিয়ার মুহুরীবেশী সুযোগ্য স্ত্রী নেরিসা তার বুদ্ধির মাথায় হাত বুলিয়ে তার হাত থেকে আংটিটিও আদায় ক'রে নিল।

নয়

প্রলয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হ'ল। অ্যান্টনিও মুক্ত। আনন্দরসে সবাই মগ্ন। আংটি-কাহিনী এই আনন্দরসকে অধিকতর ঘন ক'রে তুলেছে। সবাই তৃপ্ত। কেবল শাইলকের মনে বিষাদের কালো ছায়া—মন তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনায় ভারাক্রান্ত।

পোর্শিয়া ও নেরিসা বিচার-পর্ব সমাপ্ত ক'রে চুপিচুপি বাড়ি ফিরে এসেছেন। ব্যাসানিও বন্ধু অ্যান্টনিও'র আতিথ্য গ্রহণ করে ভেনিসে অবস্থান করেছেন। বিবাহিতা স্ত্রী পোর্শিয়া-র জন্য মন তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় অস্থির চঞ্চল। তিনি আর অহেতুক কালবিলম্ব না ক'রে বন্ধু অ্যান্টনিওকে সঙ্গে নিয়ে বেলমণ্টে যাত্রা করলেন।

পোর্শিয়া বাড়ি ঢুকে দেখেন তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে। একটিমাত্র ছোট্ট মোমবাতি মোমদানিতে জ্বলছে। তিনি ঘরে ঢুকে নেরিসাকে বললেন,—নেরিসা দেখছ একটা ছোট্ট

মোমবাতি কতদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছে। এই কুটিল পৃথিবীতে একটা সৎ কাজ এমনি করেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নেরিসা বলল,—হ্যাঁ এটাই পৃথিবীর নিয়ম। যতক্ষণ চাঁদের আলো ছিল, মোমবাতির আলো ততক্ষণ ছিল ম্লান, আমাদের চোখেই পড়েনি। ভাবাবেগে আপ্লুতা পোর্শিয়া বললেন,—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এভাবেই মহত্তর গৌরব ক্ষুদ্রতর নিষ্প্রভ ক'রে দেয়। যখন রাজা উপস্থিত থাকেন না, তখন তার প্রতিনিধি রাজারই মত শোভা পান, তারপর রাজার উপস্থিতিতে তার গৌরব ম্লান হয়ে যায়, যে ভাবে ছোট্ট স্রোতস্বিনী সাগরের বুকে হারিয়ে যায়।

এমন সময় বাসানিও তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু অ্যাণ্টনিও এবং গ্রাসিয়ানোকে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন।

বাসানিও বললেন,—সূর্য অস্তমিত হলেও তোমরা যদি ঘুরে বেড়াও তবে পৃথিবীর অপর গোলার্ধের মত আমরাও দিনের আলোক দেখতে পারি।

পোর্শিয়া বললেন,—আমরা কেমন লাইট (আলো) দান করতে পারি, কিন্তু আমরা যেন 'লাইট' (হালকা) না হয়ে যাই। হাল্কা স্বভাবা স্বামীর পক্ষে অবশ্যই কাম্য নয়। তারা স্বামীকে বিষন্ন করে তোলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আমার জন্য বাসানিওর তা হবে না। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। প্রিয়তম, তোমাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

বাসানিও বললেন,—প্রিয়তমে তোমার প্রতিও আমার আন্তরিক ভালবাসা রইল, সে সঙ্গে জানিয়ে রাখছি সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ। আমার বন্ধু অ্যাণ্টনিও আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন। তুমি আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে তাঁকেও স্বাগত সম্ভাষণ জানাও। ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আমার দুঃসময়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা স্বরূপ নিজের জীবন বিপন্ন করেও আমাকে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হননি। আমার অভিন্ন হৃদয়-বন্ধু অ্যাণ্টনিও।

পোর্শিয়া অ্যাণ্টনিওকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন,—সঙ্গত কারণেই আমাদের উভয়েরই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তুমি ইতিপূর্বেও বহুবার বলেছ। তোমার জন্য ইনি অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছিলেন, জীবন বিপন্ন দেখেও তোমার প্রতি কোন অভিযোগ করেনি।

বাসানিও বললেন,—হ্যাঁ, আমার কাজের চেয়েও আমি তাঁর কাছ থেকে অনেকই পেয়েছি, দু'হাত ভরে পেয়েছি।

পোর্শিয়া সকৃতজ্ঞ স্বরে বললেন—মহাশয়, আমাদের বাড়ীতে আমি উভয়ের হ'য়ে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। শুধু কথার মধ্য দিয়েই নয়, ব্যবহারের মধ্য দিয়েও আমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চাই। আপনি আমাকে সুযোগ দিন। কাজেই মৌখিক শিষ্টাচারের এখানেই ইতি ক'রে আপনাকে আন্তরিক সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

এমন সময় ঘরের বাইরে গ্রাসিয়ানোর কণ্ঠ শোনা গেল। সে তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে বলছে—আমি অদূরস্থিত চাঁদের নামে শপথ ক'রে বলছি তুমি বৃথাই আমার প্রতি অবিচার করছ, অহেতুক কটাক্ষপাত করছ। বিশ্বাস কর আমি সেটা উকীলের

মহুরীকে দিয়েছি। এও বিশ্বাস কর, পরিস্থিতি আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে, না দিয়ে কোন উপায়ই ছিল না। প্রিয়তমে, তুমি কেন এমন গভীরভাবে ব্যাপারটাকে দেখছ? তোমার ব্যবহারে আমার এখন মনে হচ্ছে তার চেয়ে আংটির অধিকারীর মৃত্যু হ'লেই ভাল হ'ত।

পোর্শিয়া বারান্দায় তাদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাদের ক্ষান্ত করতে গিয়ে তিনি ধমকের সুরে বললেন—কী ব্যাপার! তোমরা কি শুরু করেছ। দু'জন এক জায়গায় হ'তে না হ'তেই এমনি ঝগড়া বাধিয়ে দিলে! কি ব্যাপার? হয়েছে কি?

গ্রাসিয়ানো পোর্শিয়া'কে কাছে পেয়ে যেন একটু বল পেল। সে অনুযোগের স্বরে বলল,—মাত্র এক টুকরো সোনার ব্যাপার নিয়েই এমন তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে পা দিতে না দিতেই কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। সে সামান্য একটা আংটি আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। দেয়ার সময় অবশ্য আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, যেন কোন অবস্থাতেই আমি আংটিটা হাতছাড়া না করি। স্বেচ্ছায় কাউকে দিলে বিক্রি করলে বা হারালে তার দ্বারা প্রমাণিত হবে আমি তাকে ভালবাসি না। আমার ভালবাসায় খাদ রয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র ছুরি বিক্রেতারা ছুরির গায়ে যেমন নীতিবাক্য খোদাই ক'রে দেয়, তেমনিভাবে আংটির গায়ে খোদাই ছিল "আমাকে ভালবেসো, আর ত্যাগ করো না আমাকে।"

গ্রাসিয়ানো অপরাধীর সুরে বলল,—খুবই বিপদে পড়ে ভেনিসে এক উকিলের মুহুরীকে দিতে বাধ্য হয়েছি।

নেরিসা রীতিমত রাগতস্বরে বললেন—তুমি পারলে? আমার ভালবাসার দান এত সহজে অন্যের হাতে তুলে দিতে? তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই, সব পার।

পোর্শিয়া তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন,—এটা তোমারই দোষ। তোমার স্ত্রী'র দেয়া প্রথম উপহার এ-ভাবে হেলায় হাত ছাড়া করলে!

অঙ্গীকার ক'রে তুমি ওটা আঙ্গুলে পরেছিলে। ওটা একনিষ্ঠতার স্মারকরূপে তোমার দেহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমিও আমার স্বামীকে তোমার মতই একটা আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমি সে সময় তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলাম যে, এটা তিনি কোন পরিস্থিতিতেই হাতছাড়া করবেন না। বিশ্বাস না হয়, এই তো তিনি তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তার হ'য়ে শপথ করে আমি বলতে পারি তিনি কখনও ওটা হাতছাড়া করেন নি। তিনি আমার হৃদয়েশ্বর, আমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী। পার্থিব কোন সম্পদ, এমন কি পৃথিবীর অধিকার লাভের বিনিময়েও তিনি কখনও আঙুল থেকে খুলতে পারেন না।

বাসানিও আপন মনে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলেন—এখন দেখছি, যদি আমি আমার বাঁ হাতটা দেখিয়ে বলতে পারতাম হাতটা রক্ষা করতে আংটিটা হারাতে হয়েছে!

—প্রিয়তমে, আমি যে অপরাধ করেছি সে সঙ্গে মিথ্যা বলে নতুন আর অপরাধ করতে চাই না—সম্ভবও নয়। কারণ আমার আঙুলে এখন কোন আংটিই নেই।

বাসানিও অপরাধীর মত হাত কচলাতে কচলাতে বলল—পোর্শিয়া, প্রিয়তমে, আমার অনুরোধ অন্ততঃ আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি যদি জানতে আংটিটা আমি কাকে দিয়েছি এবং কোন পরিস্থিতিতে তার হাতে তুলে দিয়েছি, তবে হয়তো তোমার ক্রোধ সম্বরণ ক'রে আমার উপর তোমার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে। আংটি ছাড়া অন্য কিছু যখন আইনজ্ঞ গ্রহণ করতে চাইলেন না—তখনই আমি অনন্যোপায় হয়ে তোমার ভালবাসার দান আংটিটা খুলে দিয়েছি। তুমি শান্ত হও, ধৈর্য ধরে আমার সেই অসহায় অবস্থার কথা একবারটি চিন্তা কর, তবে হয়ত তোমার অসন্তোষের মাত্রা কমবে। পোর্শিয়া বলল, দেখ তুমি যদি আংটিটার প্রকৃত গুণ বা আংটিটা যে দিয়েছে তার অর্ধেক দাম বা ওই আংটিটা হাতছাড়া করা সম্বন্ধে তোমারই দেয়া প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সামান্যতমও সচেতন হ'তে, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, তবে অবশ্যই তুমি এমন কাজ করতে না।

প্রেয়সী'র কথায় বাসানিও আঁৎকে উঠলেন। তিনি কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—প্রিয়তমে, এ তুমি কী বলছ? আমার দোহাই দিয়ে বলছি, আমার জীবনের নামে শপথ নিয়ে বলছি, কোন স্ত্রীলোক নয়, আইনজীবীই তোমার প্রদত্ত আংটিটা পেয়েছেন। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমার দেয়া হাজার ডাক্যাট তিনি প্রত্যাখান করলেন, বারবারই আংটিটা দাবী করতে লাগলেন। ওটা কিছুতেই আমি দিতে চাইনি, এবং তাকে অসন্তুষ্ট হ'য়ে চলে যেতে দিয়েছিলাম, যদিও আমার প্রিয়তম বন্ধুর জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিয়তমকে তুমিই বল, আমি কি বলতে পারি! কৃতজ্ঞতাবোধে বাধ্য হয়েই তাকে এটা পাঠিয়ে দিলাম, প্রত্যাখানের লজ্জা এবং সৌজন্যবোধে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমি আমার সম্মানকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা কলুষিত হ'তে দিতে চাইনি। প্রিয়ে, এ কাজ যদি আমার অন্যায় হ'য়ে থাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

পোর্শিয়া চোখে মুখে কৃত্রিম রাগের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল—ওই আইনজীবীকে কোন দিন আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দিও না। আমার প্রিয় আংটিটা যখন সে হাতিয়ে নিয়েছে, যেটি আমার প্রতীক রূপে রাখতে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলে, তখন আমার মনও হয়তো তোমার মত হয়ে উঠতে পারে, আমার যা কিছু আছে তাকে সমর্পণ করতে কুণ্ঠিত হ'ব না। তুমি এক রাত্রির জন্যও আমাকে ছেড়ে বাইরে থেকো না, শতচক্ষু অরিগণের মত আমাকে পাহারা দিও। যদি তা না কর, আমি যদি একা থাকি, তবে এখনও আমার নিজস্ব যা আছে, আমার দোহাই দিয়ে বলছি, ওই আইন-জীবীকে আমার শয্যাসঙ্গী করব।

নেরিসা অকস্মাৎ দু'পা এগিয়ে এসে বলে উঠল, আমিও। ওই মুহুরীকে আমিও আমার শয্যায় ডেকে নেব।

বিষাদক্লিষ্ট অ্যাণ্টনিও বললেন,—আমিই হচ্ছি এই কলহের দুঃখকর কারণ।

পোর্শিয়া নিজেকে সংযত করে স্বাভাবিক স্বরে বলল,—মহাশয়, আপনি দুঃখ করবেন না। এত কিছু সত্বেও আপনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

বাসানিও সবিনয়ে নিবেদন করলেন,—প্রিয়তমে পোর্শিয়া, অনন্যোপায় হ'য়ে, যে অন্যায় করেছি, আমি আমার বন্ধুদের সামনে বলছি, তোমার দোহাই, এমন কি যার মধ্যে আমি নিজেকে দেখতে পাই, সেই সুন্দর চোখ দু'টির দোহাই।

পোর্শিয়া বললেন,—আপনারা ও'র কথা শুনুন। আমার দু'চোখে উনি নিজেকে দু'রকম দেখেন, প্রতি চোখে একরকম, তোমার দু'মুখো ব্যক্তিত্বের নামে করা শপথ এবং তবু সেই শপথ বিশ্বাসযোগ্য।

বাসানিও প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেন;—তা মোটেই নয়! তুমি আমার কথা শোন। আমার কৃতকর্মের ত্রুটি ক্ষমা কর। আমার আত্মার নামে শপথ নিয়ে বলছি তোমার কাছে আর কোনদিন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না।

অ্যাণ্টনিও এবার বললেন,—একদিন বন্ধু বাসানিও'র মঙ্গলের জন্য আমার জীবন বন্ধক রেখেছিলাম। যিনি আপনার স্বামীর আংটি নিয়েছেন, সেই আইনজীবী না থাকলে এই জীবন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'য়ে যেত।

আমি আবারও শপথ করছি, আমার আত্মা থাকছে জামিন, আপনার স্বামী ভবিষ্যতে কোন দিনই উদ্দেশ্যমূলকভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। পোর্শিয়া এবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন যেন, তিনি অ্যাণ্টনিও'কে বললেন, তবে আপনি জামিন থাকছেন। জামার তলা থেকে একটা আংটি বের ক'রে অ্যাণ্টনিওর হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললেন, —এটা ওকে দিন, বলবেন আগেরটার চেয়েও বেশী সাবধানে রাখবেন যেন।

অ্যাণ্টনিও হাত বাড়িয়ে আংটিটা নিলেন। বন্ধু বাসানিওকে কাছে ডাকলেন। বাসানিও ব্যস্ত হ'য়ে কাছে যেতে তিনি তাঁর হাতে আংটিটা তুলে দিতে গিয়ে বললেন— এই যে বাসানিও, সবই তো শুনলে, আমি আবার তোমার হ'য়ে জামিন থাকতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার স্ত্রী তোমার কৃতকর্মের অপরাধ ভুলে গিয়ে তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমাকে আর একটা সুযোগ দেয়ার সদিচ্ছায়ই অন্য একটা আংটি তোমাকে দিচ্ছেন। আশা করি তুমি এই আংটিটা ঠিকমত রাখবে কোন পরিস্থিতিতেই হাতছাড়া করবে না।

বাসানিও অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধু অ্যাণ্টনিও এবং স্ত্রী পোর্শিয়াকে বললেন—প্রিয়তমে, এ কেমন হ'ল?

পোর্শিয়া ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ব্যাপারটা না বোঝার ভান ক'রে বললেন,—কেন? কি হয়েছে? বাসানিও আবারও বার কয়েক আংটিটাকে পরীক্ষা ক'রে নিঃসন্দেহ হয়ে বললেন,—এ আংটি তুমি কোথায় পেলে?

পোর্শিয়া স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলেন,—কেন? কি হয়েছে কি বলছ তুমি?

বাসানিও দৃঢ়স্বরে বক্তব্য পেশ করলেন,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা সেই আংটিটাই'

যেটা তুমি একদিন আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে। যে আংটি নিয়ে এত কিছু হয়ে গেল, ভগবানের দোহাই এই আংটিই সেই আংটি।

পোর্শিয়া সত্য গোপন ক'রে ব্যক্ত করলেন,—বাসানিও, তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবে? এই আংটিটা আমি আইনজীবির কাছ থেকেই পেয়েছি।

বাসানিও যেন স্বপ্ন দেখার মত চমকে উঠলেন। আইনজীবীর কাছ থেকে পেয়েছ? এটা কি করে সম্ভব হ'ল?

পোর্শিয়া বললেন কত দূরে অবস্থিত আইনজীবীকে আমি এ আংটিটা তুলে দিয়েছিলাম কিন্তু ওটা দেখছি তোমার হাতে। যদিও তুমি বলছ, তুমি এটা সেই আইনজীবীর কাছ থেকে পেয়েছ। তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু কৌতূহল হচ্ছে এই অল্প সময়ের মধ্যে এটা তোমার হাতে কি করে আসা সম্ভব হ'ল?

পোর্শিয়ার দেয়া আংটিটা নিয়ে যখন চমকপ্রদ ঘটনা সৃষ্টি করল সে সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে একটা আংটি গ্রাসিয়ানোর হাতে তুলে দিলে। গ্রাসিয়ানো বিস্ময় ভরা চোখে আংটিটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—নেরিসাও হাতের আংটিটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে ঠোঁটের কোণে দুষ্টামী ভরা হাসি হাসল।

গ্রাসিয়ানো কৌতূহল নিবৃত্তি করতে গিয়ে নেরিসাকে আবার প্রশ্ন করল—প্রিয়তমে আমাকে কৌতূহল মুক্ত কর। তুমি বল কি ক'রে এ সম্ভব হ'ল?

পোর্শিয়া চিঠিটা বাসানিও-র হাতে তুলে দিয়ে বললেন অবসর মতো পড়ো। এ-চিঠিতে জানতে পারবে আসল রহস্য কোথায়, জানতে পারবে তোমার পোর্শিয়াই ছিল আইনজীবী আর তার মুহুরী ছিল নেরিসা। লরেঞ্জো হচ্ছে আমাদের সব কাজের সাক্ষী। তোমরা ভেনিসে রওনা হ'বার একদিন পরেই আমরা রওনা হয়ে যাই। অ্যান্টনিও আপনার সুসংবাদ হচ্ছে আপনার পণ্য বোঝাই তিনটি জাহাজ অচিরেই অপ্রত্যাশিতভাবে বন্দরে নোঙর করবে।

অ্যান্টনিও নির্বাক নিস্পন্দভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। বাসানিও বললেন,—তুমিই সেই আইনজীবী। তোমাকে চিনতে পারলাম না।

পোর্শিয়া উপস্থিত সবার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাতে গিয়ে বললেন,—ভোর হ'য়ে আসছে, আপনার বিস্তৃত ঘটনা জানার জন্য ব্যাকুল। চলুন ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন, সেখানেই ঘটনাটা সন্তোষজনক বিবৃত দেবো।

গ্রাসিয়ানো উদ্বেলিত আনন্দোল্লাস ব্যক্ত করতে গিয়ে দু'হাত উর্দ্ধে উত্থিত করে বলে উঠলেন,—তবে তা-ই হোক। আমি উপস্থিত ভদ্রমহোদয়ের সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, যতদিন দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকবে ততদিন নেরিসার এই আংটিটি সযত্নে ধারণ ক'রে আমাদের প্রেমের অনির্বাণ জ্যোতি অক্ষুণ্ণ রাখবো।

এ মিড সামার নাইট ড্রীম

মহাকাব্য প্রণেতা ব্যাস, বাল্মীকি ও হোমারের পর শ্রেষ্ঠ কবিরূপে যাঁর নাম তিনি হলেন উইলিয়ম শেক্সপীয়র। শেক্সপীয়রকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা হয়। তিনি সাঁইত্রিশখানা নাটক, একশো সাতান্নখানা সনেট ও দুটো দীর্ঘ কবিতা লিখে গেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনাই পৃথিবীতে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর রচিত ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লিয়র, ওথেলো, এ্যান্টনিও ক্লিওপেট্রা, রোমিও ও জুলিয়েট, এ্যাজ ইউ লাইক ইট প্রভৃতি নাটকের কথা কে না জানে।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে শেক্সপীয়রের মত জনপ্রিয়তা আর কোন লেখক বা কবির ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু এটা বড়ই দুঃখের বিষয় যে মহাকবির জীবন সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানতে পারি। মহাকবির মৃত্যুর প্রায় দু'শো বছর পরে মেলোন তাঁর একখানি ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। অব্রে উড, অলিডিস প্রভৃতি বহু সুধী ব্যক্তির অদম্য প্রচেষ্টায় মহাকবির জীবনের কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সে জীবনী-গ্রন্থ। কিন্তু এসব তথ্য কতদূর সঠিক সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা অসম্ভব। মহাকবির জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন সুধী ব্যক্তি বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছেন। বেশীদিন আগের কথা নয়, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে, পৃথিবীতে একটা সাড়া জাগানো সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদটা এই নাট্যকার মার্লোই হলেন শেক্সপীয়র। একজন আততায়ীর হাতে মার্লো নিহত হন বলে যে খবরটা শোনা গিয়েছিল তা নাকি ভুল, মার্লো নিজেই নাকি তাঁর আত্মীয়কে হত্যা করে আইনের ভয়ে নিজেকে গোপন করেন। তিনি নিরুদ্দেশ নাটক ও কবিতা লিখতে থাকেন এবং সে রচনা পেট্রন ইংল্যাণ্ডের আর্লোকে পাঠান। আর্লো ঐ রচনাগুলো শেক্সপীয়রকে দেন তাঁর নামে প্রকাশ করতে। শেক্সপীয়র তাঁর নির্দেশমত নিজ নামে মার্লোর লেখা প্রকাশ করেন। মহাকবি সম্বন্ধে এ সংবাদ কতটা সত্য সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, মার্লো প্রতিভার চেয়ে শেক্সপীয়র প্রতিভা আরো বেশী সমুজ্জ্বল বিস্ময়কর!

উইলিয়ম শেক্সপীয়র ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৬ এপ্রিল ইংল্যাণ্ডের ওয়ারউইকে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জন শেক্সপীয়র। মায়ের নাম মেরী আর্ডেন। মেরী আর্ডেন ধনাঢ্য পিতামাতার সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখাপড়া শেখা হয়নি। যে বছর মহাকবির জন্ম হয় সে বছর দেশে দারুণ প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। মহামারী দেখা দেয়। জন শেক্সপীয়র আর্ত ও রোগাক্রান্ত মানুষের সেবার জন্য এগিয়ে আসেন এবং মুক্ত হস্তে তাদের সাহায্য করেন। কয়েক বছরের

মধ্যে জন খুব দরিদ্র হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি স্ত্রীর সম্পত্তি বন্ধক রেখে আর্থিক দুরবস্থা থেকে রক্ষা পান।

মহাকবি আর তাঁর চার ভাইবোনকে নিয়ে তখন স্টাটফোর্ডের অবৈতনিক গ্রামের স্কুলে ভর্তি হন। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় এবং ভাইদের মধ্যে প্রথম। স্কুল জীবনে মহাকবি ল্যাটিন গ্রামার ও প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তাঁর লেখাপড়ায় ছিল অদম্য উৎসাহ ও গভীর নিষ্ঠা। কিন্তু, কি গভীর দুঃখের বিষয়, যখন তাঁর মাত্র তের বছর বয়স তখন তাঁকে স্কুল ত্যাগ করতে হয় এবং জীবিকা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তাঁর জীবনিকার অব্রে বলেন, স্কুল ত্যাগ করে মহাকবিকে একজন মাংসওয়ালার অধীনে কাজ নিতে হয়েছিল।

মহাকবি উনিশ বছর বয়সে আন্ হাথাওয়ে নাম্নী একটি সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করেন। মহাকবির চেয়ে তাঁর পত্নী বয়সে সাত বছর বড় ছিলেন। বিয়ের পর ওঁদের দুটো মেয়ে ও একটা ছেলে হয়। মেয়েদের নাম সুশানা ও জুডিথেয় এবং ছেলেটির নাম হ্যামলেট। কিন্তু কবির সংসার জীবন খুব সুখের হয় না। জনশ্রুতি আছে, এ সময় স্যার টমাস লুসির বাগান থেকে হরিণ চুরি করার অপরাধে মহাকবির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। মামলার ভয়ে মহাকবি সংসার ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হন।

তেইশ বছর বয়সে মহাকবি লণ্ডনে আসবেন। তখন তাঁর হাতে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না। তাঁর এমন শিক্ষাও ছিল না যার দ্বারা তিনি ভদ্রভাবে বাঁচার মত অর্থ উপার্জন করতে পারেন। কেউ কেউ বলেন এসময় তিনি স্থানীয় একটি থিয়েটারে অশ্ব-রক্ষকের কাজ নিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি থিয়েটারের অভিনেতা হন। ছোট ছোট ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতেন। এরপর তাঁকে প্রখ্যাত নাট্যকারের পাণ্ডুলিপি কপি করার কাজ করতে দেওয়া হয়। এ কাজ তাঁর প্রতিভা বিকাশে খুব সহায়ক হয়। ক্রমে তিনি নিজেও নতুন নাটক লিখতে শুরু করেন। তাঁর নাটক থিয়েটারে অভিনীতও হল। সুখ্যাতি লাভ করলেন মহাকবি।

মহাকবি নিজের লেখা নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না। বরং এর বিরোধী ছিলেন। কাজেই তাঁর নাটক তখনো পুস্তকাকারে বেরোয় নি। ক্রমশঃ তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। এ সময় জন ডাণ্টার নামে জনৈক বিখ্যাত পাইরেট (পুস্তক ব্যবসায়ী) থিয়েটার হলে গোপনে স্টেনোগ্রাফার পাঠিয়ে মহাকবির অভিনীত নাটকের সংলাপ লিখিয়ে আনেন এবং সে সংলাপ পুস্তকাকারে ছাপিয়ে বাজারে বের করেন। এর ফলে ইংল্যাণ্ডবাসীর কাছে শেক্সপীয়র ব্যাপকভাবে পরিচিত ও সমাদৃত হন। বিখ্যাত ডাণ্টার এই মহৎ কাজটি করে পৃথিবীবাসীর কাছে অমর হন। মহাকবির কথা স্মরণ করলে তাঁর প্রকাশক ডাণ্টারও স্মরণীয় হয়ে ওঠেন।

দীর্ঘ সাতাশ বছর মহাকবি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে ষাট পাউণ্ড মূল্যে নিউ প্যালেস নামে একখানি সুন্দর অট্টালিকা ক্রয় করেন। ১৬১৩

খৃষ্টাব্দে গ্লোব থিয়েটার অগ্নিদগ্ধ হলে তিনি থিয়েটারের সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং নির্জন বাসে দিন কাটাতে থাকেন।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহাকবির মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহান্ন বছর।

মহাকবির মৃত্যুর পর তাঁর অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর মেয়ে শুশানা ও জামাই ডক্টর হল। ডক্টর হলের মৃত্যু হয় ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে এবং শুশানা মারা যান ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে!

[কাহিনীর নাম "এ মিড সামার-নাইট্‌স ড্রিম"...অর্থাৎ গ্রীষ্ম-নিশি স্বপ্ন। একটি রঙীন স্বপ্নের মধ্যে এ কাহিনী গড়ে উঠেছে। চব্বিশে জুনকে মিড সামার ডে বলা হয়। কিন্তু কাহিনীর সময়কাল দেখা যায় ঊনত্রিশে এপ্রিল। এ বিষয়ে সকলের মত এক নয়। যাই হোক, এ বিষয়ে আর না এগিয়ে আমরা স্বপ্নে ঘেরা রঙীন কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করি।]

মহাবীর থিসিউল এথেন্সের ডিউক। তিনি একাধারে কর্মবীর, অতুলনীয় যোদ্ধা, অপরদিকে জ্ঞানী, রুচিবান এবং এক আদর্শ প্রেমিক। প্রজাদের প্রতি তাঁর অপার সহানুভূতিশীলতা এবং সহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে।

দিন ভালই কাটছিল। সহসা দুরন্ত আমাজনরা এথেন্স আক্রমণ করে বসল। নারী প্রভুত্বের দেশ আমাজন। এখানে পুরুষ নারীর প্রভুত্ব মেনে চলে। আমাজনের রাণীর নাম হিপ্পোলিটা। তিনি খুব যুদ্ধপ্রিয়া ছিলেন। তিনি এথেন্স আক্রমণ করলে এথেন্সের ডিউক মহাবীর থিসিউস তাঁর সাথে প্রবল সংগ্রাম করলেন। এই যুদ্ধে আমাজনরা পরাজিত হল। রাণী হিপ্পোলিটা বন্দী হলেন। থিসিউস হিপ্পোলিটাকে রাজধানী এথেন্সে নিয়ে এলেন। স্থির করলেন আর চারদিন পর হিপ্পোলিটাকে তিনি বিয়ে করবেন। হিপ্পোলিটা ডিউকের এই ইচ্ছা মেনে নিলেন। এরপর নাটকের কাহিনী শুরু হয়।

ডিউকের প্রাসাদ। এপ্রিলের শেষ। রাতের বেলা। আকাশে চাঁদ ভাসছে। থিসিউস বিয়ের স্বপ্নে বিভোর। তিনি সুন্দরী হিপ্পোলিটাকে বললেন, আমাদের বিয়ে হতে আর মাত্র চারদিন বাকী, তারপর পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দেবে।

হিপ্পোলিটা থিসিউলের অধৈর্য ভাব লক্ষ্য করে বললেন, চারটে দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। চারটে রাত সুন্দর স্বপ্ন দেখে কেটে যাবে। তারপর রুপোর ধনুকের মত নতুন জ্বলজ্বলে চাঁদের উদয় হবে।

থিসিউস তাঁর প্রমোদের সংগী ফিলেস্ট্রেটকে বললেন, তাঁর বিয়ে উপলক্ষে একটা বড় আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করতে। ফিলেস্ট্রেট নির্দেশ নিয়ে চলে গেল।

ডিউক হিপ্পোলিটাকে বললেন, আমি তোমাকে যুদ্ধে জয় করে এনেছি। তার আগে তোমাকে অনেক আঘাত করেছি। এখন যুদ্ধের মেঘ কেটে গেছে, তোমার ও আমার

মধ্যে সম্পর্ক এখন মধুর। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চলেছি। অনেক শোভাযাত্রা, নৃত্য-গীত ও বাদ্যের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।

কথায় বাধা পড়ল। ইজিয়াস, হার্মিয়া লাইসাণ্ডার এবং ডেমিট্রিয়াস এসে উপস্থিত হয়েছে। ইজিয়াস হার্মিয়ার বাবা। হার্মিয়া বেঁটে, এক শ্যামাংগী যুবতী। ধারালো প্রকৃতির মেয়ে সে। লাইসাণ্ডার ও ডেমিট্রিয়াস দুষ্ট প্রেমিক যুবক। ওরা উভয়েই হার্মিয়াকে পেতে চায়। লাইসাণ্ডার ভদ্র ও খোলা মনের ছেলে, ওর তুলনায় ডেমিট্রিয়াস একটু কর্কশ ও উগ্র প্রকৃতির। থিসিউস ওদের দিকে বিস্ময়ে তাকালেন। ইজিয়াস তাঁকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালেন।

—কি খবর ইজিয়াস? থিসিউস বললেন।

ইজিয়াসের মধ্যে উত্তেজনা দেখা গেল। সে বলল, আমি খুব অশান্তিতে পড়েছি প্রভু। অশান্তি আমার কন্যা হার্মিয়াকে নিয়ে। আমি স্থির করেছি ডেমিট্রিয়াসের সাথে ওর বিয়ে দেব। কিন্তু লাইসাণ্ডার নানারকম ছলাকলা করে আমার মেয়ের মন জয় করেছে। সে আমার মেয়েকে কত কবিতা, কত রকম উপহার দিয়েছে কি বলবো। চাঁদনী রাতে হার্মিয়ার ঘরের নিচে দাঁড়িয়ে কতদিন সে তাকে প্রেমের গান শুনিয়েছে। একটা অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ের মন জয় করতে এর চেয়ে বেশী কিছু দরকার হয় না। আমি বলছি লাইসাণ্ডার ছল-চাতুরী করেই হার্মিয়ার প্রেম চুরি করেছে এবং তাকে করে তুলেছে আমার প্রতি অবাধ্য। প্রভু, আমার মেয়ে হার্মিয়া যদি আপনার সামনে ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে সম্মত না হয়, তাহলে আমি এদেশের আইন অনুযায়ী ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। অর্থাৎ ও যদি আমার কথায় সম্মত না হয় তবে আপনার কাছে আমি ওর প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করব।

থিসিউস চমকে ওঠেন। তিনি হার্মিয়াকে জিজ্ঞেস করেন, হার্মিয়া তুমি কি বলছ? আমি মনে করি তোমার পিতার কথা তোমার শোনা উচিত। তোমার দেহ, রূপ সবই তোমার পিতার দান। তিনি তোমাকে রক্ষাও করতে পারেন ধ্বংসও করতে পারেন। তাই নয়? আমি মনে করি ডেমিট্রিয়াস নিঃসন্দেহে এক যোগ্য পাত্র।

—কিন্তু লাইসাণ্ডারও যোগ্য পাত্র। হার্মিয়ার ধারালো উত্তর।

—মানুষ হিসেবে সে যোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে সে তোমার পিতার সম্মতি পায়নি। কাজেই ডেমিট্রিয়াসই তোমার বিয়ের যোগ্য পাত্র।

—আমি যেভাবে আমার পাত্রকে দেখেছি, আমার বাবা সেভাবে দেখছেন না।

—তুমিও তোমার পিতার দৃষ্টি নিয়ে তোমার পাত্র দেখছ না।

—প্রভু, আমি নারী। আপনার সামনে আমার গভীর প্রেমের কথা ব্যক্ত করতে পারছি না।—যদি আমি ডেমিট্রিয়াসকে বিয়ে করতে সম্মত না হই তাহলে আমার কি শাস্তি হবে তা কি জানতে পারি?

—এথেন্সের নিয়ম অনুসারে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে—নয়তো তোমাকে চিরকুমারী হয়ে মঠে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন-যাপন করতে হবে। অতএব ভাল করে

ভেবে দেখ তুমি কি করবে।

—আমি স্থির করেছি, প্রভু, আমি চিরকুমারী থাকব, তবু যাকে আমি চাইনে তাকে বিয়ে করতে পারব না।

থিসিউস ভুরু কুঁচকে হার্মিয়ার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, তুমি এ বিষয়ে আরো ভাব। আমার ও হিপ্পোলিটার বিয়ের দিনে তুমি তোমার সংকল্পের কথা জানাবে। সেদিন হয় তুমি পিতার বাধ্য হবে, অথবা মৃত্যুবরণ করবে।

ডেমিট্রিয়াস হার্মিয়াকে বলল, প্রিয়া হার্মিয়া, তুমি তোমার পিতার অবাধ্য হয়ো না। লাইসান্ডার, তোমাকেও বলছি তুমিও অন্যায় আবদার করো না। যাতে কেবল আমারই অধিকার তা আমাকেই পেতে দাও।

লাইসান্ডার ডেমিট্রিয়াসকে বলল, তুমি হার্মিয়ার পিতার ভালবাসা অর্জন করেছ, হার্মিয়ার নয়, অতএব হার্মিয়ার ভালবাসা আমাকে পেতে দাও। ইচ্ছে হলে তুমি তার পিতাকে বিয়ে করতে পার।

ইজিয়াস রেগে লাল হয়ে গেল। সে চীৎকার করে বলল, খবরদার লাইসান্ডার, মুখ সামলে কথা বল। আমি ডেমিট্রিয়াসকে ভালবাসি একথা সত্য এবং সে কারণেই আমি আমার মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিতে চাই।

লাইসান্ডার থিসিউসের দিকে ঘুরে সবিনয়ে বলল, প্রভু, ডেমিট্রিয়াসের মত আমিও সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের ছেলে। হার্মিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা ওর চেয়ে বেশী গভীর এবং সবচেয়ে বড় কথা হার্মিয়া আমাকেই ভালবাসে। তাহলে আমি কেন হার্মিয়াকে বিয়ে করতে পারব না! আর একটা ব্যাপার এই, ডেমিট্রিয়াস নেদারের কন্যা হেলেনাকে ভালবেসেছিল এবং হেলেনাও ওর প্রেমে উন্মাদিনী প্রায়। অথচ ও এমন হৃদয়হীন ও বিশ্বাসঘাতক যে হেলেনার দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

থিসিউস বললেন, এরকম কথা আমারও কানে এসেছে। আমি চেয়েছিলাম ডেমেট্রিয়াসকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু নানারকম কাজের চাপে তা হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, ডেমিট্রিয়াস ও ইজিয়াস তোমরা দুজনেই আমার সাথে চল। আমি তোমাদের কিছু পরামর্শ দেব।

থিসিউস হিপ্পোলিটা, ডেমিট্রিয়াস ও ইজিয়াসকে নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন।

লাইসান্ডার হার্মিয়াকে বলল, তোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

হার্মিয়া সখেদে বলল, আমার কান্না পাচ্ছে।

—ভেব না। শোন, আমি একটা কথা চিন্তা করেছি। আমার এক ধনী কাকীমা আছেন। তিনি বিধবা। নিঃসন্তান। এথেন্স থেকে সাত মাইল দূরে তাঁর বাড়ি। তিনি আমাকে তাঁর ছেলের মত ভালবাসেন। আমি যদি ওখানে থেকে তোমাকে বিয়ে করি তবে এথেন্সের আইন আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যদি তুমি সত্যই আমায় ভালবাস তবে তুমি আগামীকাল রাতে তোমার বাবার ঘর ত্যাগ করবে আমার সাথে এসে দেখা করবে। আমি তোমার জন্য বনের ধারে অপেক্ষা করব।

ওরা উভয়ে জানে এই বন এথেন্স থেকে এক মাইল দূরে। এই বনেই লাইসাণ্ডার একদিন হেলেনাকে সংগে নিয়ে হার্মিয়ার সাথে মিলিত হয়েছিল।

হার্মিয়া উচ্ছ্বাসভরে বলল, আমি তোমার কথামত কাজ করব। এ সময় অদূরে হেলেনাকে আসতে দেখা গেল।

একটু পরেই হেলেনা এসে উপস্থিত হল। হেলেনা যুবতী, ফর্সা, দীর্ঘাংগী। লাজুক এবং কোমল প্রকৃতির মেয়ে।

—এসো সুন্দরী হেলেনা, হার্মিয়া বলল।

—আমি সুন্দরী নই হার্মিয়া, হেলেনা সখেদে বলল। তোমার কথা তুলে নাও। ডেমিট্রিয়াস তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তোমার চোখ দুটি কি সুন্দর, যেন ধ্রুবতারা, তোমার কণ্ঠস্বর লার্ক পাখীর চেয়েও সুন্দর। আমাকে বলতো হার্মিয়া তোমার দৃষ্টিতে কি যাদু আছে যা দিয়ে তুমি ডেমিট্রিয়াসকে অতখানি আকর্ষণ করেছ?

হার্মিয়া বলল, আমি ওর দিকে বিরূপ দৃষ্টিতেই তাকাই, তবু ও আমাকে ভালবাসে।

—তোমার ঐ বিরূপ দৃষ্টি যদি আমার থাকত তবে আমি নিশ্চয়ই ওর ভালবাসা পেতাম।

—আমি তাকে সবসময়ই গালমন্দ করি তবু সে আমাকে ভালবাসে। দেখছি, আমি তাকে যতই ঘৃণা করি, সে আমাকে ততই ভালবাসে।

—আর আমি ওকে যতই ভালবাসি, সে আমায় ততই ঘৃণা করে।

—আমি তার নির্বুদ্ধিতার জন্য দায়ী নই, হেলেনা।

—ঠিক কথা তুমি তার জন্য দায়ী নও। কিন্তু তোমার রূপই এজন্য দায়ী। ইস্! আমার যদি তোমার মত রূপ থাকত!

—শান্ত হও। শোন, এখন থেকে সে আর আমায় দেখতে পাবে না। আমি ও লাইসাণ্ডার এখান থেকে পালিয়ে যাবার মতলব করেছি। লাইসাণ্ডারকে পাওয়ার আগে এথেন্স আমার কাছে স্বর্গ ছিল। এখন আমি দেখতে চাই, কি গুণ রয়েছে লাইসাণ্ডারের মধ্যে যা দিয়ে এই স্বর্গকে নরকে পরিণত করেছে।

লাইসাণ্ডার হেলেনাকে তার ও হার্মিয়ার সংকল্পের কথা জানাল। তারপর হার্মিয়াকে নিয়ে সে হেলেনার কাছ থেকে চলে গেল।

হেলেনা একা। সে আপন মনে বলল, এ জগতে একজনের চেয়ে আর একজন কত না সুখী। আমি ও হার্মিয়া দুজনেই সুন্দরী। কিন্তু রূপে আমার কোন লাভ হল না। ডেমিট্রিয়াস আমার রূপে মুগ্ধ নয়। প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের চর্মচক্ষু দিয়ে একে অপরকে দেখে না, দেখে তাদের মনের রুচি ও বাসনা দিয়ে। সে কারণেই প্রেমের দেবতা অন্ধ। প্রেমিকদের মন বিচার করে ভালবাসে না। প্রেমের দেবতা এ কারণেই শিশুর মত চিত্রিত হয়েছে। কেননা প্রেম শিশুর মতই, সে শিশুর মতই নির্বাচনে ভুল করে এবং বারবার শপথ ভঙ্গ করে। উদাহরণ, ডেমিট্রিয়াস। হার্মিয়াকে দেখার আগে আমাকে কত ভালবাসত। আমার কাছে সে কত না শপথ করেছিল। কিন্তু যে

মুহূর্তে সে হার্মিয়ার প্রেমের উত্তাপ অনুভব করল, সে মুহূর্তে তার পূর্ব শপথ সব ভেসে গেল। হেলেনা স্থির করল সে গিয়ে ডেমিট্রিয়াসের কাছে হার্মিয়ার পালিয়ে যাওয়ার কথা বলবে। সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল?

কুইন্সের ঘরে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে। এখানে বটম, স্নাগ, ফ্লুট, স্নাউট এবং স্টারভেলিং এসে মিলিত হয়েছে। ওরা এথেন্সের সাধারণ শ্রমিক ও মজুর। কুইন্স একজন ছুতার মিস্ত্রী, বটম তাঁতী, স্নাগও ছুতার, ফ্লুট হপার চালায়, স্নাউট এক ঝালাইকার এবং স্টারভেলিং একজন দর্জি। ওরা ঠিক করছে ডিউকের বিবাহ অনুষ্ঠানে একটি নাটক অভিনয় করবে। ওদের নাটকের নাম 'পিরামুস ও থিসবীর করুণ মৃত্যু'। এ নাটক লিখেছে কুইন্স। সে-ই এ নাটক পরিচালনা করছে।

অভিনয়ের মহড়া হবে। ঠিক হচ্ছে কাকে কোন্ ভূমিকা দেওয়া হবে।

কুইন্স প্রত্যেক অভিনেতার নাম লিস্ট ধরে ডাকছে। প্রত্যেকে নিজেদের উপস্থিতি জানাল।

তাঁতী বটমকে প্রেমিক পিরামুসের ভূমিকা দেওয়া হল। পিরামুস প্রেমের জন্যে বীরের মত প্রাণ ত্যাগ করবে।

কিন্তু বটম এক মজার মানুষ। সে বলল, এই ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে প্রচুর কাঁদাকাটির দরকার হবে আমি এই ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে এমন ঝড়বৃষ্টির মত কান্না শুরু করব যে তা দেখে দর্শকদের চোখ ফেটে জল গড়াবে। তবে এ ধরনের ভূমিকার চেয়ে আমি দৈত্য-দানব বা কোনো শয়তানের অভিনয় করতেই বেশী ভালবাসি। ভয়ানক আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টি করতে আমি বজ্রের মত আওয়াজ ছাড়তে পারি এবং ভয়ানক ভয়ানক অংগভংগী করতে পারি। কিন্তু প্রেমিকের কেবল দীর্ঘশ্বাস আর কান্না।

ফ্লুটকে দেওয়া হয়েছে প্রেমিকা থিবসীর ভূমিকা। সে বলল, আমি মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করব না। আমার গালে দাড়ি গজিয়েছে।

কুইন্স বলল, তুমি মুখোস পরে নেবে।

বটম বলল, আমাকে নায়িকা থিবসীরের ভূমিকায় দাও। অভিনয়ের সময়ে আমি খুব নরম আর মিহি গলায় বলব—ও পিরামুস, আমার প্রিয়তম। তোমার প্রিয় থিসবীর এখানে।

কিন্তু কুইন্স বটমের প্রস্তাবে রাজী হল না। সে তাকে পিরামুসের অভিনয়ই করতে বলল।

দর্জি রবীন স্টারভেলিংকে দেওয়া হয়েছে থিসবীর মায়ের ভূমিকা, থমাস স্নাউটকে দেওয়া হয়েছে পিরামুসের পিতার ভূমিকা এবং কুইন্স নিজে নিয়েছে থিসবীর বাবার ভূমিকা। স্নাগ করবে সিংহের অভিনয়। তার কোন ডায়লগ নেই, সে শুধু যথাসময়ে গর্জন করবে।

বটম বলল, আমাকে সিংহের ভূমিকাটি দাও। আমি এমন গর্জন করব যে স্বয়ং

ডিউক আমাকে বারবার গর্জন করতে অনুরোধ না করে পারবেন না।

কুইন্স জানাল, না। তাতে বিপদ আছে। মহিলা দর্শকরা হয়তো নিদারুণ ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা যাবে। তখন সকলকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে। এমন কখনো হতে পারে না।

বটম পিরামুসের ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হল।

কুইন্স বলল, আমরা ডিউকের প্রাসাদের নিকট এক বনে গিয়ে মিলিত হবো। ওখানে আমরা নাটকের মহড়া দেব। শহরে মহড়া দিলে বহু লোক এসে জুটবে এবং আমাদের ব্যাঘাত ঘটাবে। অতএব বনই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত।

সকলে প্রস্তাবে রাজী হল এবং একে একে সকলে ওখান থেকে খুশী মনে বিদায় নিল।

রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী এক বন। কুইন্সের দল এখনও এ বনে এসে পৌঁছায়নি। পাক ও একটা পরীকে এসময় এখানে দেখা গেল।

পাক বলল, কেমন আছ পরী বোন? কোথায় চললে? পরী দুলতে দুলতে উত্তর দিল—

পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে
ঝোপ ঝাড় ও জঙ্গল হয়ে
ঝড় জল আর আগুন ছুঁয়ে,
দ্বিগুণ বেগে চাঁদের চেয়ে
বেড়াই ঘুরে বেড়াই ধেয়ে।
আমি পরীরাণির সেবা করি
সবুজ মাঠ শিশিরে ভরি—
হলুদ হলুদ ফুলের কুঁড়ি
ওরা মোদের রাণীর সহচরী—
ওদের বুকে প্রণয় মণি দোলে
তা দেখে প্রেমিকরা ওদের রূপে ভোলে।
শিশির বিন্দু মুক্তোর ফুল
ওদের কানে পরাবো দুল,
যাই গো যাই—দাও গো বিদায়
পরীরাণী আসবেন হেথায়।

পাক বলল, পরীরাজ ওবেরন আজ রাতে এখানে নাচগান ও পানের একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেছেন। অতএব তোমাদের রাণী যেন এখন এখানে না আসেন। তাঁকে এখানে দেখতে পেলেই তিনি ক্ষেপে যাবেন। এর কারণ তুমিও হয়তো জান। তোমাদের রাণী ভারতের রাজার কাছ থেকে একটি ছেলে চুরি করে এনে নিজের ভৃত্য করে রেখেছেন। কিন্তু রাজা ওবেরন চান ঐ ছেলেটিকে নিজের ভ্রমণের অনুচর করে

রাখতে। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া, রাগারাগি এবং ছাড়াছাড়ি।

একথা শুনে পরী এতক্ষণে পাককে চিনতে পারল। পাক পরীরাজ ওবেরনের বিশ্বস্ত অনুচর। সে সকলের ক্ষতি করে মজা পায়। গ্রামের সরল মেয়েদের ভয় দেখিয়ে সে আনন্দ পায়। দুধ থেকে সে মাখন চুরি করে। নিজেকে অদৃশ্য রেখে কখনো কখনো ময়দার কল চালায়। রাতের বেলা আঁধারে পথিকদের ভুল পথে পরিচালিত করে। যারা ওকে ভালবাসে, ও কেবল তাদেরই ভাল করে।

দুই বিপরীত পথ ধরে রাজা ওবেরন ও রাণী টিটানিয়া এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। দুইজনেই দুজনার দিকে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

ওবেরন টিটানিয়াকে বললেন, গর্বিতা টিটানিয়া, চাঁদের আলোতেও তোমাকে আমার অসহ্য মনে হচ্ছে।

টিটানিয়ার দ্রুত জবাব, তাই নাকি—হিংসুটে রাজা ওবেরন! আমি শপথ করছি তোমার সাথে কোন সংশ্রব রাখব না।

ওবেরন বললেন, আমি তোমার স্বামী নই।

—তাহলে আমিও তোমার স্ত্রী নই। আমি জানি তুমি কেন এখানে এসেছ। তুমি এসেছ আমাজানের রাণী হিপ্পোলিটার বিয়ে দেখতে। আর এই হিপ্পোলিটার প্রতি তুমি একদিন প্রেমাসক্ত ছিলে।

ওবেরন বিমূঢ় হল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, একথা বলতে তোমার লজ্জা হল না? তুমিও তো একদিন এথেন্সের রাজা থিসিউসের সাথে প্রেম করে বেড়িয়েছ। সে সব কি ভুলে গেলে?

—তুমি আমার উপর হিংসা করে এসব কথা বলা শুরু করেছ। যাক এখন প্রকৃতির মধ্যে যে নানারকম ওলটপালট ও দুর্যোগ শুরু হয়েছে এর কারণ কি জান? এর কারণ হলাম আমরা। আমাদের কলহ-বিবাদের ফলেই এইসব অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

—তাহলে এটা রুখতে চেষ্টা করো। তোমার ওপরই সেটা নির্ভর করছে। আমাদের মধ্যে অশান্তি থাকবে কেন? তুমি ঐ মানুষের ছেলেটাকে আমাকে দিয়ে দাও। তাহলেই সব অশান্তির অবসান হবে।

টিটানিয়া মাথা নেড়ে বলল, উহুঁ সেটা হচ্ছে না। সমস্ত পরী-রাজ্যের বিনিময়েও ছেলেটাকে আমি দেব না। ওকে টিটানিয়া বিশেষ কারণে চায়। ওর মায়ের সাথে ছিল টিটানিয়ার বোনের মত ভাব। ওরা দুজনে রাতে চাঁদের আলোয় বসে কত গল্প করত। কিন্তু একদিন সেই মহিলা বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল, তখন টিটানিয়া ঐ ছেলেটাকে নিয়ে আসে এবং মায়ের কথা স্মরণ করেই ওর দিকে বিশেষ যত্ন নেয়। ওবেরন বললেন, তুমি এখানে কতক্ষণ আছ টিটানিয়া?

—যতক্ষণে থিসিউসের বিয়ে না সম্পন্ন হয়। এই বলে টিটানিয়া পরীর দল নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন।

ওবেরন হাসলেন এবং মনে মনে ঠিক করলেন, টিটানিয়াকে খুব জব্দ করবেন।

—পাক, কোথায় তুমি?

পাক দ্রুত কাছে এসে বলল, এই যে প্রভু।

—শোন, তোমার সেই 'অলস-প্রণয়-ফুলের কথা মনে আছে তো? যে ফুলের উপর সহসা প্রেমের দেবতা কিউপিডের একটা তীর এসে পড়েছিল এবং এ কারণেই সে ফুলের নাম হয়েছে 'অসল-প্রণয়-ফুল'। এই ফুল তোমাকে আমি একদিন দেখিয়েছি। তুমি আমার জন্যে এই ফুল এখন নিয়ে আসবে। এই ফুলের রস যদি ঘুমন্ত কোন নারী বা পুরুষের চোখে দেওয়া যায় তাহলে সেই নারী বা পুরুষ ঘুম থেকে উঠে সামনে যাকে জীবন্ত দেখতে পাবে তারই সাথে প্রেমে পড়ে যাব। তুমি দ্রুত ছুটে গিয়ে সেই ফুল নিয়ে এস।

পাক মুহূর্তে অবশ্য হল।

ওবেরন ঠিক করেছেন টিটানিয়া ঘুমিয়ে পড়লে তিনি তার চোখে অলস-প্রণয়-ফুলের রস ঢেলে দেবেন। টিটানিয়া ঘুম থেকে উঠে বাঘ সিংহ ভালুক যাকে দেখতে পাবেন তারই প্রেমে পড়ে যাবেন। তাকে তখন ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা হবে। ছেলেটাকে পেলে ওবেরন অন্য একটি ফুলের রস টিটানিয়ার চোখে দিয়ে তাঁকে যাদুমুক্ত করবেন।

ডেমিট্রিয়াস এবং হেলেনাকে ওখানে আসতে দেখা গেল।

ওবেরন ওদের দেখে নিজেকে লুকালেন এবং আড়ালে থেকে ওদের কথা শুনতে লাগলেন।

ডেমিট্রিয়াস হেলেনার মুখে শুনেছে হার্মিয়া এই বনে পালিয়ে এসেছে। তাই সে হার্মিয়াকে খুঁজতে বনে এসে উপস্থিত হয়েছে। হেলেনাও ওর পিছু পিছু এসেছে। ডেমিট্রিয়াস হেলেনাকে ঝাঁঝিয়ে বলল, আমার পিছু পিছু এস না। আমি তোমাকে ভালবাসি না। লাইসান্ডার আর হার্মিয়া কোথায়? আমি লাইসাণ্ডারকে হত্যা করব আর হার্মিয়া তো আমাকে (ভাল না বেসে) আগেই হত্যা করে রেখেছে। হেলেনা, তুমি চলে যাও। আমার কথা না শুনে যদি আমার পিছু পিছু আস তাহলে এই মুহূর্তে আমি তোমার শ্লীলতা হানি করব। এই বলে ডেমিট্রিয়াস হেলেনাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু হেলেনা এ কথায় এতটুকু ভীত না হয়ে বলল—মন্দির, শহরে, প্রান্তরে সর্বত্রই তুমি আমার ক্ষতি করেছ। লজ্জা হওয়া উচিত তোমার। তোমার নির্মমতা সমস্ত নারীজাতির উপর কালিমা লেপন করেছে।

সুন্দরী হেলেনার জন্য ওবেরনের বড় মায়া হল। তিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। মনে মনে ঠিক করলেন নির্দয় ডেমিট্রিয়াসকে তিনি জব্দ করবেন। অলস-প্রেমের-ফুলের রস তিনি ওর চোখেও দেবেন।

এ সময় অলস-প্রেমের ফ্ল নিয়ে পাক এসে উপস্থিত হল।

ওবেরন পাকের কাছ থেকে ফ্ল নিলেন।

ক্রমশঃ রাত বাড়ছে, টিটানিয়া বনের মাঝে এক নদীর তীরে ঘ্মিয়ে পড়লেন। ওবেরন তাঁর চোখে অলস-প্রেমের-ফ্লের রস দেবেন। তিনি পাককে নির্দেশ দিলেন ডেমিট্রিয়াসের চোখে সে ফ্লের রস দিতে। পাককে বললেন, ঐ বদ ছেলেটাকে চিনতে তোমার অস্ুবিধে হবে না। ওর পরনে শহ্রে পোষাক। ওর পেছনে দেখবে একটি য্বতী মেয়ে ছ্টছে। ও যেন ঘ্ম থেকে উঠেই ঐ য্বতীর ম্খ দেখতে পায়।

পাক ঘাড় কাত করল। এমন মজার কাজে ওর খ্ব উৎসাহ দেখা দিল।

বনের অপর একটি অংশ। অদ্রে নদী। রাত গভীর। টিটানিয়া এখন ঘ্মিয়ে পড়বেন। তাঁর পরী-সহচারীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নাচতে ও গাইতে শ্র্ করেছে। ওদের গান শ্নতে শ্নতে টিটানিয়া ঘ্মিয়ে পড়বেন।

অনেকক্ষণ ধরে পরীরা ঘ্মপাড়ানি গান গেয়ে টিটানিয়াকে ঘ্ম পাড়াল। টিটানিয়া গভীর ঘ্মে আচ্ছন্ন হয়েছেন।

পরীরা সদলবলে নিজ নিজ কাজে গেল।

ওবেরন তখন অলস-প্রণয়-ফ্ল নিয়ে ধীরে ধীরে এসে রাণীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং ফ্ল থেকে রস বের করে টিটানিয়ার চোখে ঢেলে দিলেন। অস্ফ্টে বললেন, ঘ্ম থেকে উঠে তুমি যাকে দেখতে পাবে তাকেই তুমি ভালবেসে পাগল হবে। এই বলে তিনি দ্রুত ওখান থেকে প্রস্থান করলেন।

এরপর লাইসান্ডার ও হার্মিয়া অদ্রে এসে উপস্থিত হল। ওরা দ্জনেও বনে ঘ্রে ঘ্রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওরা এখন ঘ্ম্তে চায়।

হার্মিয়া হাই তুলে বলল, লাইসান্ডার, তুমি তোমার শোবার জন্যে একটা জায়গা দেখে নাও; আমি এই নদীর তীরে শ্য়ে পড়ছি।

লাইসান্ডার বলল, আমরা দ্জনে এক জায়গাতেই শ্তে পারি। আমাদের দ্জনের একই হৃদয়, একই শপথ, একই শয্যা।

—তা হোক। তুমি একটু দ্রে গিয়ে শোও, এত কাছে নয়।

—আমার সহজ কথাটা একটু ব্ঝতে চেষ্টা কর হার্মিয়া—

তোমার কথা বিশ্বাস করছি না তা নয়। কিন্তু বন্ধ্, প্রেমের মর্যাদা রক্ষার্থেই তোমার একটু দ্রে শোয়া উচিত। অবিবাহিত য্বক-য্বতীদের পাশাপাশি শোয়া রীতি নয়। তুমি একটু দ্রে গিয়েই শ্য়ে পড় লক্ষ্মীটি। আমার প্রতি তোমার প্রেম যেন চিরদিন অটুট থাকে।

লাইসান্ডার আর য্ক্তির অবতারণা করল না। ওরা পরস্পরে কিছ্টা দ্রত্ব বজায় রেখে শ্য়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যে ওদের চোখে গাঢ় ঘ্ম নেমে এল।

গভীর রাতের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। চুপি চুপি পাক এসে ওখানে উপস্থিত হল,

ওর হাতে প্রণয়-ফুলের রস। লাইসাণ্ডারকে দেখে সহজেই ডেমিট্রিয়াস বলে ভুল করল। লাইসাণ্ডারের পরনেও ছিল শহুরে পোষাক এবং ওর অদূরে শুয়ে আছে একটি যুবতী।

পাক মনে মনে বলল, মেয়েটা সত্যই ভাল, আর এই ছেলেটা সত্যই রসের হাঁড়ি। নইলে মেয়েটা পাশে শুয়ে নেই কেন?

পাক লাইসাণ্ডারের চোখে দু'ফোঁটা প্রণয়-ফুলের-রস ঢেলে দিল। অস্ফুটে বলল, এবার তুমি ঠিক জব্দ হবে খোকা। ঘুম থেকে উঠে তুমি যখন এই সুন্দরী যুবতীকে দেখবে তখনি তুমি ওর প্রেমে পড়বে। বেচারা মেয়েটা এবার থেকে আর হা-হুতোশ করে মরবে না।

কাজ সেরে পাক রাজা ওবেরনের কাছে চলে গেল।

পরক্ষণেই ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনা ছুটতে ছুটতে এখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

হেলেনা কাতরভাবে বলল, ডেমিট্রিয়াস একটু থাম—আমি আর তোমার সাথে ছুটে পারছি না।

ডেমিট্রিয়াস চীৎকার করে বলল. তুমি চলে যাও, আমার পিছু এসো না।

—তুমি কি আমাকে এই গভীর আঁধার রাতে এখানে ফেলে যাবে?

—হ্যাঁ, তুমি থাক এখানে। আমি চললাম।

ডেমিট্রিয়াস বেগে প্রস্থান করল। আঁধারে ওকে আর দেখা গেল না।

হেলেনা গভীরভাবে আর্তনাদ করে উঠল, চোখ ফেটে জল বেরোল। কান্না ভরা গলায় বলল, আমাকে দেখতে বোধহয় নিশ্চয়ই খুব কদর্য, পশুরাও আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে। ডেমিট্রিয়াস আমার উপর কিছু অন্যায় করেনি। আমি যেন সাক্ষাৎ এক দানবী। আয়নায় আমি নিজেকে এতদিন ভুল দেখেছি। আমি কখনোই হার্মিয়ার রূপের পাশে দাঁড়াতে পারি না।

সহসা সে নিদ্রিত লাইসাণ্ডারকে দেখে চমকে উঠল। ভাবল, ও কি বেঁচে আছে না মরে গেছে? বিস্মিতা হেলেনা লাইসাণ্ডারের নাম ধরে ডাকতে লাগল।

লাইসাণ্ডার ডাক শুনে জেগে উঠল। সে সম্মুখে দেখতে পেল সুন্দরী হেলেনাকে অমনি সে হেলেনার প্রেমে পড়ে গেল। প্রণয়-ফুলের রস তাকে প্রেমোন্মত্ত করে তুলল। সে হেলেনাকে বলতে লাগল, আমি তোমার জন্য সব কিছু করব হেলেনা। ডেমিট্রিয়াস কোথায়? তাকে আমি তরবারির আঘাতে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।

এমন অসম্ভব কথা শুনে হেলেনা তাজ্জব হয়ে গেল। এক মুহূর্ত সে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর সে বলল, এমন কথা বলবে না লাইসাণ্ডার, দোহাই তোমার। ডেমিট্রিয়াস তোমার প্রেমিকা হার্মিয়াকে ভালবাসে বটে, কিন্তু হার্মিয়া তো তোমাকেই ভালবাসে। অতএব শান্ত হও।

লাইসাণ্ডার অবাক হয়ে বলল, তুমি কি বলছ—আমি এখন হার্মিয়াকে ভালবাসি? মোটেই না। আমি তাকে এখন এটুকু ভালবাসি না। বরং আমার এখন এই ভেবে দুঃখ হচ্ছে, কেন আমি এতদিন ওর সাথে মিশে সময় নষ্ট করেছি। হার্মিয়াকে নয়,

আমি তোমাকেই ভালবাসি হেলেনা।

হায়, এ কি হল, হেলেনা আর্তনাদ করে উঠল, লাইসাণ্ডার আমায় তুমি বিদ্রূপ কর না। ডেমিট্রিয়াস কখনো আমার দিকে ভাল চোখে তাকায় নি। এটা তুমি জেনেও আমার প্রতি নির্মম আচরণ করছ। এস তুমি এখন, বিদায়। যাবার সময় শুনে যাও, আমি তোমাকে বেশ ভাল ছেলে বলেই মনে করতাম।...এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার, যখন কোন মেয়ে কোন ছেলের কাছে থেকে প্রত্যাখান পায়, তখন অপর কোন ছেলে তাকে বিদ্রূপ করে। হেলেনা চলে গেল।

লাইসাণ্ডার বুঝল হেলেনা হার্মিয়াকে দেখতে পায়নি। সে স্থির করল, হার্মিয়াকে আর সে কখনো ভালবাসবে না। এবার থেকে সে হেলেনাকে গভীরভাবে ভালবাসবে। বীর প্রেমিকের মত বিশ্বস্ত ভালবাসা।

লাইসাণ্ডার হার্মিয়াকে ফেলে রেখে হেলেনার খোঁজে চলে গেল।

একটু পরে হার্মিয়া ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল। সে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। উঠে লাইসাণ্ডারকে ডাকতে লাগল, লাইসাণ্ডার, তুমি কোথায়? আমায় রক্ষা কর। একটা সাপ আমার বুকের উপর দিয়ে হাঁটছে ওটাকে ফেলে দাও।

কিন্তু কোথায় লাইসাণ্ডার?

হার্মিয়া উঠে বসল। বলল, বাঃ বাঃ! কি দুঃস্বপ্নই না দেখেছি। এখানে কোথাও সাপ নেই তো। তারপর সে লাইসাণ্ডারকে কাতরভাবে ডাকল। কিন্তু লাইসাণ্ডারের কোন খোঁজ পেল না। অবশেষে ওকে খুঁজতে খুঁজতে ওখান থেকে অন্যদিকে চলে গেল।

পূর্বসংকল্পমত কুইন্সের অভিনেতা দল বনভূমির এক অংশে এসে হাজির হল। এ জায়গাটা নাটক-মহড়ার পক্ষে ওদের খুব পছন্দ।

কিছুদূরে টিটানিয়া ঘুমিয়ে রয়েছেন।

কুইন্সের দল কিন্তু তাঁকে দেখতে পেল না। ওরা নাটক-মহড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রথম কথা উঠল পিরামুসের আত্মহত্যা নিয়ে। বটম বলল, পিরামুস যদি নিজে তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করে তবে মেয়ে দর্শকরা ভীষণ কষ্ট পাবে। বটমের কথায় ঠিক হল, আগেই পিরামুসের মুখ থেকে বলে নেওয়া হবে পিরামুস মরছে না, কেননা আসলে সে বটম নামে এক তাঁতী।

এরপর কথা উঠল সিংহকে নিয়ে। জীবন্ত সিংহ যদি মঞ্চে আসে তবে মেয়েরা খুবই ভয় পাবে। অতএব ঠিক হল, আগেই দর্শকদের জানানো হবে যে ওটা আসলে সিংহ নয়—ও হল সিংহের মুখোশ পরা একটা মানুষ।

এরপর কথা উঠল—মঞ্চে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে কি করে? অথচ পিরামুস ও থিসবীরের মিলনকালে চাঁদের আলো দরকার হবে।

বটম বলল, তখন ঘরের জানালা খুলে দেওয়া হবে। চাঁদের আলো এসে মঞ্চে পড়বে।

এরকম কয়েকটি প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ করে ওরা নাটকের মহড়া শুরু করল।

পিরামুসের অভিনয় প্রথমে? সে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াল।

এ সময় সকলের অলক্ষ্যে পাক সেখানে এসে উপস্থিত হল, অভিনেতাদের দেখে ও অবাক হল। অভিনয় দেখার লোভ সামলাতে পারল না ও। চুপ করেও ওখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কুইন্স বটমকে বলল,—বল পিরামুস: থিসবী এদিকে এস।

পিরামুস বলল: থিসবী, ফুলের যেমন সুগন্দ—

—সুগন্দ নয়, বল সুগন্ধ।

ফুলের যেমন সুগন্ধ তেমনি তোমার প্রশ্বাস। কিন্তু ওদিকে কিসের যেন গোলমাল শোনা যায়। একটুখানি অপেক্ষা কর প্রিয়ে, আমি একটু আসছি? পিরামুস কুইন্সের নির্দেশ নিয়ে স্থান ত্যাগ করে গেল।

পাক ভাবছে, অভিনয় ঠিক হচ্ছে না। বটমের এর চেয়ে ভাল অভিনয় করা উচিত এবং সে ব্যবস্থাই সে করবে।

পাক দ্রুত অদৃশ্য হল। একটু পরে তাকে দেখা গেল সাজঘরে বটমের কাছে। এক অদ্ভুত ক্ষমতাবলে সে বটমের মাথায় পরিয়ে দিল একটা গাধার মাথা! বটম এর কিছুই জানতে পারল না।

এদিকে থিসবীরূপী ফ্লুট উঠে দাঁড়িয়েছে। কুইন্স তাকে বলল, তুমি জান পিরামুস এক্ষুনি এসে পড়বে।

থিসবী অভিনয় করে বলল, সুন্দরকান্তি-পিরামুস। লিলি ফুলের শ্বেত রং এর গোলাপ ফুলের রক্তোজ্বল রং এই দু-রংয়ের সংমিশ্রনে তোমার দেহ সুন্দর। আমি তোমার সাথে নিনির কবরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করব।

কুইন্সকে বলতে শোনা যায়, নিনি নয়—নিনাসের কবরক্ষেত্র।

বটম যথাসময়ে মঞ্চে এসে প্রবেশ করল। তার পেছন পেছন পাক। বটমের মাথায় গাধার মাথা দেখে উপস্থিত সকলে হতভম্ব হয়ে গেল।

পিরামুস বলল, আমি যদি রূপবান হই, তবে আমার সব রূপেই তোমার।

কুইন্স ভয়ে চীৎকার করে উঠল, কী ভয়ংকর দৃশ্য! ভূতের মুখে পড়েছি আমরা। সবাই পালাও। রক্ষা কর ভগবান।

বটম ছাড়া অন্য অভিনেতারা সকলে ছুটে পালিয়ে গেল।

পাক সহর্ষে বলল, পালাবে কোথায় তোমরা? আমি তোমাদের পিছু ধাওয়া করব। মুহূর্তে মুহূর্তে আমি আমার রূপ পাল্টাবো। কখনো ঘোড়া, কখনো কুকুর কখনো ভালুক হবো এবং তোমাদের ছলনা করে ভয় দেখাব। পাক পলাতক অভি-

নেতাদের পেছনে ধাওয়া করলো।

বটম একা। সে বুঝে উঠতে পারছে না সকলে পালাল কেন? তবে কি ওকে ভয় দেখানই সবার উদ্দেশ্য? যদি তা হয়, তবে বটমও এখান থেকে পালাবে না এবং সে যে ভয় পায়নি তা বোঝাবার জন্যেই সে গলা ছেড়ে গান ধরল—

কোকিল তুমি হও না কৃষ্ণ কালো
তবু তোমার গলাটি বড় ভালো
ময়না পাখী গাহ গো গান
শোনাও তোমার মধুর তান।

বটমের গানে টিটানিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, আহা! যেন কোন দেবদূত আমায় মধুর গান শোনাতে এসেছে। আহা বড় মধুর গান!

বটম কর্কশ গলায় গেয়ে চলেছে—

চাতক কোকিল চড়াই পাখী গাইছে প্রেমের গান,
পুরুষ মানুষ সে গান শুনে মুখ ফিরিয়ে যান।

গান বন্ধ করে সে বলল, যাবে না কি করবে! সবাই যাবে—কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি কখনো কোন বোকা পাখীর গান শুনে সময় নষ্ট করে?

টিটানিয়া গাধা-মুখো বটমকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলেন। বললেন, ওহে সুন্দর পুরুষ! তুমি আবার গাও। তোমার গান শুনে আমার মন-প্রাণ বিগলিত হয়েছে। তোমাকে দেখে আমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি তোমার প্রেমে উতলা হয়ে পড়েছি।

বটম অবাক! নিজেকে সামলে সে বলল, এমন প্রেমে পড়ার তো কোন যুক্তি দেখি না। তবে একথা সত্য, প্রেমের সাথে যুক্তির আজকাল খুব একটা মিল দেখা যায় না।

—তুমি যেমন জ্ঞানী তেমন সুন্দর।

—এর একটা কথাও আমার নয়। তবে আমি যদি এ বন থেকে একবার বেরোতে পারতাম তবে আমি আমার বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারতাম।

এ বন ছেড়ে তুমি যেও না। পছন্দ কর আর না কর এ বনেই তুমি থাকবে। আমি সাধারণ রূপসী নয়। আমি পরীর রাণী টিটানিয়া, আমি তোমায় ভালবেসেছি। অতএব তুমি আমার কাছেই থাকবে। আমার অধীনস্থ পরীরা তোমার সেবা করবে। তারা সমুদ্র থেকে তোমাকে মুক্তো এনে দেবে এবং গান গেয়ে তোমাকে ফুলের বিছানায় ঘুম পাড়াবে। আমি মায়াবলে তোমার মানবদেহকে এমনভাবে রূপান্তরিত করব যাতে দ্রুতগামী বায়ু কিংবা আলোর মত, তুমি আমার সাথে চলাফেরা করতে পার।

টিটানিয়া, মটরফুল, প্রজাপতি, সর্ষেবীজ, মাকসার জাল প্রভৃতি তাঁর সহচরীদের ডাকলেন। সহচারীরা দ্রুত এসে উপস্থিত হ'ল। টিটানিয়া তাদের বললেন, আমার

প্রেমিকার সেবা করবে তোমরা। তাঁকে তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো। টিটানিয়া চলে গেলেন।

সহচরীরা বটমের সেবা করতে এগিয়ে এল। বটম চক্‌চকে চোখে ওদের দিকে তাকাল।

ওবেরন নদীর তীরে টিটানিয়াকে দেখতে এসেছেন। তিনি রাণীকে খুঁজছেন। কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। এমন সময় পাক এসে রাজার কাছে উপস্থিত হ'ল।

ওবেরন জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর পাক?

পাক বলল, প্রভু, আমাদের রাণী একটা দানবের প্রেমে পড়েছেন।

এরপর সে রাজার কাছে অভিনেতা বটমের সব কাহিনী ব্যক্ত করল।

রাণী টিটানিয়া শেষে গাধা-মাথা একটা মানুষের প্রেমে পড়েছেন শুনে ওবেরন খুব খুশী হলেন। টিটানিয়া এবার ভাল জব্দ হয়েছেন! ওঁর কাছ থেকে এখন মানুষের ছেলেটাকে বাগাতে ওবেরনের কোন অসুবিধে নেই।

ওবেরন এরপর জিজ্ঞেস করলেন, সেই বদ্‌মাশ ছেলেটার চোখে ফুলের রস দিয়েছ পাক?

—হ্যাঁ, প্রভু! সে ঘুমিয়ে পড়লে আমি তার চোখে ফুলের রস দিয়েছি। মেয়েটা ছিল ওর পায়ের কাছে শুয়ে, কাজেই ঘুম থেকে উঠে ও মেয়েটার মুখই দেখবে।

ওবেরন খুশী হলেন। কিন্তু ওর একটু পরে ডেমিট্রিয়াস ও হার্মিয়া এসে ওখানে উপস্থিত হল। ওদের দেখে পাকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল!

ওবেরন পাককে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। তিনি ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, এই সেই বদ্‌ ছোকরা।···

ডেমিট্রিয়াস হার্মিয়াকে বলল, আমাকে তুমি গালাগাল করছ কেন, আমি তো তোমার শত্রু নই?

হার্মিয়ার ধারণা ডেমিট্রিয়াস ঘুমন্ত লাইসাণ্ডারকে খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে, কেননা অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সে লাইসাণ্ডারকে খুঁজে পাচ্ছে না।

তাই সে কেঁদে কেঁদে বলল, তুমি ওকে খুন করেছ; এবার আমায় খুন কর।

লাইসাণ্ডার হেলেনার সাথে প্রেমে পড়েছে একথা ডেমিট্রিয়াস জানে না। কাজেই সে বলল, বিশ্বাস কর হার্মিয়া আমি ওকে খুন করি না। বরং আমাকেই তুমি হত্যা করেছ।

হার্মিয়া উত্তেজিত পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করল।

ডেমিট্রিয়াস ওর পিছু যাওয়া উচিত মনে করল না। সে শোকে দুঃখে কাতর হয়ে ঐখানেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

ওবেরন পাককে বলল, পাক, তুমি বড় ভুল করে ফেলেছ। তুমি ঐ নির্দয় ছেলেটার চোখে ফুলের রস না দিয়ে হয়তো অন্য কারো চোখে ফুলের রস দিয়েছ। কত বড় ভুল করেছ বল দেখি!

ওবেরন বললেন, যাও, এখনই দ্রুতগতিতে বনের মধ্যে যাও। ওখানে গিয়ে এথেন্সের হেলেনা নামে একটি যুবতীকে দেখতে পাবে। সে প্রেমশরে বিদ্ধ হয়ে করুণ বিলাপ করছে। তুমি তাকে মায়াবলে এখানে নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে আমি নিজে ঐ বদ ছোকরার চোখে প্রণয়-ফুলের রস দিচ্ছি। জেগে উঠে ও হেলেনাকে সম্মুখে পেয়ে ওর প্রেমে পড়বে। তীরের থেকেও দ্রুতবেগে পাক অদৃশ্য হল।

ওবেরন ঘুমন্ত ডেমিট্রিয়াসের কাছে এগিয়ে এলেন এবং ওর চোখে প্রণয়-ফুলের রস ঢেলে দিলেন।

আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে পাক ফিরে এল।

সে ওবেরনকে জানাল হেলেনা কাছেই রয়েছে। সে ভুল করে যে ছেলেটার চোখে ফুলের রস দিয়েছে সে ছেলেটা যুবতীর কাছেই রয়েছে এবং যুবতীকে প্রেম নিবেদন করছে।

এ সময় দেখা গেল সেই ছেলেটা ও মেয়েটা এদিকেই আসছে। ওরা আর কেউ নয়—লাইসাণ্ডার ও হেলেনা।

পাক ভাবল, এবার দুই প্রেমিক একটি মেয়েকে কাড়াকাড়ি করবে। বেশ মজা হবে।

লাইসাণ্ডারের উপর প্রণয়-ফুলের কাজ চলছে। লাইসাণ্ডার হার্মিয়াকে ভুলে হেলেনার পিছু পিছু এসেছে। হেলেনার প্রণয়ী হ'ল ডেমিট্রিয়াস। অতএব সে লাইসাণ্ডারের প্রেমে পড়তে রাজী নয়। তাই সে লাইসাণ্ডারকে ভদ্রভাবে তার পিছু ছাড়তে অনুরোধ করে। এমন সময় ডেমিট্রিয়াসের ঘুম ভেঙে যায়। সে জেগে ওঠে সম্মুখে হেলেনাকে প্রথম দেখতে পেল এবং তখনি হেলেনার প্রেমে পড়ে গেল।

হেলেনাকে সম্বোধন করে বলল দেবী, তোমার রূপ গুণের তুলনা নেই। তোমার চোখের সৌন্দর্যে এক অপার বিস্ময়। ঐ উজ্জ্বল চোখের পাশে স্ফটিককেও কালো মনে হবে। তোমার রক্তলাল অধরে প্রলোভনের হাতছানি। তোমার হাত তুষারের চেয়েও ধবল। ঐ হাত আমায় চুম্বন করতে দাও।

ঘৃণায় হেলেনার চোখ কুঁচকে গেল। যাবেই তো। আদর্শ প্রেমিকা পরপুরুষের প্রেম গ্রহণ করবে কেন? আবার এ কথাও হেলেনার মনে হ'ল লাইসাণ্ডার তাকে বিদ্রুপ করছে। লাইসাণ্ডার কখনই তার প্রেমিক ছিল না। সে হার্মিয়ার প্রেমিক। অতএব তার হেলেনার কাছে প্রেমের নিবেদন যেন নির্মম উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। একথা ভেবে কোমল হৃদয়া হেলেনার চোখে জল এসে গেল। সে চোখ মুছতে লাগল।

লাইসাণ্ডার ডেমিট্রিয়াসকে বলল, তুমি হার্মিয়াকে ভালবাস, আমিও ওকে ভালবাসতাম। কিন্তু এখন আমি হার্মিয়ার দাবী ত্যাগ করেছি এবং ওর বদলে হেলেনাকে চাইছি।

উত্তরে ডেমিট্রিয়াস বলল, না, তুমি হার্মিয়াকেই নাও—ওকে আমার দরকার নেই। ওকে আমি একদিন খুব ভালবাসতাম বটে, কিন্তু এখন সে ভালবাসার এতটুকু চিহ্ন

আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

সহসা ওখানে হার্মিয়া এসে উপস্থিত হ'ল।

সে বরাবর লাইসাণ্ডারকেই ভালবাসে। তাই সে তাকে বলল, প্রিয় লাইসাণ্ডার, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে? ভাগ্যিস তোমার গলা শুনে আমি এখানে এসেছি।

—আমার প্রেমই তোমার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে এনেছে। লাইসাণ্ডার বলল।

—কোন প্রেমই লাইসাণ্ডারকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারে না। হার্মিয়া বলল।

—পারে, যেহেতু আমি হেলেনাকে ভালবাসি এবং তোমাকে ঘৃণা করি। তোমাকে না ছাড়লে আমি হেলেনাকে পাব না।

—তুমি কি রসিকতা করছ নাকি? আমাকে তুমি কখনোই ছাড়তে পার না।

হেলেনার কাছে ব্যাপারটা এবার যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও যেন একটা ষড়যন্ত্রের মুখ দেখতে পেয়েছে। ওর মনে হল হার্মিয়া, লাইসাণ্ডার ও ডেমিট্রিয়াস তিনজনে এক হয়ে ওকে ঠকাবার জন্য এক জঘন্য মতলব এঁটেছে। তাছাড়া আর ভাবা যায় না। হেলেনার সবচেয়ে বেশী রাগ হলো হার্মিয়ার উপর। হার্মিয়া তার বাল্যকালের সখী। একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখছে, একই আসনে বসে গান গেয়েছে একই বৃন্তের দুটো ফুলের মত ওরা ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে কথা ভুলে গেছে হার্মিয়া। ও হেলেনাকে দুঃখ দেবার জন্যেই এই নিষ্ঠুর তামাসায় মেতে উঠেছে। এ কথাগুলো হেলেনা হার্মিয়াকে খুব জোরের সঙ্গে শুনিয়ে দিল।

হার্মিয়া প্রত্যুত্তরে বলল, আমি তোমার সাথে তামাসা করছি না, বরং তুমিই আমার সাথে তামাসা করছ।

হেলেনা উত্তেজিতভাবে বলল, তুমি কি লাইসাণ্ডারকে আমার পিছু নিতে বলনি? তাকে আমার রূপের প্রশংসা করতে বলিনি আমি। লাইসাণ্ডার তোমার প্রেমিক। তোমার অনুমতি ছাড়া সেকি আমাকে প্রেম নিবেদন করতে পারে?

—আমি বুঝতে পারছি না, তোমার কথা।

—বুঝতে পারছ বৈকি। শুধু এখন না বোঝার ভান করছ। তোমার মধ্যে যদি এতটুকু দয়ামায়া থাকত তাহলে তুমি এমন নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠতে না। আমার এখন মরণ অথবা এই স্থান ত্যাগ করা ছাড়া গতি নাই।

হেলেনা যাবার জন্যে পা বাড়াল। লাইসাণ্ডার হেলেনার গতিরোধ করল। বলল, আমাকে ছেড়ে যেওনা হেলেনা। লক্ষ্মী সোনা আমার।

হেলেনা ব্যথার হাসি হেসে বলল, বাঃ বেশ হচ্ছে।

হার্মিয়া লাইসাণ্ডারকে বলল, প্রিয়তম ওর সঙ্গে অমন রসিকতা কর না।

রেগে গিয়ে ডেমিট্রিয়াস লাইসাণ্ডারকে বলল, তুমি যদি হার্মিয়ার অনুরোধ না রাখ, তবে আমি তোমার উপর বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।

—আমি তোমার ভীতিপ্রদর্শনে এতটুকু শঙ্কিত নই। আমাকে বলতেই হবে হেলেনাকে আমি ভালবাসি।

ডেমিট্রিয়াস বলল, আমি তোমার চেয়ে হেলেনাকে অনেক বেশী ভালবাসি।

লাইসাণ্ডার ক্ষেপে গিয়ে বলল, তাহলে চলে এসো—লড়াইয়ে প্রমাণ হোক কার কথা সত্য।

ডেমিট্রিয়াস লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল।

হার্মিয়া শঙ্কিত হয়ে তার প্রেমিক লাইসাণ্ডারকে লড়াই করতে নিষেধ করল।

লাইসাণ্ডার হুমকি দিয়ে ওকে বলল, দূর-হ কালামুখী।

হার্মিয়ার আক্কেল গুড়ুম। ওর সুন্দর মুখখানা মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। রাগ পড়ল গিয়ে হেলেনার উপর। তাই বলল, হেলেনা তুই কোন একটা কীট, আমার প্রেমিকের হৃদয় থেকে প্রেম চুরি করে নিয়েছিস।

হেলেনাও রেগে উত্তর দিল, তোর কথা শুনে আমার কঠিন উত্তর দিতে ইচ্ছে করল। ধিক্ তোকে। তুই একটা পুতুল। হ্যাঁ, তাই।

—কি বললি। আমি পুতুল? কেন, আমি বেঁটে বলে? আর তুই লম্বা, তাই? কিন্তু একথা জেনে রাখ, আমি এমন বেঁটে নই যে তোর চোখ আমি আমার নখ দিয়ে খামচাতে পারব না।

হেলেনা রাগী হার্মিয়াকে ভাল করেই চেনে। তাই সে হার্মিয়ার সাথে বিবাদ করতে চায় না। সে শান্তভাবে বলল, আমি এখান থেকে এথেন্সে চলে যাচ্ছি হার্মিয়া। তোমরা কেউ আমার সাথে এসো না।

—যাও না। কে তোমায় না করেছে।

—আমি গেলেও আমার হৃদয় পড়ে থাকবে ডেমিট্রিয়াসের কাছে।

লাইসাণ্ডার হেলেনাকে বলল, তুমি এখান থেকে যাবে কেন? হার্মিয়াকে তুমি ভয় করো না—আমি থাকতে ও তোমায় আঘাত করতে পারবে না।

ডেমিট্রিয়াস ফুঁসে উঠল, লাইসাণ্ডারকে বলল—হার্মিয়া হেলেনাকে মারবে না, তবু তুমি হেলেনার পক্ষে রয়েছ।

হেলেনা বলল, না, হার্মিয়া ভীষণ বদ্‌রাগী। ও বেঁটে এবং ভয়ঙ্কর।

—আবার আমাকে বেঁটে বলছিস? হার্মিয়া রেগে লাল হয়ে গেল।

ডেমিট্রিয়াস লাইসাণ্ডারকে বলল, তুমি কখনো হেলেনার নাম মুখে আনবে না। তাহলে তোমায় আমি আস্ত রাখব না।

লাইসাণ্ডার একথা সহ্য করতে পারে না। সে লড়াইয়ের পথই বেছে নেয়। অবশেষে ওরা দুজন লড়াইয়ের জন্য খোলা জমিতে উপস্থিত হয়।

হার্মিয়া অনুযোগ করে হেলেনাকে বলল, তোর জন্যেই এত গণ্ডগোল। তোকে পালাতে দেব না আমি।

হেলেনা বলল, তোর গায়ে যত জোর থাক না কেন, তুই বেঁটে। আমার সাথে তুই

দৌড়ে পারবি না। হেলেনা বেগে ছুট দিল।

হার্মিয়া কি করবে বুঝতে পারল না। অবশেষে ওখান থেকে চলে গেল।

ওবেরন এসব ব্যাপার দেখে তাজ্জব হয়ে গেছেন। তিনি পাককে বললেন, ছোকরা দু'টো লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজছে। পাক, তুই আলোকিত আকাশকে ঢেকে দে, আঁধার নেমে আসুক। ঐ ছোকরা দু'টো পথ হারিয়ে ফেলবে। একে অপরের কাছে এগোতে পারবে না। ওদের লড়াই বন্ধ করে দিতে হবে। তুই একবার লাইসাণ্ডারের গলা নকল করে ডাকবি। আবার কখনো ডেমিট্রিয়াসের গলা নকল করে ডাকবি। ওদের দু'জনকে বিভ্রান্ত করবি। একেবারে ক্লান্ত হয়ে ওরা যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন লাইসাণ্ডারের চোখে এই নতুন ফুলের রস ঢেলে দিবি। ও ঘুম থেকে জেগে ওর আগের প্রেমিকা হার্মিয়ার প্রেমে ফিরে যাবে এবং এথেন্সে গিয়ে আবার সুখে বাস করবে। আমি যাচ্ছি আমার রাণী টিটানিয়ার কাছে। ভারতের সেই ছেলেটাকে আমি তাঁর কাছ থেকে নেব। ছেলেটাকে পেলে আমি রাণীর চোখ থেকে অলীক মায়া সরিয়ে ফেলব এবং ঐ দানবের হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দেব।

পাক ওবেরনের নির্দেশ পালনে তৎপর হল। ওবেরনও চলে গেলেন।

পাক আপন মনে বলল, আমি ঐ ছোকরা দু'টোকে এদিক ওদিক ছুটিয়ে মারব। ওদের নিয়ে খুশীমত খেলা করব।

এদিকে লাইসাণ্ডারকে ডেমিট্রিয়াস খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আঁধারে তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

সে চিৎকার করে বলল, ওরে পাজী ডেমিট্রিয়াস, বল তুই কোথায়? কথা বল, জবাব দে।

পাক তখন ডেমিট্রিয়াসের কণ্ঠস্বর নকল করে উত্তর দিল, এই যে শয়তান এখানে আমি। কোথায় তুই?

লাইসাণ্ডার জানাল, আমি এক্ষুনি তোর কাছে যাচ্ছি।

পাক বলল, এস তুমি কোন সমতল জায়গায়।

লাইসাণ্ডার পাকের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে এগিয়ে চলল।

ডেমিট্রিয়াস আঁধারে পথ খুঁজে না পেয়ে আবার ওখানে এসে উপস্থিত হ'ল। সে বলল, লাইসাণ্ডার আবার কথা বল। তুই একটা কাপুরুষ। চলে গেলি বুঝি? বল কোথায় লুকোলি?

পাক এবার এগিয়ে আয়; আমি তোকে চাবুক মারব। তোর সাথে লড়াই করতেও আমি লজ্জা বোধ করি। তুই হীন হয়ে আকাশের নক্ষত্রের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হতে চাস।

ডেমিট্রিয়াস বলল, তুই তবে এখানে?

পাক বলল, আমার গলার স্বর শুনে শুনে এদিকে আয়। আমরা এখানে লড়াই করব না।

লাইসাণ্ডার ডেমিট্রিয়াসকে খুঁজে পেল না। ওর ধারণা হ'ল ডেমিট্রিয়াস ওর কাছ থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওহে সূর্যালোক তোমার আলো বিচ্ছুরিত করে আমাকে দেখবার সুযোগ করে দাও। আমি এই নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধ নেব। লাইসান্ডার আর ওকে খুঁজবার চেষ্টা করল না। সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন ও বিশ্রাম চায়। ভূমির উপর শুয়ে পড়ল সে। ওর চোখে ঘুম এল।

একটু পরে পাক ও ডেমিট্রিয়াস অদূরে এসে উপস্থিত হ'ল। পাক লাইসাণ্ডারের গলা অনুকরণ করে বলল, কই কাপুরুষ, এদিকে আসছিস না কেন?

ডেমিট্রিয়াস বলল, যদি সাহস থাকে তবে অপেক্ষা কর। কোথায় তুই?

—এখানে।

—বুঝতে পারছি তামাসা করছিস। রাত পোহাক, তারপর তোকে ঠিক ধরব, মজাও দেখাব। এখন তুই যেখানে খুশী চলে যা। আমার ঘুম পেয়েছে।

ডেমিট্রিয়াস ভূমির উপর শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

হেলেনা এল। সে চাইছে এথেন্সে ফিরে যেতে কিন্তু আঁধারে সে যেতে পারছে না। রাত পোহালে সে এথেন্সে চলে যাবে। রাতটা তাকে এখানেই কাটাতে হবে। অতএব হেলেনা ভূমির উপর শুয়ে পড়ল। ওর চোখেও ঘুম আসতে বেশী দেরী হ'ল না।

পাক বলল ঃ তিনজন এল, আসুক একজন আর
দুটো ছেলে দুটো মেয়ে তবেই হবে চার
ঐ আসছেন তিনি বিষম প্রতিমা—
জেনো প্রেমের দেবতা অতি পাজী
মেয়েদের পাগল করা তার কারসাজি।

অবশেষে হার্মিয়া ক্লান্তপদে এখানে চলে এল। জীবনে এত ক্লান্ত সে আর আগে কখনো হয়নি। এতখানি দুঃখ আর আগে কখনো পায়নি। ও আর এক পা এগোতে পারছিল না। ওর শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হ'ল এবং অবসন্ন দেহে ভূমির উপর শুয়ে পড়ল। শোয়ামাত্র ও ঘুমিয়ে পড়ল।

পাক লাইসাণ্ডারের কাছে এগিয়ে এল এবং তার চোখের তারায় ভিন্ন এক ফুলের রস নিংড়ে দিল এবং বিড়বিড় করে বলল ঃ

ভূমির প'রে ঘুমাও ছেলে
চোখে দিলাম ঔষধ ঢেলে—
জাগবে যখন দেখবে তখন
আগের প্রিয়া তোমার আপন।
দুঃখ রজনী শেষে মিলন হবে
তোমাদের।
অক্ষয় হোক অমর হোক
প্রেম তোমাদের।

খুশী হও, সুখী হও তোমরা সবে,
এবার মোরে দাও গো বিদায়।

ঘুম থেকে জেগে লাইসাণ্ডার পূর্ব স্মৃতিতে ফিরে যাবে এবং হার্মিয়ার প্রতি তার দুর্বার প্রেম অনুভব করবে।

বনভূমিতে লাইসাণ্ডার, ডেমিট্রিয়াস, হার্মিয়া এবং হেলেনা ঘুমিয়ে রয়েছে।

এমন সময় টিটানিয়া এবং তার প্রেমিক গাধামুখো বটমকে একত্রে দেখা গেল। ওদের পিছনে এক মটর ফুল, মাকড়সার জাল, প্রজাপতি ও সরষে বীজ। ওদের অলক্ষ্যে ওবেরন ও পাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছেন।

টিটানিয়া বটমকে সোহাগ জানিয়ে বললেন, প্রিয়তম, এস এই ফুলে ভরা স্থানে বস। আমি তোমার নরম গালে হাত বুলিয়ে দেব। তোমার সুন্দর চুলে ফুল গুঁজে দেব এবং তোমার সুবৃহৎ সুন্দর কান দুটিতে চুম্বন করব। তুমি খুশী হবে।

বটম একথায় কর্ণপাত না করে বলল, মটর এল কোথায়?

—এই যে আমি! মটর ফুল বলল।

আমার মাথাটা ভাল করে টিপে দাও এবং আঁচড়ে দাও। মাকড়সার জাল কোথায়?

—এই যে।

তুমি এক কাজ কর, তোমার জাল দিয়ে একটা লাল পাখাওয়ালা সুন্দর মৌমাছি ধরে আনো এবং এর মধুর থলেটা নিয়ে এস। সরষে বীজ কোথায়?

—এই যে প্রভু!

—তুমি মাকড়সার জালকে মাথা টিপে দিতে সাহায্য করে যাও। আমি ক্ষৌরাগারে নাপিতের কাছে যাব। আমার মুখে অনেক বড় বড় চুল গজিয়েছে।

টিটানিয়া বলল, প্রিয়তম, তুমি কি গান শুনবে?

—আমি গান খুব ভালবাসি। একটা চাষাড়ে গান শুনতে চাই গান শুরু হ'ল।

গান শেষ হলে টিটানিয়া শুধায়, প্রিয়তম তুমি কি খাবে?

—আমার জানোয়ারের খাবার খেতে ইচ্ছে করছে। শুকনো যব খাব। এক আঁটি ভাল ঘাস হলে আমি বেশ খুশী হবো। ভাল ঘাসের সত্যিই কোন তুলনা নেই।

—একটা পরী তোমার জন্যে বাদাম নিয়ে আসবে।

—তার দরকার নেই। আমি বরং দু-মুঠো শুকনো মটর খাব। কিন্তু তোমার পরীরা যেন কেউ এখন আমায় বিরক্ত না করে। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমোব।

—তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও প্রিয়। আমি তোমাকে স্বর্ণলতিকার মতো জড়িয়ে ঘুমোচ্ছি।

টিটানিয়া পরীর দলকে চলে যেতে বলল। পরীরা যে যার জায়গায় চলে গেল।

টিটানিয়া বটমকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লেন। একটি মাধবীলতা যেন এক সুগন্ধ গাছকে জড়িয়ে ধরেছে।

যথাসময়ে বটম ও টিটানিয়া ঘুমিয়ে পড়ল।

পাক এসে উপস্থিত হল।

ওবেরন ওর কাছে এগিয়ে এলেন।

ওবেরন বললেন, এস পাক। দেখছ কি সুন্দর দৃশ্য। একটা গাধার সাথে টিটানিয়া কেমন প্রেম করছে! এ দেখে ওর প্রতি আমার খুবই করুণা হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে এ বনে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। রাণী এখন আমার বশে এসেছে, ওর কাছে সেই ভারতীয় ছেলেটাকে চাইলাম। কোন রকম আপত্তি না করে ছেলেটিকে আমায় দিয়ে দিল। আমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। এবার আমি ওর চোখ থেকে অলীক মায়া সরিয়ে ফেলব।

এই বলে ওবেরন পাককে বটমের মাথা থেকে গাধার মাথা সরিয়ে দিতে বললেন। এথেন্সের মানুষ বটম যেন ঘুম থেকে জেগে অলীক মায়া সরিয়ে ফেলল।

ওবেরন নিদ্রিতা টিটানিয়ার চোখে আপন কর স্পর্শ করে বললেন—টিটানিয়া এবার জাগো।

এতে যেন মন্ত্রের মত কাজ করল। টিটানিয়া জেগে উঠলেন। বললেন, প্রিয় ওবেরন! আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি একটা গাধার সাথে প্রেম করছিলাম।···

ওবেরন গম্ভীরভাবে বললেন, হুঁ,—ঐ সেই গর্দভ শুয়ে রয়েছে। যাকে তুমি ভালবেসেছিলে।

টিটানিয়া ভুরু কুঁচকে বললেন, কি করে এসব হল? উঃ, কি কদাকার লাগছে ওকে দেখতে।

ওবেরন পাককে বললেন, বটমের মাথা বদলে দিতে। পাক ওবেরনের নির্দেশ পালন করল এবং সেই মুহূর্তেই সংগীত শুরু করা হ'ল। পরীরা এক অপূর্ব সংগীতের মূর্ছনা সৃষ্টি করল। এই সংগীতের প্রভাবে বটম আরো নিদ্রাভিভূত হ'ল এবং সেই সাথে হার্মিয়া, লাইসাণ্ডার, ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনাও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন রইল।

ওবেরন সহাস্যে, রাণী টিটানিয়ার হাত ধরলেন। মধুরস্বরে বললেন, টিটানিয়া, তোমার ও আমার মধ্যের বিবাদ মিটে গেছে। আমরা এখন পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। এবার শোন তোমাকে জানাই আমরা আগামীকাল রাতে ডিউক থিসিউসের প্রাসাদে সাড়ম্বরে নৃত্য করব এবং তাঁর বিয়েতে আশীর্বাদ বর্ষণ করব। তিনি সুখী ও সমৃদ্ধশালী হবেন।

এরপর তিনি দুই জোড়া ঘুমন্ত প্রেমিক-প্রেমিকাদের দেখিয়ে বললেন, এদেরও

ডিউকের প্রাসাদে ধুমধামের মধ্যে বিয়ে দেয়া হবে।

পাক বলল, প্রভু, আমি চাতকের ডাক শুনতে পাচ্ছি—ভোর হতে আর দেরি নেই।

ওবেরন টিটানিয়াকে বললেন, চল প্রিয়তমা আমরা অগ্রসর হই। আর দেরি নয়।

—চল যেতে যেতে আমায় তুমি বলবে, কি করে আমার জীবনে এমন একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল।

ওঁরা চাঁদের থেকে দ্রুতবেগে রওনা হলেন।

পরক্ষণে শিঙার আওয়াজ ভেসে এল। বনভূমি কেঁপে উঠল। দেখা গেল, অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে ডিউক থিসিউস ও হিপ্পোলিটা ইজিয়াসকে নিয়ে বনমধ্যে প্রবেশ করছেন। ওঁরা ক্রমে বনের ভিতরে চলে এলেন।

ডিউক একজন অনুচরকে বললেন, যাও বন রক্ষককে ডেকে নিয়ে এস, আমাদের মে দিবসের উৎসব পালন করা হবে।

এখন প্রভাত। আমার প্রিয়তমা শিকারী কুকুরের সুরেলা ডাক শুনবেন। শিকারী কুকুরগুলোকে ছেড়ে দাও; তাড়াতাড়ি করো সুন্দরী হিপ্পোলিটা, আমরা এখন পর্বতের শীর্ষদেশে যাব এবং সেখানে গিয়ে শিকারী কুকুরদের মধুর ডাক শুনব। সে ডাক চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করবে।

হিপ্পোলিটা জানালেন যখন বীর কাডমস এবং হারকিউলিস ক্রেটন বনে ছিল, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখেছেন ওরা স্পার্টার শিকারী কুকুর দিয়ে ভালুক শিকার করেছে।

থিসিউস বললেন, আমার শিকারী কুকুরগুলোও স্পার্টা থেকে আনা হয়েছে। ওদের লম্বা লম্বা ঝুলন্ত ঠোঁট, সোনালী রং, লম্বা কান, বাঁকানো হাঁটু, গলার নীচে মাংস ঝুলতে থাকে—অনেকটা থেসালির ষাঁড়ের মত। ওদের গতি মন্থর, কিন্তু ওরা শিকারে অব্যর্থ।

সহসা থিসিউসের চোখ পড়ে ঘুমন্ত প্রেমিকদের উপর। চমকে উঠে তিনি বলেন, ওখানে কারা ঘুমিয়ে আছে?

ইজিয়াস ঘুমন্তদের দেখে সহজেই চিনতে পারল। বলল, প্রভু, এই আমার মেয়ে হার্মিয়া এবং এই লাইসাণ্ডার। ঐ ডেমিট্রিয়াস এবং ওর কাছে বৃদ্ধ নেদারের কন্যা হেলেনা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ওরা এখানে কেন এসেছে!

থিসিউস এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, মনে হয় এখানে আমাদের বিয়ের খবর পেয়েই ওরা এখানে এসেছে। কিন্তু ইজিয়াস! আজই না হার্মিয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর কথা?

—হ্যাঁ, প্রভু। ইজিয়াস উত্তর দিল।

—তাহলে যাও এবং বনমালীকে শিঙা বাজিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগাতে বল।

অল্পক্ষণ পরে বাদ্যের শব্দ হয়। লাইসাণ্ডার, হার্মিয়া, ডেমিট্রিয়াস এবং হেলেনা

সকলেই ঘুম থেকে জেগে ওঠে। ওরা সম্মুখে ডিউককে দেখে নতজানু হয়।

থিসিউস মৃদু হেসে ওদের বললেন, সুপ্রভাত বন্ধুগণ!

—সুপ্রভাত, প্রভু। ওরা উত্তর দেয়।

ডিউক বললেন লাইসাণ্ডার ও ডেমিট্রিয়াস, আমি জানি তোমরা দু'জনেই হার্মিয়াকে বিয়ে করতে চাও এবং এজন্যেই একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং একে অপরের শত্রু। অথচ, দেখছি তোমরা একে অপরের কাছাকাছি বেশ দিব্যি ঘুমিয়ে রয়েছ।

লাইসাণ্ডার বলল, প্রভু আমি আপনাকে সঠিক বলতে পারব না, কি করে আমি এই বনে এসেছি। শুধু এইটুকু মনে আছে, আমি হার্মিয়ার সাথে এখানে এসেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এথেন্সের আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এথেন্স থেকে কোথাও পালিয়ে যাবো এবং সেখানে গিয়ে আমরা নির্বিঘ্নে বিয়ে করতে পারবো।

ইজিয়াস রাগ সামলাতে পারছে না। সে ডিউককে বলল, প্রভু, লাইসাণ্ডার নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে, অতএব আপনি ওকে আইনানুযায়ী শাস্তি দিন। ও আমার মেয়েকে নিয়ে পালানোর ষড়যন্ত্র করেছে এবং ডেমিট্রিয়াসকে প্রতারণা করার সংকল্প করেছে।

ডেমিট্রিয়াসও ডিউককে বলল, প্রভু, হেলেনা আমায় জানিয়েছিল লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া এথেন্স থেকে পালিয়ে এই বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওর কথা শুনে আমি রেগে গিয়ে এ বনে চলে আসি। কিন্তু আমি এখন বলতে পারছি না কেন এবং কোন্ মন্ত্রগুণে হার্মিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা কেটে গেছে। আমি এখন ওকে এতটুকু ভালবাসি না। ওকে একদিন ভালবাসতাম—এ ঘটনাটা যেন আমার কাছে এখন ছেলেবেলার অলীক-স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। হার্মিয়ার বদলে এখন হেলেনার প্রতিই আমার সমস্ত ভালবাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে এখন শুধু হেলেনা আর হেলেনা।······

একথা শুনে সবাই বিস্মিত, বিমূঢ়।

থিসিউস ডেমিট্রিয়াসকে বললেন, আমরা তোমাদের এই বিস্ময়কর কাহিনী যথা-সময়ে আরো বিস্তারিতভাবে শুনব। এরপর তিনি ইজিয়াসকে বললেন, ইজিয়াস, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারছি নে। মন্দিরে আমার সাথে যখন হিপ্পোলিটার বিয়ে হবে তখন দুইজোড় প্রেমিক-প্রেমিকাদেরও সে মন্দিরে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে।

ইজিয়াস মৌন হয়ে ডিউকের দিকে তাকাল। থিসিউস বললেন, প্রভাত উত্তীর্ণ হয়েছে। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত শিকার এখন বন্ধ থাকবে। আমরা সকলে এবার এথেন্সে ফিরে যাব। আমাদের তিন জোড়া প্রেমিকেরই অনেক ধুমধাম ও আনন্দ উৎসবের মধ্যে আজ বিয়ে হবে। এস হিপ্পোলিটা! এই বলে তিনি সুন্দরী হিপ্পোলিটার একখানি বাহু আকর্ষণ করলেন।

ওঁরা দুজনে এগিয়ে চললেন। ইজিয়াস ও অনুচরবৃন্দ নীরবে ওঁদের অনুসরণ

করল।

বাকী ওরা চারজনে একে অপরের দিকে ইতস্ততঃ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

ডেমিট্রিয়াস বলল, কোন পর্বতমালা যেমন ক্রমশঃ দূরে থেকে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, ঠিক তেমনি যেন আমার জীবনের এই ঘটনা আমার কাছে ক্রমশঃ অস্পষ্ট এবং ছায়াময় হয়ে উঠেছে! সৃষ্টি করেছে এক গোলকধাঁধা।

হার্মিয়া বলল, আমার কাছে এ ঘটনা কখনো বাস্তব আবার কখনো স্বপ্নময় বলে মনে হয়।

হেলেনা বলল, আমারও এরকম মনে হয়।

ডেমিট্রিয়াস হেলেনাকে বলল, আমরা কি সত্যিই জেগে উঠেছি? আমার যেন মনে হয় এখনো আমরা ঘুমোচ্ছি এবং স্বপ্ন দেখছি। এটা কি সত্য যে ডিউক এখানে এসেছিলেন এবং আমাদের তাঁর প্রাসাদে যেতে বলেছেন?

হার্মিয়া বলল, হ্যাঁ, ডিউক সত্যিই এসেছিলেন এবং আমার বাবাও তাঁর সাথে ছিলেন।

হেলেনা বলল, হিপ্পোলিটাও ডিউকের সাথে এসেছিলেন।

লাইসাণ্ডার বলল, তিনি আমাদের তাঁর সাথে মন্দিরে যাওয়ার নির্দেশ করেছেন।

ডেমিট্রিয়াস বলল, তাইতো! তাহলে আমরা সত্যই জেগে উঠেছি এখন। তবে আমরা ডিউকের পেছন পেছন যেতে পারি।

সকলে ওর কথায় রাজী হ'ল। ডিউককে অনুসরণ করে তখন এগোতো লাগল ওরা।

এদিকে বটম ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। পাক তার যাদুক্রিয়ায় কখন বটমের ঘাড় থেকে গাধার মাথাটা সরিয়ে তার আসল মাথাটা পরিয়ে দিয়ে গেছে। বটম অবশ্যই এখন আগের মানুষ হয়ে উঠেছে। তার মস্তিষ্কে পূর্বস্মৃতি ফিরে এসেছে। সে ঘুম থেকে জেগে উঠেই নাটকের ডায়ালগের খেই ধরে বলতে শুরু করেছে, যখন আমার ডায়ালগ আসবে, তখন আমি বলব। তারপর বলল, পিটার কুইন্স, ফ্লুট, স্নাউট তোমরা সব কে কোথায়? কাউকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন কি তোমরা আমাকে ফেলে চলে গেছ?

আমি একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি! কি অদ্ভুত আমার প্রেমবিধুর সে স্বপ্ন। উঃ কি অদ্ভুত! মানুষ গাধা হয়ে গেছে। মানুষ এমন ঘটনা কখনো শোনেনি, কেউ কখনও এমন ঘটনা দেখেনি। তার হাত এমন স্বাদ পায়নি, তার জিভ এমন ব্যাপার ভাবতে পারেনি—এমন স্বপ্ন আমি দেখেছি।

আমি পিটার কুইন্সকে বলব আমার এই স্বপ্ন নিয়ে একটা গীতিআলেখ্য লিখতে। এ কাব্যের নাম হবে 'বটমের স্বপ্ন'। আমি নাট্যাভিনয়ের শেষে ডিউকের সামনে এই গীতি-আলেখ্য নিবেদন করব। থিসবীর মৃত্যুর পর যদি এটা গাইতে পারি তবে

নাটকটা আরো প্রাণবন্ত এবং চমৎকার হবে।

বটম বনভূমি ত্যাগ করে এথেন্সে ফিরে চলল।

এথেন্স। কুইন্সের ঘর। রাতের বেলা। কুইন্স স্নাউট, ফ্লুট ও স্টার্ভেলিং চিন্তিত হয়ে পায়চারী করছে। বটমের জন্যে ওদের গভীর দুশ্চিন্তা—বটম কোথায় গেল ?

কুইন্স স্টার্ভেলিংকে জিজ্ঞেস করল, তুমি বটমের বাড়ী গিয়ে ভাল করে খোঁজ নিয়েছ ? সে কি নিরাপদে বাড়ী ফেরেনি ?

স্টার্ভেলিং উত্তর দিল, বটমের কোন খবরই নেই। মনে হয় পরীরা ওকে নিয়ে গেছে।

ফ্লুট হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল, সমস্ত নাটকটা বরবাদ হয়ে যাবে সে না এলে।

এ কথা ভুল নয়, কুইন্স উত্তর দিল। পিরামুসের অভিনয়ে বটমের মত সক্ষম এমন একটি সুক্ষ্ম অভিনেতাও সমগ্র এথেন্সে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব বটম বিনা এ নাটক হবে না।

ফ্লুটও এ কথার সমর্থন করল।

কুইন্স আবার বলল, তাছাড়া বটম হল সবচেয়ে সুদর্শন অভিনেতা এবং এক সুকণ্ঠে উপপতি।

উপপতি নয়, বল অধিপতি—ফ্লুট কুইন্সের ভুল সংশোধন করে দিল। স্নাগ এসে ঢুকল।

সে বলল, বন্ধুগণ, মহামান্য ডিউক এইমাত্র তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করে মন্দির থেকে ফিরছেন। ঐ মন্দিরে আরো দু-জোড়া বিয়ে হয়েছে। অতএব আমরা যদি এখন ডিউকের সামনে নাটক অভিনয় করতে পারতাম তাহলে নির্ঘাৎ আমাদের বরাত খুলে যেত।

ফ্লুট সখেদে বলল, হায়, আমাদের প্রিয় বটম! কোথায় তুমি ? তুমি চলে গিয়ে আজ ছয় পেনি পাওয়ার সুযোগ হারালে। ডিউক তোমার অভিনয় দেখে কম করেও ছয় পেনি দিতেন।

এমন সময় বটমকে আসতে দেখা গেল।

উপস্থিত সকলে ওকে দেখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

বটম একটা বড় আওয়াজ ছেড়ে বলল, বন্ধুগণ, তোমরা কোথায় ? এই বলে সে এগিয়ে এল।

কুইন্স আনন্দে লাফিয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, বটম! তুমি এসেছ। ওঃ কি সৌভাগ্যের দিন আজ, কি আনন্দের মুহূর্ত!

বটম বলল, বন্ধুগণ! আমি তোমাদের কাছে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলব ঃ

আমরা তোমার সব কথা শুনব, কুইন্স বলল।

বটম দম নিয়ে বলল, উঁহু, আমি এখন সে বিষয়ে একটি কথাও বলব না। যা

বলছি তা এই—ডিউক ডিনার শেষ করেছেন, তোমরা তোমাদের পোশাক নিয়ে জলদি প্রস্তুত হও। অভিনয়ের জন্য, আর যা কিছু দরকার তাও গুছিয়ে নাও। আমরা তাড়াতাড়ি ডিউকের প্রাসাদে যাব। সকলে নিজের নিজের ডায়ালগ মুখস্থ রাখ। এরপর সে ঘাড় ঘুরিয়ে ফ্লুটকে বলল, থিসবী, তুমি যেন নিজের পোশাক পরিষ্কার রাখতে ভুল না। স্নাগকে বলল, সিংহ, তুমি যেন তোমার নখ কেটে ফেল না। অভিনয়কালে তোমার নখগুলি সিংহের থাবার কাজ করবে।

আর শোন, তোমরা কেউ পেঁয়াজ বা রসুন খেও না, কারণ অভিনয়কালে আমাদের মুখ থেকে তাহলে মধুর মধুর নিঃশ্বাস বেরোবে না। আমি নিশ্চিত, দর্শকরা আমাদের নাটক দেখে খুশী হবে। আর কোন কথা নয়, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

ওরা সকলে ওদের জিনিসপত্র নিয়ে ডিউকের প্রাসাদ অভিমুখে রওনা হল।

ডিউকের প্রাসাদ। মায়াভরা সুন্দর রাত। আকাশে নতুন চাঁদের উদয় হয়েছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে দেবতার মন্দিরে তিনটে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে। ডিউক থিসিউস রাণী হিপ্পোলিটাকে বিয়ে করেছেন এবং লাইসাণ্ডার বিয়ে করেছে হার্মিয়াকে এবং হেলেনার বিয়ে হয়েছে ডেমিট্রিয়াসের সাথে।

বিয়ের পর দরাজ মন নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। বনের বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা নিয়ে থিসিউস হিপ্পোলিটার মধ্যে কথা শুরু হ'ল।

হিপ্পোলিটা বললেন, এই প্রেমিক-প্রেমিকারা যা বলছে তা সত্যই বিস্ময়কর।

থিসিউস বললেন, কিন্তু এ কাহিনী যতটা বিস্ময়কর ততটা সত্য নয়। আমি এসব অবান্তর গল্প মোটেই বিশ্বাস করি না। প্রেমিক এবং উম্মাদের মস্তিষ্ক খুবই উত্তপ্ত, তারাই এমন অদ্ভুত কল্পনা করতে পারে। উম্মাদ, প্রেমিক ও কবি তিনজনেই কল্পনাবিলাসী। নরকে যে শয়তান আছে তার চেয়েও বেশী এরা। যে এসব দেখতে পায়, সেই হল উম্মাদ এবং সেই হল প্রেমিক যে অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনার মধ্যে তার প্রেমিকার রূপ, রস, স্বাদ ও সব সৌন্দর্য দেখতে পায় এবং সেই হ'ল কবি যার দৃষ্টি এক আশ্চর্য ধারণায় স্বর্গ থেকে মর্তে, মর্ত থেকে স্বর্গে পরিভ্রমণ করে। যা অ-দেখা, অ-জানা তাকেও সে নিজের কল্পনা দিয়ে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ও ফলে ফুলে সাজিয়ে তোলে।

—কিন্তু ওরা সকলেই এক কথা বলছে, হিপ্পোলিটা বলল, কাজেই ওদের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না; এটা ভাববার মত এক আশ্চর্য ব্যাপার নিঃসন্দেহে।

ইতিমধ্যে লাইসাণ্ডার, ডেমিট্রিয়াস, হার্মিয়া ও হেলেনা এসে উপস্থিত হ'ল ওদের নিকট।

থিসিউস সাদরে বর ও বধূদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, এস, বসো। তোমাদের দাম্পত্য জীবন পরম সুখের হোক। উজ্জ্বল হোক তোমাদের ভবিষ্যৎ।

লাইসাণ্ডার তাঁকে বলল, আমরাও সর্বান্তঃকরণে আপনাদের সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি

কামনা করি।

—আমাদের বাসরে যেতে এখনো তিন ঘণ্টা বাকী, থিসিউস বললেন, এই দীর্ঘ সময় কাটাবার জন্যে আমরা কোন প্রমোদ অনুষ্ঠান চাই। ফিলেস্ট্রেট আমাদের জন্যে নিশ্চয়ই কোন প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে।

ফিলেস্ট্রেট কাছেই ছিল। সে বিনীতভাবে ডিউককে বলল, প্রভু, সে ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করেছি। প্রমোদ অনুষ্ঠানের এই তালিকা দেখুন।

ডিউক তালিকা নিয়ে পড়লেন। তালিকার মধ্যে কুইন্সের নাটকের উল্লেখ ছিল। ডিউক এই নাটকটিই অভিনয়ের জন্যে পছন্দ করলেন। নাটকের সম্বন্ধে লেখা আছে—

এ নাটক খুবই দীর্ঘ অথচ খুবই ক্ষুদ্র। এমন অদ্ভুত মজাদার কথায় থিসিউস বললেন, কথা দুটো একে অপরের পরিপন্থী, উত্তপ্ত বরফ তুষারের মতই অদ্ভুত।

ফিলেস্ট্রেট বিস্তৃত করে থিসিউসকে জানাল, নাটকটা খুবই ছোট বলতে পারা যায়। এটা দশ কথার নাটক, তবু এটা খুবই মজার অথচ খুবই দুঃখের। নাটকে নায়কের নাম পিরামুস, নায়িকার নাম থিসবী। ওরা দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। কিন্তু ওদের প্রেম সার্থক করতে পারছে না। বাধা ঘরের অসম্মতি! অবশেষে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার নিদারুণ মৃত্যু। আমি ওদের নাটক মহড়ার সময় এটা দেখেছি। সত্যই বড় দুঃখের নাটক। মজার নাটক। এমন সুন্দর নাটক এর পূর্বে আমি আর দেখিনি। আমি কাঁদতে কাঁদতে হেসেছি। হাসতে হাসতে কেঁদেছি।

—কারা এ রহস্যঘন নাটক অভিনয় করবে। ডিউক হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন।

—এথেন্সের কয়েকজন শ্রমিক—ফিলেস্ট্রেট উত্তর দেয়। এই প্রথম ওরা মানসিক শ্রমের কাজ করছে। প্রভু ওরা খেটে খাওয়া মানুষ, ওদের মনে কোন কপটতা নেই।

—ঠিক আছে ওদের নাটক আমরা দেখব। ওদের ডাক।

—কিন্তু এরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ। এ নাটক আপনার দেখার মত নয়, প্রভু।

—তবু আমি এ নাটক দেখব। সরল মনের শ্রমিকগণ—আমার আনন্দ বিধানে আগ্রহী হয়েছে, অমি ওদের প্রত্যাখ্যান করব না।—মনে দুঃখ দেব না। ডাক ওদের। ওদের অভিনয় যত খারাপই হোক তবু আমি উৎসাহ দেব ওদের।

ফিলেস্ট্রেট আদেশ পালন করতে তৎপর হয়ে উঠল।

হিপ্পোলিটা বললেন, এদের অমন নাটক দেখার আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই। এর চেয়ে অন্য কোন প্রমোদের আয়োজন করলেই বোধহয় ভাল হ'ত।

—খুব খারাপ হবে না ওদের নাটক প্রিয়তমা। ডিউক বললেন।

ফিলেস্ট্রেট বলল, ওদের অভিনয় সত্যই আপনাদের দেখার মত নয় প্রভু।

ডিউক বললেন, ওরা যেটুকু করবে সেটুকুতেই আমরা ধন্যবাদ জানাব। অভিনয়ে

ওদের ত্রুটি থাকবে অনেক। কিন্তু ওদের কর্তব্য-পরায়ণতা ও ভালবাসা সেই ত্রুটি ঢেকে দেবে। অনেক সভা অনুষ্ঠানে আমাকে বহুদিন যেতে হয়েছে। সেখানে আমার সম্বর্ধনা জ্ঞাপনকালে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁদের ভাষণ বলতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছেন, তাদের কথা গলায় আটকে গেছে। কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত কথা শেষ করতে না পেরে লজ্জায় মাথা নত করে ফেলেছেন। বিশ্বাস কর প্রিয়তমা, তবু আমি তাঁদের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার এক সরল ভীরু প্রচেষ্টা দেখেছি। যারা বাক্য প্রকাশে আমাকে ভালবাসা জানাতে অক্ষম, আমি তাদের ভালবাসা সর্বদা অনুভব করি।

ফিলেস্ট্রেট ফিরে এসে জানাল, ওরা সকলে এসে গেছে। এবার নাটকের প্রস্তাবনা শুরু হবে।

কুইন্স এসে ঢুকল। নাটকের সূত্রধর-রূপে সে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের উদ্দেশ্যে মুখস্থর মত গড়গড় করে বলে গেল। আমাদের নাটক যদি আপনাদের আনন্দ দিতে ব্যর্থ হয়—তাহলেও জানবেন আপনাদের কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমরা আমাদের যথাসাধ্য অভিনয় সামর্থ্য আপনাদের দেখাতে ইচ্ছুক। এটাই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমি আপনাদের সময় নষ্ট করব না। অভিনেতারা মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে। আপনারা তাদের অভিনয় দেখুন।

নাটক শুরু ঃ পিরামুস, থিসবী, দেওয়াল, চাঁদের আলো এবং সিংহের প্রবেশ।

কুইন্সের প্রস্তাবনা পাঠ ঃ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আপনারা হয়তো আমাদের দেখে অবাক হচ্ছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা, আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে না ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের অবাক হয়েই থাকতে হবে। এই ভদ্রলোককে দেখছেন, এঁর নাম পিরামুস এবং এই সুন্দরী মহিলা এঁর নাম থিসবী। এই দেওয়ালটা দেখছেন আসলে ইনিও একজন মানুষ, এঁর গায়ে চুন ও সুরকি লাগিয়ে দেওয়ালের রূপ দেওয়া হয়েছে। এই দেওয়ালটাই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। হতভাগা প্রেমিক-প্রেমিকা এই দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে একে অপরের সাথে প্রেমালাপ করবে। একে অপরকে প্রেম নিবেদন করবে। এই ভদ্রলোককে দেখছেন, এঁর হাতে রয়েছে একটি লণ্ঠন। নাটকে ইনি চাঁদের আলোর অভিনয় করছেন। দেখবেন একটা কুকুর ওঁকে অনুসরণ করে চলেছে। দুই প্রেমিক-প্রেমিকা নিনাসের সমাধির ধারে আসবে—চাঁদের আলোয় প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যে। থিসবী ওখানে এসে উপস্থিত হবে। পিরামুস তখনো এসে উপস্থিত হয়নি। ঠিক এই সময় এক ভয়ংকর সিংহ ওখানে উপস্থিত হয়ে থিসবীকে ভয় দেখাবে।

থিসবী ভীতা হয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে যাবার সময় তার গায়ের ওড়নাটা মাটিতে পড়ে যাবে। সিংহ ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে ঐ ওড়নাটা কামড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে। এরপর সিংহ চলে যাবে।

আগে থেকেই সিংহের মুখে ছিল রক্ত। সেই রক্ত লেগে যাবে ওড়নায়।

এ সময় থিসবীকে খুঁজতে খুঁজতে পিরামুস সেখানে এসে উপস্থিত হবে। প্রেমিকার রক্তাক্ত ওড়না দেখে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে এবং তখনি নিজের তরবারি নিজের বুকে বসিয়ে রক্ত বার করে ফেলবে। একটু পরেই তার মৃত্যু হবে।

থিসবী অদূরে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। সে প্রেমিকের মৃত্যু দেখে আর প্রাণ ধারণ করতে চাইবে না, তাই প্রেমিকের তরবারি নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দেবে। পরক্ষণেই তার মৃত্যু হবে। এবার মঞ্চে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করুন।

দেওয়াল ব্যতীত কুইন্স সহ সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চ ত্যাগ করলেন।

থিসিউস বললেন, সিংহটা যদি কথা বলে তবে বেশ অবাক হবে না সকলে?

ডেমিট্রিয়াস বলল, ওর কথা বলাটা আশ্চর্য নয়।

দেওয়াল বলল, আমার আসল নাম স্নাউট। এই ক্ষুদ্র নাটকে আমি দেওয়ালের অভিনয় করছি। এটা এমনই একটা দেওয়াল যাতে একটা ছিদ্র আছে। এই ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা পিরামুস ও থিসবী গোপনে উঁকি মেরে ঢুকে একে অপরের সাথে প্রায়ই ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলে। আমার গায়ে চুন, বালি ও কাঁকর, এর অর্থ আমিই সেই দেওয়াল। আর এই হল দেওয়ালের ছিদ্রপথ। এখান থেকেই প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমালাপ করবে।

থিসিউস হেসে বললেন, ইট চুনের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কথা কখনো শোনা যায়নি।

পিরামুসের মঞ্চে প্রবেশ ঘটল।

পিরামুস ঃ কি ভয়ংকর দর্শন রাত! কি ভয়াবহ অন্ধকার। হায়, হায়! থিসবী এখনো এল না। থিসবী! থিসবী! না, মনে হয় থিসবী ওর শপথের কথা ভুলে গেছে।

ওগো দেওয়াল, বাড়ীর মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে বাধা সৃষ্টি করছ কেন? দেওয়াল, ওগো মধুর দেওয়াল, আমাকে তোমার ছিদ্র প্রদর্শন কর। আমি ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে থিসবীকে খুঁজে বেড়াব।

(দেওয়াল আঙ্গুল তুলে ছিদ্র প্রদর্শন করে)

ধন্যবাদ ভদ্র দেওয়াল। দেবরাজ জোভ তোমাকে এই ভদ্রতা প্রদর্শনের জন্য রক্ষা করবেন।

(ছিদ্র দিয়ে পিরামুস উঁকি মারল)

কই, আমি তো আমার প্রেমিকাকে দেখতে পাচ্ছি না। ওরে দুষ্ট দেওয়াল, আমি কেন তোর ছিদ্র দিয়ে আমার প্রেমিকাকে দেখতে পাচ্ছি না! আমাকে তুই প্রতারণা করছিস। তাই আমি তোর সব ইট-চুন-পাথরকে অভিশাপ দিলাম।

থিসিউস বললেন, দেওয়ালও জ্ঞানী, তারও পাল্টা অভিশাপ দেওয়া উচিত।

পিরামুস তা শুনে বলে উঠল, না প্রভু, সে তা পারবে না। এখনি থিসবীর

প্রবেশ ঘটবে। সে আমার কথারই খেই ধরে ডায়ালগ বলবে। আমি দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখতে পাব। আপনিও দেখতে পাবেন ঠিক এখনই। ঐ থিসবীর মঞ্চে প্রবেশ।

থিসবী : ওগো দেওয়াল, তুমি আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছ। এজন্য কতদিন তোমার কাতর বিলাপ করেছি। তোমার ইট, পাথরে আমি আমার রক্তিম অধর দিয়ে কতদিন চুম্বন করেছি। কিন্তু তবু তুমি আমার উপর সদয় হওনি।

পিরামুস, দূরে থেকে বলল, আমি কার কণ্ঠস্বর শুনছি। আমি দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখব। থিসবী ?

থিসবী : প্রিয়তম! মনে হয় তুমিই আমার সেই প্রিয়তম।

পিরামুস : তুমি যা খুশী ভাব, আমি তোমার প্রিয়তম ছাড়া আর কেউ নই। আমি লাইসাণ্ডারের মত তোমার বিশ্বস্ত প্রেমিক।

থিসবী : এই পৃথিবীতে যতদিন অদৃষ্টবলে বেঁচে থাকব, ততদিন আমিও হেলেনার মত তোমার প্রতি বিশ্বাসী থাকব।

পিরামুস : ওগো, এই জঘন্য দেওয়ালটার ছিদ্র দিয়ে আমায় তুমি চুম্বন কর।

থিসবী : চুম্বন করতে গিয়ে আমি দেওয়ালের ফুটোকেই কেবল চুম্বন করে যাচ্ছি, তোমার অধর একবারও খুঁজে পাচ্ছি না।

পিরামুস : তুমি কি এখন নিনাসের সমাধি পাশে আমার সাথে দেখা করবে ?

থিসবী : বাঁচি বা মরি, আমি তোমার সাথে এক্ষুনি ওখানে গিয়ে দেখা করছি।

পিরামুস ও থিসবীর প্রস্থান।

দেওয়াল : আমার অভিনয় শেষ, এখন আমি প্রস্থান করতে পারি। দেওয়ালের প্রস্থান।

থিসিউস বললেন, বাঁচা গেল—দেওয়ালটা চলে গেছে।

ডেমিট্রিয়াস হাসতে হাসতে বললো, কিন্তু আবার ফিরে আসতে তার অসুবিধে নেই।

হিপ্পোলিটা বলে উঠলেন, এমন বিশ্রী ব্যাপার আগে কখনো শোনা যায়নি।

থিসিউস তার উত্তরে বললেন, ভাল নাটক। বাস্তব জীবনের ছায়া ছাড়া আর কিছু নেই। বাজে নাটকের অভিনয় ও ডায়ালগের দোষগুলি যদি দর্শকরা কল্পনাবলে সংশোধন করে নেন, তবে ঐ নাটক বাস্তব জীবনের চেয়ে কোন অংশে খারাপ হবে না।

হিপ্পোলিটা বললেন, এটা তবে দর্শকের কল্পনার বলে, অভিনেতাদের কৃতিত্বের জন্য নয়।

থিসিউস উত্তর দেন. এ কথা ওরা আগেই স্বীকার করে নিয়ে অভিনয় আরম্ভ করেছে। এ জন্যেই ওরা চমৎকার।

সিংহ ও চাঁদের আলোর প্রবেশ।

সিংহ ঃ দর্শকদের প্রতি করজোড়ে বললেন, হে মহিলাবৃন্দ আপনাদের অনেকের অন্তরই খুব নরম। ছোট্ট ইঁদুর দেখেও আপনারা ভীত হয়ে ওঠেন। কাজেই আপনাদের সামনে যদি কোন জীবন্ত সিংহ এসে উপস্থিত হয়, তবে আপনারা অবশ্যই মূর্চ্ছা যাবেন। কিন্তু আমাকে আপনাদের কোন ভয় নেই। আমি আসলে একজন কাঠের মিস্ত্রী, নাম স্নাগ। আমি কখনই প্রকৃত সিংহ নই। সিংহের চামড়া গায়ে পরে সিংহের শুধু অভিনয় করছি। সত্যিই যদি আমি আসল সিংহ হয়ে এখানে আসতাম, তবে আমারও প্রাণসংশয় অনিবার্য ছিল।

থিসিউস সিংহের উপর খুশী হয়ে বললেন, পশুটা বড়ই মহৎ, চমৎকার ওর কর্তব্যবোধ।

ডেমিট্রিয়াস বলল, জানোয়ারের ভূমিকায় ওর অভিনয়ও বড় চমৎকার। এত শান্ত পশু বড় একটা দেখা যায় না সচরাচর।

পাশ থেকে বাধা দিয়ে লাইসাণ্ডার বলল, এর পূর্বে আমি এমন পশু একটাও দেখি নাই। সাহসের দিক থেকে সিংহটা একটা খাঁটি শৃগাল। সিংহের বিক্রম এর মধ্যে কিছুই দেখা যায় না প্রভু।

থিসিউস বললেন, কিন্তু জ্ঞানে অবশ্যই সে পণ্ডিত।

চাঁদের আলোর প্রবেশ।

চাঁদের আলো ঃ এই লণ্ঠনটা হল অর্ধচন্দ্র, এর মধ্যে যে মানুষটি রয়েছে তার হয়ে আমি আছি।

থিসিউস বললেন, এটাই হল সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। মানুষটাকেও লণ্ঠনটার মধ্যে ভরে রাখা উচিত ছিল। এছাড়া সে চাঁদের ভিতরে মানুষ হবে কি করে?

ডেমিট্রিয়াস বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল, পুড়ে যাবার ভয়ে সে লণ্ঠনের আলোর মধ্যে প্রবেশ করতে পারছে না। কতবড় মশাল নিয়ে লণ্ঠনটা জ্বলছে।

হিপ্পোলিটা বললেন, এই চাঁদ দেখে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। ভাবছি কতক্ষণে চাঁদ অস্ত যাবে। আবার আঁধার নামবে।

চাঁদের আলো ঃ আমি আপনাদের বলেছি তো এই লণ্ঠনটা হল চাঁদ এবং আমি হচ্ছি চাঁদের ভিতরের মানুষটি। এই ঝোপটা হ'ল আমার কলংক।

থিসবীর প্রবেশ।

থিসবী ঃ এই হ'ল নিনাসের প্রাচীন সমাধি। আমার প্রিয়তম কোথায়?

সিংহ ভয়ংকর গর্জন করে ওঠে।

থিসবী ভয়ে ছুটে পালায়। ওর গায়ের ওড়না মাটিতে পড়ে যায়।

ডেমিট্রিয়াস সকৌতুকে বলল, সিংহ চমৎকার গর্জন করেছে।

থিসিউস উত্তরে বললেন, থিসবীও চমৎকার ভঙ্গিমায় পালিয়েছে।

হিপ্পোলিটা হেসে বললেন, চাঁদও চমৎকার আলো দিয়েছে।

সিংহ থিসবীর ওড়নাটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে প্রস্থান করে। ওর মুখে ছিল রক্ত, তাও ওড়নার গায়ে লেগে যায়।

পিরামুসের প্রবেশ।

পিরামুস ঃ প্রিয় চাঁদ, তোমার উজ্জ্বল কিরণের জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাই। তোমার উজ্জ্বল আলোয় আমি আমার বিশ্বস্ত প্রেমিকা থিসবীকে খুঁজে পাওয়ার আশা করি। কিন্তু এ কি দেখছি। হায়! কি হৃদয়বিদারী দৃশ্য! (থিসবীর ওড়না তুলে নিয়ে) এ আমি কি দেখছি ? কি করে এমন ঘটল ? ওগো সুন্দরী প্রিয়ে আমার, ওগো প্রিয়তমে ! একি, তোমার সুন্দর ওড়নায় যে রক্তের চিহ্ন। হে নিয়তিদেবী, তুমি ত্বরায় এসো, আমার জীবন-গ্রন্থি কেটে দাও। হত্যা কর। ধ্বংস কর, শেষ কর আমাকে।

থিসিউসের কর্ণে বেজে উঠল প্রেমিকার মৃত্যুর সুর এবং সেই সাথে প্রেমিকের এই গভীর শোক। এই অভিব্যক্তির যে কোন মানুষের মনকে নাড়া দেবে।

হিপ্পোলিটা বললেন, আমারও ঐ প্রেমিক লোকটির জন্য খুব দুঃখ হচ্ছে।

পিরামুস ঃ হে প্রকৃতি, তুমি কেন ঐ ভয়ানক সিংহ সৃজন করেছ ? পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত নারী এসেছে, ভালবেসেছে, তাদের মধ্যে আমার প্রিয়তমাই সবচেয়ে সুন্দরী। তাকে ঐ নির্মম পশু হত্যা করেছে ! এস অশ্রুজল—আমাকে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দাও। এস অস্ত্র, পিরামুসের বক্ষে আঘাত হানো। (পিরামুস নিজের বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দিল) আমি মরছি। এখন আমি মৃত। আমার আত্মা এখন দেহ ছেড়ে আকাশে আরোহণ করছে। সূর্যের আলো তুমি নিবে যাও। চাঁদ, তুমি বিদেয় হও। (চাঁদের প্রস্থান) এখন আমি মরে গেলাম। (মৃত্যু)

থিসিউস বললেন, ওঝা ডাকলে হয়তো বাঁচতেও পারতো।

হিপ্পোলিটা বলল, থিসবী আসার আগেই চাঁদ চলে গেল ! সে এখন তার প্রেমিককে দেখবে কি করে ?

—হয়তো নক্ষত্রের আলোয় দেখবে। আর এর পরই হয়তো নাটকের শেষ। থিসিউস উত্তর দিলেন।

থিসবীর প্রবেশ। সে তার প্রেমিককে খুঁজছে।

হিপ্পোলিটা বলল, থিসবীর উচিত নয় তাঁর প্রেমিকের মত অতক্ষণ বিলাপ করা।

ডেমিট্রিয়াস বললে, যেমন প্রেমিক তেমন প্রেমিকা। কার অভিনয় যে ভাল তা বলা কঠিন।

থিসবী ঃ প্রিয়তম, তুমি কি ঘুমিয়ে রয়েছ ? কি, তুমি মৃত ? ওগো পিরামুস জাগো, কথা কও। তুমি কানে এমন কালা হয়ে গেছ কেন ? বল, তুমি কি মরে গেছ ? সত্যই মরে গেলে ?

তোমার ঐ সুন্দর চোখ, শ্বেতবর্ণ অধর, চেরিফুলের মত রক্তলাল তোমার সুন্দর নাক, হলুদ ফুলের মত তোমার সুন্দর গাল, তোমার চোখ দু'টি যেন শ্যাওলার মত

সুন্দর। ওগো তুমি চলে গেছ। পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকারা তোমার বিচ্ছেদে অশ্রু বিসর্জন করবে।

ওগো ডাকিনীরা, তোমরা এস, আমার কাছে এস। তোমাদের হাত রক্তসিক্ত হোক। ইতিমধ্যে তোমাদের হাতেই পিরামুসের রক্ত ঝরেছে। আর কোন কথা বলব না, আমি এই তরবারি দিয়েই আমার বুকের রক্ত ঝরাব। (তরবারি নিজের বুকে বিদ্ধ করে থিসবী) বিদায় বন্ধু! থিসবী মরে যাচ্ছে। বিদায়—বিদায়! (ঢলে পড়ে—মৃত্যু)

থিসিউস বললেন, মনে হয় চাঁদের আলো ও সিংহ রয়েছে অন্ত্যেষ্টির জন্যে!

ডেমিট্রিয়াস বলল, দেওয়ালও বুঝি ঐ জন্যে রয়েছে।

পিরামুসরূপী বটম সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না, সে দেওয়াল আর নেই। পিরামুস ও থিসবীর প্রেমের পথে যে পাপিষ্ঠ দেওয়াল বাধা সৃষ্টি করেছিল তাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এখন বলুন, আপনারা কি নাটকের পরিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য শুনবেন? আমাদের দলের দু'জন সদস্যের নাচ দেখবেন?

থিসিউস বললেন, পরিশিষ্ট বন্ধ রাখ। যখন নাটকের বড় অভিনেতারাই মরে গেছে, তখন আর পরিশিষ্টের প্রয়োজন নেই। যদি এ নাটকের লেখক পিরামুসের অভিনয় করত এবং থিসবীর পায়ের মোজা গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করত। তবে নাটকটা একটা সুন্দর বিয়োগান্ত দৃশ্যে শেষ হ'ত। তোমাদের চমৎকার অভিনয় হয়েছে। এখন তোমরা নাচ দেখাও।

নৃত্য শুরু হ'ল।

রাত তখন বারোটার ঘণ্টা বাজছে। উৎসব মুখর রাজপ্রাসাদ ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসছে।

থিসিউস, লাইসাণ্ডার, হার্মিয়া, ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনাকে বাসর ঘরে শুতে যেতে বললেন। বললেন, আমি ও হিপ্পোলিটাও বাসরে যাচ্ছি। আমাদের আনন্দ উৎসব পনের দিন-ব্যাপী চলবে। সকলকে শুভরাত্রি জানাই।

লাইসাণ্ডার-হার্মিয়া, ডেমিট্রিয়াস ও হেলেনা নিজ নিজ বাসর ঘরে চলে গেল।

এরপর থিসিউস ও হিপ্পোলিটাও তাঁদের সুসজ্জিত বাসর ঘরে চলে গেলেন।

কোলাহলময় স্থানটি এখন জনশূন্য। রাত্রি ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে লাগল।

সহসা এখানে ঘটল পাকের আবির্ভাব। সে রাজা ওবেরনের নির্দেশে ডিউকের রাজপ্রাসাদে এসেছেন। রাত গভীর, আকাশ ভরা তারা জ্বলজ্বল করছে। ঠিক এ সময় পরীরা বিচরণে বের হয়। চলাফেরা করে অবাধ গতিতে।

পাক চাইছে একটা ইঁদুরও যেন প্রাসাদের শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারে। রাজা ওবেরনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা রয়েছে ডিউকের প্রতি। সকলের অলক্ষ্যে ওবেরনের প্রাসাদে এসে ডিউককে আশীর্বাদ করবেন। পাক এ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। তাই ওবেরন

আসরে আসার আগেই সে এখানে এসেছে এবং একটা ঝাড়ু দিয়ে প্রাসাদের ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করছে।

কিছুক্ষণ পরে ওবেরন ও টিটানিয়া প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁদের পরী অনুচরীবৃন্দ।

ওবেরন পরীদের বললেন, প্রাসাদের মধ্যে স্তিমিত আলো ছড়িয়ে দাও। তারপর তোমরা ছন্দে ও সুরে তাল মিলিয়ে নাচগান আরম্ভ কর।

টিটানিয়া বললেন, প্রথমে গানের মহড়া দাও। তারপর প্রত্যেকে হাত ধরাধরি করে নাচ শুরু কর। আমরা গান গাইব এবং ঐ প্রাসাদ গৃহকে আশীর্বাদ করব।

নৃত্য ও গীত শুরু হল।

ওবেরন বললেন, শোন পরীর দল, যতক্ষণ ভোরের আলো না দেখা যায়, ততক্ষণ তোমরা প্রত্যেকে প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে বিচরণ করবে। আমরা থিসিউস ও হিপ্পোলিটার ফুলশয্যার কাছে গিয়ে ওদের আশীর্বাদ করব। ওদের সন্তান সর্বদিক দিয়ে ভাগ্যবান হবে এটাই হবে আমাদের একমাত্র কামনা।

এ ছাড়া, তিন দম্পতি যাতে প্রেমে চিরদিন বিশ্বস্ত থাকে সে কামনা করেও ও'দের আশীর্বাদ করব। তোমরা প্রত্যেক পরী ও'দের আলাদা আলাদা বাসর ঘরে চলে যাও এবং নিঃশব্দে ও'দের আশীর্বাদ কর। যাও, এতটুকু দেরী করো না; ভোর হলে সকলে আমার সাথে এসে দেখা করবে! এস।

পাক ব্যতীত সকলে ওখান থেকে চলে গেলেন।

পাক মর্তবাসীর উদ্দেশ্যে বিনম্র কণ্ঠে বলল, আমরা ছায়াবাসী পরী। আমরা যদি আপনাদের কখনো কষ্ট দিয়েও থাকি, তবু আপনারা যেন রাগ করবেন না। আপনাদের কষ্ট অচিরেই দূর করে দেব আমরা। ভদ্রমহাশয়গণ ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, আমাদের আনন্দ কৌতুকের জন্য আপনারা আমাদের দোষারোপ করবেন না। কেন না, আপনাদের দৃষ্টিতে যেটা ভাল আমাদের সেটা দোষ বলে মনে হবে, সেটা কিন্তু আসলে একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। একথা মনে করে আপনারা যদি আমাদের মার্জনা করেন, তাহলে আমরা আমাদের আচরণ সংশোধন করার প্রয়াস পাব।

আমি যদি আমার প্রতিশ্রুতি না রক্ষা করে চলে যাই, আপনারা তবে পাককে মিথ্যাবাদী বলবেন। এখন আপনাদের প্রত্যেককে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনারা হাততালি দিয়ে আমার বিদায় দিন।

আপনাদের এই ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রদর্শন পাক কখনো ভুলবে না, সে আপনাদের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। নমস্কার।

বক্তৃতা শেষ করে পাক অদৃশ্য হ'ল।

স্বপ্নে ঘেরা কাহিনীর যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এল।

টুয়েলভথ নাইট

এক

ইউলিরিয়া রাজ্য। অর্সিনো নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করেন। রাজা অর্সিনো অবিবাহিত। অকৃতদার হলেও তাঁর জীবনে নারীর পদার্পণ ঘটেছে। কিন্তু কে সেই রূপসী তন্বী যুবতী? কি তাঁর নাম?—অলিভিয়া।

হ্যাঁ রূপসী। রূপসী অলিভিয়া। দেহে যৌবনের ঢল, সর্বত্র সৌন্দর্যের পসরা। রূপের আভায় চোখ ঝলসে দেয়।

অলিভিয়া শোকসন্তপ্তা। ভ্রাতৃ-বিয়োগবিধুরা অলিভিয়ার অন্তরে শোকের ছায়া। নির্জন গৃহকোণই আজ তাঁর একমাত্র অবলম্বন।

যুবতী অলিভিয়ার আজ কিছুই ভাল লাগছে না। অশান্তির আগুন অষ্টক্ষণ বুকের ভেতর কুরে কুরে খাচ্ছে। দেহ-মনে বিষণ্নতা আজ স্থায়ী আসন পেয়েছে।

অলিভিয়ার প্রাণের ভাই লোকান্তরে। এই তো সামান্য বয়স, এরই মধ্যে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মত বিদায় নিতে হয়েছে। দু'দিন আগেও অলিভিয়া যে ভাইকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে পারতেন না। সে আজ দূরে—বহু দূরে চলে গেছে। এই পৃথিবীর একেবারে বাইরে, জীবন নদীর ও-পারে পাড়ি জমিয়েছে। শত হা-হুতাশ করলে, বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করলেও সে আজ আর ফিরে আসবে না। ভাইঅন্তঃ প্রাণ-মনের শান্তি নিঃশেষে কোথায় উবে গেছে।

রাজা অর্সিনো প্রেমিকার দেখা না পেয়ে বিশেষ ভাবিত। তাঁর প্রেমে নেমে এসেছে ভাঁটা—বিষাদের ছায়া। অবাঞ্ছিত বিষাদঘন মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছেন তিনি। তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে অনন্ত হাহাকার, হা-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে। মুক্তির পিয়াসি রাজা অর্সিনো। শোকাহত রাজা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সামান্য শান্তি চাইছেন।

রাজকাজে মন নেই অর্সিনোর শুধুমাত্র রাজসভাই বা বলি কেন? কোন কিছুই যেন আজ তাঁর ভাল লাগছে না। বিচারপ্রার্থী প্রজারা বিষণ্ণ মনে ফিরে যাচ্ছে। বিদেশাগত রাজারাও অর্সিনো'র এই অপ্রত্যাশিত আচরণে উদ্বিগ্ন। সদাহাস্যময় বলে পরিচিত মহলে রাজার খুবই খ্যাতি ছিল। কিন্তু আজ? হ্যাঁ, তিনি আজ বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। শুধুমাত্র বিষণ্ণতাটুকু সম্বল করেই তিনি যেন আজ বেঁচে রয়েছেন।

অলিভিয়া! হ্যাঁ, অলিভিয়াই আজ তাঁর অশান্তির একমাত্র কারণ। প্রিয়তমা অলিভিয়া। তাঁর প্রাণেশ্বরী আজ বিমুখ হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ অদর্শনেই মনের

কোণে বৈশাখী মেঘের উঁকি-ঝুঁকি। থমথমে ভাব, যেন শুধুমাত্র বিশেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই যেন ভেঙেচুরে সবকিছু তছনছ ক'রে দেবে।

রাজ-সভায় গানের আসর বসালেন রাজা অর্সিনো। সভাসদ পরিবেষ্টিত হ'য়ে কিন্নর কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরীর মধ্য দিয়ে মনের বিষাদ কাটিয়ে পেতে চাইছেন একটু শান্তি—একটু সুখ।

রাজা অর্সিনো গানের আসরে বসে বলে উঠলেন,—সঙ্গীত যদি প্রেমের তুল্য হয় —তবে গাও গান। গানে গানে আমার মন ভরে দাও। আমার মন প্রাণ জুড়ে বিরাজ করুক গানের সুর-তাল-ছন্দ। নদীর তীরের ভায়োলেট ফুলের বাগান থেকে মৃদুমন্দ বাতাস যেমন মিষ্টি-মধুর গন্ধ বয়ে আনে। মানুষের মনকে মাতোয়ারা ক'রে দেয় সে যাদুভরা গন্ধ। তেমনি গানের সুর-ছন্দ-লহরী চুপি চুপি এসে আমার মন ভরে দিক।

গান চলছে—সুর-ঝংকারে সভাকক্ষ চমকিত। কিন্তু হায়। কিছুতেই রাজা অর্সিনোর মানসিক ভাবান্তর হচ্ছে না তো! মনে নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা কেটে গিয়ে স্থিরতা আসছে কই? গান যে তার চোখের পাতায় প্রেমের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিতে পারছে না। সেই মাদকতাই বা কোথায়? বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবার।

হঠাৎ রাজা অর্সিনো তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—থামাও—থামাও গান। গান চাই না আমি।—মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন—হে দেবতা—প্রেমের দেবতা! তুমি কী চঞ্চল! সাগরের মত মানুষকে বুকে টেনে নাও, সবার বুকে বইয়ে দাও প্রেমের ফোয়ারা। কিন্তু মানুষ নিতান্তই অজ্ঞ। প্রেমের বিচিত্ররূপ মানুষ বুঝতে পারে না।

রাজা অর্সিনোর সহচর কিউরিয়ো। প্রভুর কাছাকাছি পাশাপাশি অবস্থান করে তাঁর মনোরঞ্জনই একমাত্র কাজ। গান প্রভুর মানসিক অস্থিরতা কাটিয়ে শান্তি আনতে পারছে না, লক্ষ্য করে বলল,—প্রভু, শিকারে যাবেন কি?

রাজা শুধোলেন—শিকার?

—হ্যাঁ শিকার।

—কি শিকারের কথা বলছ কিউরিয়ো?

—শিকার। শিকার করতে যাবেন কিনা, জিজ্ঞেস করছি মহারাজ।

—তুমি কি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারনি কিউরিয়ো, নাকি বুঝেও না বোঝার ভান ক'রে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছ?

রাজা অর্সিনো'র কথায় কিউরিয়ো যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি ঢোক গিলে হাত কচলে কোনরকমে জবাব দিলেন, মহারাজ অন্য কোন কথা বলছি না, বলছি শিকার—

রাজা অর্সিনো তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তির্যকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধোলেন—কি কিউরিয়ো? কি শিকারের কথা বলতে চাইছ তুমি? কোন বিশেষ

ইঙ্গিত—

—ইঙ্গিত? এতে আবার ইঙ্গিতের কি থাকতে পারে মহারাজ? আমি—

—তুমি কি মৃগের—

কিউরিয়ো বললেন—হ্যাঁ, মৃগ! মৃগের সন্ধান! যাবেন কি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা সহচর কিউরিয়োকে বললেন,—এক চঞ্চলা হরিণীই যে আমার মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে। সেই রূপসী তন্বী যুবতীর কাজল-কালো চোখের সন্ধানে আমার চঞ্চল মন ছুটে বেড়াচ্ছে, আবার কখনও শিকারী কুকুরের মত তার পিছু পিছু হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করছে।

কথার মাঝখানে রাজসভায় প্রবেশ করল ভ্যালিনটাইন। রাজার অপর এক সহচর হচ্ছে এই আগন্তুক যুবকটি। তার আকস্মিক আগমন লক্ষ্য করে রাজা বললেন—ভ্যালেনটাইন, কি সংবাদ, বল।

ভ্যালেনটাইন নিয়ে এসেছে দুঃসংবাদ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিবেদন করল—প্রভু, সবই বৃথা হয়েছে—তাঁর দেখা পেলাম না।

রাজা অর্সিনো আঁৎকে উঠলেন—সে কী কথা ভ্যালেনটাইন?

—হ্যাঁ, মহারাজ!

—তুমি ওর দেখা পেলে না?

—না, মহারাজ!

রাজা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ভ্যালেনটাইনের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—আমি বিশ্বাস করি না।

সে আমার দুর্ভাগ্য মহারাজ।

—কি করেই বা বিশ্বাস করি বল তো? তোমার মত একজন চালাক-চতুর লোক খোঁজ করেও তার দেখা পেলে না, এটা একটা কথা—

—মহারাজ অধমের অপরাধ নেবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই বা করুন, আমি যে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি, এতে কোন ভুল নেই।

—ভাল কথা, সাধ্যাতীত চেষ্টা করেও তুমি ওর কোন হদিস পেলে না, এই তো?

—না, মহারাজ, কিছুতেই দেখা পেলাম না।

—যাও ভ্যালেনটাইন, আবার চেষ্টা করগে। যেখানে থাক, পাতালের ভেতরে লুকিয়ে রাখলেও তোমায় তার খোঁজ আনতে হবে, আমি তাকে চাই।

—অসম্ভব মহারাজ!

—অসম্ভব! কেন অসম্ভব?

তাঁর সখীর মুখে শুনলাম—সাত বছর বাইরের প্রকৃতি আর তাঁর মুখখানির দেখা পাবে না। মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না। এ-দীর্ঘ সময় তিনি মঠবাসিনী তপস্বিনীর মত গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ রেখে শুধু কেঁদে বুক ভাসাবেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি

ভাইয়ের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে চাইছেন।

অর্সিনো বিচক্ষণ। প্রেমের গতি তাঁর নখ-দর্পণে। ম্লান হেসে তিনি বললেন—মৃত ভ্রাতার স্মৃতি যেন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ধরে রাখেন ? কিন্তু প্রেমের দেবতা যেদিন তাঁর শর-সন্ধান করবেন, সে শরে যেদিন বিদ্ধ হবেন—সেদিন কি ভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। দূরন্ত প্রেম যে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—কি করে বাঁচাবেন নিজেকে ? আমি এবারে উদ্যানে যাব। ফুলের ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াব। উদ্যানেই যদি প্রেমের বাস হয়, সেখানেই আমি আমার প্রেমকে খুঁজে পাব। কথা বলতে বলতে রাজা সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

রাজা অর্সিনো রূপসী অলিভিয়ার প্রেমে উন্মাদপ্রায়। প্রেমের কাছে নিজেকে অকাতরে সঁপে দিয়ে তিনি সঙ্গীত ও মৃগয়ার মধ্য দিয়ে শান্তির সন্ধান করছেন। সেখানেও ব্যর্থ হতে হয় তাঁকে। অনন্যোপায় হয়ে কাননের নিভৃতে কালযাপন করছেন শোকাহত রাজা।

পাঠক চলুক রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে—বহু দূরে সমুদ্র সৈকতে কি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে চলেছে একবারটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আসি।

গত রাত্রের কথা। সমুদ্র ছিল ভীষণ অশান্ত—উত্তাল। অফুরন্ত জলরাশি ফুলে ফেঁপে চারদিক কাঁপিয়ে তুলেছিল। আজ অবশ্য সমুদ্রের সে-রুদ্র রূপ আর নেই। ভোর হতে না হতেই শান্ত সৌম্য রূপ ধারণ করেছে বিশাল জলরাশি। কালনাগিনীর মত তাঁর ভয়াল ফণা আজ নত। সে নিরবচ্ছিন্ন গর্জনও যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। সমুদ্রতীরে কয়েকজন নাবিক নজরে পড়ছে। শুধু নাবিকরাই নয়, তাদের সঙ্গে এক রূপসী তন্বী যুবতীকেও দেখা যাচ্ছে। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে গত রাত্রির জাহাজডুবির ফলে এরা আশ্রয়হীন—সহায়সম্বলহীন। রূপসী যুবতীটি কে ? —নাম তাঁর ভায়োলা। নাবিকদের সঙ্গে আলাপরতা তিনি। পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন—বিভ্রান্ত তিনি। চোখে-মুখে দুঃখের সুস্পষ্ট ছাপ। এত বিষণ্নতার মধ্যেও সুন্দরীর প্রতি মন আকর্ষিত হয়।

ক্যাপ্টেনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন কাজের ফাঁকে মুখ তুলে তাকালেন। ছোট্ট করে উত্তর করলেন—বলুন।

—দেশটা খুবই অপরিচিত মনে হচ্ছে। কোনদিন এ-দিকে এসেছি বলে মনে হচ্ছে না তো। একটা বেশ বড় ঢেউ বহু দূর থেকে ফুলে-ফেঁপে এগিয়ে এসে তাদের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। মাস্তুলটা আচমকা দুলে উঠল। ভায়োলা কোন রকমে ঝাঁকুনিটুকু সামলে নিয়ে বললেন—ক্যাপ্টেন, সত্যি সুন্দর এই দেশটা। যে কোন সৌন্দর্য পিপাসু মনকে আকর্ষণ করবে।

ক্যাপ্টেন বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের এত কাছে এমন সুন্দর একটা দেশ আছে আগে কোনদিন ভাবতেও

পারি নি তো। অঙ্গুলি নির্দেশ করে আবার বললেন—ঐ…ঐ দেখুন…কি ওটা ?

ক্যাপ্টেন ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির প্রলেপ ফুটিয়ে তুলে বললেন—ওগুলো পাহাড়ের চুড়ো। তবে খুবই ছোট ছোট ওগুলো। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কোন রকমে মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিচ্ছে। শুধুমাত্র সাগরকে নিয়ে তৃপ্ত নয় হয়ত, জল থেকে উঁকি দিয়ে নীল আকাশ দেখে নিচ্ছে।—কথা কটা ছুঁড়ে দিয়ে ভায়োলার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

—পাহাড়ের চুড়োগুলো কেমন মোচার অগ্রভাগের মত মাথা বের করে রেখেছে, তাই না ? সর্বনাশের কারণও বটে।

হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। অন্ধকারে ছুটে গিয়ে যে কোন সময় নৌকো দ্বীপের গায়ে আচমকা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলা বললেন—আচ্ছা ক্যাপ্টেন—

ক্যাপ্টেন বললেন—বলুন।

—ক্যাপ্টেন, আপনি তো এ-পথে বহুবার এসেছেন, তাই না ?

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, এ-কাজ যখন করি, জলই যখন আমাদের ঘর-বাড়ি, হামেশাই এ-পথে আসতে হয়।

—আচ্ছা ক্যাপ্টেন, কিছুদিনের মধ্যে এ-সবের অঞ্চলে কোন নৌকোডুবি হয়েছে, শুনেছেন ?

—কই, কোন নৌকোডুবির কথা শুনিনি তো।

—এটা কোন্ রাজ্য বলুন তো ? আমরা এখন কোথায় ?

উত্তর দিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন বললে—রাজ্যের নাম ইউলিরিয়া।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলা বললেন—এখানে কী করব আমি ? ভাই আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমার অবুঝ মন যে মানে না। মন বলে তার মৃত্যু হয় নি, সে বেঁচে আছে। সে কিছুতেই ডুবে যেতে পারে না। আচ্ছা ক্যাপ্টেন, এ-ব্যাপারে তোমার কি মনে হয় ?

ক্যাপ্টেন বলল—আমিও তো তা-ই মনে করি।

তার কথায় ভায়োলা আশান্বিত হলেন। উল্লসিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন—তবে নিরাশা নয়! আশা আছে! আমারই মত আমার ভাইও বেঁচে আছে ?

ক্যাপ্টেন উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, এটাই তো সম্ভব। বেঁচে থাকাটাই সম্ভব। জাহাজ ভেঙে গেলে যখন আমরা আপনার সঙ্গে ভাসছি, তখন আপনার ভাইকে দেখেছি। তিনি তখন নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে—মাস্তুল আঁকড়ে ধরে জলে ভাসছেন। এ-যেন গ্রীক উপকথার নায়ক এরিয়ন—তিনি সিসিলি থেকে ফিরছিলেন। এমন সময় নাবিকরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে, নিরুপায় দেখে তিনি জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে ভাসতে ভাসতে তিনি করুণ সুরে গান ধরলেন।

তার গানে মুগ্ধ হয়ে এক শুশুক ছুটে এসে নিজের পিঠে বহন করে তাকে নিরাপদ তীরে পৌঁছে দেয়। আপনার ভাইকেও ঠিক তেমনি অবস্থায় দেখেছি। তাকে ঢেউয়ের সাথে মিতালী পাতাতে দেখেছি।

ভায়োলা উচ্ছ্বসিত আবেগে বললে—ক্যাপ্টেন, এই শুভ সংবাদ দানের জন্য এই নাও তোমার পুরস্কার। বাঁচলাম আমি, এমনিতেই আমার মনে আশা জেগেছিল তার ওপর তোমার কথায় আমার মনের সে আশা সুদৃঢ় হল। এ-রাজ্য কি তুমি চেন?

ক্যাপ্টেন আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন—চিনি। খুব ভালই চিনি। আমার তো এখানেই জন্ম। বাল্যের, কৈশোরের ও যৌবনের দিনগুলো আমার এখানেই কেটেছে। আমার বাড়িও এখান থেকে বড় একটা দূরে নয়—মাত্র ঘণ্টা তিনেকের পথ।

ভায়োলা বললেন—এ রাজ্যের রাজা কে? কি নাম তাঁর?

ক্যাপ্টেন বললেন—এক সামন্তরাজ। নাম তাঁর অর্সিনো।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে ভায়োলা বললেন,—অর্সিনো! নামটা। কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! বাবার কাছে শুনেছি, কিন্তু তিনি তো কুমার ছিলেন?

ক্যাপ্টেন পূর্বস্বর অনুসরণ করে বললেন, এখনো তাই আছেন। মাসখানেক আগেও শুনেছি বিয়ে করেন নি।

আগ্রহ প্রকাশ করে ভায়োলা জিজ্ঞেস করলেন—কি বললেন? তিনি অবিবাহিত?

ক্যাপ্টেন ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মুচকি হেসে তার কথার জবাব দিলেন—হ্যাঁ, তিনি এখনও কাউকেই পত্নীর সম্মান দিয়ে বুকে টেনে নেননি।

—আপনি ঠিক জানেন, নাকি অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলছেন, ক্যাপ্টেন?

ক্যাপ্টেন রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন—অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথা বলা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। নিজে নিঃসন্দেহ না হয়ে কোন মন্তব্যই আমি করি না। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আমি যা বলেছি প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য।

—তবে কি তিনি চিরকুমার থাকবেন মনস্থ করেছেন?

রূপসী অলিভিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার কথা। এক আমীরের মেয়ে তিনি। রূপে-গুণে অনন্যা। বছর খানেক আগে বাপ মারা গেলেন। অভিন্ন হৃদয় এক ভাই ছিল। আজ সে-ভাইও আর ইহজগতে নেই। আজ তিনি গৃহকোণে আশ্রয় নিয়েছেন সেখানেই স্বেচ্ছায় বন্দিনী-জীবনযাপন করছেন—প্রতিনিয়ত চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোন না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভায়োলা বললেন—আহা! এমন মেয়ে! ওঁর দাসী হতে পারলেও যে জীবন ধন্য হয়ে যায়! আহা! আমিও যে অমনি হতে চাই।

ক্যাপ্টেন বললেন—কিন্তু সে যে বড়ই কঠিন কাজ। যে কেউ তো দূরের কথা, রাজাকেও আমল দেন না তিনি।

ভায়োলা কি যেন ভেবে বললেন—নাবিক, তুমিই খুব ভাল লোক। তোমাকে উপযুক্ত অর্থে পুরস্কৃত করব। তোমাকে কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখতেই হবে।

আমার মনের মত একটা ছদ্মনাম এনে দিতে হবে। আমি ঐ রাজার সেবা করব, তাঁর দাসী হব। আর তোমাকে শুধুমাত্র আমাকে ডিউকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর বলবে আমি তাঁর সেবা করতে চাই। আমি ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর খোজা-ভৃত্য হতে চাই। আর তুমি যা যা বলবে আমি তার অযোগ্য হব না। আমি গান জানি, গলার সুরের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবা করব আমি। তারপর আমার ভাগ্যে যা ঘটবে ঘটুক।—যে কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরী। তোমাকে আমার এ-অনুরোধটুকু রাখতেই হবে। ক্যাপ্টেন শোকসন্তপ্তা যুবতী ভায়োলার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন—বেশ, কথা দিচ্ছি খোজার ছদ্মবেশে আমি আপনাকে সাজাব। আশান্বিত হয়ে আবেগভরে ভায়োলা নাবিকদের নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

রূপসী যুবতী অলিভিয়ার গৃহ। গৃহের সর্বত্র আভিজাত্যের ছাপ। এক নজরে দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায় কোন বনেদী পরিবারের বাসস্থল।

দামী মেহগনি কাঠের আসবাবপত্র। ঘরের প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস পর্যন্ত অত্যন্ত যত্ন সহকারে সাজানো। প্রথম দর্শনেই গৃহকর্তার রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অগাধ চিত্তের অধিকারী না হলে কোন মানুষের মধ্যে এমন রুচিবোধের প্রকাশ সম্ভব নয়। অর্থই মানুষকে সৌখিনতার প্রতিটি ধাপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর কিছু না হোক, অন্নবস্ত্রের চিন্তায় যে লোক চমৎকার তার মধ্যে রুচিবোধ সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে সত্য, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। এ-ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে বলে মনে হয় না।

অলিভিয়ার কাকা সার টবিবেলস্। দাদার মৃত্যুর পর তিনিই এ-বাড়ির সর্বেসর্বা। অলিভিয়ার একমাত্র অভিভাবক। কার্যতঃ তিনি কিন্তু অভিভাবক বলতে যা বুঝায় প্রকৃতপক্ষে তার যোগ্য নন। নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ, সে সঙ্গে একজন পাঁড় মাতাল।

সর্বদা রসের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। সকাল হতে না হতেই মদের গ্লাসের খোঁজ শুরু হয়ে যায়। আর কিছু থাক না থাক মদের একটু ঘাটতি হলে আর রেহাই নেই, কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করে ছাড়েন। শুধু কি মদ? মদের আনুষঙ্গিক যে সব দোষ মানুষকে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে নিয়ে যায় তাদের সব কটিই রক্ত মাংস-মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এক কথায় অপদার্থের এক শেষ। তাই কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় অলিভিয়াই তাঁর অভিভাবক। বাড়িতে পা দিতেই তাঁর সঙ্গে দাসী মেরিয়ার দেখা হয়ে গেল। সদর দরজা দিয়ে শরীরটাকে কোন রকমে গলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে দু'পা এগিয়ে এলেন। শরীর রীতিমত টলছে, দেহের ভার বইবার সামান্য শক্তিটুকু পর্যন্তও যেন হারিয়ে বসেছে। কোন রকমে দেয়াল ধরে টালটুকু সামনে নিলেন। মেরিয়া পাশেই কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে ছুটে এসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। অলিভিয়ার জন্য সে বড়ই উদ্বিগ্ন। এ-ব্যাপার নিয়ে তাঁরা আলাপ জুড়ে দিলেন।

স্যর টবি বললেন—আরে ব্যাপারটা কি বল দেখি? ছুঁড়িটা ভাইয়ের মৃত্যুকে একেবারে এ-ভাবে নিলে? এ-যে দেখছি জীবনমরণ সমস্যা। ভাবনা-চিন্তা যে ওর জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দেবে।

মেরিয়া চাপা সুরে বলল—তা বাবু, রাত্রে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরলেই পারতেন। এতে যে আপনার ভাইঝির খুবই আপত্তি। কেন এত রাত্রি করেন?

স্যর টবি আচমকা মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ। মেরিয়ার চোখে চোখ রেখে শিশুর মত সহজ-সরল ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন—অনেক রাত্রি হয়ে গেছে বুঝি?

মেরিয়া বলল—রাত্রিতো হয়েছেই। দেখছেন না পাড়ার সব বাড়ির আলো নিভে গেছে।

—তাই বুঝি?

—তা নয়ত কি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখুন, কোন বাড়ির আলো দেখা যায় কি না।

স্যর টবি চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করলেন।

মেরিয়া তাঁকে বাধা দিয়ে বলল,—থাক, আর আপনাকে উঠতে হবে না। সব বাড়ির আলো তো নিভেছেই, চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ।

স্যর টবি তেমনি শিশুসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললেন—হ্যাঁ, তবে অনেক রাত্রিই হয়েছে। তুমি যখন বলছ মেরিয়া, অবশ্যই রাত্রি হয়েছে—

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে এক সময় আবার মুখ খুললেন—মেরিয়া, তোমরা আমার সঙ্গে কেন এমনটা কর বল দেখি?

মেরিয়া বিনয় প্রকাশ করে বলল—কি?

—কি আবার, ঐ যে বললাম—

—কি? কি বললেন?

অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন—মেরিয়া, তোমরা তো জান, আমি একটু-আধটু নেশা করি—

'একটু-আধটু' নেশার কথা শুনে মেরিয়া মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

মেরিয়ার অর্থপূর্ণ হাসিটুকু স্যর টবি'র দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি প্রতিবাদের সুরে বললেন—কি, মেরি তুমি হাসছ যে?

মেরিয়া ব্যাপারটাকে চাপা দিতে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল—কিছু না। তবে আমার অনুরোধ আপনি বাড়ি ফিরতে এত রাত্রি করবেন না।

স্যর টবি বললেন—কেন? কেন মেরিয়া, তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, তাই না?

মেরিয়া চমকে উঠল। আমার কথায় আপনি শেষ পর্যন্ত এই বুঝলেন?

—আমি কি কোন ভুল করেছি মেরিয়া? তোমার কথার অর্থ কি আমি ধরতে

পারিনি ?

—রাত্রি করলে আমার অসুবিধা হয়, এ-কথা আমি আপনাকে বললাম নাকি ?

—দিদিমণি'র কথা একবারটি ভেবে দেখেছেন কি ?

সহজভাবেই জবাব দিলেন স্যার টবি—ঠিক কথাই তো। রীতিমত আপত্তিকর ব্যাপার বলেই তো আপত্তি করেছে। এতো খুবই স্বাভাবিক কথা।

উত্তর দিতে গিয়ে মেরিয়া বললেন—কিন্তু উনি যা বলেন তা তো শোনা উচিত। এই যে বোতল বোতল মদ গিলে বাড়ি ফেরা, কাল উনি কতই না বকলেন। তার ওপর এই বোকা-হাঁদা যোদ্ধাকে বাড়ি নিয়ে এলেন তার সঙ্গে ভাব করাতে। স্যর টবি সোজা হয়ে বসে বললেন—কে ? কার কথা বলছ তুমি ? আন্দ্রু আগুচেকের কথা ?

—তাছাড়া আবার কে ?

—তাঁর মত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ সারা ইটালিয়ায় একটিও পাবে ?

—তা যদি হয়ও, তাতেই বা কি বয়ে গেল ?

—আরো বোকা, চার হাজার টাকার কাছাকাছি তার বছরে আয়।

—তা হলই বা। আন্দ্রু যেমন বোকা হাঁদা আর ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে প্রকৃতির, সব বিষয় সম্পত্তি এক বছরেই উড়িয়ে দেবে।

—ছিঃ ছিঃ সে কী কথা ! এ কী বলছ তুমি ! লোকটা সত্যি একজন সত্যিকারের গুণী। ভাল বেহালা বাজায়, তিন-চারটে ভাষাও অনর্গল বলে যেতে পারে। প্রকৃতি সাধ্যমত সব গুণই ওর মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। এক বিন্দুও মিথ্যে বলি নি।

ওর গুণ একেবারে গলা পর্যন্ত, তাই না ?

—তোমার কথাগুলো কেমন তির্যকপূর্ণ মনে হচ্ছে।

—না, না—তুমি যার গুণের কথা বলতে একেবারে পঞ্চমুখ, আমি কি তার সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করতে পারি কখনও। তবে তোমার বিচার-বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না।

—এটাও কি তোমার বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য নয় ? স্যর টবি বললেন ?

তিনি কোন কথা না বলে মুচকি হেসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

স্যর টবি এবার বললেন—যে লোক সত্যকারের গুণী, যার মধ্যে হাজারো গুণের সমাবেশ ঘটেছে, সে-কথা স্বীকার করতে হবে। লোকটা প্রকৃতই গুণী সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

—আহা রে! গুণের বহর দেখে বাঁচিনে। প্রকৃতির গুণে গুণে একেবারে ভরপুর! তার ওপর ঝগড়াটে—এগুণেরও দাবী করতে পারে। সবই পেয়ে গেছে মানুষের পক্ষে যা যা সম্ভব, এখন কবরে যাওয়াটাই শুধুমাত্র বাকী—এই যা।

বিরক্তি প্রকাশ করে স্যার টবি গম্ভীর স্বরে বললেন,—নিন্দুকেরা তো

রাজরাজড়াদেরও নিন্দা করে। যারা এ-রকম কাজে অভ্যস্ত তারা তো কুট, পাজী ও হতচ্ছাড়া এক কথায় বিশ্বনিন্দুক। আচ্ছা কারা কারা এ-রকম বলে বেড়ায় বল তো?

হাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হল মেরিয়া। হাসি থামিয়ে এক সময় সে বলল —শুধু কি তাই-ই?—ওরা এ-ও বলে তিনি নাকি প্রতি রাত্রেই আপনার সঙ্গে নেশা করে একেবারে বুঁদ হয়ে থাকেন।

—আমি তো ঠিক নেশার জন্য মদ খাই না, আমার ভাইঝির স্বাস্থ্য পান করি। আমার গলায় যতক্ষণ সামান্যতম স্থান অপূর্ণ থাকবে আমি স্বাস্থ্য পান করবই।—ঐ—ঐতো স্যার আন্দ্রু আগুচেক এসে গেছেন।

আন্দ্রু ঘরে প্রবেশ করেই হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন—ওগো মশায়, ও সার টাববেলস এবং স্যার টেঁকুর, আপনারা আছেন কেমন?

উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—ভাল আছি; ভাল আছি।

মেরিয়ার দিকে ফিরে ম্লান হেসে বললেন—তোমার মঙ্গল হোক সুন্দরী।—মঙ্গল হোক।

মেরিয়া চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে বলল,—আপনারও মঙ্গল হোক।

আন্দ্রু আবার বললেন—কই স্যার টবি, সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না তো?

স্যার টবি বললেন—এ আমার ভাইঝির পার্শ্বচরী সহচরী। আন্দ্রু আবেগ মিশ্রিত স্বরে বলে উঠলেন—আলাপ চাই। একটু ঘন আলাপ চাই। আর একটু কাছাকাছি পাশাপাশি অন্তরঙ্গ পরিচয় দরকার।

আন্দ্রু কথাটি হাল্কাভাবে ছুঁড়ে দিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

স্যার টবি পাশেই দাঁড়িয়ে থাকলেন।

মেরিয়া কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কেউ তাকে নবাগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, কিনা। স্যার টবিকেও নির্বাক-নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেই দু'পা এগিয়ে আন্দ্রু'র মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর নিজের পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

আন্দ্রু মুচকি হেসে বললেন—কেউ যদি নেহাৎই পরিচয় না করিয়ে দেয়—আমাদেরই অগ্রণী হয়ে পরিচয়ের পর্বটুকু সেরে নিতে হবে, কি বলেন?

মেরিয়া গালে টোল ফেলে মুচকি হাসির মাধ্যমে তাঁর কথার সমর্থন জানাল।

আন্দ্রু এবার বললেন—কি সুন্দরী, মিথ্যে বলেছি? যাক, এবার তোমার কথা কিছু বল সুন্দরী। তোমার পরিচয় দিয়ে আমার কৌতূহলী মনকে শান্ত কর।

—পরিচয় কি আর দেব, বলুন তো? পরিচয় দেবার মত কি-ই বা আমার আছে যার দ্বারা আপনাকে তুষ্ট করতে পারি।

—তবুও কিছু বল। তোমার মুখের দুটো কথা শোনার জন্য বড়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য

বোধ করছি। বোবার মত মুখ বুজে থেকো না সুন্দরী। যা হোক কিছু বলে আমার অশান্ত মনকে শান্ত কর।

মেরিয়া নিজে থেকেই বলল,—আমার নাম মেরিয়া।

আন্দ্রু অকস্মাৎ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে একেবারে গলে গেলেন—আহা! কী ভাল মেরিয়া! কী আলাপী! সচরাচর এমনটি আর হয় না।

মেরিয়া বিরক্তির স্বরেই বলল—আচ্ছা, আমি কি এখন আসতে পারি?

স্যার টবি বাধা দিয়ে বললেন—খবরদার এ-কাজও করবেন না মশায়! যদি এমনিভাবে সুন্দরীকে বিদায় দেন, তবে যে জীবনেও হাতিয়ার ধরতে পারবেন না।

স্যার আন্দ্রু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথায় সম্মতি জানাতে গিয়ে বললেন—ঠিক! আপনি তো ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা সুন্দরী, তুমি যদি আমাকে এমনিভাবে হতাশ করে চলে যাও তবে যে জীবনেও আমার পক্ষে হাতিয়ার খেলা হবে না। আচ্ছা সুন্দরী, তোমার হাতে ভাঁড় আছে?

মেরিয়া ছোট্ট করে হেসে বলল,—থাকবে কি করে? আপনাকে যে এখনও হাতে পাই নি।

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আন্দ্রুর নেই। না বুঝেই বোকার মত বলে উঠল—এই তো আমি তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।—নাও, আমাকে নাও।

মেরিয়া মুখে দুষ্টুমী ভরা হাসির ছোপ ফুটিয়ে বলল—হাত তো শুকনো একেবারে খটখটে।

স্যার আন্দ্রু তাঁর কথার প্যাঁচ বুঝতে না পেরে বললেন—তা তো ঠিকই। তবে হাত শুকনো রাখতে আমি জানি। কিন্তু সুন্দরী, তোমার রসিকতা তো বুঝতে পারলাম না—স্পষ্ট করে দেখি—

মেরিয়া অনুরূপ হেসে বলল—এ এক শুকনো রসিকতা। কথাটা বলেই মেরিয়া হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্যার টবি এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে সব কিছু প্রত্যক্ষ করছিলেন। মেরিয়া চলে গেল তিনি বললেন—ওগো বীর যোদ্ধা মশাই, ভিজে মুড়ির মত এমন করে মিইয়ে গেলে কেন? তোমার কি এক পাত্তর দরকার?

স্যার আন্দ্রু মেরিয়ার ফেলে যাওয়া পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন। সে চোখের আড়ালে চলে গেলে তার ফুসফুস নিঙড়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। স্যার টবি'র কথা লক্ষ্য করার তাঁর সময় কোথায়। মেরিয়া'র রূপ-সৌন্দর্য যে তাঁর মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

স্যার টবি তাঁর কাছ থেকে কোন রকম সাড়া শব্দ না পেয়ে আবার বললেন—কিগো, তুমি যে হঠাৎ কেমন চিপসে গেলে?

স্যার আন্দ্রু আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে স্যার টবি র দিকে ঘাড় ঘোরালেন। মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কি? আমাকে কিছু বলছ?

স্যার টবি একটু বিরক্তির স্বরেই জবাব দিলেন,—কই, তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে তো এখানে দেখছি না।

আন্দ্রু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন—কি ? কি বলছ ?

—বলছি যে, হে বীর যোদ্ধা এক পাত্তর গলায় পড়লে হয়ত তোমার ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা একটু কাটত।

—মদ ? মদের কথা বলছ ?

হ্যাঁ, মদ। যদি বল তো আনতে বলি। গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও ; শরীর ও মন দুই-ই সতেজ হবে। আনতে বলব কি ?

স্যার আন্দ্রু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন—মদ তো আমাকে নিভিয়ে দেয় না। কিন্তু কখনও কখনও একেবারে কেমন যেন হাঁদা-ভোঁদার মত করে ফেলে। আমি গরুর মাংস বেশী খাই বলেই বোধ হয় বুদ্ধি এমন ভোঁতা হয়ে গেছে।

স্যার টবি এক গাল হেসে বললেন,—তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

স্যার আন্দ্রু বললেন—ভাল কথা, কাল আমি বাড়ি যাচ্ছি। তোমার ভাইঝির চাঁদবদন দর্শন আমার ভাগ্যে জুটল না। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা কোন দিনই সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি বাজি রাখতে পারি, তিনি মোটেই আমাকে চান না। ঐ হতচ্ছাড়াটা তাঁর পিছন পিছন ছোঁক ছোঁক করছিল।

—কি বললে ?

—ঐ যে ঐ নচ্ছারটার কথা বলছি।

—কে ? কার কথা বলছ, স্পষ্ট ক'রে বল।

—এর চেয়ে স্পষ্ট করে তোমাকে বলতে হবে জেনে আশ্চর্য হচ্ছি। ঐ যে, ঐ আমীরের কথা বলছি।

স্যার টবি বললেন—আমীর ?

—হ্যাঁ, ঐ নচ্ছারটা একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল দেখছি। আমার এতদিনের আশা-ভরসায় ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে।

—আমীর'কে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছ দেখে আমিও কম অবাক হচ্ছি না।

—তুমি অবাক হচ্ছ ? কিন্তু ঐ নচ্ছারটা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন তোমার ভাইঝি র মনের নাগাল পাওয়া আমার অলীক কল্পনা মাত্র।

—না, অসম্ভব। কাউন্টকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। তার চেয়ে যার বয়স বেশী তাকে সে বিয়ে করতেই পারে না। বুদ্ধিতে বড়, এমন কি সম্পত্তিতে বড় হলেও না। এ-কথা আমি ওকে হলফ করে বলতে শুনেছি।

স্যার আন্দ্রু আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ ক'রে বললেন—আহা। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। তোমার কথা যদি সত্য হ'ত—

স্যার টবি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—যদি নয়, আমার কথায় পুরোপুরি আস্থা রাখতে পার। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি—

স্যার আন্দ্রু অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে আবার বললেন—আমি ভেবে পাচ্ছি না, এটা তুমি বিশ্বাস ক'রলে কি ক'রে! যে কাউণ্টকে সে দুচোখ পেতে দেখতে পারে না। যার মুখের কথা শুনলে তার গায়ে জ্বালা ধরে যায়, সেই হতভাগা বুড়ো হাবড়া'কে সে ক'রবে বিয়ে। সত্যই তুমি হাসালে ভাই।

—তুমি হাস, ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস ক'রতে পারিনে।

—তা না হয় না-ই বা করলে। কিন্তু তুমি এমন কি দেখলে যার জন্য এমনভাবে হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছ?

—আমি দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি কাউণ্ট তার পিছনে অষ্টক্ষণ কেমন ঘুর ঘুর ক'রে। এমন একটা ভাব যেন এক মুহূর্ত চোখের আড়াল ক'রলে একেবারে অন্ধকার দেখে। আশা করি এমন দৃশ্য তোমার চোখেও বহুবার পড়েছে, তাই না?

—হ্যাঁ, একশ বার। অস্বীকার করছি না।

—তবে?

—এতেই কি প্রমাণ হয় যে, সে কাউণ্ট'কে বিয়ে করবে? কাউণ্ট তার পিছনে পিছনে জোঁকের মত লেগে থাকে সত্য।

—শুধু কি তা-ই! কেমন লালসা মাখানো ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, এ ও অবশ্যই দেখে থাকবে?

—হ্যাঁ, তা-ও দেখেছি, অস্বীকার করছি না।

—সবই যখন স্বীকার করে নিচ্ছ, তবে অস্বীকার কি করছ, তা-ও তো আমি বুঝতে পারছি না।

স্যার টবি এবার রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্যক্ত ক'রলেন—অস্বীকার করছি একটামাত্র কথা, তুমি যে বললে, সে কাউণ্ট'কে বিয়ে করবে, এই কথাটা।

—তবে—তবে কি আর এক মাস থেকেই যাব? একটু আধটু আশার আলোক দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে। সত্যই আমি একটি অদ্ভুত মানুষ। মুখোস নাটকে একটু আমোদ-স্ফূর্তি, একটু হৈ-হুল্লোড়, আমি বড় ভালবাসি।

—আহা সে কথা আর বলতে! এ-সবে তো তুমি একেবারে প্রথম সারির প্রথম।

—সে তো নিশ্চয়। সে তো নিশ্চয়।

—আচ্ছা আন্দ্রু, বড় যোদ্ধার কাজ কি বলতে পার?

—সে তো খুবই সোজা। যে ভাল নাচতে জানে সেই তো বড় যোদ্ধা। আর আমার মত পেথম নাচ নাচতে সারা ইউলিরায় ক'জন জানে?

স্যার টবি হাসি চাপতে না পেরে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন—বন্ধু এগুলো এতদিন তবে কেন চেপে রেখেছিলে? তোমার মধ্যে এতগুণ। তাই বলি, তোমার পায়ের এমন সুডোল গঠন হ'ল কি ক'রে। তোমার এমন সুন্দর পা দু'টো দেখে মনে হয় নাচের

লগ্নেই তোমার জন্ম !

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। আমার পা দুটো খুবই শক্ত। চল যাই, এবার একটু সাইকেল ক'রে আসিগে।

—কি আর করব ? আমাদের লগ্নে রয়েছে তারাস গ্রহটি।

—সে কী কথা ! তারাস ! তিনি তো হৃদপিণ্ডে অবস্থান করেন।

—আরে এসব বাজে কথা। তিনি থাকেন পায়ে আর উরুতে। তুমি একটা কাজ করতে পার আন্দ্রু ?

—কি কাজ আদেশ কর বন্ধু।

—তোমার নাচ দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। যদি আমার আকাঙ্ক্ষা—

স্যর টবির মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই স্যর আন্দ্রু ধাড়ি ছাগলের মত ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। এ যেন রীতিমত প্রলয় নাচন।

স্যর টবি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। পেট ফাটা হাসি চেপে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত এক সময় বললেন—খুব নেচেছ—সুন্দর নাচ। থাক আর না, আবার পরে হ'বে। আমরা যেটা ভাল পারি, চল কয়েক পেগ মদ নিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিইগে।

রাজা অর্সিনোর প্রাসাদ।

খোজা-বেশী ভায়োলা এসেছেন প্রাসাদে। তিনি রাজদরবারে কাজ নিয়েছেন। রাজার ভৃত্য। রাজার সেবা করাই এখন তাঁর একমাত্র কাজ।

রাজপ্রাসাদে রয়েছেন ভায়োলা ছাড়াও অপর একজন। তিনি হচ্ছেন ভ্যালেন্টাইন। এখানে আসার পর থেকে ভায়োলা সিজারিয়ো নাম ধারণ করেছেন। এ-নামেই তিনি রাজপরিবারের কাছে পরিচিত।

এক সকালে ভ্যালেন্টাইন ভায়োলাকে বললেন—তিনদিনেই তো রাজার মন একেবারে কেড়ে নিয়েছ। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতায় রাজার চোখের মণিতে পরিণত হয়েছ। তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকাও রাজা অর্সিনোর পক্ষে সম্ভব নয়।

ভায়োলা হেসে বললেন—ভ্যালেন্টাইন, তুমি বোধহয় রাজার মন এবং আমার কাছে অমনযোগের কথা ভেবে খুবই ঘাবড়ে গেছ। তার ভাবছ রাজার চোখে আমি ক'দিন প্রিয়পাত্র হয়ে থাকতে পারব। আচ্ছা একটা কথা বল তো, তিনি কি অস্থির চিত্ত ? কয়েকদিন একজনকে পেয়ার করে তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নতুন লোককে কাছে টেনে নেন ?

ভ্যালেন্টাইন হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে বলে উঠলেন—না, না, ঠিক তা বলতে চাচ্ছি না।

এমন সময় কিউরিয়ো এবং তার অনুচররা সেখানে উপস্থিত হ'লেন।

ভ্যালেন্টাইন বলে উঠলেন—ঐ—ঐ তো রাজা আসছেন।

রাজা অর্সিনো সভাকক্ষে উপস্থিত হয়েই বললেন—সিজারিয়ো কোথায় ? সিজা-

রিয়োকে দেখেছ ?

রাজার মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ভায়োলা ছুটে এসে বললেন—হুজুর এই যে আমি হাজির।

অর্সিনো তাঁর অনুচরদের লক্ষ্য করে বললেন—তোমরা একটু দূরে সরে যাও।

রাজার নির্দেশ পাওয়া মাত্র সবাই দূরে সরে গেল। রাজা এবার সিজারিয়োকে ডাকলেন। তিনি কাছে এলে রাজা বললেন—সিজারিয়ো, তোমার কাছে কিছুই তো গোপন করিনি, সবই বলেছি। এমন কি আমার মনের একান্ত গোপন কথাও তোমার অজানা নয়। তাই হে তরুণ, তোমাকে বলছি, তুমি তোমার রূপ দিয়ে, তোমার অসীম গুণ দিয়ে তাঁকে বশ কর। দেখো, যেন তিনি বঞ্চিত না করেন। তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেবে তাঁর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত তুমি অমনিভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

ভায়োলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল। রাজা আবার বললেন—কি ? কথা বলছ না কেন ?

ভায়োলা ছোট্ট করে বলল—আপনার আদেশ শুনলাম।

—শুধু শুনলে ? কি ভাবছ কি ?

—এতে আবার ভাববার কি আছে বলুনতো ?

—ভাববার কিছুই নেই কি ? একটা গুরু দায়িত্ব তোমায় দিলাম, এ সম্বন্ধে তোমার কি মতামত—

—মতামত আবার কি থাকবে ?

—কোন মতামতই থাকবে না ? কাজটা—তোমার দ্বারা সম্ভব কিনা—তুমি কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারবে, কিনা—যা হোক কিছু তো বলবে ?

এতে তো কিছুমাত্র আপত্তির থাকতে পারে না।

—আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না, স্বীকার করছি। কিন্তু কাজটা আদৌ আমার দ্বারা সম্ভব কিনা—

—অসম্ভব হ'লেও তো কিছু করার নেই। যে কোন ভাবেই হোক অসম্ভবকে সম্ভব করতেই হবে।

—তবে তুমি যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

রাজা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বললেন—তবে কি আমি তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারি ?

ভায়োলা মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে ঘাড় কাৎ ক'রে বলল—হ্যাঁ, পারেন।

রাজা অর্সিনো আবেগ ভরে বলে উঠলেন—ধন্যবাদ। তোমার ওপর আমার আস্থা রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি কৃতকার্য হবেই।

ভায়োলা রাজার কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন,—প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে

পালিত হ'বে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তিনি এখন ভাইয়ের শোকে শোকসন্তপ্তা। নির্জন পরিবেশে এক নিরালা ঘরে থাকেন—উনি তো আমাদের দেখা দেবেন না প্রভু!

আর্সিনোর গম্ভীর স্বর শোনা গেল—যদি দেখা না-ই দেয়, চীৎকার করবে। প্রয়োজনবোধে সভ্যতার সীমা ছাড়াতেও ইতস্ততঃ করবে না। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসার চেয়ে এ অনেক শ্রেয়।

সিজারিয়োবেশী ভায়োলা এবার বললেন—স্বীকার করলাম তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, আমি কথা বললাম—তারপর?

ম্লান হেসে রাজা বললেন ভাল কথা, যদি এমন সুযোগ আসে আমার ভালবাসার কথা বলবে। আমার ভালবাসার কথা জানিয়ে তাঁকে চমক লাগিয়ে দেবে। আমার দুঃখ-বেদনা-হতাশার কথা তাঁকে নিবেদন করবে। আমার অন্তরের অন্তরতম কোণের গোপন কথা তুমিই তাঁকে জানাবে। তোমার তারুণ্য দিয়ে তাঁকে বিহ্বল করতে হবে, মুগ্ধ করে দিতে হ'বে তাঁর মন-প্রাণ।

চোখে-মুখে বিষণ্ণতার ছাপ এঁকে ভায়োলা বললেন—কিন্তু প্রভু, এ কী উচিত হ'বে? আমার মনে হয় কাজটা ঠিক হ'বে না!

রাজা আর্সিনো গর্জে উঠলেন—হ্যাঁ ঠিক হ'বে। অবশ্যই ঠিক হবে। সত্য যুবক, তুমি সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছ, এখন পূর্ণ মানুষ হ'তে পারনি। তাই তো তুমি সুন্দর, তুমি পবিত্র। দেবী ডায়ানার পূত পবিত্র দুটি অধরও তোমার চেয়ে যোগ্য নয়। যাও কিশোর, বিলম্বের কারণ নেই, এখনই যাত্রা কর।

সিজারিয়োবেশী ভায়োলা রাজার মুখ থেকে আরও কিছু কথা শোনার জন্য নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

রাজা তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন—কি ব্যাপার, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! কিছু বলবে আমাকে? তোমাকে নীরব দেখে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

—সন্দেহ? কিসের সন্দেহ মহারাজা?

—সন্দেহ হচ্ছে, তুমি হয়ত নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছ না। কাজের সাফল্য নিয়ে মনে সন্দেহ রয়েছে।

ভায়োলা কণ্ঠে দৃঢ়তা আনয়ন ক'রে বললেন—প্রভু, আপনার প্রনয়ণীর মন আমি জয় করব কথা দিচ্ছি। কথাটা শেষ করেই পিছন ফিরে ক্ষীণ কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলেন—এ যে কী লড়াই তা বুঝার সাধ্য আপনার নেই। আমি যাব তাঁর কাছে, জানাব আপনার ঐকান্তিক অনুরাগের কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমিই হ'ব আপনার পত্নী।

অলিভিয়ার বাড়ি। তার সুদৃশ্য ঘরটা দেখা যাচ্ছে। তিনি গৃহকোণে স্বেচ্ছা নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছেন। একমাত্র ভ্রাতার শোকে মুহ্যমান অলিভিয়া নির্জন

গৃহকোণ সম্বল করে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছেন। আমাদের পূর্ব পরিচিতা মেরিয়াকে দেখা যাচ্ছে। মেরিয়া এক ভাঁড়ের সঙ্গে আলাপরতা। এ-পেশাদারী ভাঁড়। গায়ে তার ঢিলে আলখাল্লা। এক নজরে তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখলেই যে কেউ তার পরিচয় স্থির করে নিতে পারবে। মানুষের সত্যিকারের একজন মনোরঞ্জনকারীই বটে। আজকের সমাজতন্ত্রের যুগে রাজদরবারে বড় একটা দেখা যায় না, সমাজের বুকেই তার অবাধ বিচরণ। সমাজের কাছে সে ক্লাউন বলেই পরিচিত। মেরিয়া ভাঁড়কে দেখতে পেয়েই বলে উঠল—কোথায় ছিলে? তোমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য মনিবাণী তোমাকে কি করেন দেখো।

ভাঁড় গম্ভীরভাবেই জবাব দিল—আগে থাকতে একটু বুঝিয়ে রাখলে ক্ষতি কি? দুনিয়ায় যে অন্যের কাঁধে ভর করে ঝুলে রয়েছে তার আর ভয় ডরের কি আছে? ফকিরের কাছা খোলার ভয় নেই।

মেরিয়া গর্জে উঠল—দেখবে গরহাজির হওয়ার মজাটা টের পাবে এবার। হয় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়বেন, নয় তো তাড়িয়ে দেবেন। অবশ্য তোমার কাছে দু'টোর মূল্যই সমান।

ভাঁড় ম্লান হেসে বললেন—অনেক সময় দেখা গেছে ফাঁসিতে ঝোলালে খারাপ বিয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আর যদি তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বল। আমি বলব গরমকালে পথে পড়ে থাকতে মন্দ লাগবে না। মেরিয়া চোখ কপালে তুলে বলল—ওমা, তুমি তবে দু'টোই স্থির করে রেখেছো!

ভাঁড় বাধা দিয়ে বলল—না, না, দু'টোই নয়।

মেরিয়া হেসে বলল—তার মানে একটা যদি ভেঙে যায় আর একটা থাকবে,—এই তো?

—ঠিক কথা মেরিয়া। তুমি তোমার পথ ধরে এগিয়ে যাও মেরিয়া। মদটা ছেড়ে দিলে সারা ইউলিরিয়ায় তোমার মত দ্বিতীয় মেয়েমানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মৃদু ধমকের স্বরে মেরিয়া বলল—পাজি কোথাকার, চুপ কর। ঐ ঐ মনিব আসছেন। আগে তোমার কৈফিয়ৎ দাও, পরে অন্য কথা ভেব। কথা বলতে বলতে মেরিয়া প্রস্থান করল।

একরাশ রূপের ডালি নিয়ে হাজির হলেন অলিভিয়া, সঙ্গে রয়েছেন, ম্যালভোলিও। তিনি অলিভিয়ার সংসারে তত্ত্বাবধায়ক।

ভাঁড় অলিভিয়াকে আসতে দেখেই ভাঁড়ামি জুড়ে দিল। সে বলল, মহাশয়া, আমার বুদ্ধি আর আপনার ইচ্ছা মিলে আমাকে দিয়ে বোকামি করিয়ে নিচ্ছে। তা না হ'লে আমি হয়ত বুদ্ধিমানই হয়ে যাব।

অলিভিয়ার এ সময়ে এ-সব ভাল লাগছিল না। তাই তিনি বললেন—এই ভাঁড়টাকে এখান থেকে দূর করে দাও তো।

তাঁর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ভাঁড় আবার বলে উঠল বাপু, শুনছ না,

মহিলাটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

অলিভিয়া ছোট্ট করে ধমক দিয়ে উঠলেন—যাও, যাও তোমার হাস্যরসের উৎস শুকনো—খটখটে। তাছাড়া তুমি সৎও নও।

ভাঁড় চোখের পলকে নতজানু হয়ে করজোড়ে বলল—মাগো, আমার যে দুটো অপবাদ দিলেন তা মদে আর উপদেশে দূর হতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না।

খটখটে শুকনো ভাঁড়কে মদ খাওয়ান দেখবেন কত তাড়াতাড়ি ভিজে ঝোল হয়ে যায়। আর অসৎ লোককে সৎ উপদেশ দিলে দেখবেন সে ভাল হয়ে মদও ছোঁবে না। এতো সহজ কথা! আপনি বললেন ভাঁড়টাকে দূর করে দিতে। আর আমি বললাম আপনাকে সরিয়ে দিতে। ব্যস—মিটে গেল!

অলিভিয়া এবার রীতিমত চটে গিয়ে বললেন—আমি তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছি।

ভাঁড় চুপটি করে দাঁড়িয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল। মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত করল না।

অলিভিয়া পূর্ব স্বর অনুসরণ করে বলে উঠলেন—কি ব্যাপার তোমার বলতো?

ভাঁড় তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

অলিভিয়ার মুখ রাগে ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠতে লাগল। শরীরের সবটুকু রক্ত মুখে এসে ভিড় করছে। দু'পা এগিয়ে ভাঁড়ের সামনে এলেন, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পূর্ব গাম্ভীর্যের সুরেই বলে উঠলেন—কি ব্যাপার, আমি তোমায় কি বলেছি, শুনতে পেয়েছ?

ভাঁড় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। অলিভিয়া আবার বললেন—আমি দেখছি, তুমি ইদানিং কানে কম শুনতে শুরু করেছ। নইলে—

ভাঁড় তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আচমকা বলে উঠল—এতো ভারী তাজ্জব কাণ্ড দেখছি! আমি কানে কম শুনি কিনা—এটা দেখছি আমার চেয়ে ভাল বোঝেন অন্য আর একজন। কানের মালিকের চেয়েও অন্য আর একজন কানের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিবাল। চমৎকার কথা—

অলিভিয়া ধমকের সুরে বলে উঠলেন—চুপ কর বেয়াদপ কোথাকার।

—আজ্ঞে মহাশয়া, আমি তো মুখে কুলুপ এঁটেই ছিলাম। একেবারে ঠোঁট দু'টো সেলাই করে রেখেছিলাম।

—তাই রাখ। তবে আবার মুখে খই ফুটতে শুরু করেছে যে?

—আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে আমার মুখের সেলাইটা ফটাস করে কেটে গেল।

—সেলাই তো কাটবেই, সেটা সুতোর দোষ নয়, মুখেরই দোষ।

—সে না হয় স্বীকার করলাম, দোষ আমারই মুখের। কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক হজম করে উঠতে পরলাম না। বদহজমের রোগী যেমন আচমকা বমি করে ফেলে ঠিক তেমনি আচমকা আমার পেট থেকে দম ফাটা হাসি বেরিয়ে এল।

—কি ব্যাপার, তোমার হঠাৎ এমন হাসির উদ্রেক হবার কারণ ?

—কারণ আর কি। আপনি আবার কানের ডাক্তারী শুরু করেছেন দেখে হাসি আটকে রাখতে পারলাম না।

অলিভিয়া কথায় রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—সে যা-ই হোক, তোমাকে যে এখান থেকে বিদায় নিতে বলেছি, তার কি হল ?

ভাঁড় একগাল হেসে বলল—কী যে বলেন! এখন বুঝছি আপনার ঘটে এক বিন্দুও বুদ্ধি নেই।

—প্রমাণ করতে পারবে ?

—পারব। নিশ্চয়ই পারব। তবে আমার কটা কথার জবাব দিতে হবে কিন্তু। আচ্ছা আপনার এ-শোক কিসের জন্য ?

—ভাইয়ের জন্য। আমার সদ্য মৃত ভাইয়ের শোক।

—আপনার ভাইয়ের আত্মা তো এখন নরকে অবস্থান করছে।

—না, না, কিছুতেই হতে পারে না। তিনি এখন স্বর্গে।

—তাই তো বলছি আপনি নেহাৎই বোকা। আপনার ভাইয়ের আত্মা স্বর্গে রয়েছেন, আপনি দুঃখ করে মরছেন।

অলিভিয়া ম্লান হেসে বললেন—ভাঁড়ের বুদ্ধি একটু খুলেছে মনে হচ্ছে।

ম্যালভোলিও বলল—তা যা বলেছেন, ওর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ-উন্নতি চলবে। বুড়ো হলে সবার বুদ্ধি হ্রাস পায়, বোকাদের বুদ্ধি কিন্তু পাকা হয়।

ম্যালভোলিওর কথা শুনে অলিভিয়া রীতিমত হো হো শব্দ করে হেসে উঠলেন।

তাঁর হাসি দেখে ভাঁড়ের মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। সে বেশ রাগত সুরেই বলে উঠল আপনার হাসি পাচ্ছে হাসুন। আমি বাধা দেব না, বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করব না। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, কথাটা সত্যই অমন হো হো করে হাসার মত কথা কি ? বুদ্ধি কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকা হয়, অধিকতর গাঢ় হয়। উনি তো ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁকে সমর্থন না করে পারছি না।

এমন সময় মেরিয়া ছুটে এসে খবর দিল—এক সুদর্শন তরুণ দর্শনপ্রার্থী।

অলিভিয়া বিরক্তির স্বরে বলল—রাজা আর্সিনোর কাছ থেকে এসেছে, তাই না ?

অলিভিয়া মেরিয়ার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে বললেন—কে ? কে ঐ ভদ্রলোক মেরিয়া।

মেরিয়া মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

অলিভিয়া ধমকের সুরে বললেন—কি হল ? কথা বলছ না কেন মেরিয়া ? আমি জিজ্ঞেস করছি, আমার দর্শন প্রার্থনা করে কে এসেছে ?

মেরিয়া তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, একটাও কথা বলল না। আসলে তার বলার মত কোন কথাও ছিল না। নীরবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। কাজটা খুবই ভুল করে ফেলেছে। আগন্তুকের নাম-ধাম-পরিচয় প্রভৃতি জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল।

কোন কিছুই জিজ্ঞেস না করে এখানে এসেছে।

অলিভিয়া রীতিমত ধমকের সুরে বললেন—তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছিনে মেরিয়া। তুমি ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। খুবই ভাল কথা। কিন্তু আমি যে তোমায় জিজ্ঞেস করলাম, আগন্তুকটি কে? কই তার তো কোন উত্তরই তুমি দিলে না, সং-এর মত বোবা সেজে দাঁড়িয়ে থাকলে, একটি কথাও তোমার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না। কে আমার দর্শন প্রার্থী? কোত্থেকে এসেছে?

মেরিয়া আমতা আমতা করে বলল—তা তো জিজ্ঞেস করিনি। তবে ছেলেটি দেখতে খুবই সুন্দর, সঙ্গে লোকজনও অনেক রয়েছে দেখলাম। তাছাড়া সে বিশেষ করে বলল—অলিভিয়ার সঙ্গে কথা বলার তার নাকি অনেক দিনের বাসনা।

—তবে তাকে কেন আটকে রেখেছ, এখানে নিয়ে এলেই পারতে।

—কে আবার আটকাবে, আপনার আত্মীয় স্যার টবি স্বয়ং।

—যাও তাকে নিয়ে আসগে, তবে শোন, যদি উনি কাউন্টের কাছ থেকে এসে থাকেন, তবে দরজা থেকেই বিদায় দেবে—বলবে আমি বাড়ি নেই।

স্যার টবি হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন।

স্যার টবিকে দেখতে পেয়েই অলিভিয়া বলে উঠলেন—কাকা কাকে তুমি আটকে রেখেছ?

—এক অপরিচিত ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক! কে সে?

নেশার ঝোঁকটা একটু সামলে নিয়ে স্যার টবি বললেন—ভদ্রলোক। ভদ্রলোক এইটুকু শুধু এ পর্যন্ত বুঝেছি। সে যদি শয়তানই হয় তবেই বা আমার কি আসে যায়?

ম্যালভোলিও এবার ঘরে ঢুকল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে স্যার টবি টলতে টলতে চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ম্যালভোলিও বলল—লোকটা আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না বলছে।

অলিভিয়া বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—বলগে দেখা হবে না।

—তা তো আগেই বলেছি। তিনি দরজা ছেড়ে এক পা'ও নড়ছেন না। তিনি ঠিক যুবা পুরুষ নন—আপেল যখন না পাকা না কাঁচা অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি। ডাঁশা আপেল যাকে বলে। বালক ও যুবকের মাঝামাঝি পর্যায়। কথাগুলো বড়ই মিষ্টি, তবে স্বরটা একটু মেয়েলী বলেই মনে হল। হঠাৎ করে শুনলে মনে হবে বুঝিবা এখনও দুধের গন্ধ লেগে রয়েছে।

এমন একজন যুবককে দেখার কোন্ অষ্টাদশী নারীর না সাধ হয়! কৌতূহলী হয়ে অলিভিয়া তাকে ভেতরে নিয়ে আসার অনুমতি দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুরুষবেশী ভায়োলা ঘরে ঢুকলেন—বার কয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে ভায়োলা জিজ্ঞেস করলেন—এ-ঘরের মাননীয়া কর্ত্রী কে জানতে পারি কি?

অলিভিয়া ম্লান হেসে বললেন—তুমি তোমার বক্তব্য আমাকে বলতে পার, তাঁর হয়ে আমিই জবাব দেব।

—তিনি কে বলুন না, আমার কথা অপরকে শোনাতে হলে মনে খুবই ব্যথা পাব। বড়ই কষ্ট করে তৈরী করেছি আমার বক্তব্য। তবে সুন্দরী, একটা অনুরোধ, আমাকে অনুগ্রহ করে ঘৃণা করবেন না, কারণ ঘৃণা ও বিদ্রূপ আমার একেবারেই অসহ্য।

—আপনি কোথেকে আসছেন জানতে পারি কি?

ক্ষমা করবেন, আমার লিখিত বক্তব্যের মধ্যে এ-কথা নেই। আমি যা শিখে আসিনি সে কথা তো বলতে পারব না। অনুগ্রহ করে বলুন, আপনিই কি মাননীয়া গৃহকর্ত্রী? যদি তা-ই হয় তবে আমি বক্তব্য শুরু করি।

অলিভিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকলেন।

আগন্তুকও তার বক্তব্য শেষ ক'রে নীরব হ'ল। সে নীরবে অলিভিয়ার দিকে তাকিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ধীরে ধীরে বোলাতে লাগল।

অলিভিয়া অবাক বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন —ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার হ'ল না।

আগন্তুক যুবক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অলিভিয়ার মুখের দিকে তাকাল। সে তার পূর্ব কথিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে বলল—আমি তো বলেছি, আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না। আমাকে যা যা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা তার মধ্যে ছিল না।

অলিভিয়া পুনরায় ছোট্ট ক'রে হেসে বললেন—আচ্ছা, আপনি কি হাস্যরসের অভিনেতা?

—না, না! তা হতে যাব কেন? তবে আমি এমন ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি, আমি আসলে তা নই। তবে কি আমি মনে করতে পারি যে, আপনিই গৃহকর্ত্রী?

—হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্য। অবশ্য যদি আত্মপ্রবঞ্চনা না করি।

এবার পুরুষবেশী ভায়োলা বলে উঠলেন—দেখুন, আপনি যদি সত্যিই তিনি হন তবে আমি বলব, আপনিই আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন। যা আপনি অনায়াসেই দিতে পারেন তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখছেন। তবে এ কথা আমার বক্তব্যের বাইরে। ঠিক আছে, এবার তবে আমার পার্ট শুরু করি। অলিভিয়া চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে বললেন—আপনার যা বক্তব্য তার সারমর্ম বলে ফেলুন তো তাড়াতাড়ি।

ভায়োলা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার উপক্রম। তিনি হায় হায় করে উঠলেন। বললেন—দেখুন অনেক কষ্ট স্বীকার ও যত্ন করে আমি আমার বক্তব্য তৈরী করেছি —তাছাড়া সে তো রীতিমত এক কবিতা!

অলিভিয়া রেগে গিয়ে বললেন—দেখুন, আমার সময় খুবই কম। আর সময় নষ্ট করতে পারব না। আপনি পাগল না হলে বিদায় নিতে পারেন। অলিভিয়া পুরুষবেশী ভায়োলার দিকে কথা ক'টা ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম

করছিলেন।

পুরুষবেশী ভায়োলা তাঁকে বাধা দিয়ে বলল—কি ব্যাপার, আপনি রাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে।

অলিভিয়া দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ভায়োলার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট ক'রে বললেন,—তবে কি করব?

ভায়োলা অনুরোধের সুরে বলল—আমি ছুটে এলাম আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলব বলে, আর আপনি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে কথাটা বলি, বলুন তো।

অলিভিয়া বিরক্ত প্রকাশ করে আপন মনে বললেন—এতো মহা বিপদে পড়েছি দেখতে পাচ্ছি! কিছু বলবেও না, আবার যেতেও দেবে না! পুরুষবেশী ভায়োলারের দিকে তাকিয়ে এবার বললেন—আমি তো আগেই বলেছি—

ভায়োলা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—কি কথা?

অলিভিয়া রাগত সুরে বললেন—আমার বৃথা নষ্ট করার মত সময় নেই। যদি কিছু বলার থাকে স্পষ্ট করে বল, আমি শুনতে রাজি আছি।

—আপনি শুনেছেন কোথায়! ঘর থেকে চলে গেলে আর শুনবেন কি ক'রে।

—তবে কি এখানে দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনব? আর যদি তেমন দরকারী কথা থাকে, সংক্ষেপে বলুন।

পুরুষবেশী ভায়োলা ম্লান হেসে বললেন—দেখুন, আমি দূত মাত্র, তবে ভগ্ন দূত অবশ্যই নই। কোন রকম জুলুমের ইচ্ছাও আমার নেই। যুদ্ধের খবর বা কর-সংক্রান্ত প্রস্তাবও নয়। আমি শান্তির জলপাই পাতা নিয়ে এসেছি।

—আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? কি-ই বা মতলব?

—কে আমি? আমার মতলব কি? আমার মতলব আমার কৌমার্যের মতই গোপনীয়। আপনার কাছে যা অতীব দরকারী অন্যের কাছে তা-ই গর্হিত।

—কিন্তু আপনার দরকারটা কোথায় জানতে পারি কি?

—সেটা রাজা আর্সিনোর মনের গ্রন্থে বাঁধা পড়ে রয়েছে।

—কোন্ অধ্যায়ে?

—কোন্ অধ্যায়? একেবারে সর্ব প্রথম অধ্যায়ে।

—আর কিছু বলার নেই?

—ভদ্রে, আপনার মুখখানা একবার দেখতে ইচ্ছুক।

—আমার মুখখানাকে কথা বলতে হ'বে এমন আদেশ আপনার প্রভুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন নাকি? ঠিক আছে, আপনার অভিলাষ পূর্ণ করব। এই যে ওড়না সরিয়ে দিলাম। এবার বলুন, কেমন দেখছেন?

অলিভিয়া মুখের ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ছদ্মবেশী ভায়োলা'র দিকে তাকালেন।

ভায়োলা বিস্ময় ভরা চোখে রূপ সৌন্দর্যের আকর অলিভিয়ার মুখের দিকে নীরবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। আচমকা সে যেন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

অলিভিয়া মুচকি হেসে বললেন—কি গো, এবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো ?

ভায়োলা নীরবে শুধুমাত্র ঘাড় কাৎ করল। একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। সে অপলক চোখে তাঁর মুখাবয়ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

অলিভিয়া বললেন—আপনার সাধ তো পূরণ করলাম, এবার কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন. নতুবা আমি চললাম।

ভায়োলা হঠাৎ চমকে উঠলেন—চলে যাবেন, বলছেন কি!

অলিভিয়া বললেন—হ্যাঁ, আপনার কোন কাজের কথা না থাকলে তো যেতেই হ'বে। বৃথা সময় নষ্ট করতে আমি রাজী নই।

অলিভিয়ার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে এক সময় বললেন—এ যদি স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি হয় তবে বলতে হবে এ তাঁর চমৎকার কীর্তি।

অলিভিয়া এক গাল হেসে বললে—এ স্বাভাবিক। এর মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতার ছোঁয়া পাবেন না। এ রং এবং সৌন্দর্য শত ঝড়-জলেও ধুয়েমুছে যাবে না।

অলিভিয়ার বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে ভায়োলা হেসে বললেন—মধুরের সঙ্গে মধুরের একত্র সমাবেশ, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলব আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর।

সচকিত হয়ে অলিভিয়া বললেন—স্বার্থপর ?

—তা নয় তো কি ? পৃথিবীর বুকে যদি এ-রূপের কোন নকল না রইল, তবে কি হবে এ-অনন্যা রূপ নিয়ে।

অলিভিয়া সদ্য চাবুক খাওয়া প্রাণীর মত সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ় প্রতিবাদ করলেন—না-না-না! আমি এত নিষ্ঠুর নই! সে রকম কোন প্রতিজ্ঞার পূজারীও আমি নাই। আমার রূপ-সৌন্দর্যের বিভিন্ন নমুনা আমি পৃথিবীর বুকে রেখে যাব। আমার দানপত্রের সঙ্গে প্রতি বিষয়ে লেবেল এঁটে দেবার ব্যবস্থাও করে যাব আমি। যেমন ধরুন, উদাসী লাল ঠোঁট দুটি। তারপর দুটি ধূসর চোখ আর তাদের পাতা। তাছাড়া আমার চিবুক, গ্রীবা সবই ফর্দের মধ্যেই উল্লিখিত হ'বে। আচ্ছা, একটা কথা জানতে পারি কি ?—আপনাকে কি আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেই পাঠান হয়েছে ? আর একটা কথা—আপনার প্রভু আমাকে কেমন ভালবাসেন তার একটা নমুনা দিতে পারেন কি ? অর্থাৎ তিনি আমাকে কেমন ভালবাসেন ?

ম্লান হেসে ভায়োলা বললেন—আমার প্রভু আপনাকে দেবীর মত পুজো করেন।

—কিন্তু আপনার প্রভুতো আমার মন জানেন না। কিন্তু আমি যে তাঁকে ভালবাসিনে। যদিও আমি তাঁকে সৎ ও মহান, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক বলেই জানি। তাছাড়া তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক বলেও জানি। তবু বহু চিন্তা করেও আমি যে তাঁকে মন থেকে ভালবাসতে পারিনি। এ-কথা তো তিনি অনেক আগেই জেনে

নিতে পারতেন।

—যদি আমার প্রভুর মত এমন কামনা নিয়ে আপনাকে ভালবাসতাম, তাহলে আপনার এ প্রত্যাখানের অর্থ খুঁজতে যেতাম না।

অলিভিয়া মুচকি হেসে বললেন—তাই নাকি?

ছদ্মবেশী ভায়োলা বলল—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—আপনার কথায় আমি না হেসে পারছি না।

—আমি কিন্তু হাসার মত কথা বলিনি।

—আপনি যা বললেন, প্রত্যাখ্যানের অর্থ খুঁজতে যেতেন না—কথাটা কি হাসার মত শোনাচ্ছে না?

—না, মোটেই না! এটা আমার মনগড়া কথা নয়। সম্পূর্ণ মনের কথা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সত্যই মনের কথা। আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মোটেই বানিয়ে বানিয়ে কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছি না। আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যই আমি প্রত্যাখানের অর্থ খুঁজতে যেতাম না।

—কেন? তবে কি করতেন?

—আপনার দরজায় পাতা দিয়ে কুঁড়েঘর তৈরী করে থাকতুম। ব্যর্থ পেম নিয়ে গান বেঁধে সারা রাত্রি গান গেয়ে বেড়াতাম। আকাশবাতাস মুখরিত করে দিতাম আমার গান দিয়ে। তখন আর আপনার কোন উপায় থাকত না, অনন্যোপায় হয়ে করুণা করতেই হ'ত।

—তা হয়ত আপনার দ্বারা সম্ভব হ'ত। কিন্তু আপনার বংশ পরিচয় জানতে পারি কি?

—আমার ভাগ্যের চেয়ে বড় আমার বংশপরিচয়। ভদ্রবংশেই আমার জন্ম।

—আপনার প্রভুকে গিয়ে বলুন আমি তাঁকে মোটেই ভালবাসিনে। আর একটা কথা তিনি যেন ভবিষ্যতে আর কোন লোক না পাঠান। অবশ্য আপনি যদি নিজে আসেন তবে কোন অসুবিধা নেই। এসে বলেও যেতে পারেন আমার কথাগুলো তিনি কেমনভাবে নিলেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ—আপনি এখন আসতে পারেন। আপনার কষ্টের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার সামান্য উপহার গ্রহণ করুন।

উপহারের কথা শুনে ভায়োলার মুখ বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। সে ভাবছে—যার মনে ভালবাসা নেই, মন যার পাথরের মত শুষ্ক, একেবারেই নীরস, তার কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতে হবে। এতো উপহার নয়, উপহারের নামে দয়ার দান।

ভায়োলা'কে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অলিভিয়া আবার বললেন—কি ব্যাপার, আবারও বোবা হয়ে গেলেন যে! যা হোক কিছু বলুন।

—কি আর বলব, আমার বলার মত কথা আর নেই।

—কোন কথাই কি নেই?

—না। আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতেই আমি ধন্য। শুধু আমিই বা বলি কি করে, আমার মনিবও অবশ্যই ধন্য হবে।

মুচকি হেসে অলিভিয়া বললেন—এ কিন্তু আপনার রাগের কথা।

—তা যদি মনে করেন, হ'তেও পারে। আপনার কথায় রাগ না হোক, তবে আনন্দ যে হওয়ার নয়, আপনি অবশ্যই তা বুঝতে পারছেন।

—আমি তো বলছি, আমি অক্ষম। আপনার প্রভুকে গিয়ে আপনি এ-কথাই বলবেন।

—হ্যাঁ, দূত হ'য়ে যখন এসেছি, সংবাদটা তো তাঁকে পোঁছে দিতেই হবে

—হ্যাঁ, তাই করবেন। আমি যা যা বললাম, সবই গিয়ে বলবেন।

—হ্যাঁ, বলব বলেই তো প্রতিটি কথা একেবারে অন্তরের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি।

—ভাল কথা। কিন্তু আমি আপনাকে উপহারের কথা বললাম। সে কথাও তো কিছুই বললেন না ?

—উপহার আমার দরকার নেই। আপনার উপহার আপনার কাছেই রেখে দিতে পারেন। আপনি যাকে ভালবাসেন তার মনও যেন পাথরের মতই হয়। আপনার প্রেমের পরিণতিও যেন আমার মনিবের মতই হয়। নমস্কার!

পুরুষবেশী ভায়োলা বিদায় নিলেন। যাবার মুহূর্তে অলিভিয়ার মনে ভীষণ রকম দোলা দিয়ে গেলেন।

ভায়োলার কথাগুলো অলিভিয়ার মনের কোণে বার বার পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। আমার বংশ পরিচয় আমার ভাগ্যের চেয়ে বড়, ভদ্রবংশ জাত। মুহূর্তের মধ্যে তার দেহ মনে মারাত্মক রকম পরিবর্তন লক্ষিত হ'ল। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চীৎকার করে বললেন—আমি জানি, জানি। উচ্চবংশ-জাত তুমি। তোমার মুখশ্রী, তোমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বংশ গৌরবের ঐতিহ্য বহন করছে। এমন কি তোমার প্রতিটি কথা, হাসিও তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। পর মুহূর্তেই আবার তাঁর ভাবান্তর লক্ষিত হ'ল। তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—না, এত সহজে দুর্বল হ'য়ে পড়লে তো চলবে না। এত তাড়াতাড়ি কি ভালবাসা সংক্রামিত হ'তে পারে ? ওর যত গুণ তা শতগুণ অধিক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আমার সামনে ভেসে উঠছে।

অলিভিয়া হাততালি দিয়ে অনুচরকে ডাকলেন। ম্যালভোলিও ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এল। তিনি আদেশ করলেন রাজা আর্সিনোর দূতকে অনুসরণ করতে। আর তিনি একটি আংটি রেখে গেছেন তা ফিরিয়ে দিতে। আর তাঁকে যেন বলে তিনি যেন রাজাকে আশ্বাস না দেন। এও যেন জানিয়ে দেন আমি আর্সিনোকে ভালবাসিনে। কাল যদি ঐ তরুণ একবারটি আসে তিনি নিজেই তাঁকে সব বলবেন।

ম্যালভোলিও চলে গেলে অলিভিয়া আবার আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন —জানি না এ আমি কি করতে চলেছি ! কোন ভুল করছি কি না তা আমার বিবেক

বুদ্ধির বাইরে। অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিলাম আমি। হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

দুই

পাঠক চলুন না আমরা এবার আবার সমুদ্রতীরের দিকে যাই, সেখানে এখন কি ঘটে চলেছে দেখা যাক।।

অশান্ত অতলান্ত সফেন সমুদ্র। সমুদ্রের ভীষণ গর্জনে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে। বার বার উন্মত্ত ক্রোধে বালুকা-বেলায় আছাড় খেয়ে পড়ছে। এই তো তার স্বভাব। যুগ-যুগান্ত ধরে ঘটে চলেছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সমুদ্রের ভেজা বালির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো মনুষ্যমূর্তি। একজনের গায়ে নাবিকের হাল্কা-নীল পোষাক, মাথার টুপিতে আঁটা রয়েছে পদমর্যাদার তকমা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি? দ্বিতীয় ব্যক্তিটির গায়ে সাধারণ পোষাক। এঁদের একজন জাহাজের ক্যাপ্টেন। নাম তাঁর আন্তনিয়ো। আর দ্বিতীয় জনের নাম সেবাস্তিয়ান। তিনি সাধারণ পোষাক পরিহিত হলেও তাঁর বিশেষ পরিচয় রয়েছে। রূপসী তরুণী ভায়োলার মুখের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কে তিনি? ভায়োলার ভাই? আমরা যতদূর জানি ভায়োলার ভাই তো মারা গেছেন। তবে কে তিনি?—হ্যাঁ, ধারণা অভ্রান্ত; ভায়োলার ভাই-ই তিনি। জাহাজ ডুবিতে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল তা মিথ্যা। আন্তনিয়ো ও তিনি আলাপে মগ্ন। সেবাস্তিয়ান জবাব দিলেন—আমার রাশি-নক্ষত্র এখন খুবই খারাপ। আমার ভাগ্য হয়ত তোমার ভাগ্যকেও খারাপ করে তুলতে পারে। আমি তাই আমার ভাগ্যকে নিয়ে দূরে দূরেই থাকতে চাই—আমাকে তুমি রডরিগো বলেই জানবে, আসলে আমার নাম সেবাস্তিয়ান। আমি মেসালিনের ছেলে। আমাকে আর আমার বোনকে রেখে তিনি মারা যান। আমরা দুজনে যমজ ভাই-বোন। আমাকে যখন তুমি উদ্ধার করেছ আমার বোন তখন ডুবে মারা গেছে।

আন্তনিয়ো তাঁর বোনের মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আমাকে তোমার চাকর করে নাও।

সেবাস্তিয়ান চমকে উঠে বললেন—না, না, আমার কাছে নয়!—এখান থেকে চলে যাও। আমি আর্সিনোর দরবারে যাচ্ছি।

সেবাস্তিয়ান চলে গেলেন। আন্তনিয়ো তাঁর ফেলে যাওয়া পথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি চোখের আড়াল হয়ে গেলে এক সময় বললেন—সমস্ত দেবতাদের ভদ্রতা যেন তোমাকে ঘিরে রয়েছে। রাজা আর্সিনোর দরবারে রয়েছে আমার হাজারো শত্রু। তবু আমাকে সেখানে যেতেই হবে। তাতে আমার যা হবার হবে। ঝড়-ঝাপটা বিপদ-আপদতো আমার কাছে খেলার মত। অতএব আমি যাবই।

রাজপথে জনতার মেলা। প্রত্যেকেই যে যার কাজে চলেছে। পথ চলতি মানুষের মেলায় ম্যালভোলিওর সঙ্গে ভায়োলার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ভায়োলা সবেমাত্র অলিভিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরেছেন।

ম্যালভোলিও জিজ্ঞেস করল—আপনি কি এইমাত্র ফিরছেন?

ভায়োলা বললেন—হ্যাঁ, এই তো সবেমাত্র বেরিয়ে এটুকু পথ এসেছি।

ম্যালভোলিও তাঁর দিকে একটা আংটি এগিয়ে দিয়ে বলল—এটা আমার মনিবাণী ফেরৎ পাঠিয়েছেন, আপনি আসার সময় নিয়ে এলে আমাকে আর এ দুর্ভোগটুকু ভুগতে হত না। আর একটা কথা, আপনি আপনার মনিবকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, তিনি তাঁর অনুরাগিণী নন। আর আপনি ওঁর প্রেমের দরবার করতে আর কোন দিনই সেখানে যাবেন না। তবে হ্যাঁ, তিনি আংটিটা ফেরৎ নিয়েছেন কিনা তা জানাতে যেতে পারেন।

ভায়োলা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—তা কি করে হয়? এটা যে তিনিই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন। এটা আমি ফেরৎ নিই কি করে?

ম্যালভোলিও ইতস্তত করে বলল—না না, তিনি এটা নেন নি। তা হলেও এখন আর তিনি এটা চান না। আমি এটা আপনার সামনে পথের ওপর রেখে গেলাম। আপনি না নিলে এখানেই পড়ে থাকবে।

ম্যালভোলিও চলে গেলে ভায়োলা ভাবলেন, এ কী ব্যাপার! তিনি তো এ-আংটি অলিভিয়াকে দেন নি! তবে কি করে এই রহস্যজনক ব্যাপার ঘটল? রূপসী যুবতী মনে মনে কি ভেবেছেন? এ কি রকম পরিহাস! তবে কি তিনি আমারই বাইরের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এক নারী এমনি ভুল করে এক নারীকে ভালবাসলেন?—তাকে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন? আমার ছদ্মবেশের আড়ালে কি রয়েছে তা একবার খোঁজ করারও প্রয়োজন বোধ করলেন না! এত সহজেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তা না হলে এ-ভাবে কেউ ছলনা করে কাছে ডাকে?

রূপসী যুবতী এ আংটি আমার উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন। এখন এর উপায় কি? এর চেয়ে তিনি স্বপ্নে দেখা কোন পুরুষকে ভালবাসলেই তো পারতেন। একি ভ্রান্তি—একি দুর্বিষহ জ্বালা! আমারই জন্য এক পূর্ণ যৌবনা তিলে তিলে দগ্ধে মরবে!

সবই বিধিলিপি। ভাগ্যই চক্রান্ত করে এ জট পাকিয়েছে। একমাত্র ভাগ্যদেবতার পক্ষেই এই জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এমনি ভাবনার জট ছাড়াতে ছাড়াতে অলিভিয়া আর্সিনোর প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললেন।

অলিভিয়ার বাড়ি। দরজার কাছেই স্যর টবি এবং স্যর আন্দ্রুকে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে।

স্যার টবি বললেন—এতো সোজা কথা বন্ধু, দুপুর রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকার অর্থই হচ্ছে দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা।

—আমার মত হচ্ছে দেরী করে ওঠার অর্থই হচ্ছে দেরী করে বিছানা ছাড়া। আমি একটা সোজা কথাই বুঝি, জীবনটাকে ভোগ করে নাও। জীবনের অর্থই হচ্ছে খাওয়া—মদ খাওয়া আর বিছানা আঁকড়ে আরাম উপভোগ করা।

দুই বোকারাম যখন এমনি উদ্ভট যুক্তিতর্কের মধ্যে নিজ নিজ মতকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা করছিলেন এমনি সময়ে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ভাঁড়।

ভাঁড়কে দেখেই স্যর টবি বলে উঠলেন—আরে, তুমি এসে গেছ! যাক, ভালই হ'ল, এখন একটু মজার মজার গান শুনা যাবে। ভাঁড় মশায়, আর দেরী নয়। একটা বেশ মজাদার গান ধরতো শুনি।

ভাঁড় আরও বেশ কিছুটা সময় রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে সবার অনুরোধে গান জুড়ল। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে প্রলয় নাচ সহযোগে গান পরিবেশন করল সুরসিক ভাঁড়।

গান শেষ হ'লে স্যর টবি ও স্যর আন্দ্রু উচ্চৈস্বরে তার গানের ভূয়সী প্রশংসা জুড়ে দিলেন।

গান শেষ হ'তে না হতেই মেরিয়া সেখানে এসে হাজির। মেরিয়া কর্ত্রীর নির্দেশ জারি করতে গিয়ে বলল—দেখুন, কর্ত্রীর কড়া হুকুম এখানে মাতলামি করা চলবে না।

স্যর টবি বা আন্দ্রু কেউ-ই এত সহজে দমবার পাত্র নন। কেউই তার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না। তিন বন্ধু নতুন করে গান ধরলেন। তাঁদের কাণ্ড-কারখানা দেখে শেষ পর্যন্ত ম্যালভোলিও ছুটে আসতে বাধ্য হলেন। সে গুলিখাওয়া বাঘের মত ক্রোধোম্মত্ত স্বরে গর্জে উঠল—আপনারা ভেবেছেনটা কি? আমার কর্ত্রীর বাড়িটাকে কি আপনারা শুঁড়িখানা করে তুলতে চাইছেন! স্থান-কাল-পাত্রের কথাও কি আপনারা একবারটি ভাববেন না। একেবারেই কি কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে বসেছেন?

স্যর টবি ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—পাগলের মত কী বকবক করছ? কে বলল আমাদের গানের তাল-মাত্রা নেই?

ম্যালভোলিও এবার স্পষ্ট ভাষায় জানাল—দেখুন, কর্ত্রী আমাকে বলে পাঠিয়েছেন নেহাৎ আত্মীয় বলে আমার মনিবাণী আপনাকে এখানে ঠাঁই দিয়েছেন। কিন্তু আপনার এ অত্যাচার সইবেন না। আপনি যদি এ-সব বদভ্যাস ছাড়েন, যথেষ্ট খাতির পাবেন। নতুবা এখান থেকে বিদায় নিতে হবে।

স্যার আন্দ্রুর অবস্থা বড় শোচনীয়। তিনি নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। তিনি অস্পষ্ট স্বরে গুঙিয়ে গান ধরলেন।

ম্যালভোলিও কড়া স্বরে ধমক দিয়ে উঠল। কিন্তু তার ধমকের কারণ বুঝার মত সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধিও তিনি হারিয়ে বসেছেন।

স্যর আন্দ্রুর গান শুনে স্যর টবিও দু-চার লাইন গেয়ে উঠলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে গান থামিয়ে বললেন—কি হে বাপু তুমি না বলছিলে আমাদের তালজ্ঞান নেই ? এবার কেমন বুঝছ ?

ম্যালভোলিও এবার সহ্য করতে পারল না। তার সর্বাঙ্গ রাগে-তাপে-মানে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। সে রীতিমত রাগত স্বরে বলল—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, কর্ত্রীকে সব বলছি। তখন দেখা যাবে কেমন পোষা কুকুরের মত লেজ নাড়—কথা ক'টা শেষ করেই সে রাগে গজগজ করতে করতে সশব্দে সেখান থেকে চলে গেল। স্যার আন্দ্রু ম্যালভোলিওর ওপর রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। আমার কি ইচ্ছে করছে আপনারা জানেন ?—ইচ্ছা করে ওকে লড়াইয়ে ডেকে একেবারে বোকা বানিয়ে ছাড়ি। ডেকে নিয়ে এসে কথা না রাখলে এমনিতেই বোকা বনে যাবে।

মেরিয়া কর্ত্রীর অধিকতর পেয়ারের, এ মাতব্বরী তার সহ্য হল না। তাই সে বলল—যা যা, কর্ত্রীর কাছে গিয়ে কুকুরের মত লেজ নাড়গে।

স্যার আন্দ্রু স্যার টবিকে বলল—তোমার লড়াইয়ের আহ্বানপত্র আমিই লিখে দিচ্ছি। যদি বল গিয়ে মুখেও জানিয়ে আসতে পারি।

মেরিয়ার এ-কাজটা বিশেষ মনঃপূত হ'ল না। ভাবল অহেতুক আবার হল্লা হবে। তাই সে বলল—না থাক, অকারণ হল্লা করে লাভ কি ? ম্যালভোলিও চিরদিনই এমনি বজ্জাত। বড় বড় কথা মুখস্ত করে আওড়ে আনন্দ পায়। ভাবে সেগুলো তার নিজেরই কথা। আর একটা অন্ধ বিশ্বাস তার রয়েছে, সে ভাবে যে মেয়ে তাকে দেখবে সে-ই ভালবাসবে। এই বজ্জাতটাকে আমার ঢিট করতে এক মিনিটও লাগবে না। ঘা মেরে আমি তার বদলা নেব।

স্যার আন্দ্রু বলল—মেরিয়া, কি করে বদলা নেবে শুনতে পারি কি ?

মেরিয়া রাগে গজ গজ করতে করতে বলল—তার চলার পথে একখানা নকল প্রেমপত্র লিখে ফেলে রাখব। যেন সুন্দরী যুবতী ওকে ভালবেসে লিখেছে। তাতে থাকবে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ির সুখ্যাতি, গায়ের রং-এর ভূয়সী প্রশংসা, ভ্রূ যুগলের হাজারো বাহবা। যাতে করে হতচ্ছাড়া একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে যায়। সে স্পষ্ট বুঝবে চিঠিটা ওকে ভালবেসে লেখা হয়েছে। আমি আমার কর্ত্রীর মতই ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখতে ওস্তাদ। লেখা পড়ে হারামজাদা বুঝতে পারবে না কার লেখা।

স্যার টবি এবং স্যার আন্দ্রু একযোগে মেরিয়াকে বাহবা দিয়ে উঠলেন।

মেরিয়া আবার বলল—চিঠিটা যেখানে ফেলে রাখব তার কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকবেন আপনারা দু'জনে। চিঠিটা পড়ে তার মানসিক অবস্থা কেমন হয় জানতে হবে।—কথা কটা বলে মেরিয়া চলে গেল।

মেরিয়া চলে গেলে স্যার আন্দ্রু বললেন—ছুঁড়িটা বুদ্ধি রাখে।

স্যার টবি বললেন—সত্যি মেয়েটা খুব ভাল, আমাকে খুবই ভক্তি করে।

স্যার টবি হতাশার সুরে বললেন—মিঃ আন্দ্রু এ যে সবই ভেস্তে যাবার উপক্রম। এখনও টাকা আনতে পাঠালেন না যে! আমার টাকাটাও কি মারা গেল ?

না না, টাকা আনতে পাঠাও। শেষ পর্যন্ত তুমিই যদি তাকে না পাও তবে আমাকে বোকা বলো।

—না-ই যদি বলি। আমাকে বিশ্বাস করো না। বলব—অবশ্যই বলব—তুমি যা-ই বল না কেন।

—থাক, খুব হয়েছে, এখন চল। আর দেরী নয়, এমনিতেই বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

আবার আমরা ফিরে এলাম আর্সিনোর প্রাসাদে। আর্সিনো সামন্তরাজ, মধ্যযুগে সামন্তদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। স্বাধীন রাজাদের মত প্রজাশাসন করতেন তারা। বহু আমীর-ওমরাহ তাদের সভায় থাকতেন। ইউলিয়া রাজ্যের সামন্তরাজ রাজা আর্সিনোর প্রতিপত্তি কোন অংশে কম নয়। অলিভিয়া অবশ্য জানিয়েছেন আর্সিনো হচ্ছেন জমিদার বা কাউণ্ট। কাউণ্ট সামন্তরাজের অধীনে থাকেন। অবশ্য মহাকবিই এই গোলামীর সূত্রপাত করেছেন। যা-ই হোক না কেন আমরা আর্সিনোকে প্রভাবশালী এক সামন্তরাজ বলেই স্বীকার করব।

রাজা আর্সিনোর বিশ্রাম-কক্ষ। রাজা সফেন সুদৃশ্য আরামদায়ক শয্যায় বিশ্রামরত। কিউরিও প্রভৃতি সভাসদরা তাঁর চারদিকে ভিড় করে বসে। তাঁর পুরুষবেশী অনুচর ভায়োলাও সেখানে উপস্থিত। অনুচরের সেখানে থাকাটাই বরং স্বাভাবিক।

রাজা আর্সিনো সঙ্গীতপ্রিয়। কর্মক্লান্ত রাজা মানসিকতার পরিবর্তন ও ক্লান্তি অপনোদনের জন্য গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। গান শুনার এই অদম্য ইচ্ছার পিছনে কামপ্রবৃত্তির নিবৃত্তির উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু গান গাইবে কে ? গায়ক কোথায় সিজারিও জানালেন।

রাজা আর্সিনো সিজারিও-র হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন—কেন ? ফেস্তে কোথায় ? ফেস্তেকে ডেকে আনার ব্যবস্থা কর।

ফেস্তে ভাঁড়। সুগায়ক বলেও তার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। রাজার নির্দেশে কিউরিও গায়ককে খুঁজতে চলে গেল। আর্সিনো এবার পুরুষবেশী ভায়োলাকে কাছে ডাকলেন, সিজারিওকেও ডেকে কাছে নিলেন। বললেন—তোমরা আমার কাছে এসো—আরও কাছে সরে এসো। যদি তোমরা কোনদিন কারো প্রেমে পড়, যদি কাউকে ভালবাস, তবে সেই মধুর বেদনার ভেতর আমার কথা যেন মনে পড়ে। যারা সত্যিকারের প্রেমিক, প্রেমের যথোচিত মর্যাদা যারা দিতে জানে তারা তো আমারই মত। প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি কাজের মধ্যে তাদের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হলেও ভালবাসার ক্ষেত্রে কিন্তু তারা স্থির—অচঞ্চল। আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আজ দেউলে হয়ে গেছি।

কয়েক মুহূর্ত পরে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরুষবেশী ভায়োলার দিকে

ফিরে তিনি বললেন—বালক, আমার বিশ্বাস তুমি জীবনে কাউকে না কাউকে ভালবেসেছ—আমি কি ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় দিলাম ?

ভায়োলা ম্লান হেসে বললেন—অনুমান সত্য। একটু ভালবেসেছি এই মাত্র। তাকে ভালবাসার প্রথম ধাপ বলতে পারেন।

—কেমন সে নারী, বলবে ?

—সে আপনারই মত দেখতে।

—তবে তো সে তোমার যোগ্য নয়। আচ্ছা, তার বয়স কেমন হবে বল তো ?

—প্রভু, কত আর হ'বে ? আপনারই মত হবে হয়ত।

—তবে তো তোমার চেয়ে অনেক বেশীই হবে। তোমরা কি জান না, নারীর উচিত তার চেয়ে বেশী বয়সের পুরুষকে বিয়ে করা। তবে সে নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারবে, স্বামীর মন জয় করতে পারবে। বালক, আর একটা কথা তোমাকে বলছি শোন আমরা পুরুষরা নিজেদের যতই প্রশংসা করি না কেন আমাদের প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র, আমরা বড়ই চঞ্চল। মানুষের কামনা-বাসনা যতই ভদ্র হবে, সে ততই অস্থির-চঞ্চল হবে—তাই তো সে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে তা কখনই হয় না।

ভায়োলা রাজা আর্সিনোর কথা সমর্থন করতে গিয়ে বললেন—মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক।

—তাই যদি স্বীকার কর তোমার প্রেমিকাকে অবশ্যই তোমার চেয়ে কম বয়সী হতে হবে। অন্যথায় সে ভালবাসা হবে ক্ষণস্থায়ী—সহজেই চিড় ধরবে। মেয়েরা তো গোলাপের মত। সৌন্দর্য নিয়ে ফোটে, অচিরেই আবার ঝরে পড়ে।

—প্রভু, ঠিক তাই আপনার যুক্তি অকাট্য। পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হতে না হতেই ধ্বংস এসে হাজির হয়।

কিউরিও এসে হাজির হ'ল, সঙ্গে তার ভাঁড়। ভাঁড়কে দেখেই রাজা যেন প্রাণ-চাঞ্চল্য ফিরে পেলেন। বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে বললেন। তিনি বললেন—এতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষায়ই ছিলাম। আর দেরী নয় একটা গান গাও। কিন্তু কি গাইবে ? এক কাজ কর, কাল রাত্রে যে গানটা গেয়েছিলে সেটা গাও তো ফেরেস্তা। পুরনোদিনের গান, কী সহজ-সরল তার বাণী; বর্ষীয়সী কুমারী মেয়ে আর বয়স্ককারিনীর রোদে বসে বুনতো আর গাইত সে গান। সে-গান কামনার শান্তি বারি বর্ষণ করে। আর জয় গান করে নিষ্পাপ প্রেমের।

ভাঁড় ফেস্তে তার কম্বুকণ্ঠের গানে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। রাজা আর্সিনো গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গায়ককে বকশিস দান করে সন্তুষ্ট করলেন।

প্রাপ্ত বকশিস মাথায় ঠেকিয়ে ভাঁড় ফেস্তে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—দুঃখের দেবতার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি আপনাকে রক্ষা করুন। আপনার মত মানুষের সঙ্গসুখই আমার কাম্য। এমন মানুষের সঙ্গে অথৈ সমুদ্রেও ভাসা যায়।

ফেস্তে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। রাজা এবার অন্যান্য সভাসদ্‌দেরও বিদায় দিলেন। সভাকক্ষে রয়ে গেলেন শুধুমাত্র রাজা আর্সিনো এবং পুরুষবেশী ভায়োলা—অর্থাৎ অনুচর সিজারিও। আর্সিনো কাতর স্বরে নির্দেশ দিলেন—সিজারিও, তুমি আর একবারটি সেই পাষাণহৃদয়া নারীর কাছে যাও। তাঁকে পুনরায় আমার প্রেম নিবেদন কর। তাঁকে বলবে আমার প্রেম পৃথিবীর চেয়েও মহান, আমার এ প্রেম তাঁর বিষয় কামনা করে না। নারীর মধ্যে যিনি রত্ন সমতুল্য শুধুমাত্র তাকে কামনা করে।

সিজারিওবেশী ভায়োলা জানাল—আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু কথা হচ্ছে, যদি তিনি ভালবাসার প্রতিশ্রুতি না দেন?

—এমন প্রেমের এ-রকম নির্মম উত্তর হ'তে পারে না।

—কেন হ'তে পারে না? মনে করুন আপনার মত এমনি ব্যথায় ব্যথিত কোন মেয়ে যদি এ-কথা বলে তবে আপনি তো তাকে ভালবাসতে পারেন না। তবে সে কি তার উত্তর পাবে না?

—কোন নারীর প্রেম আমার মত এমন গভীর হ'তে পারে আমি বিশ্বাস করি না। নারীর হৃদয়ে প্রেমের এমন গভীরতা কোথায়?

নারীর প্রেম ক্ষুধার তুল্য—তারা প্রেমকে ধরে রাখতে পারে না। তারা প্রেমে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে জিভের ব্যাপারের মতই মনে করে, যকৃতের ব্যাপার বলে মানতে পারে না। অলিভিয়ার প্রতি আমার ভালবাসার সঙ্গে নারীর ভালবাসার তুলনা করতে গেলে মারাত্মক রকম ভুল করবে বালক।

ভায়োলা সুচতুরা। তিনি এমনি বাকচাতুর্যের মধ্য দিয়েই জানাতে চেয়েছিলেন রাজা আর্সিনোর প্রতি তার ভালবাসার কথা। কিন্তু রাজা আর্সিনোর সে মানসিকতা কোথায়? তার মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে যে অলিভিয়া। তাই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আমি জানি—

রাজা আর্সিনো সচকিত হয়ে বললেন—জান? কি জান তুমি?

—জানি নারীর হৃদয়ে রয়েছে পুরুষের প্রতি গভীর প্রেম। তারা আমাদের মতই একনিষ্ঠ। আমার বাবার এক মেয়ে ছিল, এক পুরুষের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়, যেমন আমি যদি মেয়ে হতাম আপনাকে ভালবাসতাম।

—বল, বল! তার প্রেমের কাহিনী বল।

—সে কাহিনী আর কি শুনবেন! সে সবই শূন্য—সব ফাঁকা। আসল কথা হচ্ছে সে তো তার ভালবাসার কথা তার প্রেমিককে জানাবার সুযোগ পেল না। মনের কথা গোপনে মনেই লুকিয়ে রাখল, কুঁড়ির ভিতর কীটের মত। বিষাদের ছবির মত সে বসেই রইল। মুখে কিন্তু হাসি ফুটিয়ে রাখতে হ'ল। আচ্ছা, আপনি কি বলতে চান, একি ভালবাসা নয়?

—তোমার বোনের ভালবাসার অপমৃত্যু হয়েছে কি?

—আমার ভাই-বোনদের মধ্যে আজ আমি একমাত্র বেঁচে রয়েছি। থাক ওসব কথা পরে হবে, আমি এখন কুমারী অলিভিয়ার কাছে যাচ্ছি।

—ঠিক আছে যাও। এক কাজ করবে, এ মণিটা তাঁকে দেবে। বলবে আমার প্রেম তাঁর প্রত্যাখ্যান সইতে পারবে না। আমার কথা যেন সে অন্তর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে।

অলিভিয়ার গৃহ। মেরিয়া উঠে পড়ে লেগেছে মালভোলিওকে জব্দ করতে। স্যর টবি এবং স্যর আন্দ্রুকে দেখা যাচ্ছে। মানিকজোড়ের সঙ্গে রয়েছে অলিভিয়ার ভৃত্য ফেবিয়ান।

ফেবিয়ান স্যর টবিকে বললেন—রঙ্গরস দেখতে এলাম। এমন রঙ্গরস দেখতে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না।

স্যর টবি বললেন—ঐ পাজি হারামজাদাটা জব্দ হলে তুমিও খুব খুশি হও?

—কি যে বলেন হব না? বদমায়েশটা সব সময় কর্ত্রীর কাছে লাগিয়ে লাগিয়ে আমাকে বিষনজর করে তুলেছে। ওকে ভালুক বানাতে পারলে আমার হাড় কটা জুড়োয়?

—অবশ্যই। যদি তা না পারি তবে এ-দুঃখ জীবনে ঘুচবে না।

মেরিয়া এসে হাজির। সে এসেই ওদের নির্দেশ দিল—আপনারা তিনজনে গিয়ে ওখানে লুকিয়ে থাকুন। এ পথেই ম্যালভোলিও আসবে। এ সময়ে সে নিজের ছায়াকে সহবৎ শেখায়। নজর রাখলে দেখতে পাবে কী জব্দই না তাকে করি। আমার এ-চিঠি তাকে বোকা বানিয়ে লেজে-গোবরে করে ছাড়বে।

স্যর টবি, স্যর আন্দ্রু এবং ফেবিয়ান যথাস্থানে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন। এবার মেরিয়া পথের ওপর একটা চিঠি ফেলে দিল। এ-চিঠি টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, ম্যালভোলিওরূপী মাছ এসে গপ করে গিলবে এ-টোপ। চিঠিটা ফেলে দিয়েই মেরিয়াও সেখান থেকে সরে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে ম্যালভোলিও গুন গুন স্বরে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সেখানে উপস্থিত হ'ল। গানের সুর বন্ধ করে এক সময় বলল—মেরিয়া বলেছে আমার ওপর নাকি কর্ত্রীর একটু টান রয়েছে। তিনি নাকি বলেছিলেন—যদি বিয়ে করেন তবে নাকি তার স্বামীর চেহারা হ'বে আমারই মত। তাছাড়া আমিও লক্ষ্য করেছি, তিনি এমনিতেও আমাকে একটু আলাদা নজরে দেখে থাকেন। এসব চিন্তা করে তো আর অন্য কিছু ভাবা যায় না। তাছাড়া এরকম উদাহরণ তো পৃথিবীতে নতুন নয়। স্টাচির জমিদারণী তো নিজেরই সাজ-কামনায় এক খিদমদগারকে বিয়ে করেছিলেন। তবে আর আমার বেলা বাধা কিসের? আমি হব অলিভিয়ার স্বামী—মস্ত জমিদার—কাউন্ট ম্যালভোলিও।

মখমলের জোব্বা গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন প্রাণাধিকা অলিভিয়া।

তখন আমি গম্ভীর মেজাজে দাস-দাসী চাকরানিকে ডাকব। আত্মীয় টবিকে তলব ভুলব না। ম্যালভোলিও সুখ-স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে। স্যর টবি আমার তলব পেয়ে ছুটে আসবে, আমাকে দেখে নতজানু হয়ে সেলাম ঠুকবে। তাকে ডেকে বলব —স্যর টবি তোমার ভাইঝির সঙ্গে আমার জীবন এক হয়ে গেছে। আমরা এখন একাত্মা এক প্রাণ। তুমি একটা নীরেট বুদ্ধু—ঐ ক্যাবলাকান্ত যোদ্ধাটার সঙ্গে তুমিও একটা অপদার্থ হয়ে গেছ।

ম্যালভোলিও তো এদিকে মনে মনে তার কর্ত্রী রূপসী যুবতী অলিভিয়াকে বিয়ে করে সেরেছে। সে-সঙ্গে স্যর টবি, স্যর আন্দ্রু প্রভৃতির সঙ্গে বিয়ের পর কেমন ব্যবহার করবে তারও একটা দৃশ্য এঁকেও নিয়েছে। তবে সমস্যা হচ্ছে নিজের মনের সঙ্গে পরামর্শ হলেও সে কোন কথাই নীচু গলায় তো নয়ই বরং রীতিমত চেঁচিয়েই বল-ছিল। ফলে স্যর টবি, আন্দ্রু এবং পরিচারিকা মেরিয়া তার কথাবার্তা সবই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। ফলে কথাগুলো কারুরই মনঃপুত না হওয়ায় আড়ালে দাঁড়িয়ে রাগে গজ গজ করছিলেন।

ম্যালভোলিওর কিন্তু কোন দিকেই খেয়াল নেই, খেয়াল করার কথাও নয়। ভাবে বিভোর ম্যালভোলিও আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সামনে একটা ভাঁজ করা কাগজ দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে তুলে নিয়ে খুলল। হাতের লেখা অচেনা নয়, তার কর্ত্রী অলিভিয়ার লেখার মত। বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিঃসন্দেহ হল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে—কর্ত্রীর লেখাই বটে। এবার সে পরম আগ্রহভরে চিঠিটা পড়তে লাগল। 'আমি আমার অজানা প্রিয়কে এ চিঠি লিখছি। প্রভু জেহবা জানেন যাকে ভালবাসি—তাকে মুখ ফুটে বলতে পারি না। আমার প্রেম যাকে পুজো করে, আমি তাকে আদেশ করি। আমার মন-প্রাণ আমার হিয়াকে আমি স্তব্ধ রেখেছি। তীক্ষ্ম ছুরির ফলায় প্রতিনিয়ত আমার মন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে—আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলেও রক্ত ঝরে না।'

চিঠি পড়া শেষ হলে ম্যালভোলিওর চিন্তা, তার মানসিক অস্থিরতা শতগুণ বেড়ে গেল। অশান্ত সাগরের ঢেউ তার বুক তোলপাড় করতে লাগল। এ চিঠি যে তার কর্ত্রীর লেখা এতে এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ রইল না। তিনি লিখেছেন—আমার প্রেম যাকে পুজো করে, আমি তাকে আদেশ করি। আমি তো কর্ত্রীর দাস, তাকে পুজো করলেও আদেশ করতে হয়।

চিঠি কিন্তু শেষ হয় নি, আরো আছে। এর পরের ছত্রগুলো হচ্ছে—'এই চিঠি যদি তোমার হাতে পড়ে একবারটি ভেবে দেখো। আমার ভাগ্য তোমাকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে, পদমর্যাদার ভয়ে পিছিয়ে যেত না। অনেকে মহান হয়ে জন্মায়, আবার কাউকে নিজের চেষ্টায় মহত্ত্ব অর্জন করতে হয়। তাছাড়া এমনও দেখা যায় যে, কারুকে মহত্ত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়। তোমার ভাগ্য মুক্তহস্ত—তার দান প্রত্যাখ্যান না করে গ্রহণ করে নাও। তোমার মনের দীনতা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে সাহসে বুক বেঁধে

এগিয়ে এস। তা যদি না পার চিরদিন সরকার হয়েই অবাঞ্ছিত জীবনযাপন কর।'

ইতি—

চির অসুখী ভাগ্যবতী

ম্যালভোলিও-র কাছে এ-চিঠির ভাষা দিনের চেয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে আপন মনে বলে উঠল—আমাকে বড় হতেই হবে। স্যর টবিকে আমি তাড়াব আর যত সব নচ্ছার রয়েছে কারো সঙ্গেই সম্পর্ক রাখব না। এখন এটা পাগলের প্রলাপ নয়, কর্ত্রী আমাকে সত্যি ভালবাসেন। এই তো এতেই রয়েছে তাঁর ভালবাসার প্রকাশ।

চিঠির অবশিষ্টাংশ আবার পড়তে লাগল—'আমি কে তা হয়ত বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। আমার প্রতি যদি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে তা যেন তোমার হাসির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। তোমার হাসিটি আমার খুব মনে ধরেছে, তোমাকে খুবই সুন্দর দেখায়। তুমি কিন্তু আমার সামনে এসে হাসবে। শুধু এইটুকুই আমার প্রার্থনা—আমার প্রেমের কামনা।'

আড়াল থেকে স্যর টবি, স্যর আন্দ্রু এবং অন্যান্যরা সবই দেখতে লাগলেন। স্যর টবি প্রেমোন্মাদ ম্যালভোলিও-র কাণ্ড দেখে মেরিয়াকে বললেন—মেরিয়া, তোমার পা দু'টো আমার গলার ওপর রাখ। আমি তোমার দাস হতে চাই। এমন স্বপ্নে তুমি হারামজাদাটাকে ডুবিয়ে দিয়েছ, স্বপ্ন ঘুচলে সে পাগল হয়ে যাবে।

মেরিয়া যুদ্ধ জয়ের হাসি হেসে বলল—যদি এই তামাসার আসল রসটুকুও পেতে চান তবে সে যখন কর্ত্রীর কাছে যাবে তখন আশেপাশে থেকে সব লক্ষ্য রাখবেন। কর্ত্রীর কাছে গিয়ে যখন ফিক্ ফিক্ করে হাসবে তখন তিনি মোটেই সহ্য করতে পারবেন না। তাঁর যা মনের অবস্থা, তার ওপর তার গা জ্বালা করা হাসি। যদি আসল মজা দেখতে চান তো আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

তিন

অলিভিয়ার গৃহসংলগ্ন উদ্যান। সেখানে পুরুষবেশী ভায়োলো আর বেহালা হাতে ফেস্তে ছাড়া আর কেউই নেই।

ভায়োলা বললেন—বন্ধু আপনার বেহালাটা দয়া করে একটু থামান। আচ্ছা আপনি কি অলিভিয়ার বোকা ভাঁড় ?

—না, অলিভিয়া মহাশয়া, বোকাকে আমল দেন না। তবে বিয়ের পর কি হবেন জানি না। চিংড়ী মাছ আর হেরিং মাছের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য—বোকা আর সোয়ামির মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাৎ। সোয়ামি একটু বেশি রকম বোকা এইটুকুই মাত্র পার্থক্য।

ভায়োলা তার হাতে একটা মোহর গুঁজে দিল।

ফেস্তে হাত পেতে মোহরটা নিয়ে বলল—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এর পরের

চালানে আপনার গালে যেন একটু দাড়ি মোচ দিয়ে পাঠান।

—আমার চিবুকের দাড়ির অভাব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। একটা খবর দিনতো, কর্ত্রী কি বাড়ি আছেন?

ফেস্তে মুখ বাঁকিয়ে বেহালা বাজতে বাজতে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হলেন দুই রত্ন ; স্যর টবি আর স্যর আন্দ্রু।

ভায়োলা জানাল যে, সে তাঁর ভাইঝির কাছেই এসেছে। ভেতরে যেতে চাচ্ছে।

এমন সময় অলিভিয়া সেখানে হাজির হলেন। ভায়োলা হাত তুলে নমস্কার জানালেন অলিভিয়াকে।

অলিভিয়া আদেশ করলেন—তোমরা এখান থেকে চলে যাও, উদ্যানের দরজা বন্ধ করে দাও। সবাই বিদায় নিলে ভায়োলাকে বললেন—আমার হাতে হাত মেলাও।

ভায়োলা বললেন—সে তো আমার কর্তব্য।

ভায়োলা সামান্য কাছে এগিয়ে এলে অলিভিয়া বললেন—যুবক, তোমার নাম কি?

—আপনার দাসানুদাস সিজারিও।

—যুবক, তুমি তো অর্সিনোর দাস। তবে তুমি আমার দাস কি ক'রে হ'লে?

—তিনি তো আপনার-ই দাস। তাই বলছিলাম আমি আপনার দাসের দাসের দাস।

—আমি তাঁর কথা ভাবিনে যুবক। তিনিও যেন আমার কথা ভেবে নিজের শূন্য হৃদয় পূর্ণ করার চেষ্টা না করেন। এই আমার শেষ কথা।

—আমি তাঁর হয়েই যে আপনার কাছে এসেছি।

—আমার সামনে তাঁর নামটিও উচ্চারণ করো না। তবে যদি একটা কাজের ভার নিয়ে যাও, তবে আমি তোমার কথা—

পুরুষবেশী ভায়োলা ভাবলেন সময় ঘনিয়ে এসেছে, প্রেম নিবেদনের সময় আগত-প্রায়। তিনি কিছুই না বুঝার ভান করে বললেন—বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য?

—আমাকে বলার সুযোগ দাও। যুবক, তোমার খোঁজে ঐ আংটি পাঠিয়েছিলাম। তুমি আমাকে কী যে যাদু করে গিয়েছিলে! সেদিন আমি নিজেকে এবং আমার দাস-দাসী সবাইকে গালমন্দ করেছি—একী করলাম আমি। একী ছলনার আশ্রয় নিয়েছি আমি। তোমার যা মন চায় ভাবতে পার যুবক। বলতে দ্বিধা নেই, যুবক, তুমি আমার সরম সম্মান সবই হরণ করেছ। তোমার মন বড় পাষাণ—শুধুই উৎপীড়ন জানে - ভালবাসতে জানে না। আমার মনের জ্বালা বুঝাবার ভাষা আমার জানা নেই। এবার বল, তুমি কি বলতে চাও।

—দেখুন, দুঃখ-করুণা-বিষাদ এ-সবই প্রেমের লক্ষণ।

—না, না যুবক প্রেমের লক্ষণ নয়। আমরা কি আমাদের শত্রুকে করুণা

করি না।

—তবে আমার নতুন করে হাসার সময় হয়েছে যুবক। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—গর্বে কি অতি দরিদ্র কখনও উদ্ধত হয়? কারো কবলে পড়তে হলে ভালুকের চেয়ে পশুরাজ শ্রেয় নয় কি?

ঢং শব্দ করে ঘড়ি বেজে উঠল। অলিভিয়া বলে উঠলেন—ঐ ঘড়ি আমাকে কি বলছে জান? ঘড়ি আমাকে উপহাস করে বলছে—বৃথাই তুই সময় নষ্ট করলি। তবে কুমার ভয় পেও না, তোমাকে আমি চাই না। তোমার বুদ্ধি পাকা হলে, যখন তোমার পরিণত বয়সে তুমি প্রণয়ীকে ঘরে আনবে তিনি স্বামী-সুখ লাভ করে জীবন ধন্য করতে পারেন যেন।

—দেবী, লাবণ্য আর চিত্তের শুদ্ধতা তোমাকে ঘিরে অবস্থান করুক। আর একটা কথা, আমার প্রভুকে কিছুই কি আপনার বলার নেই?

—যুবক, তুমি আমাকে ভাব কি বল তো?

—আপনি হয় তো ভাবেন, তুমি যা ভাব তুমি তো তা নও।

—ঠিকই বলেছ, আমি তোমাকে ঠিক তা-ই ভাবি।

—তবে তো ঠিকই ভাবেন, আমি যা, তা তো আমি নই।

—আমার মন বলছে, তুমি যদি তা-ই হতে যুবক!

—দেবী তবে কি আমি যা আছি তার চেয়ে খুব একটা ভাল হত? হয়ত বা হতেও পারত।

অলিভিয়া পুরুষবেশী ভায়োলার দিকে তাকিয়ে বললেন—হত্যার অপরাধ মানুষ গোপন রাখে, কিন্তু প্রেম তো তার প্রেমিকের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। যুবক সিজারিও এই বসন্তের দোহাই দিয়ে বলছি, আমার কুমারীত্ব আমার সতীত্বের নামে শপথ নিয়ে বলছি—আমি তোমাকে ভালবাসি যুবক। তোমার সমস্ত অহংকার, তোমার ঔদ্ধত্য তো আমার কামনাকে দমন করে রাখতে পারল না। আমি তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি বলে, তোমাকেও যে আমাকে ভালবাসতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে ভালবাসা প্রতিদান পেল সে ভাল। কিন্তু প্রতিদান পেল না সে তো আরও ভাল, যুবক।

অলিভিয়ার প্রেম নিবেদনের কথা শুনে ভায়োলা বললেন—আমার পবিত্র কৌমার্যের নামে আমি শপথ করছি—আমার মন একটিই, বক্ষ একটিই, সত্য একটিই কেউ তো এর অর্দ্ধস্বামিনী হতে পারবে না। বিদায় দেবী। আজ বলে যাচ্ছি, আর কোন দিন আমার প্রভুর প্রেম নিবেদনের নামে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না।

—তবুও তুমি এসো যুবক, আবার এসো। সে হৃদয় তোমার প্রভুর ভালবাসাকে প্রত্যাখান করছে, তাকে হয়ত বা তুমি প্রেম দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারবে, যুবক।

অলিভিয়ার গৃহ। মানিকজোড়—স্যার টবি এবং স্যার আন্দ্রুকে সেখানে দেখা

যাচ্ছে, সে সঙ্গে ফেবিয়ান তো রয়েছেই।

স্যর আন্দ্রু বলে উঠলেন—না, না এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা চলে না বন্ধু। তোমার ভাইঝিটি আমার চেয়ে তাঁর চাকরদের বেশী ভালবাসে। আমার ওপর তার বিন্দুমাত্র ভালবাসা তো নেই-ই, বরং রয়েছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। আমাকে কি তিনি বোকা ঠাওরেছেন ?

ফেবিয়ান বললেন—এ আপনার মনের ভুল মশাই। আপনাকে রাগাবার জন্যই তিনি বাগানে ঐ ছোঁড়াটাকে এমন পেয়ার দেখিয়েছেন। আপনার মধ্যে যে ঘুমন্ত সাহস রয়েছে তাকে জাগাবার জন্যই তাঁর এ অভিনয়। এখনও যদি কিছু একটা করতে না পারলেন, তবে ওলন্দাজের দাড়িতে জমাট বাঁধা বরফের মত ঝুলে থাকতে হবে।

স্যর আন্দ্রু বললেন—সবই বুঝেছি। এখন একটা পথই রয়েছে যা মুরুদের পথ। ছিচ কাঁদুনে ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝিনে।

—তবে তাই কর, সাহসে ভর করেই তোমার সৌভাগ্যের কেল্লা গড়ে তোল। কাউন্টের ঐ ছোঁড়াটার কাছে লড়াইয়ের চিঠি পাঠান। তাকে জখম কর। তবেই আমার ভাইঝির নেক নজরে পড়বে।

—তবে আপনারা কি একটা চিঠি ঐ ছোঁড়ার কাছে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন ?

—নিশ্চয়ই দেব। আপনি লিখে নিয়ে আসুন। ভাষা হবে কাটখোট্টা—কথার বাহার থাক না থাক, চিঠি যেন কথা বলে। মিছে কথার ফুলঝুরি ছিটিয়ে ছাড়বেন, কালির অক্ষরে বিষ থাকে যেন।

উল্লসিত হয়ে স্যর আন্দ্রু চিঠি লিখতে চলে গেলেন।

আন্দ্রু চলে গেলে স্যর টবি বললেন—ছোকরাকে প্রাণের বন্ধু করেছি, দু দুটো হাজার নগদ খিঁচে নিয়েছি। তার ওপর একটা নগদ চিঠি পাব ফাউস্বরূপ।

এমন সময় মেরিয়া হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। সে স্যর টবিকে বলল—ওদিকে প্রেমের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। প্রেম-পাগল চিঠির বয়ান অনুযায়ী নিজেকে সাজিয়েছে। গীর্জার পাদ্রীর মত হলদে গার্টার চাপিয়েছে মোজায়। যা সাজ চড়িয়েছে কর্ত্রী দেখলে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেবেন। তার ওপর যদি চিঠির বয়ান অনুযায়ী—কর্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করতে গেলে তো আর কথাই নেই। কুকুরের আঠালীর মত আমি তার পিছন পিছন লেগে রয়েছি।

স্যর টবি অধৈর্য হয়ে বললেন—আর দেরী সইছে না। চল-চল যাই পাগল ম্যালভোলিওকে দেখে আসি কেমন সেজেছে।

ইউলিরিয়া নগর। আন্তনিয়ো এসেছে ইউলিরিয়ায়। এখানে তার বহু শত্রু ওত পেতে রয়েছে জেনেও সে সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে ইউলিরিয়ায় এসেছে। সেবাস্তিয়ান আন্তনিয়োকে বলল—তুমি যখন স্বেচ্ছায় এসেছ, তোমাকে আমি ভর্ৎসনা করব না।

আন্তনিয়ো বলল,—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারলাম না বলেই চলে এসেছি। তুমি বিদেশ বিভূঁইয়ে এসেছ, কত রকম বিপদ ঘটতে পারে। বন্ধুত্বহীন দেশে আতিথ্যবিহীন অবস্থায় কি করবে সে চিন্তায় আমি চিন্তিত।

সেবাস্তিয়ান বলল—তোমার আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ।

আমার ইচ্ছা ছিল এ শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি তোমাকে দেখাব। এ-শহরে আমি খুবই ভয় পাই, এখানে পদে পদে বিপদ। কোন এক নৌ-যুদ্ধে আর্সিনোর বিপক্ষে লড়েছি আমি। তাই ভয় হয় ধরা পড়লে আমার ধড়ে মুণ্ডু থাকবে না।

—তুমি কি রাজার সৈন্য ধ্বংস করেছিলে?

—না, এমন ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে নি। তবে রক্তপাত যথেষ্টই হয়েছিল। সুযোগ পেলে প্রতিশোধ তো নেবেই। আমরা অবশ্য ওদের যা কিছু কেড়ে নিয়েছিলাম সবই ফিরিয়ে দিয়েছি।

—তবে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো সঙ্গত নয়। দক্ষিণ শহরতলীর এলিফ্যাণ্ট সরাইখানায় আমি উঠছি। তুমি টাকার থলি দিয়ে যাও। খুব করে ঘুরে ঘুরে সব দেখ। আমাকে ঐ সরাইখানায় পাবে। কথা শেষ করে তারা দুজনে এদিকে চলে গেল।

অলিভিয়ার গৃহের পার্শ্ববর্তী উদ্যান। উদ্যানে মেরিয়াসহ অলিভিয়া রয়েছেন। উভয়ে কথোপকথনে ব্যস্ত।

অলিভিয়া বললেন—তাকে আসতে বলেছি, আসবে বলেছে। তাকে কি খাওয়াব? —কি দিয়ে আপ্যায়ন করব তার যৌবনকে, সে সঙ্গে আমার ভালবাসার মূল্য তো দিতেই হবে। আমার ভদ্র চাকর ম্যালভোলিয়ো কোথায় মেরিয়া?

ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমী ভরা হাসি হেসে মেরিয়া বলল—সে এক্ষুণি এসে যাবে।

বিচিত্র সাজে সেজেছে ম্যালভোলিও। বুদ্ধি-শুদ্ধিও লোপ পেয়েছে লক্ষ্য করছি। সে এলে আমার মনে হয় আপনার কাছে কেউ থাকা দরকার।

অলিভিয়ার নির্দেশে মেরিয়া তাকে ডেকে আনতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে মেরিয়া ম্যালভোলিয়োকে নিয়ে ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই ম্যালভোলিও বলে উঠল—মধুরহাসিনী দেবী।—কথাটা বলেই সে হো হো করে হেসে উঠল।

অলিভিয়া চমকে উঠে বললেন—ম্যালভোলিও আমি বিষাদের জ্বালায় ডুবে মরছি।—তুমি হাসছ।

ম্যালভোলিও বলল—দেবী আপনি দুঃখী? বিপদগ্রস্তা? আমিও আপনার বিষাদের ভাগীদার হতে জানি। আমার যৌবনভরা দেহে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিতেও কুণ্ঠিত হব না।

ম্যালভোলিওর প্রলাপ শুনে অলিভিয়ার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি মনের ক্ষোভ চেপে সহৃদয়তা প্রকাশ করে বললেন—ম্যালভোলিও যাও বিছানায় শুয়ে পড়গে।

ম্যালভোলিও উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠল—বিছানায়? বিছানায় শুতেই তো চাই প্রিয়া। তোমার কাছে আমি আসব প্রিয়া। কথা বলতে বলতে সে ঘন ঘন নিজের হাতে চুমু খেতে লাগল। আবার বলতে শুরু করল সে-ই চিঠির বয়ান স্মরণ ক'রে। বাঃ কী চমৎকার কথা—মহত্বকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেও না। কেউ কেউ জন্মায় মহান হয়ে, কারো ওপরে মহত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়, আবার কেউ বা নিজের কীর্তির বলে মহান হয়ে ওঠে। বাঃ চমৎকার কথা!

ম্যালেভোলিওর কাণ্ড দেখে অলিভিয়া বললেন—তোমার অবস্থা দেখে আমি দুঃখিত। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ করে তুলুন।

ম্যালভোলিও কিন্তু তবুও নিরস্ত হল না। সে অনর্গল বকেই চলেছে—যদি তুমি ভাগ্য গড়ে তুলতে চাও তবে তুমি ভাগ্যবান। তা না চাইলে দাস হয়েই থাক।

ম্যালভোলিওর ক্ষেপামী যখন চরম পর্যায়ে উঠতে চলেছে ঠিক অমনি সময়ে এক ভৃত্য এসে জানাল আর্সিনোর দূত সেই যুবক এসেছে। অলিভিয়ার দর্শনপ্রার্থী। দেখা না করে যাবে না।

অলিভিয়া ক্ষেপা ম্যালভোলিওকে মেরিয়ার হাতে সঁপে দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।

অলিভিয়া চলে গেলে ম্যালভোলিও আবেগভরে বলে উঠল—বাঃ, এই তো চিঠির বয়ানের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

তিনি স্পষ্টই লিখেছেন—তোমার খোলস ছেড়ে নতুন রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসো। বিশিষ্ট হয়ে ওঠ। এখন আবার যাবার সময় মেরিয়াকে বলে গেলেন—ওকে দেখাশুনা কর। আমার আশা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

ম্যালভোলিও যখন এমনি আত্মসুখে বিভোর তখন স্যার টবি এবং ফেবিয়ান এসে হাজির।

স্যার টবি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন - কোথায় শয়তানটা, সে জাহান্নামে গেলেও ছাড়ব না। আমি কটা কথা ওকে বলবই।

চিঠির বয়ানে ছিল দাসদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে। সে কথা স্মরণ করে ম্যাল-ভোলিও বলে উঠল—যাও এখান থেকে, দূরে হও তোমরা। আমি একা থাকতে চাই।

স্যার টবি সহানুভূতির সুরে বললেন—ম্যালভোলিও কেমন আছ? শয়তানকে এড়িয়ে চল ম্যালভোলিও, জান তো ওরা মানুষের চির শত্রু।

শয়তানের কথা শুনে ম্যালভোলিও ভীষণ রকম চটে গিয়ে চীৎকার করে উঠল।

মেরিয়া বলল—দেখেছেন ব্যাপারটা, শয়তানের নিন্দা করতেই কেমন চটে উঠল। নির্ঘাৎ শয়তানই তার কাঁধে ভর করেছে।

ফেবিয়ান রসিকতার সুরে বলল—ঠিকই বলেছেন। তার সঙ্গে এখন মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। শয়তান চড়া মেজাজের, কড়া কথা একেবারেই সইতে পারে না।

ম্যালভোলিও এবার উন্মত্ত প্রায় হয়ে চীৎকার করে উঠল--তোমরা যাও, এখান থেকে সরে যাও বলছি। আমি তোমাদের চেয়ে অনেক উঁচু দরের, আস্তে আস্তে সবই পরিষ্কার হবে। যত্ত সব কুঁড়ের দল।

স্যার টবি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। মেরিয়া বাধা দিয়ে বলল,—বাবু, ওকে আর ঘাঁটাবেন না। ধীরে ধীরে মজা লুঠতে হ'বে তড়িঘড়ি করতে গেলে সবই ভন্ডুল হয়ে যাবে।

এবার ষোল কলা পূর্ণ হল। স্যার আন্দ্রু এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষবেশী ভায়োলার উদ্দেশে লড়াইয়ের আহ্বান পত্র লিখে এনেছেন।

স্যর টবি চিঠিটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন—"হে যুবক, তুমি যেই হও, আমার চোখে তুমি একটা পাজি হতচ্ছাড়া। কারণ—তুমি আমার প্রেয়সী অলিভিয়ার কাছে আস, আমারই সামনে তিনিও তোমার প্রতি আত্মহারা হয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন। এজন্যই তোমাকে আমি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করছি। তুমি তাঁর কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আমি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। সম্ভব হলে আমাকে হত্যা করো। আজ আর নয়—বিদায়। আমাদের একজনের ওপর ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হোক। তবে তা নিশ্চয়ই আমার ওপরই বর্ষিত হবে।"

চিঠি পড়া শেষ করে স্যর টবি বললেন—সুন্দর হয়েছে, যাও বীর, বাগানের কাছে কোথাও লুকিয়ে থাক—কড়া নজর রাখবে। নচ্ছারটাকে দেখলেই খুব করে গাল দেবে—আর তলোয়ার বের করে এগিয়ে যাবে।

স্যর আন্দ্রু রীতিমত গর্বের সঙ্গে বার কয়েক হাতের পেশী আন্দোলিত করে নিজের ক্ষমতা জাহির করে বিদায় নিয়ে বাগানের দিকে চলে গেলেন।

স্যর আন্দ্রু চলে গেলে স্যর টবি বললেন—এ-চিঠি তাকে দেওয়া হবে না। বোকামিতে ভরা এ-চিঠি। এটা হাতে পেলে যুবক তাকে নিরেট আহাম্মক ভাববে।

কথাটা শেষ করে স্যর টবি ফেবিয়ানের মুখের দিকে চোখ ফেরালেন।

ফেবিয়ানকেও চিন্তিত দেখা গেল। কি যেন একটা ব্যাপার তার বুকের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে! গভীর ভাবে কি যেন ভাবছে।

ফেবিয়ানের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে স্যর টবি বললেন—কি হে, তুমি যে হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেলে? কি ভাবছ অমন করে?

ফেবিয়ান নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আচমকা বলে উঠল—কই, কিছুই না তো! কি আবার ভাবব?

—কিছু ভাবছ না?

—না না, কি আবার ভাবব?

হ্যাঁ, কোন ব্যাপার নিয়েই গভীর ভাবনায় তলিয়ে যাবে না। ভাবনা-চিন্তা মন থেকে যত দূরে সরিয়ে রাখতে পার, মঙ্গল। যাক, আমি যা বললাম, সে সম্বন্ধে কিছুই তো বললে না।

—কি ? কি কথা ?

—এই তো বাবা তোমার জালে তুমিই জড়িয়ে পড়লে। এইমাত্র তুমি বললে তুমি কিছুই ভাবছিলে না। তা-ই যদি হয়, তবে আমি এতক্ষণ ধরে যে পাঁচালি গাইলাম, তার একটা কথাও তুমি শুনেছ বলে তো মনে হচ্ছে না।

ফেবিয়ান খুবই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সে আমতা আমতা করে বলল—ঠিক আছে, বলুন—আমি শুনছি।

স্যার টবি আর কথা না বাড়িয়ে পূর্ব বক্তব্যটি পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে বললেন—এই চিঠিটার প্রতিটি অক্ষরে বোকামির ছাপ রয়েছে। এটা তাকে দেব না।

এমন সময় অলিভিয়ার সঙ্গে পুরুষবেশী ভায়োলাকে আসতে দেখা গেল।

ফেবিয়ান বলল—ছোঁড়া এবার বিদায় নেবে মনে হচ্ছে, আমরাও তার পিছু নেব। চলুন আমরাও এখান থেকে সরে অন্যত্র লুকিয়ে থাকি।

স্যার টবি বললেন—প্রস্তাব উত্তম, সমর্থনের যোগ্যও বটে। তবে—

ফেবিয়ান স্যার টবির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—তবে কি ?

—বলতে চাচ্ছি, কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে তো ভালই হয়।

—এতে অসুবিধা কোথায় দেখছেন ?

—অসুবিধা অনেক।

—যেমন ?

—প্রথমতঃ সময় খুবই অল্প, ওরা এসে পেঁছে গেল বলে। দ্বিতীয়তঃ এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গিয়ে লুকোবো ? উপযুক্ত স্থান—

—উপযুক্ত স্থান আছে। সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। সে ব্যবস্থা আমি করব, আমার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিন তো, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব তবে তুমি নিচ্ছ ?

হ্যাঁ, সে দায়িত্ব আমার। আপনি চলুন, আমি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।

স্যার টবি সবাইকে নিয়ে গোপন অন্তরালে আশ্রয় নিলে অলিভিয়া ভায়োলাকে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আসলেন।

অলিভিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—যুবক, তোমার মন পাষাণের চেয়ে কঠিন। তোমার পাষাণ-হৃদয়ের কাছে অনেক কেঁদেছি। আমার মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার নারীত্বের গর্ব আমাকে ভৎসনা করছে—আমি কোন কথাই ভাবিনি। তোমাতেই আমাকে—

সিজারিয়োবেশী ভায়োলো জবাব দিল—দেবী, আমার প্রভুর কামনাও আপনারই মত।

অলিভিয়া সবিনয়ে মিনতির সুরে বললেন—যুবক, এই মণিটা তুমি নাও, ফিরিয়ে দিও না। এতে রয়েছে আমার প্রতিকৃতি। এটার তো আর বাক্‌ক্ষমতা নেই যে, তোমাকে এমনি ক'রে বিরক্ত করবে। আমার একমাত্র মিনতি রইল—কাল আবার এসো।

—আমার মিনতিও তো খুবই সামান্য। আপনি শুধুমাত্র আমার প্রভুকে ভালবাসুন। তাঁর প্রতি এমন নির্দয় হবেন না, একটু সদয় হোন।

—কিন্তু যুবক, তা কি করে সম্ভব? আমার যা কিছু সবই তোমাকে অর্পণ করেছি তা অন্যকে কি করে দেব?

—আমি মুক্তি দিলাম আপনাকে।

—মুক্তি?

—হ্যাঁ, আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম।

—তুমি তো এক কথাতেই সব সমস্যার সমাধান করে দিলে কিন্তু—

—এর মধ্যে তো আর কোন কিন্তু নেই।

—তোমার সহজ-সরল মনোভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি।

সে ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে বলে উঠল,—তাই নাকি?

—তা ছাড়া কি? এক মুহূর্তে সব কিছু মিটিয়ে দিয়ে কী সুন্দর নিষ্পত্তি করে ফেললে! সত্যি আমি খুবই অবাক হলাম।

—অবাক মনে করলেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হবে। নইলে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখলে খুবই সহজ সরল—নিতান্তই সাধারণ একটা ব্যাপার ছাড়া কি? যাক, আমার দিক থেকে যেটুকু প্রত্যাশা করছেন, পাবেন। এতটুকুও ত্রুটি হবে না।

—ঠিক আছে, কাল এসো। তোমার দেখছি বড়ই দুর্মতি, তুমি আমাকে নরকে টেনে নিয়ে যেতে পার।

বিদায় নিয়ে অলিভিয়া চলে যেতেই স্যার টবি পুরুষবেশী ভায়োলাকে বললেন—হে ছোকরা, এবার আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হও। তোমার শত্রু, তোমার মৃত্যুদূত বাগানের কোণে রাগে গজ গজ করছে।

ভায়োলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি সশঙ্কিত চিত্তে জবাব দিলেন—আপনি মনে হয় কোথাও ভুল করছেন। আমি তো কারো ক্ষতিই করিনি, আমার শত্রু কোত্থেকে আসবে?

—সে কী! তুমি যে পরম নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ হে।

—আমি সত্যি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনে।

—কিছুই বুঝতে পারছ না?

—না।—ভায়োলা স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিলেন।

—আমি কিন্তু এক বিন্দুও মিথ্যে বলিনি।

—সে না হয় স্বীকার করলাম, আপনি যা বলছেন সবই সত্যি। কিন্তু—

স্যার টবি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভায়োলার মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, তুমি নিজেকে যত নিরাপদ ভাব, যতই নিজেকে অজাতশত্রু ভাব না কেন, তোমার সমূহ বিপদ, যা আমি আয়নার মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

—কিন্তু জীবনে কারো এতটুকুও ক্ষতি করেছি বলে মনে পড়ছে না !

—সময় মত টের পাবে 'খন। প্রাণে বাঁচতে চাইলে তৈরী হও।

—শুনেছি এমন অনেক লোক রয়েছে যারা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজেকে জাহির করতে চায়।

স্যর টবি ফেবিয়ানকে বললেন—তুমি এক কাজ কর, ওর কাছে থাক, আমি গিয়ে দেখে আসি এর জন্য কি করতে পারি।

স্যর টবি চলে গেলে ভায়োলা বললেন—আচ্ছা, এ-ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন? অকারণ ও অবাঞ্ছিত বিবাদটি মিটিয়ে দিতে পারেন না। যদি আমাকে বিপদমুক্ত করতে পারেন, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের বাইরে স্যর টবি ও স্যর আন্দ্রুর কথা শোনা গেল।

স্যর টবি বললেন—যুবকটা একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান। আমার সঙ্গে এক হাত তলোয়ার খেলল, এমন মোক্ষম প্যাঁচ কষলে যে কি বলব। শুনলাম সে নাকি এক সময় পারস্যের বাদশার তলোয়ার খেলোয়াড় ছিল।

স্যর আন্দ্রু ভয়ে মুষড়ে পড়লেন। বললেন—তবে আর বিবাদ করে লাভ নেই, কি বলেন? এমন বীর জানলে কি আর লড়াইয়ে ডাকি? আপনি চান তো আমার ঘোড়াটাও আপনাকে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু মধ্যস্থতা করে বিবাদটা মিটিয়ে দিন দয়া করে।

—বৃথা চেষ্টা বন্ধু। একবার যখন লড়াইয়ে আহবান করেছেন, না লড়ে ও ছাড়বে না।

ঘরের ভেতরে অবস্থানরত ভায়োলা সবই শুনছেন। ভাবছেন সর্বনাশ হয়েছে, যদি শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের পরিস্থিতি আসে তবে বাধ্য হয়ে সব ফাঁস করে দেব। বলব—আমার পুরুষত্বে অভাব রয়েছে, আমার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরে নিজের বীরত্বের কলঙ্ক ডেকে আনবেন না।

ফেবিয়ান ভায়োলাকে রক্ষা করার আশ্বাস দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। এমন সময় সেখানে আন্তনিয়ো হাজির হল।

তাকে দেখে স্যর টবি বললেন—আপনি কে? কি চাই এখানে?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কয়েকজন রাজকর্মচারীও সেখানে প্রবেশ করলেন। তাদের মধ্যে একজন আন্তনিয়োকে বললেন—রাজা আর্সিনোর অভিযোগে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

আন্তনিয়ো বললেন—আমি আন্তনিয়ো নই, আপনারা হয়ত কোথাও ভুল করছেন।

—না, না ভুল আমরা করিনি। আপনাকে আমি চিনি।

আন্তনিয়ো ভায়োলাকে বলল—তোমাকে খুঁজতে এসে এ-বিপদে জড়িয়েছি। এখন রাজাদেশ না মেনে উপায় নেই। তোমার জন্যও কিছু করতে পারলাম না, এই যা

দুঃখ।

—কিন্তু ব্যাপারটা—

—এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই ভায়োলা। রাজাদেশ—

ভায়োলা তাকে বাধা দিয়ে বললে—হোকগে রাজাদেশ।

—তা হয় না ভায়োলা। রাজাদেশ অমান্য করা যায় না।

—কিন্তু যদি—

—যদি রাজাদেশ অন্যায় জুলুম হয় তবুও তাকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। তোমার জন্যই এখানে এসেছিলাম, তোমার জন্য যদি কিছুও করতে পারতাম, অন্ততঃ স্বস্তি থাকত।

—হ্যাঁ, আমার জন্যই আপনাকে—

—যাক, তার জন্য আর মিছে আক্ষেপ করে কি হবে? যা ভবিতব্য তাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না।

আন্তনিয়োর বিলম্বে রাজকর্মচারীদের বিরক্তির উদ্রেক করলো। তাদের মধ্যে একজন রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল,—কী ব্যাপার, আপনি অহেতুক আমাদের দেরি করিয়ে দিচ্ছেন।

আন্তনিয়ো রাজকর্মচারীর কথায় যেন আচমকা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—আপনারা মিছেই রাগ করছেন। আমি তো যাব না বলিনি। যাবার আগে ওর সঙ্গে দুটো কথা—

রাজকর্মচারীটি খেঁকিয়ে উঠল—থাক, আর কথা বলে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি চলুন মশায়। এখানে দাঁড়িয়ে নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।

আন্তনিয়ো বললেন—ঠিক আছে, তোমাদের অমূল্য সময় আর নষ্ট করব না। চল কোথায় নিয়ে যাবে, আমি প্রস্তুত।

ভায়োলা বললেন—আপনি আমার জন্য এ বিপদ ঘাড়ে নিলেন। কিন্তু আপনাকে আমি চিনিনে, দেখিওনি কোন দিন।

আন্তনিয়ো ওপরে দু'হাত তুলে বলে উঠলেন—হে ঈশ্বর!

প্রহরীরা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। সে চীৎকার করে বলতে বলতে এগিয়ে গেল—সেবাস্তিয়ান, তুমি এখন কোথায়? এসে দেখ আমার কী বিপদ।

আন্তনিয়োর মুখে সেবাস্তিয়ানের নাম শুনে ভায়োলো চমকে উঠলেন। ভাবলেন—তবে সে কি জীবিত? সে কি বেঁচে আছে? সে আমার মতই দেখতে ছিল, আমার মত এমন সাজসজ্জা করত। আমি নিজেকে অবিকল তার মত করেই সাজিয়েছি। ভায়োলা সেবাস্তিয়ানের কথা ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন।

চার

সেবাস্তিয়ান অলিভিয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাঁড় এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। ভায়োলা মনে করে সে ভুল করেছে। তাই বললেন—তার কর্ত্রী তাঁকে এখেলা দিয়েছেন।

সেবাস্তিয়ান এ সবের কিছুই জানেন না। তাই ধমক দিয়ে বললেন—সরো, পথের মাঝে রঙ্গ করো না।

ভাঁড় বলল—রঙ্গ আমি করছি, নাকি আপনি করছেন। আমি কি আপনাকে চিনি না নাকি? আমার কর্ত্রী যেন আপনাকে ডেকে পাঠান নি, এমন একটা ভাব করছেন! আপনার নাম যে সিজারিয়ো তাও বুঝি আমি জানিনে!

ভাঁড়ের কাণ্ড দেখে সেবাস্তিয়ানের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম। তুমি কেন মিছে ঝামেলা করছ? আমার নাম সিজারিয়ো নয়। তুমি আমাকে চিনতে ভুল করেছ। পথ ছেড়ে দাঁড়াও, মিছে ঝামেলা করো না।

আপনিই তো ঝামেলা বেশি করছেন দেখছি। চিনি না, জানি না, এসব কথা ছাড়ুন। বাজে কথা রেখে বলুন, কর্ত্রীকে গিয়ে কি বলব? আপনি তাঁর কাছে যাচ্ছেন কি?

—তুমি পথ ছাড়, আমাকে যেতে দাও, বকশিস চাও দিচ্ছি আমাকে রেহাই দাও।

—বুঝেছি আপনি খুবই দয়ালু। আপনার বকশিসে আমার দরকার নেই।

এমন সময় ঘটল আর এক বিপদ। স্যার টবি এবং স্যার আন্দ্রু সেখানে এসে হাজির হলেন। স্যার আন্দ্রু তাকে দেখেই বলে উঠলেন—এবার বাছাধন যাবে কোথায়?—পেয়েছি।

সেবাস্তিয়ান তো ভায়োলা নন তিনি যে পুরুষ। তিনি সহ্য করবেন না কেন? তিনিও রীতিমত রুখে দাঁড়ালেন।

পরিস্থিতি জটিল দেখে স্যার টবি ব্যস্ত হ'য়ে দু'জনকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে ভাঁড় সরে পড়ল।

নাকানি চুবানি খেয়ে স্যার আন্দ্রু বললেন—দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। আদালতে নালিশ করব আমি। দেখি ইউলিরিয়ায় আইন আছে কিনা।

দুজন পরস্পরের ওপর যখন মারমুখি হয়ে উঠেছিল, স্যার টবি এগিয়ে এসে মধ্যস্থতা না করলে হয়ত বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে যেত।

স্যার টবির ব্যবস্থা ভাঁড়ের অনুকূলেই গেল। সে সুযোগ হাত ছাড়া করল না, পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই সঙ্গত মনে করল। সে সেখান থেকে সরে পড়ার সময়ে ফিসফিসিয়ে বলল,—দরকার নেই বাবা, এসবের মধ্যে গিয়ে। বলা যায় না কোত্থেকে কি ঘটে যাবে। একটা খুনোখুনি ঘটে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অতএব য

পলায়তি স জীবতি।

এমন সময় অলিভিয়া সেখানে এলেন। তাদের বাক্‌বিতণ্ডা তখনও চলছিল। মারমুখী স্যার আন্দ্রু এবং সেবাস্তিয়ানকে দেখে তিনি ছুটে তাঁদের কাছে গিয়ে নিরস্ত করলেন।

স্যার টবি, স্যার আন্দ্রু এবং ফেবিয়ান অনন্যোপায় হ'য়ে সেখান থেকে চম্পট দিলেন। অলিভিয়া এগিয়ে এসে সেবাস্তিয়ানকে পুরুষবেশী ভায়োলা মনে করে বললেন—বন্ধু, এর জন্য তুমি কিছু মনে করো না। চল বাড়ির ভেতর চল। এ বদমায়েশটা সম্বন্ধে তোমাকে এমন সব কথা বলব যা শুনে তুমি হেসে খুন হবে। আমার প্রতি বিমুখ হয়ো না।

সেবাস্তিয়ান তো অলিভিয়াকে দেখে মুগ্ধ। তাঁর সুরেলা মিষ্টিমধুর গলার স্বর তাঁকে রীতিমত বিস্মিত করেছে। তাঁর সর্বাঙ্গে শিরা-উপশিরার এক আনন্দানুভূতি বয়ে চলেছে। ভাবছে একী স্বপ্ন না সত্যি? যদি স্বপ্নই হয় এ ঘুম যেন কোন দিনই না ভাঙে।

উদ্ভিন্ন যৌবনা অলিভিয়া তার রূপের ডালি মেলে ধরে সেবাস্তিয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে মিষ্টি হাসির ছোপ, চোখের তারায় কাছে টানার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

সেবাস্তিয়ান বিস্ময় ভরা চোখে অলিভিয়ার রূপ-যৌবন-সুধা পান করছেন অবাক-বিস্ময়ে ভাবছেন, কী রূপ! যেন সারা বিশ্বের সৌন্দর্য রাশি অলিভিয়ার দেহে একত্রে পুঞ্জীভূত হয়েছে। এমন একটি রূপসী-যুবতীর সাহচর্য লাভ করা তো দূরের কথা, মুহূর্তের জন্য চোখে দেখলেও যে কোন সৌন্দর্যের পূজারী পুরুষের জীবন সার্থক। অলিভিয়া সবিনয়ে নিবেদন করলেন—চল যুবক, চল। আমার শাসন মানবে?

অলিভিয়ার ব্যবহারে সেবাস্তিয়ান মুগ্ধ। তিনি বলে উঠলেন—মানব। দেবী, আপনার শাসন আমি অক্ষরে অক্ষরে মানব।

—ঠিক আছে। তবে আর দেরী করছ কেন—চল।

সেবাস্তিয়ান দ্বিরুক্তিমাত্র না করে অলিভিয়ার সঙ্গে ভিতরে চলে গেলেন।

অলিভিয়ার বাড়ি। ঘরে মেরিয়া এবং ভাঁড় ফেস্তেকে দেখা যাচ্ছে। তারা কথোপকথনে ব্যস্ত। জোব্বাটা পরে চটপট তৈরী হ'য়ে নাও। আর এই নকল দাড়িটা লাগিয়ে নাও যাতে একজন পাদ্রী বলে মনে হয়। পাদ্রী স্যার তোপাস। আমি স্যার টবিকে ডেকে আনছি। এর মধ্যে তৈরী হয়ে নাও।

মেরিয়া চলে গেলে ফেস্তে জোব্বা পরতে পরতে বলল—আজই জীবনের প্রথম জোব্বা চাপিয়ে প্রতারণা করতে চলেছি।

স্যার টবি ঘরে ঢুকেই নতজানু হ'য়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। ভাঁড় ফেস্তেও প্রতি সম্ভাষণ জানালেন। পাদ্রীর ভড়ং সহ পাদ্রীসুলভ কথা শুরু করল সে।

স্যার টবি জাল-পাদ্রীর প্রশংসা করে বললেন—বাঃ! জাল-পাদ্রী তো তোফা

অভিনয় করছে !

এমন সময় বাইরে ম্যালভোলিওর স্বর শোনা গেল—সে বলল—কে ? কে কথা বলছে ওখানে ?

ভাঁড় বলল—আমি পাদ্রী তোপাস, পাগল ম্যালভোলিওকে দেখতে এসেছি।

ম্যালভোলিও পাদ্রীর কথা শুনে আবেগে গদগদ হয়ে বলল—ওগো, পূজোনীয় পাদ্রী তোপাস, আপনি দয়া করে একবারটি আমার কর্ত্রীর কাছে যান।

জাল-পাদ্রী বলে উঠলেন—তোর কাঁধে সত্যি শয়তান ভর করেছে দেখছি ! তা না হলে মেয়েমানুষ ছাড়া তোর মুখে কথা নেই কেন ? কাঁধে শয়তান চেপেছে তোর, আমি তোর কর্ত্রীর কাছে গিয়ে কি করব রে হতচ্ছাড়া ?

ম্যালভোলিও কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল—দেখুন আমি পাগল নই। সবাই আমাকে পাগল সাজিয়ে এখানে আটকে রেখেছে। আমার মত এমন অত্যাচার যেন পরম শত্রুকেও ভোগ করতে না হয় ! ওরা আমাকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে, আবার পাদ্রী ডেকে এনেছে আমার চিকিৎসার জন্য।

পাদ্রী তোপাস বলল—তাই তো তোমার কষ্টে আমি আন্তরিক দুঃখিত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে শীঘ্র সুস্থ ক'রে তুলুন।

অলিভিয়ার বাড়ির সামনের বাগান। এখানে এখন আর আগের মত হাসি-তামাসার আসর বসে না। কিউপিড়ের সৌভাগ্যবান সেবাস্তিয়ান স্থায়ী আস্তানা গেড়েছেন।

বাগানের ঝিরঝিরে বাতাসে পায়চারি করতে করতে সেবাস্তিয়ান আপন মনে বলছেন—এই তো সূর্য—এই তো বাতাস নিত্য দিনের মত স্বাভাবিক ভাবেই বইছে। এই মুক্তো তিনি আমাকে দিয়েছেন, এই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। একী বিস্ময় আমার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। এলিফ্যাণ্ট সরাইখানায় গিয়ে আন্তনিয়োকে পেলাম না। আমার খোঁজে শহরে গিয়েছে শুনলাম। এ-সময়ে তার পরামর্শ আমার একান্ত দরকার ছিল। আমার মনে হচ্ছে সব কিছুর পিছনে এক মহাভুল কাজ করছে। আমারই চোখকে বিশ্বাস করতেই হবে। বিবেক যে স্বীকার করছে না, বিবেকের সঙ্গে বিবাদ চলছে প্রতিনিয়ত। বিবেক তো বলছে না, আমি উন্মাদ হয়ে গেছি। তবে কি রূপসী যুবতীই উন্মাদিনী ? কিন্তু তা-ই ভাবি কি করে ? তবে তিনি বাড়ির কর্ত্রী হয়ে সবাইকে চালাচ্ছেনই বা কি করে ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই কোন ভুল এর পিছনে রয়েছে। যার বশবর্তী হয়ে এই যুবতী চালিত হচ্ছেন !

এমন সময় পাদ্রীর সঙ্গে অলিভিয়া সেবাস্তিয়ানের সামনে এসেই বললেন—যুবক, আমি একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছি, তার জন্য কিছু মনে করো না কিন্তু। এখন চল পাদ্রী আর আমরা যাই উপাসনাগৃহে। সেখানে সেই পবিত্র পীঠস্থানে তোমার বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি আমাকে দেবে তুমি। আমার মন বড়ই দুর্বল, বড়ই সন্দেহ-প্রবণ। তোমার প্রতিশ্রুতি পেলে মন আমার শান্ত হবে। পাদ্রীমশাই কথা দিয়েছেন তিনি এ-কথা গোপন রাখবেন। তোমার অনুমতি পেলে আমার জন্মদিনের শুভক্ষণে

সর্বজন সমক্ষে তা প্রচার করবেন।

সেবাস্তিয়ান যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি সানন্দে বললেন—আমি যাব। পাদ্রী মশাইকে অনুসরণ করব আমি। পবিত্র উপাসনা-মন্দিরে শপথ করব আমি তোমার চিরবিশ্বস্ত হয়ে থাকব।

উভয়েই আনন্দে টলমল। পাদ্রীমশাই সেবাস্তিয়ান এবং অলিভিয়াকে নিয়ে চললেন উপাসনা-গৃহের উদ্দেশ্যে।

এতদিনে অলিভিয়ার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। তিনি তাঁর বাঞ্ছিত যুবক সিজারিয়োকে নিজের করে পেয়েছেন। তাঁর অনেক দিনের সাধ আজ পূর্ণ হল। সার্থক পরিণতি লাভ করল তাঁর প্রেম। এর অনির্বচনীয় আনন্দের মধ্যে প্রহর কাটাচ্ছেন তিনি। কিন্তু ভুলের বোঝা এখনও হাল্কা হল না। অলিভিয়া সেবাস্তিয়ানকে পুরুষবেশী ভায়োলা মনে করে সেবাস্তিয়ানকে গ্রহণ করেছেন। রাজা আর্সিনোর দূত ভায়োলা কিন্তু এ-সব ব্যাপার কিছুই জানেন না। তিনি এখনও আর্সিনোর হয়ে প্রেম নিবেদন করার ইচ্ছা পোষণ করছেন। আর রাজা আর্সিনো? তিনি রূপসী যুবতী অলিভিয়াকে পাবার জন্য এখনও প্রেমোন্মাদ। তাঁর গতি কি হবে?

রাজা আর্সিনো অনুচরদের নিয়ে অলিভিয়ার বাড়ি হাজির হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ভায়োলা, কিউরিয়ো এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ। রাজা অলিভিয়ার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ফেবিয়ান এবং ভাঁড় ফেস্তের সঙ্গে কথা বলছেন।

আর্সিনো বললেন—আমি অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার উপস্থিতির কথা তাঁকে জানাও।

ভাঁড় ফেস্তে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল। আর্সিনো ভাঁড়ের মধ্যে কর্তব্য পালনের সামান্যতম আভাসও পেলেন না।

আর্সিনো আবার বললেন—আমি অলিভিয়ার দর্শনপ্রার্থী।

—আপনি?

—আমার পরিচয় জানার তোমার দরকার নেই।

—তবে কি বলব গিয়ে!—সে এমন একটা ভাব করল যেন জীবনে কোন দিনই তাকে দেখেনি।

—ঠিক আছে, তাকে গিয়ে বল, আর্সিনো নামে এক আগন্তুক তার দর্শনপ্রার্থী।

আর্সিনোর নামটা কানে যেতেই ভাঁড়ের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল।

আর্সিনো বললেন—যাও, অলিভিয়াকে গিয়ে শুধু আমার উপস্থিতির খবরটা পৌঁছে দাও, তবেই যথেষ্ট।

—ভাঁড় ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে বলল—ঠিক আছে, আপনি ঐ ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি এক্ষুনি খবরটা পৌঁছে দিচ্ছি।

—আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি, তুমি

তাকে খবরটা পৌঁছে দাও।

ভাঁড় সম্মতি জানিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে ছুটে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সঙ্গীদের সঙ্গে আন্তনিয়ো সেখানে উপস্থিত হলেন।

ভায়োলো তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন—ইনি আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

আর্সিনোও আন্তনিয়োকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—এ মুখ আমার খুবই চেনা। জীবনে ভুলব না একে। একে যখন আমি প্রথম দেখি তখন আমার রণ-দেবতা ভালকানের মতই রুদ্র রূপ ধারণ করেছিল। এ-লোকটা ছিল এক ছোট্ট জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমাদের নৌবহরের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছিল সে। আমাদের ক্ষতি করেই সে নিজের ক্ষতি বাড়িয়ে দিয়ে ছিল। রাজা আর্সিনো এবার রক্ষীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—কি ব্যাপার বলতো? একে কোথায় পেলে?

রক্ষীদের প্রধান জানাল—মহারাজ এ লোকটার নাম আন্তনিয়ো, আমাদের পণ্য তরী লুঠ করেছিল। আর আমাদের তরী নষ্ট করেছিল। তাছাড়া আপনার ভাইপোর পা খোঁড়া করেছিল। আজ শহরের পথে ঘোরাঘুরি করতে দেখতে পেয়ে আমরা একে ধরে ফেলি।

ভায়োলো বললেন—ইনি আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরে পাগলের মত এমন সব প্রলাপ বকতে শুরু করলেন যার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারছিলাম না। সব কিছুর মধ্যেই কেমন একটা গভীর রহস্য রয়েছে মনে হচ্ছে।

রাজা আর্সিনো বলে উঠলেন—কুখ্যাত জলদস্যু তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি। কোন্ সাহসে তুমি এখানে এলে? কোন্ সাহসেই বা তুমি শত্রু জেনেও আমাদের সীমানায় পা দিয়েছো?

আন্তনিয়ো রাজা আর্সিনোর মারমুখি ভাব দেখে মিইয়ে গেলেন। কোন রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ভয়মিশ্রিত কাঁপা গলায় জবাব দিলেন—মহারাজ, আপনি বৃথাই আমার ওপর রাগ করছেন। ক্রোধোন্মত্ত রাজা আর্সিনো গর্জে উঠলেন—আমি বৃথা রাগ করছি! তোমার এত বড় বুকের পাটা যে, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এত বড় কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে?

আন্তনিয়ো হাত কচলে পুনরায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন,—আপনার কাছে এই মুহূর্তে আমার একটাই অনুরোধ—

—অনুরোধ? কি তোমার সেই অনুরোধ?

—যদি অভয় দেন আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে ব্যক্ত করি। সবকিছু শুনে আপনি যা ভাল মনে করেন করবেন।

—ঠিক আছে, তোমার কি বলার আছে, বলতে পার।

আন্তনিয়ো ভীত সন্ত্রস্তমনে জবাব দিলেন—হে রাজা আর্সিনো,আপনি আমাকেযে

খেতাবের দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আজ আর অন্তনিয়ো দস্যু নন। সে নিজেও অবশ্য রাজা আর্সিনোর শত্রু বলেই নিজেকে জানে। এক মায়ার জালে জড়িয়েই আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অকৃতজ্ঞ বালকটিকে আমি উত্তাল সমুদ্রের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিলাম। তার জীবন রক্ষার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—আমি নিজের জীবন তুচ্ছ করে সমুদ্রের করাল গ্রাস থেকে তুলে এনে নব জন্ম দান করেছিলাম। সে মুহূর্ত থেকেই তাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। আর তার জন্যই আমাকে শত্রুর সীমানায় প্রবেশ করতে হয়েছে। শুধু কি তা-ই। শত্রুর রক্ষীদের দ্বারা ধৃত হয়ে আপনার কাছে হাজির হ'তে হয়েছে। বড় দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, সে যখন আক্রান্ত হয়েছিল আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে অসি হাতে ছুটে গিয়েছিলাম। শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়েও এনেছি। কিন্তু অকৃতজ্ঞটা আমার বিপদের সময় আমার সঙ্গী তো হলই না, এমনকি আমি যে তার পরিচিত একথাটুকুও স্বীকার করল না।

ভায়োলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এ-সব ব্যাপারের কিছুই তাঁর জ্ঞাতসারে ঘটে নি। আসলে ব্যাপারটা যে তাঁর ভাই সেবাস্তিয়ানকে নিয়ে ঘটচে তা-ও কারোরই জানা নেই। ভায়োলা এবং সেবাস্তিয়ান যমজ ভাই-বোন। মুখের গঠন থেকে শুরু করে দৈহিক আকৃতি সবেতেই যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

আর্সিনোও ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতবাক। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—আচ্ছা এ বালক কবে শহরে আসে।

আন্তনিয়ো বললেন—আজ তিন মাস হল। আমরা এক সঙ্গেই শহরের এক প্রান্তে সরাইখানায় উঠেছিলাম। ক'দিন ধরে সে সরাইখানা ত্যাগ করে শহরে আসে। তার খোঁজ না পেয়ে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আর খোঁজ করতে করতে শহরের দিকে আসি, তখনই এ-বিপদের মুখে পড়ি।

আর্সিনো বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—তিন মাস!

—হ্যাঁ মহারাজ তিনমাস।

—তোমরা একই সঙ্গে ছিলে? এক সঙ্গে সরাইখানায় উঠেছিলে?

—হ্যাঁ মহারাজ, আমরা দু'জনে একই সঙ্গে সরাইখানায় উঠি।

—তারপর?

—তারপর ঐ যে বললাম মহারাজ একদিন হঠাৎ সে নিখোঁজ হয়ে যায়। একদিন আমি বিশেষ দরকারে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়েছিলাম। ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল।

—তারপর?

—আমি সরাইখানায় ফিরে আর তাকে দেখতে পেলাম না। খোঁজ করে হতাশ হয়েই আমাকে শহরের দিকে আসতে হয়েছে।

এমন সময় অলিভিয়ার কথা শোনা গেল। তিনি সংবাদ পেয়ে আর্সিনোর সঙ্গে

দেখা করতে আসছিলেন। রাজা আর্সিনোকে দরজায় অপেক্ষমান দেখে অভিবাদনসহ বললেন—প্রভু, আপনি হঠাৎ আমার দরজায়! অলিভিয়াকে আদেশ করুন কি করতে হবে?

সমস্যার সমাধান কিন্তু এখানেই হয়ে যেত। কিন্তু তা সম্ভব হল না। অলিভিয়া আসার আগেই তিনি রক্ষীদের দ্বারা আন্তনিয়োকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

তারপর পুরুষবেশী ভায়োলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—সিজারিয়ো, কই তুমি তো তোমার কথা রাখনি।

ভায়োলা শশব্যস্ত হয়ে বললেন—কি কথা দেবী? কই, আমারও তো কিছু মনে পড়ছে না কোন কথা খেলাপ করেছি বলে!

অলিভিয়া বললেন কিছুই তোমার মনে পড়ছে না? তোমার কিছু বলার নেই।

ভায়োলা নীচু গলায় জবাব দিলেন—আমার আর কিছুই বলার নেই। আমার কর্তব্য আমার বাক্‌শক্তি কেড়ে নিয়েছে। যা কিছু বলার সবই আমার প্রভুই বলবেন, তাঁর মুখ থেকেই শুনুন দেবী।

অলিভিয়া সবিনয়ে নিবেদন করলেন—প্রভু, সেই পুরোনো কথা আর নয়। সেই প্রেমের কথা যদি তোলেন তবে তা তো আমার কাছে অপ্রিয়ই ঠেকবে। সঙ্গীতের পর যে শূন্যতা মনের কোণে জেগে ওঠে সে-শূন্যতাই মনকে নতুন পীড়া দেবে।

আর্সিনো চমকে উঠলেন—সুন্দরী, সত্যি তুমি এত নিষ্ঠুর। তোমার মনের খবর আজও পেলাম না।

শান্তস্বরে অলিভিয়া জবাব দিলেন—আমি অচঞ্চল স্থির। আমি নিষ্ঠুর তো নই।

—তুমি রীতিমত অভদ্র। আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাকে অর্পণ করেছি আমি। এমন ভালবাসার অর্ঘ্য তো আমার শূন্য হৃদয় কোনদিন লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। তুমিই বল—এখন আমি কি করি?

অলিভিয়ার মৃদুস্বর শোনা গেল—আমি তার কি করব বলুন প্রভু। আমি নিরুপায়—একান্ত অসহায় আমি। এখন আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।

—তাই করব আমি। কেনই বা করব না! আমিও তো মানুষ আমারও তো মন বলে জিনিষ রয়েছে। মিশরীয় দস্যুর মত যাকে ভালবাসি তাকে যদি নিজে হাতে হত্যা করতে পারতাম—তবে তা-ই করতাম আমি। আমার কথা শোন সুন্দরী, তুমি আমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছ তা আমি জানতাম। আমার ঈপ্সিত মন তুমি কাকে অর্পণ করেছ তা-ও আমার অজ্ঞাত নয়।—কথা কটা বলে রাজা আর্সিনো চলে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। হঠাৎ পিছন ফিরে আবার বললেন—সুন্দরী, আমার স্থানে যে দাসকে তুমি বুকে ঠাঁই দিয়েছ, তাকে আমি রেহাই দেব না। সে অত্যাচারীকে আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হব না। এসো বালক, এখানে আর নয় —চলে এসো। আমার মন এখন পাপের বশবর্তী, পাপের মধ্য দিয়েই আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করব। ক্রোধোন্মত্ত রাজা আর্সিনো সদর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে

লাগলেন। ভায়োলা তাঁকে অনুসরণ করলেন।

গমনোদ্যত ভায়োলাকে লক্ষ্য করে অলিভিয়া বললেন—সিজারিয়ো তুমি কোথায় যাচ্ছ?

সিজারিয়ো বেশধারিণী ভায়োলা বললেন—কোথায় আবার যাব? যাকে ভালবাসি তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছি।

উন্মাদিনী হয়ে অলিভিয়া আর্তনাদ করে উঠলেন—হায়! এ কী প্রতারণা করছ যুবক। পৃথিবীতে এমন কে রয়েছে যাকে—

চোখের পাতা দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে ভায়োলা বললেন,—এ কী বলছেন আপনি? প্রতারণা? কে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে?

অলিভিয়া প্রায় কান্নাপ্লুত স্বরে বললেন—তুমি কি তোমার নিজের কথা ভুলে গেছ? সে তো দীর্ঘদিনের কথা নয়! মেরিয়া যাও, পাদ্রীকে ডেকে নিয়ে এসো।

অলিভিয়ার নির্দেশে মেরিয়া চলে গেল পাদ্রীকে ডেকে আনতে।

আর্সিনো অহেতুক সময় নষ্ট করতে রাজী নন। তিনি ভায়োলাকে বললেন—সিজারিয়ো কেন মিছে সময় নষ্ট করছ? চলে এসো আমার সঙ্গে।

অলিভিয়া বাধা দিয়ে বললেন—না, না তা হয় না। তুমি আমাকে ফেলে কোথায় যাবে স্বামী! তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না প্রাণনাথ।

তুমি থাকবে—আমার কাছেই থাকবে স্বামী।

রাজা আর্সিনো যার-পর-নাই বিস্মিত হলেন। তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ভাবছেন—একী বলছেন অলিভিয়া। সিজারিয়োকে স্বামী বলে সম্বোধন করছে। তবে কি—তবে কি আমার অগোচরে কোন অঘটন ঘটে গেছে! তিনি অলিভিয়াকে সম্বোধন করে বললেন—কি বললে সুন্দরী সিজারিয়োকে স্বামী সম্বোধন করলে?

অলিভিয়া নির্দ্বিধায় বললেন—হ্যাঁ, স্বামী। আমি তাঁকে স্বামীর মর্যাদায় বুকে ঠাঁই দিয়েছি।

ভায়োলা আঁৎকে উঠে দু'হাত নাড়িয়ে বলে উঠলেন—না, না আমি না। আমি না।

অলিভিয়া এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন—এ তুমি কি বলছ! এ তোমার ভীরুতা, তোমার নীচতা, তুমি তোমার ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ স্বামী সিজারিয়ো। তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ—আমি তো স্বেচ্ছায় তোমাকে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছি। আমার মন প্রাণ সর্বস্ব তোমাতে অর্পণ করেছি। তোমার তো এতে ভয়ের কিছু থাকতে পারে না স্বামী। তুমি নিজেকে কেন বৃথা আড়াল ক'রে রাখছ। মুক্ত কণ্ঠে তুমি সবার সামনে বল—তোমার বীরত্বের কথা ঘোষণা কর।

এমন সময় ষোল কলা পূর্ণ হল—পাদ্রী এসে ঢুকলেন। অলিভিয়া তাঁকে দেখেই সসম্মানে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে বললেন—সুপ্রভাত পিতা। আসুন—আসুন আপনার পবিত্রতার ওপর আমার ভরসা রয়েছে। আপনি নিজে মুখে সব কথা খুলে

বলুন। আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতেই চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম সব কথা গোপন রাখতে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে তা আর সম্ভব হল না। পিতা, বলুন—সব খুলে বলুন। বলুন আপনার উপস্থিতিতে দেবালয়ে এই যুবক আর আমার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সবার সামনে আপনি সত্য ঘোষণা করুন।

পাদ্রী উপস্থিত সবারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ধীর স্থির শান্তস্বরে ঘোষণা করলেন—বলব নিশ্চয়ই বলব। সত্য গোপন করব না। উপস্থিত সবাই শোন, ভালবাসার পূত পবিত্র দলিলে তারা উভয়ে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছে। সবই ঘটেছে আমার উপস্থিতিতে দেবতা সাক্ষী রেখে আমি দোঁহার হাত মিলিয়ে দিয়েছি। ওদের পবিত্র ভালবাসাকে সুদৃঢ় করতে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছি। দেবতার সামনে চারি চক্ষুর মিলন ঘটেছে, বিনিময় করিয়েছি উভয়ের অঙ্গুরীয়। আমিই ছিলাম সেই পবিত্র অনুষ্ঠানের পুরোহিত। এই তো কিছুক্ষণ আগের ঘটনা, এখনও দুঘণ্টা পূরণ হয় নি।

পাদ্রীর কথায় আর্সিনো ক্রুদ্ধ হলেন। একজন ধর্মযাজকের মুখে এহেন উক্তি তিনি আশা করতে পারেন নি। গুলিখাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠে ভায়োলাকে বললেন—যাও, তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ কর। গ্রহণ কর ওকে। স্মরণ রেখো তোমার ঐ পোড়া মুখ যেন ভবিষ্যতে আমাকে আর কোন দিন দেখতে না হয়।

ভায়োলা আর্তনাদ করে উঠলেন—না, না! সব মিথ্যা—প্রবঞ্চনা! আমি প্রতিবাদ করছি। আমি এ-সবের কিছুই জানি না। আমার সঙ্গে প্রতারণা করে—মিথ্যার জালে জড়িয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছেন সবাই। আমাকে ক্ষমা করুন—সত্যি।

অলিভিয়া তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—তুমি কেন মিথ্যা প্রতিবাদ করছ? কেনই বা এমন করে মুষড়ে পড়ছ স্বামী। অহেতুক ভয় পাচ্ছ তুমি।

যখন এমনি একটা জটিল সমাধানের চেষ্টা চলেছে, এমন সময় স্যার আন্দ্রু চীৎকার করতে করতে সেখানে হাজির হ'লেন—আরে সর্বনাশ হয়ে গেছে! সর্বনাশ, আপনারা সবাই এখানে রয়েছেন দেখছি! তাড়াতাড়ি স্যার টবিজ জন্য একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিন।

অভিলিয়া ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন? কি হয়েছে? ডাক্তার কেন? তিনি এখন কোথায় আছেন?

—দেখছেন না আমার মাথা একেবারে ফুটিফাটা হয়ে গেছে। আর স্যার টবির মাথা দিয়েও অঝোরে রক্ত ঝরছে। তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন। আমাকে একটু লুকিয়ে থাকার সুযোগ করে দিন। আমাকে মেরে ফেলবে,—পিতৃদত্ত প্রাণটুকু এবার বুঝি যাবেই।

—কে? কে এমনটা করল?—আপনার মাথা এমন করে কে ফাটাল?

—শয়তান! সাক্ষাৎ শয়তান জুটেছে বাড়িতে। রাজার যে অনুচরকে বাড়িতে

ঠাঁই দিয়েছেন সে শয়তান আমাদের মেরে একেবারে লম্বা করে দিয়েছে। আমি নচ্ছারটাকে ভীতু ভেবেছিলাম। একটু মজা করতে গিয়ে দেখি বিষধর সাপের মাথায় পা দিয়েছি।

রাজা আর্সিনো বলে উঠলেন—কী বাজে কথা বলছ? আমার অনুচর সিজারিয়ো তো সেই তখন থেকেই আমার কাছাকাছিই রয়েছে! সে আবার কখন তোমার মাথা ফাটাতে গেল? কেন ছেলেটার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ?

ভায়োলা আর্সিনোর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্যার আন্দ্রু তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন—তুমি অকারণে আমার মাথায় আঘাত করে এমনি করে ফাটিয়ে দিলে। আমার কি অপরাধ বল? স্যার টবিই তো আমাকে উস্কানি দিল, না হলে তোমার সঙ্গে আমি লাগতে যাই।

ভায়োলা স্যার আন্দ্রুর কথায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন—বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন—আমাকে কেন এ-সব দোষারোপ করছ? আমি তোমাকে কখন আঘাত হেনেছি? তোমার মাথা ফাটাবার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কি লাভ বল তো? বরং বলতে পারি, তুমিই সে-দিন তলোয়ার খুলে আমার দিকে রুখে এসেছিলে! কই তবুও আমি তো তোমাকে আঘাত করিনি!

এমন সময় স্যার টবি এবং ভাঁড় এসে হাজির হল। স্যার টবিকে দেখতে পেয়ে স্যার আন্দ্রু বলে উঠলেন—এই যে স্যার টবি এসে গেছেন। তোমার ভাগ্য ভাল যে তিনি তখন খুব বেশী পরিমাণে নেশা ক'রে একেবারে চুপ হয়ে পড়েছিলেন। তা নইলে তোমার হাড় কটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছাড়তেন।

আর্সিনো স্যার টবির রক্তাপ্লুত অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন—একী সর্বনেশে কাণ্ড! কে তোমার এমন অবস্থা করল?

অলিভিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন—আর এক মুহূর্তও দেরী নয়, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও এঁকে। অলিভিয়ার নির্দেশ পাওয়া মাত্র ফেবিয়ান স্যার টবি এবং স্যার আন্দ্রুকে নিয়ে ডাক্তারের খোঁজে চলে গেল।

চরম মুহূর্ত আগত প্রায়। সব ভুল বোঝাবুঝি ও মন কষাকষি পরিসমাপ্তির পথে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেবাস্তিয়ান এসে সভাতে দাঁড়ালেন। সেবাস্তিয়ানকে দেখে উপস্থিত প্রত্যেকের চোখ ছানাবড়া। একবার অলিভিয়ার মুখের দিকে পর মুহূর্তেই আবার সেবাস্তিয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই ভাবছে—একি কাক-তালীয় কাণ্ডরে বাবা! একি স্বপ্ন, না সত্য?

সেবাস্তিয়ান রাগে ফোঁস ফোঁস করছিলেন—দেবী, আমি বাধ্য হয়েই তোমার আত্মীয়ের গায়ে আঘাত হেনেছি। তাঁর উদ্ধত আচরণই আমাকে এ-কাজ করতে বাধ্য করেছে। আমার ভাই হলেও আমি তাকে ছেড়ে কথা বলতাম না। প্রিয়ে, তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছ? তুমি বিশ্বাস কর একান্ত নিরুপায় হয়েই আমাকে এ কাজ করতে হয়েছিল। প্রিয়ে, তুমি এমন ক'রে তাকাচ্ছ কেন? তুমি চুপ ক'রে

থেকো না। কথা বল—কথা বল। তোমার অভিমান আমি সইতে পারব না। এই মাত্র আমরা যে নতুন বন্ধনে জড়িয়েছি একমাত্র সে-কথা স্মরণ করে আমাকে ক্ষমা কর প্রিয়ে।

রাজা আর্সিনো ভাবছেন—এ কেমন হল। একি মুখ-চোখ-নাক, কণ্ঠস্বরও সম্পূর্ণ এক—অথচ দুটি মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্তনিয়োকে নিয়ে রক্ষীরা প্রবেশ করলে সেবাস্তিয়ান ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—বন্ধু, তোমার এ-হাল কি করে হল? তোমাকে হারিয়ে আমি যে কি মর্মবেদনার মধ্যে সময় কাটিয়েছি তা তোমাকে বলে যে বোঝাতে পারব না। আমার একান্ত সুখের সময়ে তোমাকে বার বার স্মরণ করেছি।

বন্দী আন্তনিয়োও চরম সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। একই দৈহিক সাদৃশ্যযুক্ত ভায়োলা এবং সেবাস্তিয়ানকে দেখে তাঁরও বাকশক্তি হারাবার উপক্রম। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন—বন্ধু, এরই মধ্যে তুমি কি ক'রে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করলে? আপেলকে দু'টুকরো করলেও তো এমন সাদৃশ্য চোখে পড়ে না।

এবার সেবাস্তিয়ানের পালা। তিনি পুরুষবেশে ভায়োলাকে দেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

এমন কোন দৃশ্যের মুখোমুখি হ'তে হবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। ব্যাপারটা দেখে প্রথমে তিনি ভাবলেন হয়ত বা চোখের ভুল। নিজের চোখের ওপরও যেন আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছে না। বলা তো যায় না, কি বলতে গিয়ে কি ব'লে ফেললেন। কে কি ভেবে বসবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত বা লোকের হাসির খোরাক হ'বেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত নির্বাক নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। চোখের মণি দু'টোকে বার বার পুরুষবেশী ভায়োলার মুখের ওপর নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করলেন, চেষ্টা ক'রতে লাগলেন গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করতে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

সেবাস্তিয়ান কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে এক সময় ভাবলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভায়োলা'কেই জিজ্ঞেস ক'রবেন। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হ'লেন। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন সজোরে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। মুখ ফুটে কথাই বলতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত ভায়োলা'ই এই সংকটজনক পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে বললেন,—

ভায়োলা প্রথম মুখ খুলতে গিয়ে রসিকতা করে বললেন—আমার বাড়ি মেসালিনে। আমার পিতা সেবাস্তিয়ান। আর এক সেবাস্তিয়ান ছিল আমার ভাই। সে এখন সলিল-সমাধি লাভ করেছে। যদি প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করে এসে থাকে—তবে আমি বলব তুমি আমাদের ভয় দেখাতে এসেছ।

—হ্যাঁ আম্মাই তো। কিন্তু এ-সাজ আমার জন্মাবধি। যদি তুমি পুরুষ না হ'য়ে নারী হও তবে আমার চোখের জলে তোমার দেহ ধুইয়ে আমি সোহাগ করে বলব—আমার অতল সাগরে নিমজ্জিতা ভগ্নি ভায়োলা এসো। মন-প্রাণ দিয়ে আদর করব তোমাকে—ভরিয়ে তুলব তোমাকে।

ভায়োলা তখন ধরা দিলেন না। নিজেকে গোপন রেখে পূর্ব রসিকতার সুরে বললেন—আমার বাবার ভুরুর ওপরে একটা মেজ ছিল।

ভায়োলা'র কথাটা কানে যেতেই সেবাস্তিয়ান যেন আচমকা একটা হোঁচট খেলেন। হঠাৎ ভায়োলা'র মুখের দিকে তাকালেন।

ভায়োলা ঠোঁট টিপে টিপে হাসছেন।

সেবাস্তিয়ান অবিশ্বাস্য দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন,—কি? কি বললে?

ভায়োলা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা বজায় রেখে আবার বললেন,—আমার বাবা'র কথা বলছিলাম!

—তোমার বাবা? কি হয়েছে তোমার বাবা'র?

—না, হয়নি কিছু।

—তবে?

—বলছিলাম কি, আমার বাবা'র ভুরুর ওপরে একটা মেজ ছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি।

—ভুরুর ওপরে? মানে ভুরুর ঠিক এইখানে কি? কথা বলতে বলতে সেবাস্তিয়ান ডান হাতের তর্জনীটাকে নিজের ডান দিকের ভুরুর ওপরে এক জায়গায় স্থির ক'রলেন।

ভায়োলা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—আরে না না, এই দিকে নয়।

—তবে?

—ডান দিকের ভুরুর ওপরে নয়। এই দিকে, বাম দিকের ভুরুর ঠিক ওপরে, এইখানে।—ভায়োলা বাম দিকের ভুরুর ওপরের এক জায়গায় তর্জনী নির্দেশ করে দেখালেন।

সেবাস্তিয়ান বলে উঠলেন— আমার বাবারও।

আমার তের বছর বয়সে তিনি মারা যান। আমার পুরুষের এই পোষাক ছাড়া আর কিছু আমাকে অসুখী করতে পারবে না। এখন আমাকে ভায়োলা মনে করে আদর করতে এসো না। প্রমাণের জন্য অপেক্ষা কর। এ-শহরের এক ক্যাপ্টেন রয়েছেন তিনি সব কিছু জানেন—প্রমাণ দেবেন, তাঁর কাছে রক্ষিত আছে আমার কুমারী বেশ। তার পরের ঘটনা রাজা আর্সিনো এবং রূপসী অলিভিয়া সবই জানেন।

সেবাস্তিয়ান বললেন—তবে ভুল এবার প্রমাণিত হয়েছে। তোমার প্রতি আকৃষ্ট

হয়েছিলেন এক কুমারী।

আর্সিনোর ব্যথাহত বুকে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল। তিনি আবেগ মিশ্রিত স্বরে বললেন—বালক, আমি তোমাকে চিনেও চিনতে পারিনি। তুমি বার বার আমাকে বলেছিলে তুমি আমাকে যতখানি ভালবাস কোন নারীকে এতখানি ভালবাস না। আমি বুঝতে পারিনি।

ভায়োলা বললেন—প্রভু, শুধু মাত্র অতীতের কথা নয়, বর্তমানেও আমি বলছি একই কথা। আমার প্রতিশ্রুতি আকাশের চন্দ্র-সূর্যের মত চির ভাস্বর।

রাজা আর্সিনো দু'পা এগিয়ে ভায়োলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের হাতের মধ্যে তাঁর হাত দুটো তুলে নিয়ে বললেন—ভায়োলা, তোমার নারীবেশ আমার কাম্য।

ভায়োলা হতাশার সুরে বললেন,—নারী বেশ? সে তো এ মুহূর্তে সম্ভব নয় প্রভু! ক্যাপ্টেন আমাকে উত্তাল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি এখন বন্দী। ম্যালভোলিও তাঁকে অভিযুক্ত করেছে।

—তোমার জীবন রক্ষক নাবিকের মুক্তির ব্যবস্থা করছি আমি। অলিভিয়ার আদেশে ম্যালভোলিয়োকে ফেবিয়ান সেখানে হাজির করল। ক্যাপ্টেনকে হাজির করার প্রতিশ্রুতি দিতে ম্যালভোলিও ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

অলিভিয়া রাজা আর্সিনোর দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রভু আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করতে পারলেও ভগ্নী রূপে গ্রহণ করার বাধা কোথায়? আপনি আমাকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করে ধন্য করুন। আমাকে যদি ভগ্নীরূপে গ্রহণ করেই থাকেন তবে আসুন আমার গৃহে? আপনারা দুজনে আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমার গৃহকে পবিত্র করে তুলুন।

রাজা আর্সিনো তাঁর প্রিয়তমা ভায়োলার হাত ধরে হাসিমুখে এগিয়ে চললেন ভগ্নী অলিভিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করতে।

কমেডি অফ এরস

এখানকার কথা নয়, বহু আগেকার। তখনকার দিনে সিরাকিউজ একটি নামকরা বন্দর। আর সিরাকিউজে বহু ধনী সওদাগরের বাস—কয়েকজনকে কুবেরতুল্য ধনী বললেও অতি উক্তি করা হয় না। এই সকল সওদাগরদের জাহাজ সাতসমুদ্র পাড়ি দেয়, সাতসমুদ্রের নানা দেশে মালপত্র বয়, আমদানি—রপ্তানি করে।

বিশেষ করে বড় বড় প্রতি বন্দরেই তাঁদের আড়ত, ঐ সব আড়তের তদারক এবং মালপত্রের কেনা-বেচা করে ঐ সকল সওদাগরদেরই বিশ্বস্ত কর্মচারী।

জাহাজের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক লেন-দেন করে সওদাগরগণ মণি, মাণিক্য, হীরা এবং নানা ধরনের বিলাস দ্রব্যাদি স্বদেশে অর্থাৎ সিরাকিউজে ফিরে আসতেন। কিছুদিন বিশ্রাম করে আবার জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

তখনকার দিনের জাহাজ আধুনিক কালের জাহাজের মতো যান্ত্রিক জাহাজ তো নয়। ঝড় তুফান—বিশেষ করে সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে বাঁচার আশা থাকত না।

বিপদ আছে জেনেও সওদাগরগণ জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দূরে সমুদ্র যেন তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারী হয়েও তারা সিরা-কিউজে চুপচাপ বেশিদিন বসে থাকতে পারতেন না। জীবনকে অনিশ্চিতের হাতে সঁপে দিয়ে তাঁরা জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সমুদ্রপারের দেশগুলিতে বাণিজ্যের আকর্ষণ যেন তাঁদের আহ্বান, তাই ঘরে চুপচাপ বসে অলস ভোগ-বহুল জীবন-যাপনের কথা তাঁরা কল্পনাও করতেন না।

ইউজিনও ছিলেন সিরাকিউজের একজন নামকরা সওদাগর। অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে নিজের ঘরে পরম সুখে রাজার মতোই কাল কাটাতে পারতেন। তবু তিনি বাণিজ্য থেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবতেন না। দূরে সমুদ্রের বাণিজ্য করার ব্যাপারটা তাঁর কাছে প্রবল নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল। নেশা যদি বাড়তে থাকে, তা সহসা কমে না। বরং বেড়েই যায়। ইতিমধ্যে এপিডামনাম বন্দরের তাঁর গোমস্তাটি মারা যাওয়ায়, তাঁর পক্ষে ঘরে সামান্য কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকাও সম্ভব হো'ল না—ওখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার জন্য অন্য কোন কর্মচারী বা গোমস্তা আর নিয়োগ না করে সওদাগর ইউজিন নিজেই চলে গেলেন এপিডামনামে।

কিন্তু এপিডামনামে গিয়ে সওদাগর ইউজিন নানা কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে—তাঁর পক্ষে সহসা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হোল না। স্বামীর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী আমেলিয়া মহা সমস্যায় পড়লেন। ঘরে অবশ্য ধনরত্নের অভাব কিন্তু গুরুতর কাজে স্বামীর সান্নিধ্য এবং পরামর্শ একান্তই দরকার। তাছাড়া তখনকার দিনে দূরদেশ থেকে চিঠি পত্রের সত্বর আদান-প্রদানও সম্ভব ছিল না। তাই স্ত্রী আমেলিনা স্বামীর জন্য

উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং এরূপ উৎকণ্ঠা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকও।

তাই আমেলিয়া অন্য এক সওদাগরের সাথে এপিডামনামে এলেন এবং স্বামী ইউজিনের সঙ্গে মিলিত হোলেন। এপিডামনামে থাকা কালে তিনি যমজ সন্তান প্রসব করলেন। দুজনের চেহারা অবিকল এক। রং এক, আদল এক—কোথাও কোন গরমিল নেই: একটু বড়ো অবস্থাতেও কোন্‌টি যে কে—বাইরের লোকদের পক্ষে নির্ণয় করা তো সম্ভবই নয়, এমনকি নিজের বাবা-মার পক্ষেও নিরূপণ করা খুব কঠিন হল।

প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়ালে আর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। ইউজিনের পাশের বাড়িতে এক গরীব মহিলা যমজ ছেলে প্রসব করে প্রসবান্তে মারা গেলেন। ঐ দু'টি ছেলেও হুবহু এক। অনাথ দু'টি যমজ ছেলে—কে'ই বা তাঁদের লালন-পালন করে? তাই দয়া পরবশ হয়ে ইউজিন গরীব ঘরের ঐ যমজ ছেলে দু'টিকেও নিজের বাড়িতে এনে লালন-পালন করতে লাগলেন, বড় হয়ে ঐ পালিত যমজ ছেলে দু'টি কি করবে—তা'ও তিনি মনে মনে ভেবে রাখলেন। ঐ অনাথ ছেলে দু'টি ভবিষ্যতে ইউজিনের দুই ছেলের পরিচারক বা ভৃত্য হবে। এভাবে দু'জোড়া যমজ ছেলে একই বাড়িতে বড় হ'তে লাগল। ওরা প্রায় সমবয়েসীও বটে। চেহারার দিক থেকে নিজের যমজ দু'টি ছেলের মধ্যে অদ্ভুত মিল। তাছাড়া ঐ দু'টি যমজ ছেলের পরস্পরের চেহারার মধ্যে অদ্ভুত মিল। অনেক ভেবেচিন্তে ইউজিন নিজের ছেলে দু'টির নাম রাখলেন অ্যাণ্টিফোলাস—কিন্তু জোড়ের যেটি বড়ো তার নাম হ'লো সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস আর ছোটটির নাম হ'লো জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস। এভাবে সিনিয়র বা জুনিয়রের ব্যবধান একটা রাখতেই হোল—তা না হ'লে দেখতে এক, নামেও এক থাকলে—ভবিষ্যতে কাজকর্মের বেশ অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই নামের দিক থেকে ইউজিন তাঁর ছেলেদের নাম এক রাখলেও—সিনিয়র এবং জুনিয়রের ব্যবধান রাখলেন। অর্থাৎ বড়ো এবং ছোটোর ব্যবধান রাখলেন শুধু।

আর অনাথ সেই দু'টি ছেলের নাম রাখলেন দ্রোমিও। জোড়টির যে বড়ো সে হ'লো সিনিয়র দ্রোমিও, আর যে ছোটো সে হ'লো জুনিয়র দ্রোমিও। এদের ক্ষেত্রে নামকরণ এক করলেও—কাজকর্মের সুবিধার জন্যে কেবলমাত্র সিনিয়র ও জুনিয়রের ব্যবধান রাখা হ'ল।

যমজ ছেলে দু'টি সামান্য বড় হয়ে উঠতেই ইউজিন সেরাকিউজে ফেরার জন্য তৎপর হোলেন। অসুবিধা কিছু নেই। জাহাজ তাঁর নিজেরই। স্ত্রী আমেলিয়া, নিজের দু'টি যমজ ছেলে, আর পালিত দু'টি যমজ ছেলে-সহ তিনি জাহাজে আরোহণ করলেন। সঙ্গে অবশ্য কিছু দাসদাসী, আর জাহাজের নাবিকেরা তো রয়েছেই।

সমুদ্র শান্ত, আবহাওয়া ভালো—কিছুটা জলপথ নিরাপদেই গেলেন তারা। সমুদ্রে তেমন তরঙ্গ নেই। পালতোলা জাহাজ বায়ুবেগে হেলে দুলে চলছে—সমুদ্র তরঙ্গে আলো-ছায়ার খেলা, সেই সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ। অতএব সকলেই খুশী।

কিন্তু হঠাৎই দেখা দিল একদিন আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। সেই সঙ্গে সামুদ্রিক

ঝড়ের প্রবল সোঁ সোঁ শব্দ। আর পাহাড়ের মতো উচ্চ উত্তাল তরঙ্গ। ঝড়ের প্রবল বেগে পাল ছিঁড়ে পড়ল, মাস্তুল ভেঙে পড়ল—শুরু হ'ল প্রবল বর্ষণও। জাহাজ ডুবে যেতে বাকি নেই।

সকল জাহাজেই একটি করে আলাদা নৌকো থাকে, মাইনে করা নাবিকেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর দায়ে সেই নৌকোটি দখল করে বসল। মালিক বা মালিকানী বা তাঁর ছেলেদের কথা একবারও ভাবল না। নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই তাঁরা নৌকোটিতে উঠে—অকুল—দরিয়ায় ভাসিয়ে দিল। পেছনে ডুবন্ত জাহাজে পড়ে রইল—ইউজিন, তাঁর স্ত্রী, চারটি বাচ্চা ছেলে আর কয়েকজন দাসদাসী।

নাবিকদের এরূপ বেইমানিতে ইউজিনের দু'চোখ জলে ভরে এল। তিনি কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন—এই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার, নতুবা স্ত্রী পুত্র—কাউকেই বাঁচানো যাবে না। এমনিতে তাঁরা আর বাঁচবেন কিনা কে জানে? তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। কিছু একটা করতেই হবে। নাবিকদের নিয়ে অতিরিক্ত নৌকোটি বহু দূরে মিলিয়ে গেছে। ভাগ্য ভালো জাহাজে একটা অতিরিক্ত মাস্তুল ছিল,—এই মাস্তুল আঁকড়েই তাঁদের অকুলদরিয়া ভাসতে হবে। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী? অতএব সেই বাড়তি মাস্তুলটিকে আঁকড়েই তারা ভেসে পড়লেন। মাস্তুলের দু'দিকে সমান ভার রাখা দরকার—একদিকে রইলেন ইউজিন নিজে ও সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস আর সিনিয়র দ্রোমিও—আর মাস্তুলের অপর দিকে স্ত্রী আমোলিয়া, জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস এবং জুনিয়র দ্রোমিও।

মাস্তুল উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলল। অবশ্য ইউজিন বুদ্ধি করে বাচ্চাদের মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ছিলেন—নইলে কে কোথায় ছিটকে যাবে কে জানে?

বেশ কিছু পরে ঝড় অনেকটা কমে এল, দূরে তাকিয়ে দেখা গেল দু'দিক থেকে দু'খানা জাহাজ আসছে—ইউজিন আর তাঁর স্ত্রী ভাবলেন এই চরম বিপদেও তাঁরা বেঁচে যাবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘটে গেল এক অভাবিত বিপদ। চোরা পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে—মাস্তুল ভেঙে আধখান হোলো। স্বামী স্ত্রী ও বাচ্চারা আলাদা হয়ে গেল। অর্থাৎ ইউজিন ভেসে রইলেন বড় ছেলে আর বড় দ্রোমিওকে নিয়ে। আর তাঁর স্ত্রী ভেসে রইলেন ছোটো ছেলে আর ছোটো দ্রোমিওকে নিয়ে। এক জোড়া করে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে পড়লেন। আর এক ধাক্কায় বিপরীত দিকে ভেসে চলল দু'টি মাস্তুলের টুকরো। ইউজিনের পক্ষে চেষ্টা করেও আর স্ত্রীর কাছাকাছি যাওয়ার কোনো উপায় রইল না। আর স্ত্রীর পক্ষেও ঐ এক জোড়া ছেলে নিয়ে স্বামীর কাছাকাছি আসা সম্ভব হোলো না। একজোড়া করে ছেলে স্বামী-স্ত্রী দুজন দু'দিকে চলে গেলেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তারা পরস্পরের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে তারা পরস্পরের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেলেন।

অবশ্য ঈশ্বর তাঁদের একেবারে শেষ করলেন না, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখলেন—দু'দিক থেকে দু'খানা জাহাজ তো আসছিল। একখানা জাহাজ তুলে নিল ইউজিন

আর সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস এবং সিনিয়র দ্রোমিওকে। আর কিছু পরে আর একখানা জাহাজও এল—সেই জাহাজখানা তুলে নিল ইউজিনের স্ত্রী আমেলিয়া আর জুনিয়ার অ্যাণ্টিফোলাস এবং জুনিয়ার দ্রোমিওকে। বলা বাহুলা—দু'টি জাহাজ দু'দিকে চলতে লাগল।

অবশ্য ইউজিন যে জাহাজে উঠেছিলেন, সেই জাহাজের নাবিকেরা এবং কাপ্তেন সদাশয়। কাপ্তেন ইউজিনের অনুরোধে অপর জাহাজটিকে কাছাকাছি আসার জন্য সংকেত জানাল। কিন্তু অপর জাহাজের কাপ্তেন সেই সংকেতকে দেখেও অগ্রাহ্য করল। ইউজিনের স্ত্রী আমেলিয়া জুনিয়রদের নিয়ে যে জাহাজে উঠলেন বা আশ্রয় পেলেন—সেই জাহাজের ক্যাপ্তেন ও নাবিকেরা মোটেই ভালো লোক নন। কাপ্তেন ভাবলেন—স্ত্রীলোকটিকে কোনো নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে, ছেলে দু'টিকে অন্য কোনো বন্দরে নিয়ে বিক্রি করে দেবেন। ওঁরা ছিল করিন্থের জেলে নাবিক। করিন্থের নাবিকরা দস্যুভাবাপন্ন।

*　　　　*　　　　*

এরকম আশ্চর্য দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে খুব কমই ঘটে, যা ইউজিনের জীবনে ঘটল। ইউজিন এই দুর্ঘটনা ঘটার পর সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস ও সিনিয়র দ্রোমিওকে নিয়ে নিজের বাড়ি সেরাকিউজে ফিরে এলেন। সেরাকিউজে ফিরেই তিনি দেশে-বিদেশে হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী ও ছেলে দু'টির খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁর অর্থবল এবং লোকবল দুই-ই ছিল—অতএব হারানো স্ত্রী এবং জুনিয়র অ্যাণ্টি-ফোলাস ও জুনিয়র দ্রোমিওর খোঁজে তিনি দেশ-বিদেশ তোলপাড় করে ফেলেছিলেন। বিভিন্ন দেশে তাঁদের খোঁজে একের পর এক লোক পাঠিয়েছেন—কিন্তু তাঁর এমনই ভাগ্য—যে দীর্ঘদিনের মধ্যেও তাঁদের কোনো সন্ধানই তিনি পেলেন না। অথচ তিনি হাত পা গুটিয়ে বসেছিলেন না।

এভাবেই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হো'ল। সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস আর ছোটটি নেই, সে এখন রীতিমত একজন যুবক। আর সিনিয়র দ্রোমিও এখন রীতিমত যুবক। সে এখন সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসের চিরসঙ্গী এবং পরিচারক। সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস তাঁর বাবার কাছে হারিয়ে যাওয়া মা ছোটো ভাই-এর কথা শুনেছিল। সেও মনে প্রাণে তাঁর বাবার মতই দৃঢ় বিশ্বাস করে—তাঁরা যেখানেই থাক এখনও জীবিত রয়েছেন। হয়তো বা তাঁদের সেরাকিউজে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই, অজানা বিদেশ-বিভূঁয়ে তারা হয়তো বা নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করছেন। তাছাড়া জ্ঞান হওয়া অবধি সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস মা ও ভাইকে কখনও দেখিনি পর্যন্ত—অথচ নাড়ীর টান ও রক্তের টান অনুভব করে প্রতিনিয়তই। হারিয়ে যাওয়া মা ও ভাইয়ের জন্য সে মাঝে মাঝেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোনো কিছুই তাঁর আর ভালো লাগে না।

একদিন সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস ইউজিনকে বলল : বাবা তুমি যদি অনুমতি দাও,

আমি একবার মা ও ভাইয়ের খোঁজে বিদেশে ঘুরে আসতে চাই। আমার বিশ্বাস আমি তাঁদের খোঁজ পাবই।

ছেলে বড়ো হয়েছে, তাছাড়া দীর্ঘদিন বাইরে যায়নি সে, তাই ইউজিন ছেলের প্রস্তাবে আপত্তি না করে বলল ঃ বেশ যাও, তবে বিদেশ-বিভুঁয়ে সাবধানে চলাফেরা করবে। আমিও ভেবেছিলাম সওদাগরি বাণিজ্য ছেড়ে তোমার মা ও ভাইয়ের খোঁজে দেশ-বিদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজব, কিন্তু তুমি ছোটো ছিলে বলে—তোমাকে এখানে একা ফেলে রেখে আমি নিজে তেমন ভাবে খোঁজ নিতে পারিনি। তুমি এখন সাবালক হয়েছো, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো। তাছাড়া আমি বুড়ো হয়েছি—বর্তমানে দীর্ঘদিন ধরে দেশ বিদেশ পর্যটনের ক্ষমতাও আমার নেই, শরীরেও এত ধকল সইবে না। এক নাগাড়ে বিভিন্ন দেশ ঘোরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিদেশ যাত্রার আগে বাবার কাছ থেকে নানা উপদেশ নিলেন। সিনিয়র অ্যাণ্টি-ফোলাস, তারপর চিরসাথী ও পরিচারক সিনিয়র দ্রোমিওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দেশ পর্যটনে। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সওদাগরি করা নয়—মা ও ভাইয়ের খোঁজ করা। কোন দেশই পর্যটন করতে বাকী রাখল না সে। কিন্তু মা ভাইয়ের কোনো খোঁজই পেল না সে।

তবু সে বিচলিত বা হতাশ হোলো না, নতুন বন্দরের নাম শুনলেই সিনিয়ার দ্রোমিওকে নিয়ে সেখানে ছুটে যেতো। এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে—এভাবেই দীর্ঘদিন কেটে গেল।

অন্যদিকে সেরাকিউজে ইউজিনও চিন্তা-ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন। স্ত্রী আর ছোটো ছেলেতো দীর্ঘদিন আগেই হারিয়ে গেছে—তাঁদের শোক দীর্ঘ আদর্শজনিত কারণে ক্রমে ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছিল—কিন্তু বড় ছেলেটিকে তিনি নিজে মানুষ করেছেন, একাই বাবা ও মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু স্ত্রী ও ছোট ছেলের খোঁজ করতে গিয়ে সেও যদি হারিয়ে যায়—এই দুঃখ ইউজিন আর এই বয়সে সইতে পারবেন না। আর সমুদ্র পথ তো নিরাপদ নয়—কখন কোথায় কি ঘটে যায় কে জানে! বড় ছেলের অদর্শনে ইউজিন ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠলেন। সিনিয়র অ্যাণ্টি-ফোলাস গিয়েছেন অনেকদিন—কয়েকবছর পার হয়ে গেছে। অবশ্য সে যেখানেই যাক অর্থসম্পদের কোনো অভাব হবে না, নিজেদেরই জাহাজ। তবু…

তাই কয়েক বছর পেরিয়ে যেতেই ব্যাকুল ইউজিন পুনরায় বড় ছেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। স্ত্রী আমেলিয়া আর জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসকে খুঁজে পাওয়ার আশা আর নেই—বর্তমানে ইউজিনের যা অবস্থা বড় ছেলে সিনিয়র অ্যাণ্টি-ফোলাসের খোঁজ পেলেই তিনি বর্তে যাবেন। মহান ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বারবার ধন্যবাদ জানাবেন।

কয়েকটি বন্দরে খোঁজ করে পরিশেষে ইউজিন এলেন এফিসাস বন্দরে। এফিসাস বেশ বড় বন্দর। বহু জাহাজের আনাগোনা এই বন্দরে। নানান দেশের লোকেরা

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এফিসাসে আসে।

কিন্তু ইউজিন জাহাজ ঘাটাতে নামতেই একদল রাজকর্মচারী তাকে ঘিরে ধরল।

—আমি চোর ডাকাত নই, দীর্ঘদিন পরে এই বন্দরে এলাম, আমাকে এভাবে ঘেরাও করার মানে কি?

অন্যান্য বন্দরেও বিভিন্ন দেশের রাজকর্মচারীরা রীতি অনুযায়ী মামুলী সাধারণ সব প্রশ্ন করে থাকেন। অভ্যাগতগণ ছকবাধা মামুলী উত্তর দিয়ে থাকেন, ব্যস—ঐ পর্যন্তই। তখনকার দিনে পাশপোর্ট ও ভিসার ঝামেলা ছিল না—বরং বিদেশী সওদাগরদের যথেষ্ট সমাদর করা হোত। ইউজিন নিজেও এর আগে বহু বন্দরে জাহাজ নিয়ে ঘুরেছেন, এফিসাসেও বহুবার এসেছেন—কিন্তু এর আগে কোনোবার এরকমটি হয়নি। এভাবে রাজকর্মচারীরা কখনও তাঁকে ঘেরাও করেননি। অতএব ইউজিন অবাক হয়ে গেলেন।

একজন প্রধান কর্মচারী এগিয়ে এসে বলল: এবার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। তবে মশায় আমাদের কোনো দোষ নেই, রাজার নির্দেশেই আমাদের এমনটি করতে হচ্ছে। আপনার নাম কি?

ইউজিন তাঁর নাম বললেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: কোথায় আপনার বাড়ি?

ইউজিন গর্বের সঙ্গে বললেন: সেরাকিউজে আমার বাড়ি।

ব্যস্ হয়ে গেল। প্রধান কর্মচারী বলল: মহামান্য ডিউকের নির্দেশে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হো'ল মশাই?

—আমার অপরাধ?

—তা ডিউককেই গিয়ে জিগ্যেস করবেন। তবে যদ্দুর জানি আপনিতো বন্দী হ'লেনই, আপনার জাহাজ, জনসম্পদ সব কিছু রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হো'ল।

—সেরাকিউজে আমার বাড়ি বলেই কি আমাকে বিনা দোষে এভাবে শাস্তি পেতে হবে?

—হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ। সেরাকিউজে আপনার বাড়ি না হ'লে—আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে ছেড়ে দিতুম।

—কিন্তু আমি যদি মিথ্যা পরিচয় দিতুম।

—তবে আমাদের কিছু করার ছিল না, কিন্তু একবার যখন নিজের মুখে পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন, তখন আপনার রেহাই নেই।

—এরকমটি হওয়ার কারণ?

—কিছুদিন আগে বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের ডিউক ও সেরাকিউজের ডিউকের মধ্যে দারুণ কলহ হয়, সেরাকিউজের ডিউক আমাদের ডিউককে অপমানজনক চিঠিও দেন।

—তারপর?

—তারপরই আমাদের ডিউক নির্দেশ জারী করেন সেরাকিউজের কোনো নাগরিক

এ বন্দরে এলে তাঁকে আটক করা হবে এবং তাঁর শিরশ্ছেদ করা হবে।

ইউজিন প্রধান রাজকর্মচারীর মুখে একথা শুনে ভয়ানক মুষড়ে পড়লেন।

প্রধান রাজকর্মচারী ফিসফিসিয়ে বললেন: তবে আপনি প্রাণে বেঁচে যাবেন, যদি সেই ব্যবস্থা করেন।

—কি ব্যবস্থা!

—আপনার হয়ে যদি কেউ রাজকোষে হাজার মোহর জমা দেয়—তবেই আপনি বেঁচে যেতে পারেন। অবশ্য আপনার জাহাজে যা ধন-সম্পদ ছিল, ইতিমধ্যে ডিউকের লোকেরা বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছে।

—তবে উপায়?

জাহাজে ইউজিনের যথেষ্টই ধনসম্পদ ছিল, ইউজিনকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে আর একদল রাজকর্মচারী মালপত্র আর টাকাপয়সা সব ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছে। তিনি শূন্য হাতেই জাহাজ থেকে নেমেছিলেন, পরে তাঁর এক কর্মচারী টাকার থলে নিয়ে নামবে—এমন কথা ছিল, আর জাহাজ থেকে নেমেই তিনি গ্রেপ্তার হোলেন, এখন তিনি কপর্দকহীন, বলতে গেলে ভিখারী।

এ বন্দরে তাঁর যে আড়ত ছিল এবং গোমস্তা ছিল সেই আড়ত নিশ্চয়ই আগেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গোমস্তাও নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হয়েছে, অথবা কোথায়ও সরে পড়েছে। এখন তিনি নিরুপায়।

রাজকর্মচারীরা ইউজিনকে ডিউকের দরবারে হাজির করল। প্রধান কর্মচারী ডিউককে জানাল: ইনি সেরাকিউজের একজন সওদাগর।

—ধনী নিশ্চয়ই? সঙ্গে নিশ্চয়ই নিজের জাহাজও নিয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ, হুজুর।

—মালপত্র, টাকা পয়সা সহ জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, হুজুর।

—একে কারাগারে রাখ। এর হয়ে কেউ হাজার মোহর দিলে, এ মুক্তি পাবে।

ইউজিন বিনীতভাবে বললেন: আমার এখানে পরিচিত এমন কেউ নেই, যিনি আমার হয়ে হাজার মোহর জমা দেবেন। তাছাড়া বর্তমানে আমি সওদাগরী করি না, দীর্ঘদিন পরে আমার ছেলের খোঁজে এখানে এসেছি।

ডিউক রেগে গিয়ে বললেন: ওসব ধানাই-পানাই শোনার আমার অবসর নেই, আপনার হয়ে কেউ হাজার মোহর আজ সন্ধ্যার মধ্যে জমা না দিলে, আপনার গর্দান যাবে। এটিই বর্তমান নিয়ম। আমি নিজে নিয়ামক হয়ে—আপনার জন্যে নিয়ম ভাঙতে পারি না। টাকা দেওয়ার মতো আপনার পরিচিত কেউ এই বন্দরে থাকলে তাঁর নাম ঠিকানা বলুন।

ইউজিন কারও নাম বলতে পারলেন না। বহুদিন আগে এবন্দরে দু'একবার তিনি এসেছেন, দুই-একজন তাঁর পরিচিত থাকলেও তাঁদের নাম তিনি ভুলে গেছেন, তাছাড়া

এখানে তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই। আর নাম মনে থাকলেও কোন লাভ হোত না, তারা হয়তো তাঁর কথা মনেও রাখেন নি। অপরিচিত কারো জন্য—কে আর রাজ সরকারে হাজার মোহর জমা দেবে? অতএব নিরুপায় ইউজিন চুপ করে রইলেন।

ডিউক কর্মচারীদের বললেন: তোমরা নগরবাসীদের জানিয়ে দাও। ঢেঁড়া পিটিয়ে ভালভাবে জানাবে যে—সেরাকিউজের ইউজিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শীঘ্রই তাঁকে শিরচ্ছেদ করা হবে, তবে কেউ যদি তার হয়ে হাজার মোহর রাজসরকারে জমা দেয়—তবে ইউজিনকে মুক্তি দেওয়া হবে। নতুবা নয়।

প্রথমে কর্মচারী বললেন: যে আজ্ঞা হুজুর, আমরা এখনই আপনার নির্দেশ চারদিকে প্রচারের ব্যবস্থা করছি।

অতএব প্রহরীরা ইউজিনকে অন্ধকার কারাগারে আটক করে রাখল। ইউজিন নিজের ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলেন। স্ত্রী আর ছোটো ছেলে বহু আগেই হারিয়ে গেছে। বড় ছেলে তাঁদের খোঁজে নিজেই বেপাত্তা। আর ইউজিন নিজে এফিসাসে ছেলের খোঁজ করতে এসে এখন কারাগারে আটক। বিনা অপরাধে তাঁর গর্দানও যাবে। তিনি স্ত্রী ও ছেলেদের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। এক হাজার মোহরের কারণে ধনকুবের ইউজিন আজ মৃত্যু পথযাত্রী।

* * *

কিছুক্ষণ পরে এফিসাসেস বন্দরে আর একটি জাহাজও এসে ভীড়ল। নানা দেশ ঘুরে এফিসাসে এই জাহাজে এলেন ইউজিনের বড় ছেলে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস ও তাঁর চিরসঙ্গী ভৃত্য সিনিয়র দ্রোমিও।

তবে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস জাহাজে আসার সময়েই একজন যাত্রীর মুখে শুনেছিলেন যে, এফিসাস বন্দরে নেমে সেরাকিউজের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিলে আর রক্ষা থাকবে না। ধনসম্পদ সব বাজেয়াপ্ত তো হবেই—সে সঙ্গে গর্দানটিও যাবে।

অতএব সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস জাহাজে থাকতেই বার বার করে দ্রোমিওকে বলেছিলেন:

এফিসাসে নেমে কখনও বলবিনে, আমরা সেরাকিউজের বাসিন্দা বুঝলি?

—বুঝেছি, হুজুর। কেউ সেরাকিউজের কথা জিজ্ঞেস করলে বলব—সেরাকিউজের নামই শুনিনি কখনও, তা সে বন্দরটি কোথায়? জাহাজের ঐ যাত্রীটিও বার বার করে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে বললেন: যদি এফিসাসে নামার পর ওখানকার রাজকর্মচারীরা ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করে আপনি কোন্ দেশের বাসিন্দা কখনো সেরাকিউজের নাম বলবেন না। অন্য যে কোনো দেশের নাম বললে কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু সেরাকিউজের নাম বললে আর রক্ষা থাকবে না, গর্দান তো যাবেই সেই সঙ্গে আপনার জাহাজের সব মালপত্র টাকা পয়সা সব কিছুই রাজ দরবারে বাজেয়াপ্ত হবে।

এই কারণেই সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস নিজে তো সতর্ক ছিলেনই—তাছাড়া তাঁর

চিরসঙ্গীও পরিচারক দ্রোমিওকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

জাহাজঘাটায় নামতেই রাজকর্মচারীরা তাঁদের ঘিরে ধরে যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস এবং সিনিয়র দ্রোমিও বলল: আমরা বহুদেশ ঘুরেছি বটে, সেরাকিউজে কখনও যাইনি. ঐ দেশের নামও শুনিনি।

রাজকর্মচারীরা সন্তুষ্ট হয়ে দু'জনকেই ছেড়ে দিল। সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস তাঁর ভৃত্য সিনিয়র দ্রোমিওকে এফিসাসের সবচেয়ে সেরা হোটেল সেণ্টরে যেতে বললেন, আর তার সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল তা'ও ভৃত্যের হাতে দিয়ে বললেন: মনে আছে তো, সবচেয়ে সেরা হোটেল সেণ্টারে গিয়ে উঠবি, টাকাকড়ি মালপত্র সব সাবধানে রাখবি।

—ঠিক আছে হুজুর, কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি একটু ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরব, তুই কিন্তু হোটেল থেকে একদম বাইরে বেরবি না, বিদেশ বিভূঁয়ে পথ হারিয়ে ফেলে, খুঁজে বের করা এক ঝামেলা।

—ঠিক আছে হুজুর, আমি হোটেল থেকে এক পা'ও বাইরে বেরুব না। কিন্তু হুজুর আপনার সঙ্গে যে একদম টাকাকড়ি রাখলেন না।

—অচেনা দেশে সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি করা ভালো নয়, তাই তোর সঙ্গে টাকাকড়ি দিয়ে দিলাম। কাকাকড়ি গুণে হোটেলে জমা দিবি।

—ঠিক আছে হুজুর।

অতএব সিনিয়র দ্রোমিও মালপত্র আর টাকাকড়ি নিয়ে সেণ্টর হোটেলে চলে গেল। আর সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস বন্দরের নানা পথে তাঁর হারিয়ে যাওয়া মা-ভাই সম্পর্কে খোঁজ করতে লাগলেন। কয়েকটি রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার আকস্মিকভাবে দ্রোমিওর মুখোমুখি হয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

দ্রোমিও তাঁর কাছে এসে বলল: হুজুর বাড়ি চলুন। সেই যে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন—এখনও ফেরেননি। এদিকে খাবারদাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল—গিন্নীমা আপনার খোঁজে আমায় পাঠালেন। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলুন হুজুর।

এসব কথা শুনে সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস খুবই অবাক হলেন, তবে কি চাকরটা এফিসাস বন্দরে নেমে পুরোপুরি পাগলই হয়ে গেল, সঙ্গের মালপত্র আর টাকা পয়সাই বা গেল কোথায়? এ আবার কি বিড়ম্বনা। এত দেশ তো এই চাকরটাকে নিয়ে ঘুরলেন, কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি, হঠাৎ এখানে এসে ওর কি হো'ল? মনিবের সঙ্গে তো আর রসিকতা চলে না, নিশ্চয়ই ও'র মাথাটা বিগড়ে গেছে।

তিনি দ্রোমিওকে ধমক দিয়ে বললেন: ইয়ার্কি রাখ, বাঁদর? মালপত্র সব হোটেলে রেখেছিস তো? টাকা কড়ি সব হোটেলে জমা দিয়েছিস তো?

এবার অবাক হওয়ার পালা দ্রোমিওর, আসলে সে তো সিনিয়র দ্রোমিও নয়, জুনিয়র দ্রোমিও, তাই সে ঢোক গিলে সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসকে বলল: হুজুর, আমিতো আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস বললেন: আমার কথা না বোঝার কি

হয়েছে রে উল্লুক ? আমি কি অন্য ভাষায় কথা বলছি ?

তবুও জুনিয়র দ্রোমিও যেন আকাশ থেকে পড়ল, তাঁর মনিব এসব কি বলছে ? যার বাড়ি এখানে—সে হোটেলেই মালপত্র রাখতে বলবে কেন ? আর হোটেলেই বা টাকা পয়সা রাখতে বলবে কেন ? তাছাড়া মনিব তাঁকে তো হোটেলে যেতে বলে নি, এমন কি টাকা পয়সা দিয়েও হোটেলে জমা দিতে বলেনি ? এখন তবে কেন উল্টো পাল্টা বকছে ! মনিবেরই বুঝি মাথা বিগড়ে গেছে। তাই জুনিয়র দ্রোমিও অবাক হয়ে বলল ঃ হুজুর, আমি কি আপনার সঙ্গে কখনও ইয়ার্কি করতে পারি ?

—ইয়ার্কি নয়, তবে এসব কি বাজে বকছিস ?

—হোটেল, টাকা পয়সা এসব কি বলছেন ?

একশ'বার বলব, যা সত্যি তাই বলছি।

—হুজুর, আমি তো বাড়ি থেকে আসছি, খাবার-দাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে—গিন্নীমা আপনার খোঁজে পাঠালেন। আর আপনিই তো হোটেল, আর হোটেলে টাকা জমা দেওয়ার কথা বললেন।

—গিন্নী ! আমার বাড়ি ?

—রাগ করেছেন বলে তো গিন্নীমা উবে যেতে পারে না, বাড়ি ত উবে যেতে পারে না !

—তবে রে হতভাগা ! আবার সেই ন্যাকামি ! এখনই তোর ন্যাকামিপনা শেষ করছি।

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস জুনিয়র দ্রোমিওকে কি মারটাই না মারলেন, রাস্তার লোকেরাও অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখল।

কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ একী মশাই একে মারছেন কেন ?

—মারছি, বেশ করছি। বেয়াড়া ঘোড়াকে যেমন চাবুকে সিধে করতে হয়, তেমনি বেয়াড়া চাকরকে বেধড়ক পিটিয়ে সিধে করতে হয়।

তবু একজন বলল ঃ রাস্তায় এভাবে পেটানো কি ঠিক ? যা করার বাড়ি নিয়ে গিয়ে করুন।

আর এক ভদ্রলোক বললেন ঃ চাকর বেয়াড়া হ'লে মাথার ঠিক রাখা দায়, সে রাস্তায়ই হোক, আর বাড়িই হোক।

মনিবের কিল খেয়ে জুনিয়র দ্রোমিওকে হজম করে নিতে হো'ল। হাজার হ'লেও মনিব। মনিবের নিশ্চয়ই মাথা বিগড়ে গেছে, নইলে বারবার হোটেল আর টাকার কথাই বা বলবে কেন ? তাঁকেই বা এভাবে পেটাবে কেন ?

—তোর মুখ দেখতে চাইনে, যেখানে খুশী চলে যা। মেরে ধরে সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস সেণ্টের হোটেলের দিকে চলে গেলেন। সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস মেরে ধরেও বুঝতে পারলেন যে, এক নির্দোষ বেচারাকে তিনি বেধড়ক পেটালেন। এই দ্রোমিও তাঁর ভৃত্যই নয়—একথাও তিনি বুঝতে পারলেন না। দু'জনের চেহারা যে একরকম এক

হ'তে পারে কারও পক্ষে কল্পনায় আনা সম্ভব নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকেও তেমন দোষ দেওয়া যায় না। এই জুনিয়র দ্রোমিওই তাঁর হারিয়ে যাওয়া ভাই-এর ভৃত্য, যাদের খোঁজে তিনি বিভিন্ন বন্দর ও শহর দীর্ঘদিন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন। একথাও সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের একবারও মনে হোল না।

*　　　　*　　　　*

এ প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন পূর্বের সেই ঘটনায় ফিরে আসা দরকার। অতি শিশু বয়সে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস এবং জুনিয়র দ্রোমিও ইউজিনের স্ত্রী আমেলিয়াসহ করিন্থের জেলেদের জাহাজে উঠেছিলেন। সেই করিন্থের নাবিকরা ছিল অত্যন্ত পাজী লোক। তাঁদের মতলবও ভালো ছিল না।

তারা ইউজিনের স্ত্রী আমেলিয়াকে এক অজানা দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বলল: তোর ছেলে দু'টিকে আমরা নিয়ে চললাম। হাঃ হাঃ হাঃ। এদের সুযোগ বুঝে অচেনা দেশে নিয়ে বিক্রি করে দেব।

আমেলিয়া নাবিকদের উদ্দেশ্যে বহু আবেদন ও নিবেদন জানালেন: আমাকে ছেলেদের সেরাকিউজে নিয়ে চল। ওখানকার নাম করা ধনী ইউজিন আমার স্বামী—তিনি আমাদের ফিরে পেলে, তোমাদের প্রচুর ধনরত্ন দেবেন। ভগবান তোমাদের মঙ্গল বিধান করবেন। তোমরা আমার কথা শোনো। এভাবে আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না।

কিন্তু পাজী জেলেরা আমেলিয়ার কথায় মোটেও কর্ণপাত করল না, বরং ঐ জাহাজের কাপ্তান বলল: ওসব গালগল্প আমরা মোটেও বিশ্বাস করি না, আর ব্যাপারটা সত্য হ'লেও আমাদের পক্ষে সেরাকিউজে যাওয়া আর উচিত হবে না। অতএব বাছা তুমি এখানেই পচে মর।

সন্তানহারা আমেলিয়া অজানা-অচেনা দ্বীপে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আর ঐ শয়তান জেলেরা বিদেশের বাজারে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস ও জুনিয়র দ্রোমিওকে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে দিল। কিন্তু ওদের ভাগ্য খুবই ভালো। নানা দুঃখ কষ্টে ও লাঞ্ছনার পর জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস এক সদাশয় ধনী ব্যক্তির সান্নিধ্য ও আশ্রয় লাভ করলেন। আশ্রয় পেল জুনিয়র দ্রোমিও। ঐ ভদ্রলোক ছিলেন এফিসাসের ডিউকের সেনাপতিগণের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস তাঁর প্রশিক্ষণে যৌবনকালেই যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠল। পরিশেষে একদিন খোদ ডিউকের সুনজরে পড়ল এবং ক্রমে ক্রমে সে এফিসাসের ডিউকের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠল।

ডিউক তাঁর জন্যে এফিসাসেই একটি সুন্দর অট্টালিকা বানিয়ে দিলেন, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এক সুন্দরীর সঙ্গেও তাঁর বিয়ে দিলেন। জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের স্ত্রীর নাম আদ্রিয়ানা। আর জুনিয়র দ্রোমিও চিরসঙ্গী ভৃত্যের ন্যায় জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গেই রয়ে গেল। অতীত সম্বন্ধে তাঁদের আর কোনো নির্দিষ্ট ধারণাও রইল না। যা রইল তা কেবলমাত্র—আবছা বা অস্পষ্ট একটি ছবির মতো।

এদিকে জুনিয়র দ্রোমিও সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের কাছে বিনা অপরাধে প্রচণ্ড মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গিয়ে গিন্নীমা আদ্রিয়ানার কাছে নালিশ ঃ জানাল ঃ গিন্নীমা, হুজুর বোধ হয় বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন।

কেন ? কেন ?

—বাড়ির কথা বললাম। বললাম খাবার-দাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, গিন্নীমা আপনাকে ডেকেছেন।

—তারপর ?

—যতবারই আমি বলি বাড়ির কথা, আপনার কথা—ততবারই উনি বলতে লাগলেন হোটেলে মালপত্র রেখে এসেছি কিনা, হোটেলে টাকা জমা দিয়ে এসেছি কিনা।

—বলিস কিরে ?

—আরও বলি গিন্নীমা, হুজুরের বোধ হয় মাথাও বিগড়ে গেছে, আমাকে আবার রাস্তার লোকের সামনে বেদম মারও মারলেন।

ভৃত্যের মুখে এসব কথা শুনে আদ্রিয়ানাও মহা ভাবনায় পড়লেন। একি হোল ? কাল রাতে সামান রাগারাগি হয়েছিল মাত্র। তাই বলে এমনটা হবে কেন ? এর আগেও কতবার এমনটি হয়েছে—উনি বরং বাড়ি ফিরে এসে নানাভাবে মান ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন। নানা উপহার এনে দিয়েছেন। আর সেই তিনি কিনা—এমন হঠাৎ পাগল হয়ে যাবেন ? এ যে ভাবাই যায় না।

আদ্রিয়ানা দ্রোমিওকে বললেন ঃ তুই আবার ও'র কাছে যা। যেভাবেই হো'ক ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একবারটি বাড়ি নিয়ে—তারপর যা করার আমি করব।

কিন্তু জুনিওর দ্রোমিওকে পাঠিয়েও আদ্রিয়ানা মনে শান্তি পেলেন না। সে তো অনেকক্ষণ গেছে—এখনও তো ওকে নিয়ে ফিরে এল না। যদি সে আবারও মার খেয়ে ফিরে আসে, অথবা দ্রোমিও যদি তাঁর খোঁজ না পায়।

ধৈর্য ধরে আর আদ্রিয়ানার পক্ষে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা হোল না। ছোটো বোন লুসিয়ানাও বলল ঃ দিদি, দ্রোমিওর মুখে শুনলাম—জামাইবাবু নাকি পাগল হয়ে গেছেন। যা তা বলছেন, দ্রোমিও নাকি বাড়ির কথা বলতেই তাঁকে বেধড়ক পিটিয়েছেনও।

—আমিও সেই কথাই শুনেছি। দ্রোমিওকে আবার ওকে ধরে আনার জন্যে পাঠিয়েছি।

—কিন্তু জামাইবাবু যে জেদী লোক, দ্রোমিওর পক্ষে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আর তোরও এ রকম ভাবে হাত পা গুটিয়ে বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা উচিত নয়।

—কি করি বলতো।

কেবলমাত্র দ্রোমিওর ওপর ভরসা না রেখে—আমাদেরও জামাইবাবুর খোঁজে

বেরিয়ে পড়া উচিত। ব্যাপার মোটেও ভালো ঠেকছে না—চল্ তবে আমরাও বেরিয়ে পড়ি, যদি দেখা পাই যেভাবেই হোক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। দ্রোমিও চাকর মাত্র, ওঁকে হয়তো বা পাত্তাই দেবে না। কিন্তু আমাদের এড়িয়ে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। চল্, তবে আর দেরী না আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

অনেক ভেবেচিন্তে আদ্রিয়ানাও ছোটো বোন লুসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

* * *

অপরদিকে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস সেন্টর হোটেলে এসে দেখলেন দ্রোমিও যথারীতি মালপত্র তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রুমে গোছগাছ করে রেখেছে—তাছাড়া টাকা-পয়সাও যথারীতি হোটেলে জমা দিয়েছে। এছাড়া খাওয়ার-দাওয়ার ব্যবস্থাও যথারীতি ঠিক করে সে সম্ভবতঃ তাঁরই খোঁজে বাইরে গেছে।

টাকা পয়সা হোটেলে জমা পড়েছে শুনে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁর রাগও গলে জল হয়ে গেছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন দ্রোমিও মুখে যাই বলুক—আসল কাজে কোনো ত্রুটি রাখেনি। শুধু অথবা ইয়ার্কি করার জন্য এতটা মার খেল।

কিন্তু তাঁর পক্ষে হোটেলে বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব নয়, বন্দরের সব রাস্তা এখনও ভালোভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি, হারিয়ে যাওয়া মা ও ভাই-এর খোঁজ করার জন্যেই তার এখানে আসা। অতএব হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস আবার বেরিয়ে পড়লেন।

হোটেল বয় অবশ্য বলছিল: হুজুর বিশ্রাম করুন, খেয়ে দেয়ে না হয় আবার বেরোবেন।

—না হে। যে কাজের জন্য এসেছি, সে কাজ আমাকে সমাধা করতে হবে। আমি ফিরে এসে খাব। আর আমার চাকরটা ফিরে এলে বলবে—আমার খাবার যেন ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখে।

—জী হুজুর।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে কিছুটা এগুতেই দ্রোমিওর সঙ্গে দেখা। এই দ্রোমিও অবশ্য সিনিয়র দ্রোমিওই বটে। কিন্তু সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের পক্ষের সিনিয়র আর জুনিয়র দ্রোমিওর পার্থক্য বোঝা সম্ভব হো'ল না। আর সিনিয়র দ্রোমিও এগিয়ে এসে বলল, হুজুর, আপনার কোনো চিন্তা নেই। হোটেলের ঘরে মালপত্র সব গোছগাছ করে রেখে এসেছি, তাছাড়া টাকাকড়ি জমা করে দিয়েছি।

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস ওঁর কথা শুনে অবাক ও হতবাক হয়ে গেলেন। একটু আগেই এটা ইয়ার্কি করতে গিয়ে তাঁর হাতে কী মারটাই না খেলে, এখন তবু ওর মাথা ঠিক হয়েছে। ব্যাটার মাথা নিশ্চয়ই বিগড়ে গিয়েছিল, মারধোর খেয়ে আবার ঠিক হয়ে গেছে। একটু আগেই উল্টো-পাল্টা কত কিছু বকছিল। তাই সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস

দ্রোমিওকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ কিছুক্ষণ আগে যখন তোর সঙ্গে দেখা হো'ল—তখন এতো আজে বাজে বকছিলি কেন ?

—কি রকম ?

—তুই বাড়ির কথা, গিন্নীমার কথা বলছিলি না ?

—হুজুর, আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, হুজুর।

—থাক্, তোকে আর বুঝতে হবে না। তুই হোটেলে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমার ফিরতে দেরী হ'লে খাবারগুলো ঢাকা দিয়ে রাখবি।

—জী হুজুর।

হোটেলে রওনা হ'তে গিয়েও সিনিয়র দ্রোমিও রওনা হোল না, মনিবের কথা শুনে তাঁর মনে বেশ খটকা লাগল, সে বলল ঃ হুজুর, আমার সঙ্গে সেই জাহাজঘাটায় ছাড়া, এর আগে দেখা হয়নি তো।

—কি আজেবাজে বকছিস, কিছু আগেই তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

—কী যে হলেন হুজুর।

সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস ধমক লাগিয়ে বললেন ঃ আবার ন্যাকামি? সেই এক চড় মুণ্ডু ঘুরিয়ে তখন বললি গিন্নীমার কথা, বাড়ির কথা।

মনিব আর চাকর রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন এরূপ তর্ক করছিল, তখন অকুস্থলে আদ্রিয়ানা তাঁর ছোটো বোন লুসিয়ানাকে নিয়ে হাজির হোল।

আদ্রিয়ানা সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসকে স্বামী বলে ভেবেছিলেন, অবশ্য এরূপ ভাবাটা তাঁর পক্ষে কোনো অপরাধও নয়। দেখতে হুবহু এক, কোথাও কোনো গরমিল নেই।

অতএব সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসকে পাকড়াও করে আদ্রিয়ানা ঝড়ের বেগে বলতে লাগলেন ঃ স্বামী-স্ত্রীতে সামান্য ঝগড়া-ঝাটি হয়েই থাকে। তাই বলে তুমি এমন ব্যবহার করবে ? তুমি বলেছ তোমার স্ত্রী নেই ! ঘর-বাড়ি নেই ! চাকরটাকে তুমি বেধড়ক মেরেছও।

আদ্রিয়ানার কথা শুনে সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস হতবাক হয়ে গেলেন।

আদ্রিয়ানা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ তোমাকে বলতেই হবে, আমি এমন কি অপরাধ করেছি—তুমি আমায় এভাবে শাস্তি দিচ্ছ। এমন ভাব করছ—যেন নিজের স্ত্রীকেও চিনতে পারছ না।

সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস প্রাথমিক পর্যায়ে হতভম্ব হ'লেও শান্ত কণ্ঠে আদ্রিয়ানাকে বললেন ঃ দেখুন, আপনার ভুল হচ্ছে ঃ

—আমার ভুল ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখুন, আমি আপনার স্বামী নই।

—ছি ! ছি ! পথের মাঝে দাঁড়িয়ে, তুমি নিজের স্ত্রীকেও অস্বীকার করছ ?

—আমি সত্যি বলছি, আমি বিদেশী লোক, আজই জাহাজ থেকে এ বন্দরে নেমেছি।

আদ্রিয়ানা ফঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, লুসিয়ানা বলল: জামাইবাবু, এরকম ইয়ার্কির কি মানে হয়?

—ইয়ার্কি মানে?

—আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না, আপনি কিরকম উল্টো পাল্টা বকছেন। এত-দিন দিদির সঙ্গে ঘর করে আজ বলছেন—আপনি ও'র স্বামী নন, আপনি বিদেশী! ঢের ঢের ন্যাকামি দেখেছি—এখন বাড়ি চলুন। আর কত দিদিকে কষ্ট দেবেন?

রাস্তায় যদি এমন নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি হয় এবং নাটকীয় সংলাপ চলে—তবে রাস্তার লোকেরা তো ভীড় করবেই। কৌতূহলী আর উপযাচক লোকের অভাব তো নেই। একটা বিশ্রী ধরনের গোলমাল পাকিয়ে উঠতে কতক্ষণ।

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে ভেবে মন স্থির করলেন: আপাততঃ অপরিচিতা এই নারী দুটির সঙ্গে তাঁদের বাড়ি যাবেন, তারপর সুযোগ-সুবিধা বুঝে পালিয়ে আসবেন। বিদেশ বিভূঁয়ে একটা বিশ্রী গোলমালে জড়িয়ে পড়লে—নানা রকম ঝামেলা ও বিপদ হতে পারে।

ইতিমধ্যে তাঁদের চারপাশে কৌতূহলী জনতার ভীড় জমে উঠেছে, নানা লোক নানারকম মন্তব্য করছে। বলা বাহুল্য, তারা সকলেই নারী দুটির পক্ষে।

কেউ কেউ প্রকাশ্যেও বলছে: ছিঃ! ছিঃ! রাস্তায় দাঁড়িয়ে—কি কেলেঙ্কারি। মহাপাষণ্ড লোকটা। নিজের স্ত্রীকেই অস্বীকার করতে চাইছে।

অতএব আর কোনো দ্বিধা না করে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস ভৃত্য দ্রোমিওকে নিয়ে নারী দুটির সঙ্গে যাওয়াই স্থির করলেন। আপাতত রেহাই পাওয়া যাক, পরে ভেবে চিন্তে যাহোক একটা কিছু করা যাবে।

অতএব সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস ভৃত্য দ্রোমিওকে নিয়ে আদ্রিয়ানা ও লুসিয়ানার পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

আদ্রিয়ানা বাড়িতে ঢুকেই সিনিয়র দ্রোমিওকে নিজেদের ভৃত্য ভেবে বললেন: দরজা বন্ধ করে দাও। আর দরজায় কড়া পাহারায় থাকবে। কেউ যেন বাড়ির ভেতর থেকে না বেরুতে পারে, আর কেউ যেন বাইরে থেকে হুট্ করে ভেতরে ঢুকে না পড়ে। তোমার মনিবের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—সুযোগ পেলেই নিজের বাড়ি আর স্ত্রীর কথা ভুলে গিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠবে। অতএব সাবধান। একবার তোমার মনিব বাড়ির বাইরে গেলে আর তাঁর হদিশ পাওয়া যাবে না, ভিনদেশী জাহাজে উঠে কোথায় চলে যাবেন ঠিক নেই। তোমার মনিবের মাথা একদম বিগড়ে গেছে।

আদ্রিয়ানার কথা শুনে সিনিয়র দ্রোমিও বলল: আপনি কিছু ভাববেন না গিন্নীমা আমি সদর দরজা বন্ধ করে পাহারায় রইলাম। এ দরজা সহসা খুলছি না।

*　　　　*　　　　*

ওদিকে পথে ঘুরতে ঘুরতে জুনিয়র দ্রোমিওর সঙ্গে দেখা হোল, তাঁর, আসল মনিবের অর্থাৎ জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে।

—কি ব্যাপার তুই এখানে ?

গিন্নীমা, আপনাকে ডাকতে যে আবার পাঠালেন—নইলে কি অমন আর মার খাওয়ার পর আমি আর সাধ করে আপনাকে ডাকতে আসতুম ?

—কে তোকে মারল ?

—কেন, একটু আগেই আপনি আমাকে বেধড়ক পিটোলেন।

—আমি পিটিয়েছি তোকে ? তোর মাথা-ফাতা খারাপ হয়নি তো রে হতভাগা।

—হুজুর, আমার মাথা মোটেও খারাপ হয় নি। আমি গিন্নীমার কথা বললুম, বাড়ির কথা বললুম—আপনি এমন ভাব দেখালেন—এখানে আপনার বাড়িও নেই, স্ত্রীও নেই।

—কি যা তা বকছিস ?

ঠিকই বলছি আমি, আপনি আবার হোটেলে টাকা জমা দেওয়ার কথাও বললেন।

—নিজের বাড়ি থাকতে—আমি হোটেলে উঠবই বা কেন ? আর হোটেলে টাকা জমা দিতেই বা বলব কেন ?

—কিন্তু আপনি যে সে কথাই বললেন।

—ফের মিথ্যে কথা।

অতএব জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস তদীয় ভৃত্য জুনিয়র দ্রোমিওকে পেটাতে লাগলেন—আর ঠিক ঐ সময়েই সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস জুনিয়রের স্ত্রী আদ্রিয়ানার সঙ্গে জুনিয়রের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন—সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। এরকম তো হওয়ার কথা নয়, সদর দরজা খোলা হয় সকালে আর বন্ধ হয় রাতে। আজ কি ব্যাপার ? দুপুর না হ'তেই দরজা বন্ধ কেন ?

তিনি দরজায় আঘাত করলেন, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পেলেন না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দরজায় দুমদাম আঘাত করলেন, এবার ভেতর থেকে কে যেন প্রশ্ন করল ঃ আপনি কে মশাই ?

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন ঃ আগে দরজা খোল্ উল্লুক, তারপর বলছি আমি কে ?

—ওটি হ'চ্ছে না মশাই—আগে নাম বলুন, তারপর দরজা খোলা হবে।

—তার মানে ?

—গিন্নীমার নিষেধ আছে।

—নিকুচি করেছে, তোমাদের গিন্নীমার।

—মশায়, আপনিতো ভারী অসভ্য লোক, এসব কি বলছেন ?

—আমি তোদের মনিব, দরজা খোল।

ভেতর থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল। আসল কথা হো'ল সিনিয়র দ্রোমিও সদর

দরজার চাবিকাঠি ট্যাকে গুঁজে ঘুমুচ্ছেন—আর চাকর-বাকরদের বারণ কেউ শত ডাকা-ডাকি করলেও যেন দরজা খোলা না হয়। চাকর-বাকররা সিনিয়র দ্রোমিওকেই জুনিয়র দ্রোমিও বলে ভেবে নিয়েছে—এবং সেই হোল বাড়ির মনিবের প্রধান ভৃত্য। আর তারা দেখেছে বাড়ির মনিব স্বয়ং গিন্নীমার সঙ্গে বসে অন্দর-মহলে খাওয়া-দাওয়া করছে।

অতএব বাড়ির আসল মালিক জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস দরজার বাইরে থেকে নিজেকে মনিব বলে পরিচয় দেওয়া—চাকর-বাকররা ধরেই নিল, বাইরে থেকে যে-লোকটা দরজা খুলতে বলছে—সেই লোকটা ঠগ বা জোচ্চোর।

একটা চাকর অন্যান্যদের বলল : দরজা খুলছি না, তবু লোকটার সঙ্গে একটু মজা করা যাক্।

অন্যান্য দাস-দাসীরা বলল : সেই ভালো। এ আবার কোন্ উটকো আপদ এল।

চাকরটা হেঁড়ে গলায় বলল : আপনি বলছেন বাড়ির মালিক, তা বলুন তো আমার নাম কি?

—ইয়ার্কি হচ্ছে, একবার ঢুকি সব কটাকে চাবকে সিধে করব।

—আগে ঢুকতে পারলে তো চাবকে সিধে করবেন, আপনাকে বাড়ির ভেতরে কে ঢুকতে দিচ্ছে বলুন। মানে মানে পথ দেখুন মশাই, বরং আমাদের মনিব জানতে পারলে আপনারই বিপদ ঘটবে।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন : নিকুচি করেছে তোদের মনিবের, নিকুচি করেছে তোদের গিন্নীমার।

এই বলে তিনি দরজায় তিনটে লাথি মেরে—বন্ধুর বাড়ি রওনা হয়ে গেছেন মনিব হয়ে বাড়ির দরজা খোলাতে না পারায়—তাঁর রাগও হোলো ভয়ানক। ভাবলেন স্ত্রী আদ্রিয়ানাকে উচিত শিক্ষা দেবেন, সহসা বাড়ি ফিরবেন না, বন্ধুর বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং আপাততঃ ওখানেই থাকবেন।

বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার পথে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোর দেখা হোল। তিনি স্যাকরা অ্যাঞ্জোলার কাছে কয়েকদিন আগে স্ত্রী আদ্রিয়ানোর জন্য একছড়া হার গড়াতে দিয়েছিলেন।

—কি ব্যাপার অ্যাঞ্জেলো?

—হুজুর আপনি যে হার গড়াতে দিয়েছিলেন, সে হার তৈরী হয়ে গেছে।

স্ত্রীর ওপর তখন জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের রাগ ভয়ানক কি সর্বনেশে মহিলা। স্বামীকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাকর-বাকরদের পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছে। অতএব এই হার তাঁর জন্যে বানানো হলেও—তাঁকে আর দেওয়া হবে না। এ হারটা বন্ধুর বউকে বা তাঁর বোনকে উপহার দেওয়া হবে। যে স্ত্রী স্বামী যাতে বাড়িতে ঢুকতে না পারে—এই কারণে সদর দরজা বন্ধ করে রেখে, উল্টে ঝি চাকরকে লেলিয়ে দেয় স্বামীকে ঠগ জোচ্চর বলতে—সেই স্ত্রীকে এই হার দেওয়া উচিত হবে না।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে ভাবতে দেখে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলা জিজ্ঞেস করল : হুজুর, হারটা কি বাড়িতে গিন্নীমার কাছে দিয়ে আসব।

—না। আমি এখন আমার বন্ধু বার্সিলোর বাড়ি যাচ্ছি—তুমি বরং হারটা এখুনি ঐ বাড়িতে নিয়ে এসো।

—ঠিক আছে, হুজুর।

হুকুম পেয়ে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলো তখনই হারটা আনতে ছুটে গেল। কারণ হারটা গছিয়ে দিতে পারলেই আজ হোক বা কাল হোক বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। বড়লোকদের কি করে সন্তুষ্ট করতে হয় স্যাকরা অ্যাঞ্জেলো বেশ ভালভাবেই জানে।

জুনিয়ার অ্যান্টিফোলাস তাঁর বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বলল : আজ লাঞ্চ এখানেই খাব।

বন্ধু মুচকি হেসে বলল : বুঝেছি। আবার ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে তো ?

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস গম্ভীর হয়ে রইল, কারণ আজ স্ত্রী আদ্রিয়ানা তাঁর সঙ্গে সে ব্যবহার করছে, তা বইরের কাউকে বলা যায় না, এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও নয়। বলাটা শোভনও নয়।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস বন্ধুর বাড়িতে যখন খেতে বসেছেন, সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস তখন আদ্রিয়ানার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছেন।

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস খেতে বসেও আদ্রিয়ানার কাছে সত্যি কথাটা বলার সুযোগই পাননি।

বরং আদ্রিয়ানাই ঝড়ের বেগে বক্ বক্ করে যাচ্ছিলেন : স্বামী হয়ে এই কি ব্যবহার তোমার ? রাস্তায় চাকরটাকে বলছো—তোমার স্ত্রীও নেই, বাড়ীও নেই। বলি এটা তবে কি ? আমিই বা কে ? রাস্তার লোকজনেরা নিশ্চয়ই তোমার প্রলাপ শুনেছে। কথাটা ডিউকের কানে গেলে—মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায় ? চাকরটাকে বেধড়ক পেটালে—তা'ও বিনা দোষে। তোমার ব্যবহারে ঝি-চাকরদের কাছে আমার মুখ দেখানোর উপায় রইল না পর্যন্ত, ওরা যদি এ ব্যাপার নিয়ে গোপনে হাসাহাসি করে—আমি তাদের কি বলতে পারি ? তোমার কথাবার্তা ও ব্যবহারে বোন লুসিয়ানা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য ঝগড়া-ঝাটি সব বাড়িতেই হয়—তাই বলে কেউ এমন নাটক করে না।

ঝড়ের বেগেই আদ্রিয়ানা বক্ বক্ করে চলছিলেন, তাই সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস তাঁর নিজের কথা বলার কোনো সুযোগই পাননি। অতএব আদ্রিয়ানার ভুলই ভাঙাতে পারেন নি।

আদ্রিয়ানা আবার বলল : খেয়ে দেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমই হলো পাগলের ওষুধ। ঘুম থেকে উঠে দেখবে—মাথার ভূত নেমে গেছে। বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করো না। আমি দ্রোমিওর কাছে সদর দরজার চাবি কাঠি রেখে এসেছি, সে কিছুতেই তোমায় সদর দরজা খুলে দেবে না। একবার মার খেয়ে তার নিশ্চয়ই শিক্ষে হয়ে গেছে—বার বার সে আর ভুল করবে না। বিকেল বেলা ডাক্তার ডাকাও হবে।

অবশ্য আদ্রিয়ানা জানেন না যে, এ দ্রোমিও তাঁদের ভৃত্য সেই দ্রোমিও নয়, কি করেই বা জানবেন। আদ্রিয়ানা নিজের কাজ করতে অন্য ঘরে ঢুকতেই সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস বললেন ঃ তুমি সুন্দরী, লুসিয়ানা।

—দিদির চেয়েও।

—তা বলতে পারো।

—কথাটা দিদি জানতে পারলে আর কিন্তু আপনার রক্ষা থাকবে না জামাইবাবু। সকাল থেকে যা একখানা কাণ্ড করলেন, এমনিতেই দিদি আপনার ওপর প্রচণ্ড রেগে রয়েছেন।

—তোমার দিদি রেগে গেল তো, আমার বয়েই গেল।

—এখনও দেখছি উচিত শিক্ষে আপনার হয়নি।

—শোনো, তোমায় আমি চুপি চুপি দু'টো কথা বলি, কাছে এসো।

—বলুন কি বলবেন ?

—তোমায় আমি ভালবাসি, লুসিয়ানা। তোমায় আমার খুব পছন্দ।

—কি যা তা ইয়ার্কি করছেন, দিদি জানতে পারলে সর্বনাশ ঘটবে।

—তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই, লুসিয়ানা।

—সর্বনাশ, একথা মুখে আনাও পাপ। নিজের স্ত্রীকে ভালবাসুন। দেখুন, জামাইবাবু, আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে ফাজলামো করছেন।

বেচারী লুসিয়ানা জামাইবাবুকে পাহারা দিতে এসে, জামাইবাবুর কথাবার্তা শুনে লজ্জায় পালিয়ে গেল নিজের ঘরে।

নীচে চাকরদের ঘরে তখন আর এক নাটক জমে উঠেছে। এ বাড়ির ঝি লুসী হ'লো জুনিয়র দ্রোমিওর প্রেমিকা। সেই লুসী সিনিয়র দ্রোমিওকেই জুনিয়র ভেবে প্রেম নিবেদন করতে লাগল। প্রেম নিবেদনের ঠেলায় বেচারা সিনিয়র দ্রোমিও অস্থির হয়ে উঠল। কোন রকমে লুসীকে এড়িয়ে সে মনিব সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে দেখা করে বলল ঃ হুজুর, এই সুযোগে তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলুন, চাবিকাঠি আমার কাছে, এরা সব মায়াবিনী।

অতএব সকলের অজান্তে ওরা দু'জনে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন চুপে চুপে। আদ্রিয়ানা টের পেল না, তিনি তো জানেন চাবি কাঠি দ্রোমিওর কাছে, দরজা খুলতে গেলে প্রভু ভৃত্যে বচসা হবে—আর দ্রোমিও তাঁর কাছেই ছুটে আসবে। তিনি তো জানেন না—এ দ্রোমিও সে দ্রোমিও নয়।

যাওয়ার পথে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোর দেখা হলো সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের সঙ্গে। আর বলা বাহুল্য স্যাকরা ধরেই নিল—ইনিই জুনিয়ার অ্যান্টিফোলাস। ইনিই হার গড়াতে দিয়েছিলেন—এবং কিছু আগেই হার ছড়া বন্ধুর বাড়িতে দিয়ে আসতে বলেছিলেন। স্ত্রীর যদি ভুল হয়ে থাকে—স্যাকরার ভুল হবে—এতে আর আশ্চর্য কি। স্যাকরা ভাবল পথেই যখন দেখা হয়ে গেল, তখন আর তাঁর বন্ধুর বাড়িতে কষ্ট করে

যাওয়া কেন ?

স্যাকরা হার ছড়া সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসের হাতে গছিয়ে দিয়ে বলল : এই নিন—আপনার হার। আমার কাজের এদিক-ওদিক পাবেন না। গিন্নীমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। আমি আপনার বন্ধুর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম হুজুর, আপনার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। আমার আবার কাজের চাপ ভীষণ। চলি।

স্যাকরা হারটা গছিয়ে দিয়ে, গড় গড় করে কথা বলে, হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেল। সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস প্রথম কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়েছিলেন, স্যাকরা কিছুটা দূর যেতেই তিনি ডাকলেন : ওহে শোনো, তোমার ভুল হচ্ছে।

স্যাকরা ডাক শুনতে পেয়ে অনেক দূর থেকে জবাব দিল : হুজুর টাকা পয়সার কথা আমি ভাবি না, আপনার মতো বড় লোকের কাছে এই কটা টাকা নস্যি—যখন দরকার হবে নিয়ে আসব।

স্যাকরা হন্ হন্ করে চলে গেল, জনারণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসের মুখ থেকে শুধু একটি কথাই বেরুল : আশ্চর্য...

সিনিয়র দ্রোমিও বলল : হুজুর—এ বন্দরের কোন কিছু আশ্চর্য নয়। এটা যাদুর দেশ। এখানে এসে স্ত্রী পেলেন—বাড়ি পেলেন। এখানে আর বেশিদিন থাকলে—আর সেরাকিউজে ফিরে যাওয়া হবে না, পাকে চক্রে জড়িয়ে পড়বেন একদম।

সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসও হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলেন : সত্যি আশ্চর্য বন্দর এই এফিসাস আরও আশ্চর্যের এখানকার বাসিন্দারা। কথা নেই, বার্তা নেই এক স্যাকরা এসে হারটা গছিয়ে দিয়ে চলে গেল। হারটা আসল সোনার। কয়েকটি মুক্তোও কম হবে না। কথা বলার পর্যন্ত সুযোগ দিল না, দামের কথাও বলল না। দুম করে হারটা গছিয়ে দিয়েই হন্ হন্ করে ছুটে গেল, অবাক হওয়ার মতো বৈকি। আর এখানকার মহিলাদেরই বা কি অদ্ভুত নীতি। সুন্দর বাড়ি—সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী মহিলা। অথচ জানা নেই, শোনা নেই—সে তাঁকে স্বামী বলে আহ্বান করে বাড়ি নিয়ে গেল, ভালো ভালো খাবার খাওয়াল, পরিচর্যা করল—সত্যি চরম আশ্চর্যের দেশ এই এফিসাস। কিন্তু বাবা তো এদেশের রীতি-নীতির কথা কিস্যু বলে দেননি।

তাছাড়া ও বাড়ির ঝি লুসীর প্রেম নিবেদনের ঠেলায় সিনিয়র দ্রোমিওকে কম ভোগান্তি সইতে হয় নি। গায়ে পড়ে এভাবে যে মেয়েরা প্রেম নিবেদন করতে পারে —তা ছিল সিনিয়র দ্রোমিওর কল্পনার বাইরে। ভাব যেন—কত কালের চেনা। এটা যাদুর দেশ নিশ্চয়ই। নইলে এ রকমটা হবে কেন ?

পথের মাঝে দাঁড়িয়েই মনিবে ও ভৃত্যে নানা পরামর্শ চলল।

সিনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস বলল : বড়ো অদ্ভুত দেশ, তাই না রে দ্রোমিও।

অদ্ভুত বলে অদ্ভুত—একেবারে কিম্ভুত হুজুর। এখানে আর কিছুদিন থাকলে ব্যাপার-স্যাপার দেখে পাগল হয়ে যাব হুজুর।

যেমন তুই সকালে হয়েছিলি—হোটেল আর টাকার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে

কেবল গিন্নীমা আর বাড়ির কথা বলছিলি।

হুজুর, আমি বলিনি—সে কথা।

ফের মিথ্যে কথা।

ঠিক আছে হুজুর—এখানে বেশিদিন থাকলে আমরা দু'জনেই পাগল হয়ে যাব হুজুর। এখানকার লোকদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার কি মনে হয় জানেন?

কি মনে হয়?

মনে হয় এখানকার অধিকাংশ লোকই বদ্ধ পাগল?

এমন মনে হওয়ার কারণ?

হুজুর, কত আর বলব। এই ধরুন না স্যাকরার কথাটাই। চেনা নেই জানা নেই—দুম করে একটা দামী হার আপনাকে গছিয়ে দিয়ে চট করে সরে পড়ল।

তা বটে।

আরও কত বলব হুজুর, সম্ভ্রান্ত ঘরের ঐ মহিলার কথাই ধরুন না কেন! আপনাকে স্বামী বলে আহ্বান করে—দিব্যি বাড়ি নিয়ে চলে গেল। হুজুর এটা পাগলের দেশ, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়াই উত্তম। আপনার কাজ থাকে আপনি থাকুন হুজুর—এদেশে আমি আর একদণ্ডও থাকতে চাইনে হুজুর—আমি আপনাকে আগে-ভাগে জানিয়ে রাখলুম, এখানে আমি তেরাত্রি থাকতে রাজী নই, আপনি থাকতে চান, থাকুন। আমি কিন্তু যে দিকে দু'চোখ যায়—চলে যাব।

আরে, আমিও সে কথা ভাবছি রে। এই যাদু মুল্লুকে বা পাগলের দেশে আমারও আর এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই—আমি চললুম জাহাজঘাটায়। জাহাজ ছাড়ার বন্দোবস্ত করতে—তুই চলে যা হোটেলে—জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে রাখ। জাহাজ ছাড়ার ঠিক হ'লেই আমরা মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, আর এখানে নয়। সকাল থেকে যেভাবে ঘটনার পর ঘটনা চলেছে—ভাবতে গেলে ভিরমি খেতে হয়।

সেই ভালো, হুজুর।

অতএব সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস জাহাজঘাটার দিকে রওনা হয়ে গেলেন, আর সিনিয়র দ্রোমিও চলে গেল সেণ্টর হোটেলের দিকে।

*　　　　*　　　　*

অন্যদিকে পথের মাঝেই বহুদিনের এক পাওনাদারের সঙ্গে দেখা হো'ল স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোর। পাওনাদারটির অবস্থা ভালো। তিনি তেমন চাপ দেননি। সেই, দিচ্ছি বলে—স্যাকরাও টাকাটা পরিশোধ করেনি।

তাছাড়া পাওনাদারটি কার্যোপলক্ষে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন—অবশ্য যাওয়ার আগে স্যাকরাকে বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে টাকাটা দিয়ে আসতে।

কিন্তু স্যাকরা আর টাকাটা তাঁর বাড়িতে পোঁছে দেয়নি। ইচ্ছে করলে অবশ্য স্যাকরা টাকাটা তাঁর বাড়িতে পোঁছে দিতে পারত। তবে নানান কাজের ঝামেলায় এবং পাওনাদার বিদেশে থাকায়—আর টাকাটা দেওয়া হয়ে ওঠে নি। আর এও

একরকম সত্যি—দেনাদারের হাতে যখন টাকা পয়সা প্রচুর থাকে—তখন পাওনাদারের পাত্তা থাকে না। হাত যখন প্রায় নিঃশেষ তখন পাওনাদার এসে হাজির হয়—এবং টাকার জন্য প্রবল চাপ দিতে থাকে। আর ঐ টাকাটা শোধ করতে হবে বলে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোও ভাবেনি। পাওনাদারই যখন বিদেশে বেপাত্তা, তখন পাওনা টাকাই বা কে বাড়ি বয়ে দিয়ে আসে?

কিন্তু পাওনাদার ভদ্রলোকের বর্তমানে দুঃসময়। তিনি বিদেশে বহু টাকা লোকসান দিয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় দেশে ফিরে এসেছেন, দেশে যার কাছে যত টাকা পান—দেশে ফিরে রুদ্রমূর্তি হয়ে দেনাদারদের কাছে বর্তমানে টাকা আদায় করতে ব্যস্ত। অ্যাঞ্জেলো অন্যতম একজন দেনাদার। তিনি দেশে ফিরেই অ্যাঞ্জেলোর বাড়িতে ও দোকানে কয়েকবার হানা দিয়েছেন, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক অ্যাঞ্জেলোর দেখা পাননি। অ্যাঞ্জেলো তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে পারেনি।

অতএব পথে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোর দেখা হ'তেই তিনি মারমূর্তি ধারণ করলেন: ওহে অ্যাঞ্জেলো…

পাওনাদারকে দেখে অ্যাঞ্জেলো ভূত দেখার মতো ভড়কে গিয়ে ঢোক গিলে বলল: 'স্যার, আপনি…'

চিনতে পারছ না বুঝি?

স্যার, আপনাকে চিনব না, আপনি অসময়ে যে উপকার করেছিলেন, সে-কথা কি ভোলার। শোনো মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজবে না—আর টাকাটা আমি এক্ষুনি চাই। তোমার বদ মতলব আমি টের পেয়েছি। তোমার যদি টাকা পরিশোধ করার ইচ্ছে থাকত—অ্যাদ্দিনে দিতে পারতে। অতএব আর কোনো কথা নয়—আমার পাওনা টাকাটা আমি এক্ষুনি চাই।

অ্যাঞ্জেলো বলল: এখন আমি টাকা পাব কোথায়?

ওসব আমি কিসসু জানি না, এক্ষুনি আমার টাকা দিতে হবে। যেখান থেকে পারো—আমার টাকা এক্ষুনি তোমায় দিতে হবে—তোমার সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্রতা করা হয়েছে, আর নয়।

একবার ভেবে দেখুন, হুজুর।

আর কোনো ভাবনা নয়, তোমার নামে ডিউকের কাছেও নালিশ জানানো হয়েছে। ভালোয় ভালোয় আমার টাকাটা এক্ষুনি দিয়ে দাও—নইলে আমি একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধিয়ে দেব। পেয়াদা নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়ি থেকে তোমায় পাকড়াও করব।

টাকা না দিয়ে আর উপায় নেই, তাই নিরুপায় হয়ে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলো বলল: হুজুর, পেয়াদা দিয়ে পাকড়াও করবেন না, আপনার টাকা শোধ করার আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি, আমি একজনকে একটু দামী হার বিক্রি করেছি—তাঁর বাড়িতে গেলে এক্ষুনি টাকাটা পেয়ে যাব।

বেশ, চলো তাঁর বাড়ি। টাকা আমি এক্ষুনি চাই।

অতএব স্যাকরা অ্যাঞ্জেলো তাঁর পাওনাদারকে নিয়ে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের বাড়ির দিকে রওনা হোল।

অবশ্য বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হোল না, পথেই জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের দেখা পেল তারা।

স্যাকরা অ্যাঞ্জেলো জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে বলল: হুজুর, দীর্ঘদিনের এক পাওনাদার হঠাৎ আমাকে পাকড়াও করেছে, তাঁর পাওনা টাকাটা এক্ষুনি আমাকে দিতে হবে। হারের দামটা যদি এক্ষুনি দেন—তবে আমি এর হাত থেকে রেহাই পাই।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস সচ্ছল ব্যক্তি, তাঁর টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই, তিনি স্যাকরার কথা শুনে বললেন: তোমার হারের দাম এক্ষুনি দেব। কিন্তু আগে হারটা দাও।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের কথা শুনে স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল: হার? একি বলছেন, হুজুর। কিছুক্ষণ আগে পথে আপনার দেখা পেয়ে—হারটা যে আপনাকে দিয়ে দিলাম।

স্যাকরা অবশ্য সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে হারটা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস জানবেন কি করে? আর স্যাকরাও সিনিয়রকে জুনিয়র ভেবেই হারটা দিয়েছিল। অতএব স্বাভাবিকভাবে উভয়েরই অবাক হওয়ার কথা।

স্যাকরার কথা শুনে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন: তুমি আমায় হার কখন দিলে?

স্যাকরা ঢোক গিলে বলল: প্রথমবার আপনার সঙ্গে দেখা হ'তে আপনি বললেন, হারটা বন্ধুর বাড়ি দিয়ে আসতে···

ঠিক্।

কিন্তু দ্বিতীয়বার পথে আপনার সঙ্গে দেখা হ'তেই আপনার হাতে হারটা দিয়ে দিলাম।

—বাজে কথা বলছ কেন, দ্বিতীয়বার এই দেখা হো'ল।

—না, হুজুর।

—ফের মিথ্যে কথা বলছ, তুমিতো ভয়ানক মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, ফেরেব্বাজ।

অতএব উভয়ের ঝগড়া শুরু হোল, লোকের যেমন ভীড় হোল, তেমনি কয়েকজন পেয়াদাও ছুটে এল। ভাগ্য-গুণে কয়েকজন পেয়াদা আবার স্যাকরা অ্যাঞ্জেলোকে ভালভাবেই চিনত। পেয়াদাদের মধ্যে একজন স্যাকরাকে জিগ্যেস করল: কি ব্যাপার স্যাকরা মশাই?

—আর বলবেন না, এই ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে হার কিনেছেন। এখন টাকা দেওয়ার সময় বলছেন, হারই নেননি। দয়া করে একে এখুনি গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলুন।

ঐ দেশে তখন একটা নিয়ম চালু ছিল। কেউ কারো নামে অভিযোগ করলেই—অপরাধী দোষীই হোক বা নির্দোষই হোক, তাকে আগে গ্রেপ্তার করা হোত। এরূপ গ্রেপ্তারের জন্য আদালতের কোনো পরোয়ানার দরকার হোত না। পেয়াদারাই গ্রেপ্তার করতে পারত।

জুনিয়র দ্রোমিও অবশ্য এবার তাঁর মনিবের সঙ্গেই ছিল।

পেয়াদারা জুনিয়র অ্যান্টিফেলাসকে এখুনি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চাইছে দেখে—তিনি দ্রোমিওকে বললেন ঃ যত্তোসব বাজে ঝামেলা। এখুনি বাড়ি যা, গিন্নীমার কাছ থেকে দুশো মোহর নিয়ে চটপট্ চলে আয়।

—যে আজ্ঞে।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস ভাবলেন ঃ আগেতো গ্রেপ্তার এড়ানো যাক। পরে জোচ্চোর অ্যাঞ্জেলোর যথাযথ ব্যবস্থা করা যাবে।

আর স্যাকরা অ্যাঞ্জোলো ভাবছে—ঠেলায় পড়ে বাবু এখন টাকাটা দিতে চাইছে। নইলে হার নিয়ে উনি না বলছেন কেন? এতো ধনী মানী লোক হয়ে—এমন আশ্চর্য ব্যবহার।

জুনিয়র দ্রোমিও একরকম ছুটেই হাজির হোলো বাড়ির গিন্নী আদ্রিয়ানার কাছে ঃ মা, তাড়াতাড়ি দু'শো মোহর দিন—নইলে কর্তাবাবুকে পেয়াদারা এক্ষুনি গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে।

কি ব্যাপার? হঠাৎ গ্রেপ্তারই বা করবে কেন?

সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার, আগে মোহর দিন, পরে কর্তাবাবু বাড়ি ফিরে এলে—তাঁর কাছেই সব ব্যাপারটা শুনতে পারবেন।

স্বামীর এরূপ বিপদের কথা শুনে, আদ্রিয়ানা জুনিয়র দ্রোমিও'র হাতে দু'শো মোহর গুনে দিলেন।

*　　　　　*　　　　　*

কিন্তু জুনিয়র দ্রোমিও টাকাটা নিয়ে কিছুটা এগুতেই—পথে সিনিয়র অ্যান্টি-ফোলাসের দেখা পেয়ে নিজের মনিব বলেই ধরে নিলেন। আর সিনিয়র অ্যান্টি-ফোলাসও জুনিয়র দ্রোমিওকে নিজের ভৃত্য বলেই ভেবে নিলেন। সিনিয়র অ্যান্টি-ফোলাস আসলে জাহাজের বন্দোবস্ত করে জাহাজঘাটা থেকেই ফিরে আসছিলেন।

জুনিয়র দ্রোমিও বুঝতে পারল না, টাকা ছাড়া তাঁর মনিব কি করে পেয়াদাদের হাত থেকে ছাড়া পেল। সে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের হাতে টাকাটা দিয়ে বললেন ঃ গিন্নীমা টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন হুজুর।

আর সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস ধরে নিলেন ঃ যে মহিলা তাঁকে স্বামী বলে আহ্বান জানিয়েছিল, সেই মহিলাই ভৃত্য দ্রোমিওর দেখা পেয়ে টাকা দিয়েছেন। ব্যাপার মন্দ নয়। টাকা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা। তবে চেষ্টা আর সফল হচ্ছে না—তিনি অবিলম্বেই জাহাজে করে এ বন্দর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। টাকাটা না নিলে হয়তো বা ঝামেলা

বাধবে—অতএব পড়ে পাওয়া টাকাটা নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আর জুনিয়র দ্রোমিও একবার মনিবকে জিগ্যেস করল না, তিনি টাকা ছাড়া পেয়াদাদের হাত থেকে কি করেই বা ছাড়া পেলেন?

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস টাকাটা নিয়ে দ্রোমিওকে বললেন ঃ তুই সেণ্টর হোটেল থেকে মালপত্তর সব নিয়ে জাহাজঘাটায় চলে যা। এই পাগলের দেশে আর একদণ্ডও থাকব না।

অবশ্য সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের পক্ষে এই দেশটাকে পাগলের দেশ বলে ভেবে নেওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সকাল থেকে নানা অদ্ভুত কাণ্ড চলছে। নানা লোক—তাকে পরিচিত ভেবে নমস্কার করছে, কেউবা কুশল সংবাদ জিগ্যেস করছে, এক দরজী তাঁকে সাদরে দোকানে আহ্বান করে বলছে ঃ হুজুর আপনার জন্যেই এইসব দামী কাপড়, আপনি ছাড়া এত দামী কাপড়ের পোষাক—এখানকার খুব কম লোকই পরে থাকেন।

দরজী আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ের মাপ পর্যন্ত নিয়ে নিল। তারপর সেই স্যাকরা! চেনা নেই, শোনা নেই—চট করে হার গছিয়ে দিল। তারপর সেই মহিলার কথা—যিনি স্বামী হিসাবে বাড়ি ডেকে নিয়ে গেলেন, আদর করে খাওয়ালেন। এখন আবার তাঁর ভৃত্যের হাতে মন ভোলাবার জন্য এতগুলো টাকা পাঠিয়েছেন। সত্যি বিচিত্র এই দেশ।

জুনিয়র দ্রোমিও কিন্তু ভাবছে অন্য কথা, আবার কি সকলের মতো মনিবের মাথা বিগড়ে গেল। নইলে মালপত্র নিয়ে জাহাজঘাটাতে যেতে বলবেন কেন? সেণ্টর হোটেলেই বা যেতে বলবেন কেন? অতএব প্রতিবাদ করা চলবে না, প্রতিবাদ করলেই আবার মনিবের হাতে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। তাই সে বুদ্ধি করে বলল ঃ ঠিক আছে হুজুর, আমি এখুনি সেণ্টর হোটেল যাচ্ছি।

সেণ্টর হোটেলে যাওয়ার নাম করে জুনিয়র দ্রোমিও নিজে সরাসরি বাড়ি চলে এসে আদ্রিয়ানাকে বলল ঃ গিন্নীমা সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আবার কি হোলরে? টাকাটা ওঁকে দিয়েছিস তো।

টাকা তো দিয়েছি মা, কিন্তু—

কিন্তু কি বলবি তো?

কর্তাবাবুর মাথা আবার সেই সকাল বেলার মতো বিগড়ে গেছে। উনি আমাকে সেণ্টর হোধেল থেকে মালপত্র নিয়ে জাহাজঘাটায় যেতে হুকুম করেছেন।

বলিস কি, তুই কিছু বলিস নি!

আমি কিছু বলতে যাই, আর সকাল বেলার মতো বেধড়ক পিটুনি খাই। আমি সেণ্টর হোটেলে যাওয়ার নাম করে আপনার কাছে বাড়িতে পালিয়ে এসেছি—তখন আপনি মা ভালো বোঝেন তাই করুন গিন্নীমা।

আদ্রিয়ানা আবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন, সকাল থেকে একী বিপর্যয় চলছে, এত

ধকল কেই-ই বা সইতে পারে? তিনি বোন লুসিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আদ্রিয়ানা এবার সত্যি সত্যিই তাঁর স্বামীর দেখা পেলেন। টাকা না পেয়ে পেয়াদারা জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে নিয়ে তখন কয়েদখানার দিকে যাচ্ছিল।

স্ত্রীকে দেখে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস রাগে গজগজ করতে করতে বললেন: তোমার মতো কোনো স্ত্রী থাকলে—হতভাগা স্বামীর আর বাঁচার উপায় থাকে না। দুপুর বেলা বাড়িতে খেতে গিয়ে দেখি—ভেতর থেকে সদর দরজা বন্ধ, কতো ডাকলুম দরজায় কত ধাক্কা মারলুম—কিন্তু চাকর-বাকরেরা কেউ দরজা পর্যন্ত খুলল না, বরং মনিব বলে পরিচয় দেওয়ায় তাঁরা ভেতর থেকে নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। আমি জোচ্চর, আমি ঠগ, আমি প্রতারক। এই কি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার। তোমার যে নরকেও স্থান হবে না। আমি ডিউকের কাছে তোমার নামে নালিশ করব।

স্বামীর কথা শুনে আদ্রিয়ানা অবাক হয়ে গেল। অবাক হো'ল আদ্রিয়ানার বোন লুসিয়ানাও।

দুপুর বেলা স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছেন, অথচ উনি বলছেন—ও'কে বাড়িতেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। চাকর-বাকরেরা নাকি দরজাই খোলে নি—বরং নানাভাবে তাঁকে ঠাট্টা করেছে।

আদ্রিয়ানা স্বামীর কথা শুনে এবার নিশ্চিত হোলেন, তাঁর স্বামী পাগল হয়ে গেছেন। লুসিয়ানারও এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা রইল না। আর কিছুক্ষণ আগেও তিনি তাঁকে পেয়াদাদের হাত থেকে খালাস করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক গাদা টাকা দিয়েছেন। কিন্তু টাকা দেওয়া সত্ত্বেও, টাকা কি কোথাও ফেলে দিয়েছেন! নইলে পেয়াদারাই বা তাঁকে আটক করে রাখার জন্য কয়েদখানাতে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

যতই পাগল হোক, হাজার হ'লেও স্বামীতো বটেই—অতএব স্বামীকে আগে বাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার।

আদ্রিয়ানার যে প্রচুর টাকা তা এ শহরের সবাই জানে, তাছাড়া তিনি খোদ ডিউকেরও বিশেষ পরিচিতা।

আদ্রিয়ানা পেয়াদাদের বললেন: তোমরা ওকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি ফিরে গিয়েই টাকাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রাস্তায় আদ্রিয়ানার পরিচিত কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিও ছিলেন, তাঁরাও পেয়াদাদের বললেন।

অতএব পেয়াদারা একরকম ভয় পেয়েই জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে ছেড়ে দিল। আদ্রিয়ানা পরিচিত মাতব্বর ব্যক্তিদের ফিসফিসিয়ে কিছু বলতেই, তাঁরাই লোকজন ডেকে আনলেন এবং লোকজনেরা জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে বেঁধে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল। জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসও চীৎকার করতে লাগলেন: একী, আমাকে বেঁধে

নিয়ে যাচ্ছে কেন ?

লোকজনেরা বলল ঃ আপনি যে পাগল হয়ে গেছেন হুজুর, নইলে আপনার স্ত্রীই বা আপনাকে বেঁধে নিয়ে যেতে বলবেন কেন ?

আমি পাগল না, তোমরা সকলেই আমাকে পাগল করে ছাড়লে ? আমি তো বলছি—আমার কিছু হয় নি।

আদ্রিয়ানা শান্তকণ্ঠে বললেন ঃ বেশ, আগে বাড়ি চলো—কিছু খাওনি বলছ, আগে কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করো। তারপর তোমার সব কথাই শুনবো।

অতএব স্বামীকে একরকম বেঁধেই বাড়ি নিয়ে এলেন আদ্রিয়ানা! তখনকার দিনে পাগলের চিকিৎসা করতে ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদিই ছিল একমাত্র ভরসা এবং ওঝারাই তা করত। আদ্রিয়ানা নিরুপায় হয়ে স্বামীকে বাড়িতে আটকে রেখে, এক নামকরা ওঝাকে ডেকে এনে স্বামীকে ওঝার হাতে তুলে দিলেন। এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারেন তিনি ? এখন যা করার ওঝাই করুক।

কিন্তু স্যাকরা অ্যাঞ্জেলার দেনাটা শোধ করা দরকার, কারণ পেয়াদারা তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েই জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে ছেড়ে দিয়েছে।

আদ্রিয়ানা সেই টাকাটা শোধ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

কিন্তু কিছুটা পথ গিয়েই সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে দেখতে পেয়ে আদ্রিয়ানা হতভম্ব হয়ে পড়লেন, স্বামীকে তিনি বাড়িতে আটক রেখেছেন, ওঝার হাতে সঁপে দিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই ওঝাকে ফাঁকি দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন।

অবশ্য সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসের চেহারা তখন অনেকটা পাগলের মতোই। এ বন্দরের অনেকেই জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে চেনে। অনেকেই ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গেছেন যে, অ্যান্টিফোলাস পাগল হয়ে গেছেন, তাঁর স্ত্রী তাঁকে বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেছেন। কু-কথা ছড়াতে দেরী হয় না, এসব কথা বাতাসের আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতএব অ্যান্টিফোলাসের পাগল হওয়ার ব্যাপারটাও ইতিমধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই চারদিকে চাউর হয়ে গেছে।

পাগল বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ভেবে বন্দরের লোকেরা এখন সিনিয়র অ্যান্টি-ফোলাসকে ধরার চেষ্টা করছে। কারণ সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকেই তাঁরা এ বন্দরের বাসিন্দা বলে ধরে নিয়েছে, ঐ চেহারার মিলের জন্যেই।

তাই লোকজন ধরতে এলে, তাঁদের বাধা দেওয়ার জন্য সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে পথ চলতে চলতে তরোয়াল ঘোরাতে হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর চিরসঙ্গী ভৃত্য সিনিয়র দ্রোমিও রয়েছে। সেও মনিবের মতোই পথ চলতে চলতে থেকে থেকে তরোয়াল ঘোরাচ্ছে।

আদ্রিয়ানা সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে স্বামী ভেবে—তাঁকে বাঁধার জন্য লোকজন ডাকতে লাগলেন। ব্যাপার স্যাপার দেখে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস এবং তাঁর চাকর দ্রোমিও ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন। এতলোক যদি বাঁধতে আসে তবে তো আর রেহাই

নেই—অতএব তাঁরা সামনে একটা বড় বাড়ি পেয়ে—চট্ করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

সেই বাড়িটি একটি মঠ। মঠের কর্ত্রী একজন বৃদ্ধা মহিলা। তিনি সারা জীবন প্রায় ধর্ম নিয়েই রয়েছেন। ধর্ম আচরণই তাঁর একমাত্র ব্রত।

আড্রিয়ানা দূর থেকে চেঁচিয়ে বললেন: উনি আমার স্বামী, উনি পাগল হয়ে গেছেন—ওঁকে আমরা বাড়ি নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা বললেন: মঠে উনি যখন একবার আশ্রয় নিয়েছেন—তখন আপনি ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারবেন না, ম্যাডাম। উনি এখানেই থাকবেন, আপনারা ফিরে যান।

—কিন্তু উনিতো পাগল। পাগলের বেলা কি এসব নিয়মকানুন খাটে? তাছাড়া উনি আমার স্বামী, ওকে ধরে নিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে।

কিন্তু বৃদ্ধা মহিলা ভালো করে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে দেখলেন আর ভাবলেন:

এ লোকটি মোটেই পাগল নয়, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল বা গোলমাল আছে—লোকটি বলছে মহিলা তাঁর স্ত্রী নয়, অথচ মহিলা দাবী করছেন লোকটি তার স্বামী। ব্যাপারে কি? ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করে এই লোকটিকে মহিলার হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

তাই মঠাধ্যক্ষা বৃদ্ধা মহিলা আড্রিয়ানাকে বললেন: উনি যদি আপনার স্বামী হন—তবে আমি নিশ্চয়ই ওঁকে আপনার বাড়ি পেঁছে দেব আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু আওাতত বিচার বিশ্লেষণ না করে আমি ওকে আপনার হাতে ছেড়ে দিতে পারি না, আমায় ক্ষমা করবেন ম্যাডাম।

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস আর সিনিয়র ড্রোমিও মঠের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল, মঠাধ্যক্ষার কথা শুনে তাঁরা কিছুটা আশ্বস্ত হো'ল।

এদিকে তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জরিমানা আদায় না হওয়ায়—ইউজিনকে তখন মিছিল করে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বধ্যভূমিতে যেতে হলে মঠের পাশ দিয়েই যেতে হয়। ডিউকের লোকেরা ইউজিনকে নিয়ে মিছিল করে মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন। মিছিলের পুরোভাগে ঘাতক চলেছে হাতবাঁধা ইউজিনকে নিয়ে।

ইতিমধ্যে অড্রিয়ানা গিয়ে ডিউকের কাছে নালিশ জানিয়েছে।

—কি ব্যাপার ম্যাডাম? হঠাৎ আপনি, আপনার কর্তাটি কোথায়?

—আর কি বলব মহামান্য ডিউক আমার দুঃখের কথা।

আড্রিয়ানা যেমন ডিউকের প্রিয়পাত্রী তেমনি আড্রিয়ানার স্বামী জুনিয়র অ্যান্টি-ফোলাসও ডিউকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

তাই ডিউক চিন্তিত হয়ে আড্রিয়ানাকে জিজ্ঞেস করলেন: কি হয়েছে ম্যাডাম,

আমাকে বিনা সঙ্কোচে সব কথা খুলে বলুন।

আমার স্বামী, আপনার অন্যতম প্রিয়পাত্র পাগল হয়ে গেছেন।

সেকী, কবে থেকে এমন হো'ল ? বড়োই দুঃখের বিষয়। অ্যাণ্টিফোলাস আমার যে অত্যন্ত প্রিয়জন, তাঁর বীরত্বে আমি নিজেও মুগ্ধ। সে পাগল হয়ে গেলে এ রাজ্যের পক্ষেও ক্ষতি। এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি বলুন ?

আমি আমার স্বামীকে বাড়িতে আটক করে রেখেছিলাম, একজন ওঝাকে চিকিৎসার জন্য বহাল করে রেখে এসেছিলাম।

তারপর ?

ওঝার চোখে ধুলো দিয়ে উনি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমায় দেখতে পেয়ে উনি মঠের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। কিন্তু মঠাধ্যক্ষা বৃদ্ধা মহিলাটি কিছুতেই আমার স্বামীকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে চাইছেন না। এখন আমি কি করি ? তাই বিপদে পড়ে পাপনার কাছে ছুটে আসা।

বেশ, আমিও আপনার সঙ্গে মঠে যাচ্ছি। আমি কথা দিচ্ছি—যেভাবেই হোক আপনার স্বামীকে আপনার হাতে তুলে দেব। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

স্বয়ং ডিউক আাড্রিয়ানাকে নিয়ে মঠে এলেন এবং তিনি মঠাধ্যক্ষা বৃদ্ধা মহিলাকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে বললেন ঃ বর্তমানে আপনার মঠে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি আমারও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। একবার অ্যাণ্টিফোলাসকে আমার সামনে নিয়ে আসুন, আমি তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি।

মঠাধ্যক্ষা বললেন ঃ মহামান্য ডিউক আপনি যদি কথা দেন—যে, আমার আশ্রিত ব্যক্তিটির কোনো ক্ষতি করবেন না এবং তার অনিচ্ছায় তাঁকে তাঁর স্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন না, তবেই আমি তাঁকে আপনার সামনে হাজির করতে পারি, নতুবা নয়। আমার এই ধৃষ্টতা মাপ করবেন—আপনি নিশ্চয়ই জানেন—মঠ আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও—মঠের অভ্যন্তরে আপনার প্রশাসন চলে না।

আমি জানি। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম—আপনার আশ্রিত ব্যক্তির আমি কোনো ক্ষতি করব না এবং অনিচ্ছায় তাঁকে তাঁর স্ত্রীর হাতেও সঁপে দেব না।

বেশ।

মঠাধ্যক্ষা ডিউককে বলতে বলে আশ্রিতাকে আনতে গেলের মঠের অভ্যন্তরে।

*　　　　*　　　　*

আর ওদিকে জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাসের বাড়িতে তখন তুলকালাম কাণ্ড। অ্যাণ্টি ফোলাস স্ত্রীর নিযুক্ত ওঝাকে বললেন ঃ মশায়, আমি মোটেই পাগল নয়, আমার কথাবার্তা শুনে কি আমায় পাগল মনে হচ্ছে ? তবে আজ সকাল থেকে যে সব কাণ্ড আমার জীবনে ঘটেছে তাতে রীতিমতো পাগল হয়ে যাওয়া কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয় আপনি এখন মানে মানে বিদায় নিন, আপনার ফিয়ের টাকা আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে

দেওয়া হবে।

ওঝাটি বৃদ্ধ, গায়ে শক্তিও কম, তিনি মনে মনে ভাবলেন: একে দেখে শুনে, মোটেও পাগল মনে হচ্ছে না। তাছাড়া বাড়ির লোক সহযোগিতা না করলে এর ওপর কোনো জোর খাটানোও চলবে না। এর গায়ে অসীম শক্তি। শক্তিতে এঁর সঙ্গে তিনি মোটেই এঁটে উঠতে পারবেন না। অতএব ওঝাটি মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল।

ওঝাটি চলে যেতেই জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস তাঁর ভৃত্য জুনিয়র দ্রোমিওকে ডেকে পাঠালেন। দ্রোমিও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মনিবের সামনে হাজির হ'লো।

জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস হুঙ্কার ছাড়লেন: পেয়াদারা যখন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি তোকে গিন্নীমার কাছ থেকে দুশো মোহর নিয়ে যেতে বলেছিলুম। টাকাটা নিয়ে গিয়ে দিসনি কেন?

জুনিয়র দ্রোমিও কাঁপতে কাঁপতে বলল: হুজুর আমার কোনো দোষ নেই। হুজুর আপনাকে পেয়াদারা টাকার জন্যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ খবর এসে গিন্নীমাকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীমা টাকাটা আমায় দিয়ে দিলেন।

সে টাকা কোথায়?

একী বিপদ রে বাবা। বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুটা এগুতেই আপনার সঙ্গে দেখা হো'ল।

আমার সঙ্গে তোর দেখা হো'ল?

হ্যাঁ, হুজুর।

টাকা কি করলি?

আমি দেখলুম, টাকা ছাড়াই আপনি দিব্যি ছাড়া পেয়ে গেছেন, তবু আমি টাকাটা আপনার হাতে তুলে দিলুম।

টাকাটা আমার হাতে তুলে দিলি? দেব এক চড়ে তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে।

হুজুর টাকাটা আপনি নিয়ে—আমায় বললেন সেণ্টর হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে জাহাজঘাটায় যেতে!

এসব কথা আমি বললুম?

হ্যাঁ, হুজুর।

প্রভু-ভৃত্যে যখন এমন বার্তালিপি চলছে, তখন লুসিয়ানা ঘরে ঢুকে বলল: জামাইবাবু, আপনার কথা আর বলবেন না, সকাল থেকে আপনি যে সব কাণ্ড-কারখানা চালাচ্ছেন—তাতে বাড়ির সকলেরই পাগল হওয়ার উপক্রম।

কি রকম?

দুপুরে বাড়িতে দিদির সঙ্গে বসে খেয়ে গেলেন, অথচ দিদিকে বললেন আপনাকে নাকি বাড়িতেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি, আপনাকে নাকি চাকর-বাকরেরা অপমান করেছে।

আমি বাড়িতে দুপুরে খেয়েছি ?

হ্যাঁ, খেয়েছেন এবং এই দ্রোমিও সাক্ষী। জুনিয়র দ্রোমিও বলল : বারে আমিতো দুপুরে বাড়িই আসিনি। কর্তার খোঁজেই হন্যে হয়ে ঘুরছিলুম।

ঝি লুসী বলল : কেন হুজুরের কাছে মিথ্যে কথা বলছিস, তুই দুপুরে বাড়ি ছিলি না ?

কই নাতো ?

ফের মিথ্যে কথা।

লুসিয়ানা বলল : কিন্তু আপনি দ্রোমিওকে সকালে বলেছিলেন—আপনার এখানে বাড়ি নেই, আপমার এখানে স্ত্রী নেই। দ্রোমিও প্রতিবাদ করতে আপনি তাকে বেধড়ক পিটিয়েছেন।

দ্রোমিও তার পিঠের মারের দাগ পর্যন্ত দেখাল। সবার কথা শুনে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসেরই সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। স্যাকরা আঞ্জেলোর কথাই ধরা যাক না, লোকটা হার না দিয়েই টাকা চেয়ে বসল দুম করে।

অথচ লোকটা তো ঐ রকম ছিল না। সে শান্ত কণ্ঠে লুসিয়ানাকে জিজ্ঞেস করল : তোমার দিদি কোথায় ?

দিদি তো আপনার টাকা দেওয়ার জন্যই আবার বেরিয়েছে।

তবে আর বাড়ি বসে থেকে কি করব, আজ আদ্রিয়ানার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। এসব জিনিস সহ্য করা যায় না, নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা বিরাট গোলমাল ঘটেছে। চলরে দ্রোমিও বেরিয়ে পড়া যাক।

অতএব জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস জুনিয়র দ্রোমিওকে নিয়ে আদ্রিয়ানার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেই মঠের সামনে চলে এলেন। আর মঠে এসে দেখতে পেলেন, তাঁর স্ত্রী এবং স্বয়ং ডিউক।

আদ্রিয়ানা স্বামীকে দেখে তো অবাক : তুমি ?

হ্যাঁ, আমি। সঙ্গে দ্রোমিও আছে।

তবে মঠের ভেতরে ওরা কারা ?

ইতিমধ্যে মঠাধ্যক্ষা সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস ও সিনিয়র দ্রোমিওকে নিয়ে এলেন। একজোড়া অ্যান্টিফোলাস এবং একজোড়া দ্রোমিওকে একসঙ্গে দেখে, রাজা অবাক। অবাক আদ্রিয়ানাও, অবাক অ্যান্টিফোলাস এবং দ্রোমিওরা।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাসের মুখে সব কথা শুনে সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস বললেন : আপনার এ হয়রানির জন্যে আমিই অনেকাংশে দায়ী।

কি রকম ?

স্যাকরা, আমার কাছেই হারটা দিয়েছিল। আর আপনার স্ত্রী আমাকেই স্বামী বলে ধরে নিয়ে বাড়িতে খাইয়ে ছিলেন।

জুনিয়র দ্রোমিও বলল : গিন্নীমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে

দিয়েছিলাম।

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস বললেনঃ নিশ্চয়ই।

জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস বললেন ঃ আর আমাকে সকলে পাগল ভাবতে লাগল— এই তো।

ডিউক বললেন ঃ কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, একজোড়া প্রভু ও ভৃত্যের এমন মিল কি করে সম্ভব ?

এমন সময় মঠের সামনে দিয়ে ইউজিনকে নিয়ে ডিউকের ঘাতক ও পেয়াদাগণ মিছিল করে যাচ্ছিলেন।

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাইরে এত গোলমাল কেন ?

মঠের একজন লোক বলল ঃ ডিউকের লোকজন কাউকে হত্যা করার জন্য বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।

ডিউক বললেন ঃ উনি হলেন সেরাকিউজের সওদাগর ইউজিন—এদেশের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া ওর জাহাজ ও মালপত্র সব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু ও'র এখানে কোন আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত কেউ নেই যে ও'র হয়ে একহাজার মোহর জমা দিতে পারে।

সিনিয়র অ্যান্টিফোলাস ডিউককে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি নাম বললেন।

সেরাকিউজের সওদাগর ইউজিন।

উনি যে আমার বাবা, ও'র হয়ে আমি এক লক্ষ মোহরও জমা দিতে রাজী।

সিনিয়ার অ্যান্টিফোলাস আর সিনিয়র দ্রোমিও ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সিনিয়ার অ্যান্টিফোলাস গিয়ে ইউজিনকে জড়িয়ে ধরল ঃ বাবা, আমি।

বড় ছেলেকে দেখে বৃদ্ধ কেঁদে ফেলে বললেন ঃ তোর মা আর ছোটো ছেলেকে সেই কবে হারিয়েছি—তুই তাদের খোঁজে এসে কত বছর কাটিয়েছিলি, আমি আর সেরাকিউজে চুপচাপ বসে থাকতে পারলুম না, তোর খোঁজ করতে করতে এখানে এলাম, তারপর এই অবস্থা।

আর কোন ভাবনা নেই বাবা। তবে এখানে এসে আমরাও এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

কি রকম ?

ঠিক আমারই মতো দেখতে আর একজন, আর ঠিক দ্রোমিও'র মতো দেখতে আর একজন।

বলিস কি, কই তারা ?

ইতিমধ্যে ডিউকের সঙ্গে জুনিয়র অ্যান্টিফোলাস, জুনিয়র দ্রোমিও এবং আড্রিয়ানাও এলেন।

ইউজিন তাঁদের দেখে অবাক, আনন্দে তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল ঃ আর এই তো আমার হারিয়ে যাওয়া ছোটো ছেলে, আর ঐ তো তাঁর চিরসঙ্গী আর এক

ড্রোমিও। আমার ভুল হ'তেই পারে না। এরকম একজোড়া করে প্রভু-ভৃত্য আর পৃথিবীর কোথাও নেই।

এবার জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস ইউজিনের কাছে গিয়ে তাঁর অতীত জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা সব বললেন, আদ্রিয়ানাকে দেখিয়ে বললেন ঃ এ হচ্ছে আমার স্ত্রী।

এতদিন পরে বাবাকে ফিরে পেয়ে জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস স্বাভাবিকভাবে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

এই সুখকর এবং অভাবিত মিলন শুধু স্বপ্নের মধ্যেই সম্ভব, ডিউক এসব দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তিনি ইউজিনের জরিমানাতো মাপ করে দিলেনই, তাছাড়া রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত তাঁর ধনসম্পদও ইউজিনকে ফেরত দেওয়ার জন্য হুকুম জারী করলেন।

আদ্রিয়ানার সঙ্গে তাঁর স্বামীর ঝগড়া মিটে গেল, আদ্রিয়ানা হেসে স্বামীকে বললেন ঃ এবার তো বুঝতে পারলে—এসব ব্যাপারে আমার কোনো দোষ নেই।

জুনিয়র অ্যাণ্টিফোলাস বললেন ঃ তাতো বুঝতে পারছিই এখন, ভাগ্যিস এমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল—তাই দাদাকেও ফিরে পেলাম, বাবাকেও ফিরে পেলাম।

লুসিয়ানা এমন সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ আমি কিন্তু সিনিয়র অ্যান্টিফোলাসকে সহজে ছাড়ছি না।

সকলেই জিজ্ঞেস করল ঃ কেন ? কেন ?

—উনি জামাইবাবু হয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করেছেন, আমাকে বিয়েও করতে চেয়েছেন।

ডিউক গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ গুরুতর অপরাধতো বটেই, তবে সিনিয়রকে সহসা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে এ রাজ্যে আটক থাকতে হবে।

মঠাধ্যক্ষ্য বৃদ্ধা মহিলাটি এতক্ষণ চুপচাপ সব কিছুই দেখছিলেন দূর থেকে শুনছিলেনও।

বৃদ্ধ ইউজিন আক্ষেপ করে বললেন ঃ সবাইকেই ফিরে পেলাম, শুধু একজনকেই এই আনন্দের দিনে ফিরে পেলাম না।

দুই ছেলে জিজ্ঞেস করল ঃ তিনি কে বাবা ?

তোদের হারানো মা।

বলা বাহুল্য, মঠাধ্যক্ষ ঐ বৃদ্ধা মহিলাই ইউজিনের হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী। স্বামী আর ছেলেদের দেখে—বৃদ্ধা মহিলার চোখে মুখে আনন্দের রেশ ফুটে উঠল!

তিনি সকলের সামনে এগিয়ে গিয়ে পরিশেষে আত্মপরিচয় দিলেন। মঠাধ্যক্ষার বেশে ছিলেন বলে—প্রথমে ইউজিন নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন নি। পরিচয় পেয়ে তিনি আনন্দে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলেন।

ছেলেরাও তাঁদের মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরল।

তিনি সকলকেই ফিরে পেয়ে মনে মনে পরম করুণাময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

সিম্বেলিন

এক

এখনকার কাহিনী নয়। দু'হাজার বছর আগেকার কথা। তখনকার ইংলন্ড—বর্তমানের ইংলন্ডের মতো ছিল না মোটেই। ইংলন্ড ছিল কতকগুলি ছোটো ছোটো রাজ্যে ভাগ করা। দক্ষিণ সাগরতীরের বড় রাজ্যটির নাম ছিল ব্রিটেন।

সমসাময়িককালে ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ রাজ্যই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীন। সুদূর ব্রিটেনেও রোমানরা যাতায়াত শুরু করেছিল।

ব্রিটেনের রাজা কেসিবেলান রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজারের নিকট পরাজিত হন। ব্রিটেনে রাজাকে রোমে রাজকর পাঠিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়। তখন রোম সাম্রাজ্যেরই ইউরোপে রমরমা অবস্থা।

কিন্তু জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পরই—রোম সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরে। ঘরোয়া বিবাদ শুরু হয়। অতএব রোমে ঘরোয়া বিবাদ শুরু হওয়াতে—আভ্যন্তরীণ গোলযোগে রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ব্রিটেনরাজ সিম্বেলিন রোমে রাজকর দেওয়া বন্ধ করে দেন। সিম্বেলিন কিন্তু ব্রিটেনরাজ কেসিবেলানের পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রিটেনরাজ কেসিবেলানের ভাইপো।

কেসিবেলানের মৃত্যুর পর সিম্বেলিনই ব্রিটেনের রাজা হন।

সিম্বেলিনের অত্যন্ত অনুগত তথা বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন বেলারিয়াস। নানা যুদ্ধে তিনি অনন্য সাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করে ক্রমশঃই তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠার ঝামেলা অনেক—যারা রাজার প্রিয়পাত্র হতে পারেন নি—তাঁরা স্বভাবতঃই বেলারিয়াসকে হিংসা করতে থাকেন। বেলারিয়াসের সৌভাগ্যে অনেকেই জ্বলে-পুড়ে যেতে থাকেন। কি করে বেলারিয়াসের ক্ষতি করা যায়—তার জন্য তারা তৎপর হতে থাকেন। এরূপ তৎপরতা থেকেই জঘন্য ষড়যন্ত্র সূচিত হয়ে থাকে। পরিশেষে ষড়যন্ত্রকারীগণ বেলারিয়াসের বিরুদ্ধে রাজার কাছে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন।

কোনো মিথ্যাকে বারবার বললে—অনেক সময় তা সত্য বলে মনে হয়। বেলারিয়াসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনতে শুনতে—রাজা মিথ্যা অভিযোগগুলিই সত্য বলে মনে করতে থাকেন। রাজা সিম্বেলিন ভাবলেন বেলারিয়াস তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর এবং এই কারণে সে রোমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। তাই রাজা সিম্বেলিন বেলারিয়াসকে দোষী সাব্যস্ত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

বেলারিয়াস অবশ্য তাঁর অপরাধের কথা জানতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন: কি

অপরাধে আমায় দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আদেশ দেওয়া হলো, তা আমি জানতে চাই। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীগণের একজন বললেন: রাজা আপনার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই এরূপ শাস্তি প্রদান করেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে আর কোনো আলোচনা করতে চান না বা আপনার সঙ্গে দেখা করতেও নারাজ।

অতএব বেলারিয়াস নিজেও জানতে পারলেন না—তাঁর কি অপরাধ। কেনই বা তিনি ব্রিটেন থেকে বিতাড়িত হোলেন।

বেলারিয়াসতো বিতাড়িত হোলেনই, তাঁর জমিদারী, কেল্লা ও ধনসম্পদ সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হোল। একদা প্রবল প্রতাপান্বিত বেলারিয়াসের অবস্থা হোল ভিখারীর মতো, কপর্দকহীন বেলারিয়াস স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অজানা আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি দেশকে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন রাজাকেও—কিন্তু পুরস্কার পেলেন, অসম্মান ও বিতাড়ন। তাঁকে তাঁর স্বদেশ থেকে কুকুরের মতই তাড়িয়ে দেওয়া হোল। ক্ষোভে ও দুঃখে বেলারিয়াস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন: ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ পেলে—এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিশোধ তিনি অবশ্যই নেবেন।

বেলারিয়াসের মনে কোনো পাপ নেই। তিনি কোনো অন্যায় বা অপরাধ করেননি। অতএব দুঃখ বা ক্ষোভ তাঁর মনে প্রতিহিংসার বিষক্রিয়া অবশ্যই শুরু করতে পারে।

বেলারিয়াস চলে যাওয়ার পর, ব্রিটেনরাজ সিমবেলিন—তাঁর কোন খোঁজ-খবরও নিলেন না। যারা বেলারিয়াসকে দু'চোখে দেখতে পারত না, তারা খুশী হয়ে বলল: যাকগে আপদ চুকে গেছে। ব্যাটা দেশ ছেড়েই চলে গেছে। ওরকম দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো।

বেলারিয়াস কিন্তু আসলে দেশ ছেড়ে চলে যাননি। তিনি ওয়েলসের ঘন জঙ্গলে নাম পাল্টে বসবাস করতে লাগলেন। আর প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে—কখন কি করা যায়—তাই ভাবতে লাগলেন।

রাজা সিমবেলিনের দুই ছেলে।—তাঁরা অবশ্য তখন বালকই বটে। বড়টির বয়স তিন, আর ছোটটির বয়স এক। বড় ছেলেটির নাম সিভেরিয়াস আর ছোটো ছেলেটির নাম আরভিসেরাস। ধাইমা ইউরিফাইলের ওপরই রাজার এই দুই ছেলের লালনপালনের ভার ছিল।

কিন্তু বেলারিয়াসও নানা চেষ্টায় ছিলেন। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়—ইউরিফাইলের এক গরীব আত্মীয়ের মাধ্যমে ইউরিফাইলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল। আর বেলারিয়াস কপর্দক শূন্য হ'লেও—তাঁর দু'তিনজন অন্তরঙ্গ ধনী বন্ধু ছিল। তিনি ছদ্মবেশে গোপনে তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতেন এবং বন্ধুরাও তাঁকে গোপনে

প্রয়োজনমতো সাহায্য করতেন। অতএব বেলারিয়াসের সেদিক থেকে টাকা পয়সার কোনো অভাব ছিল না। বন্ধুরার বেলারিয়াসের ওপর রাজার অন্যায় অবিচার সমর্থন করেননি, কিন্তু অন্য দল দলে ভারী ছিল বলে—তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে নীরব দর্শক হয়েছিলেন মাত্র। আর বেলারিয়াসের বিরোধী দলের লোকেরা—তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এক তরফভাবে লাগিয়ে রাজাকে তাঁদের খপ্পরে এনে ফেলেছিলেন।

আগেই বলেছি ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। ইউরিফাইলকে নানা উপঢৌকন ও অর্থ দিয়ে—আরও বহু কিছুর লোভ দেখিয়ে বেলারিয়াস তাঁকে পুরোপুরিই কব্জা করে ফেলেছিলেন।

অবশ্য প্রথমটা ইউরিফাইল ভয় পেয়ে বলেছিল ঃ রাজার দুই ছেলেকে চুরি করে এনে আপনার হাতে তুলে দিলে—পরিণতি কি হবে জানেন? আপনারও মৃত্যুদণ্ড হবে, আমারও মৃত্যুদণ্ড।

বেলারিয়াস হেসে বলল ঃ ধরা পড়লে তো। বরং দুই ছেলোক হাত করে রাজাকে আমি পুরোপুরি কব্জা করে ফেলব।

কিন্তু আমার ভবিষ্যত?

তোমার ভবিষ্যতের জন্যে ভেবো না। আমি তোমাকে বিয়ে করব এবং তুমি হবে ভবিষ্যতের ব্রিটেনের রাণী।

এত সুখ কি আমার সইবে?

সইবে, সইবে—সওয়ালেই সইবে।

প্রলোভনে অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে থাকে। ইউরিফাইল সেই প্রলোভনের ফাঁদে ধরা পড়লেন। রাজার দুই ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ওয়েল্সের জঙ্গলে ইউরিফাইল বেলারিয়াসের সঙ্গে মিলিত হলেন। ছেলে দু'টি অবোধ বালক মাত্র। বেলারিয়াস অবশ্য কথা রেখেছিলেন—তিনি ইউরিফাইলকে বিয়ে করেছিলেন এবং স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ওয়েল্সের পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে রাজার ছেলে দু'টিকে লালন-পালন করতে লাগলেন।

রাজার ছেলে দু'টির নাম পাল্টে নতুন নাম রাখা হোল—বড়টির নাম রাখা হোল পলিডোর আর ছোটটির নাম রাখা হোল কডওয়াল।

রাজা সিম্বেলিন তাঁর হারানো ছেলে দু'টির খোঁজ আনার জন্য চারদিকে লোক পাঠালেন এবং বহু টাকাও পুরস্কার ঘোষণা করলেন, কিন্তু কোনো লাভ হোল না—কোন খোঁজই তাদের পাওয়া গেল না।

রাজা সিম্বেলিন অবশ্য চেষ্টার কসুর করেননি। কিন্তু কোনো ফল হয়নি—বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা সত্বেও—ছেলে দু'টি বা ধাইমার কেউ কোনো খোঁজ আনতে পারেনি। এক সঙ্গে দু'টি রাজপুত্র বেপাত্তা হওয়ায়—রাজা স্বাভাবিকভাবে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

দু'টি ছেলে এভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলে কোন্ পিতারই বা মনস্থির থাকে। রাজা

সিম্‌বেলিনের পক্ষে আক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনো পথই রইল না। ছেলেরা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় এবং তাঁরা বেঁচে না থাকলে—সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও কেউ রইল না। অতএব রাজার পক্ষে চিন্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকলেও—এ নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক ঝামেলা ও ঘরোয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়ে থাকে। দেশে সাময়িকভাবে অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

তবু ভাগ্য ভালো ইতিমধ্যে রাজা সিম্‌বেলিনের একটি কন্যাসন্তান জন্মাল, মেয়েটির নাম রাখা হোল আইমোজেন। আইমোজেনকে জন্ম দিয়েই রাণী মারা গেলেন। এমনি দু'-দুটি পুত্রের শোকে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে পড়েছিল। চিকিৎসকদের পক্ষে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হোল না।

*　　　　　*　　　　　*

সময় এবং স্রোত কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। এভাবেই বহু বছর কেটে গেল। রাজার ছেলে দু'টি অবশ্য বেঁচে থাকলেও তাঁদের ধাই মা ইউরিফাইল ইতিমধ্যেই মারা গেছেন।

রাজপুত্রেরাও আগের মতো আর ছোটোটি নেই। তাঁরা এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক। বেলারিয়াস অবশ্য এখনও বেঁচে আছেন। অবশ্য বেলারিয়াস দীর্ঘদিন ধরেই নতুন নামে পরিচিত। তাঁর নাম হ'লো মর্গান। রাজপুত্রেরা জানে মর্গানই তাদের বাবা।

পাহাড়ে ও জঙ্গলে নানা কষ্টের সম্মুখীন হতে দেখেছে ছেলেরা, অতএব তারা তাঁকে দেবতার মতোই ভক্তি করে থাকে।

বেলারিয়াস ওরফে মর্গান অবশ্য ঘূণাক্ষরেও জানতে দেননি—ওরা রাজপুত্র। তবে তিনি তাঁর সাধ্যমত রাজপুত্রদের যথোপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা সিংহাসন লাভ করলেও—যথোপযুক্ত ভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

আর ওদিকে রাজকন্যা আইমোজেনও এখন সুন্দরী যুবতী। রূপে ও গুণে সে অনন্যাতো বটেই তাছাড়া ধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল। তাছাড়া রাজকীয় মানমর্যাদা ও সৌজন্যবোধও তাঁর মধ্যে বেশ প্রবল। ব্রিটেনের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তো আইমোজেনই। তাঁর দাদারা আর বেঁচে না থাকাই সম্ভব। বেঁচে থাকলে—এ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে তাঁদের খোঁজ পাওয়া যেত—এরূপই রাজা সিম্‌বেলিন ও তাঁর পার্ষদগণের ধারণা।

পুত্রার্থে অথবা অন্য কোন কারণে রাজা সিম্‌বেলিন বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করে বসলেন।

রাজার খেয়াল, কে আর বাধা দেবে? তবু কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন, মেয়েও প্রথমে আপত্তি করেছিল, কিন্তু তাঁদের কারো আপত্তিই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। এক বিধবা মহিলাকে রাজা সিম্‌বেলিন দুম করেই বিয়ে করে বসলেন।

অবশ্য ঐ বিধবা মহিলার আগের পক্ষেও একটি ছেলে রয়েছে—ছেলেটি বয়সে তরুণ,

তাঁর নাম ক্লোটেন।

তাঁকে কেউ রাজার ছেলে না বললেও, সকলে ক্লোটেনকে রাণীমার ছেলে বলেই জানে। ক্লোটেন রাণীমার ছেলে, আর আইমোজেন হোল রাজার মেয়ে।

ক্লোটেনের স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভালো নয়। তাঁর বিবেক বলে কিছু নেই, অসম্ভব লোভীও বটে। তাঁর মা রাণী হওয়াতে তাঁর লোভ আরও শতগুণ বেড়ে গেছে। এমন অন্যায় নেই যা ক্লোটেন করেননি, সব রকম অপরাধজনিত কাজেই সে ইতিমধ্যে হাত পাকিয়েছে। পাপের ভয় বলে তাঁর কিস্যু নেই।

ছেলের হাব-ভাবের পরিচয় পেয়ে নতুন রাণী একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন: এখন থেকে সমঝে-বুঝে চলতে চেষ্টা কর।

কেন? আমি আর কারও পরোয়া করি না। তুমি যখন দেশের রাণী।

সে কথা বললে, রাজার বিষ নজরে পড়লে আমার সব পরিকল্পনাই যে ভেস্তে যাবে।

তোমার আবার নতুন পরিকল্পনা কি? রাজাকে রূপের ফাঁদে ফেলে তুমি তো রাণী বনেছ। এখন আমাকে আমার আখের গুছিয়ে নিতে দাও।

আরে এ পরিকল্পনা নয়, আমার অন্য পরিকল্পনা আছে।

কি পরিকল্পনা শুনি?

তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই অনেক চিন্তা করেই আমি বুড়ো রাজা সিমবেলিনকে বিয়ে করেছি।

কি রকম?

বুড়ো রাজার দুই ছেলেই বেপাত্তা। তাঁরা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই ফিরে আসতো।

তাতে আমার কি হ'লো? সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী তো রাজার মেয়ে আইমোজেন।

আরে সেই জন্যেই তো তোকে এমন করে বলা? আইমোজেন মেয়েও খুব ভালো। তুই যদি বুঝে-সমঝে চলিস, তাহ'লে রাজাকে বলে আইমোজেনের সঙ্গে যদি তোর বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারি, তবে তুই তো ভবিষ্যতে ব্রিটেনের রাজা হ'তে পারবি।

ক্লোটেন উৎফুল্ল হয়ে বলল: তাইতো বটে, আমিতো এদিকটা মোটেও ভেবে দেখিনি।

বটে বুদ্ধি থাকলে তো ভাববি, মা কি কখনও ছেলের পর হয়রে। ছেলের ভালোর জন্য মা সর্বদাই চেষ্টা করে।

রাজা মশায় তো তোমার হাতের মুঠোয়। তুমি ইচ্ছে করলে—এ বিয়েটা অনায়াসে ঘটিয়ে দিতে পারো, মা।

আইমোজেন যদি বেঁকে বসে। অতএব তাঁর সঙ্গেও বেশ মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে।

সে কথা আর বলতে। আমিও আইমোজেনের মন জয় করতে চেষ্টা করব। রাজা, রাজা—আমি তাহলে ভবিষ্যতে ব্রিটেনের রাজা হচ্ছি, আমাকে আর পায় কে?

ক্লোটেন উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, তাঁর মা তাঁকে বললেন ঃ এই চুপ। সবকিছু ভেবে চিন্তে করতে হবে—আমাদের পরিকল্পনার কথা যেন বাইরের কেউ না টেরপায়।

ঠিক আছে মা, এই আমি মুখে কুলুপ এঁটে রইলুম, তুমি জোর চেষ্টা চালিয়ে যাও। বেশি বিলম্ব আমার সইবে না।

নতুন রাণীমা মিষ্টি ব্যবহারে আইমোজেনকে নানা ভাবে তুষ্ট করতে লাগলেন, আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আইমোজেনের কাছে নিজের ছেলে ক্লোটেনের প্রশংসা করতে লাগলেন ঃ এমনিতে দুরন্ত হ'লেও ওর মনটা খুব সরল। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর—আমি তেমন ভাবে ওর দেখা শোনা করতে পারিনি, তাই মাঝে মাঝে কেমন উদ্ধত হয়ে ওঠে বটে—তবে ছেলে হিসেবে খুব ভালো এবং তোমাকে ভালোও বাসে খুব, কিন্তু ভয়ে ভয়ে এই ভালোবাসার কথাটাও তোমাকে বলতে সাহস পায় না।

নতুন রাণী দু'দিক থেকে জবর চেষ্টা করতে লাগলেন। রাজার কাছে আইমোজেনের নামে নানা কথা লাগিয়ে লাগিয়ে মেয়ের প্রতি রাজার মন ক্রমশই বিষিয়ে তুলতে লাগলেন ঃ আইমোজেন বড় জেদী আর অহংকারী। মা হারা মেয়ে—তাই আমি যতো কাছে টানতে চাই, সে আমাকে মোটেই পাত্তা দিতে চায় না। মা বলে স্বীকারই করতে চায় না। অথচ ওকে আমি নিজের মেয়ের মতো দেখি, আমার নিজের মেয়ে থাকলেও তার জন্যে এতটা করতুম না। এখন থেকে সমঝে না চললে—ভবিষ্যতে নিজেই কষ্ট পাবে? রাজার মেয়ে, যে ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারিণী হবে—তাকে কতো শিষ্টাচার জানতে হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? আমাকে মা বলে রাণী বলে পাত্তাই দিতে চায় না একদম। অথচ আমি সব সময় ওর খোঁজ নিই—কখন কি করছে, ঠিক মত খেল কিনা, শরীর খারাপ হো'ল কিনা, ওর।

রাজা মেয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে যখন আইমোজেনকে কড়া ভাষায় বকা-ঝকা করেন তখন কিন্তু নুতন রাণীর অন্য রূপ ঃ "মহারাজ মা-হারা মেয়েকে এমনি করে বকবেন না, ওকে বকলে বুকে আমার ব্যথা লাগে। বেচারা! ওর বয়সেই বা কতো? বড় হয়ে সবকিছু বুঝবে।

রাজা চীৎকার করে বললেন ঃ যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, এর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা হওয়া দরকার—যে মা বা রাণীর সম্মান দিতেপারেনা—তার শিষ্টাচার শেখাসম্পূর্ণ হয়নি।

নতুন রাণী হেসে আইমোজেনকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে চুম্বন করে বলেন ঃ সম্মান করবে না, ও আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে—তবে মা বলে মেনে নিতে একটু সময় লাগবে বৈকি। মহারাজ, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ওকে এতটুকুও বকবেন না, দেখুন না এর মধ্যেই ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। আয় মা, তোর চোখের জল মুছিয়ে দিই।

রাণীর ভেতরে বিষ থাকলেও, ছলা-কলায় অত্যন্ত নিপুণা তিনি—এভাবেই তিনি মুখে মধু মাখিয়ে আইমোজেনর মন জয় করতে চেষ্টা করেন। আইমোজেন তো অতো ছলা-কলা জানেন না, তাই বিমাতার প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা দিন দিনই বেড়ে

ওঠে। আইমোজেন যাতে তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলে, সেই চেষ্টাও চালান নতুন রাণী। মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ তোর মনের কথা আমায় খুলে বল না। দেখি আমি তোর জন্যে কি করতে পারি। আমার ক্লোটেন খুব ভালো ছেলেরে—মাঝে মাঝে তোর কথা বলে। কিন্তু ভীষণ লাজুক তো সব কথা ঠিক আমার কাছে বলে না।

কিন্তু রাণী যতই চেষ্টা করুন না কেন, আইমোজেন মনে মনে সব বুঝতে পেরে নতুন মা আর ক্লোটেনের প্রতি বিরক্ত হল।

ক্লোটেনের স্বভাব-চরিত্র যে ভালো নয়—ইতিমধ্যেই আইমোজেন নানা সূত্র থেকে জানতে পেয়েছে। রাণী শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইলে কি হবে—আসল কথা পরিচারক ও পরিচারিকাদের মাধ্যমেই ফাঁস হয়। ইতিমধ্যেই আইমোজেনের একজন পরিচারিকার প্রতি ক্লোটেন কুনজর দিয়েছিল, ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কেলেঙ্কারিই ঘটত—কিন্তু রাজাকে বলে নতুন রাণী আগেভাগেই পরিচারিকাটির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তবু সবকিছু ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় নি। রাণীও সাফাই গাইতে কসুর করেননি, আইমোজেনকে ডেকে বলেছেন ঃ দেখলেতো এই রাজ-প্রাসাদের পরিচারিকাগুলো কি পাজী, নিজেদের দোষ ঢাকতে—আমার সরল সুবোধ ছেলেটার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়েছে। তবে আমিও বলে রাখি মা, এসব আমি বরদাস্ত করব না। বেয়াদপি আর ছলনা আমার সহ্য হয় না, সব কটাকে আমি শায়েস্তা করে ছাড়ব। তুমি কিন্তু মা, ওদের কথায় কান দিয়ে আমার ক্লোটেনকে ভুল বুঝো না। জানি তুমি বুদ্ধিমতী, এসব বাজে কথায় মোটেও কান দেবে না। তোমাদের দু'টি হাত এক করে দিতে পারলে সব দিক থেকে আমার শান্তি।

ক্লোটেনকে স্বামী রূপে ভাবতেও আইমোজেনের সারা শরীর ঘৃণায় রি রি করে ওঠে, তবু সে চুপ করে থাকে।

রাণী রাজার ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করেন।

রাণী ঃ একটা কথা বলব ?

একটা কেন হাজার কথা বললেও তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে শুনি ?

আমি বলছি—তোমার মেয়ে আইমোজেনের মতি গতি তেমন ভালো না।

কেন কি হয়েছে ?

এ বয়েসটাতে ভালো নয়, রাজার মেয়ে বলে কথা, তাই সময় থাকতে একটা সুব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

তুমি কি বলতে চাও, আমায় খুলে বলো রাণী।

মহারাজ, আপনার বয়েস হয়েছে, প্রত্যেক স্ত্রীই চান, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন সুখে ও নীরোগ অবস্থায় বেঁচে থাকুক, তবু মহারাজ—কখন কি হয়তো বলা যায় না।

কি বলতে চাও, তুমি।

আমার ক্লোটেন খুবই ভালো ছেলে, আমার ছেলে বলেই আমি তার প্রশংসা করছি

না। তাই বলছি সময় থাকতে যদি ক্লোটেনের সঙ্গে আইমোজেনের বিয়ে দেন, তবে সব কুলই রক্ষা হয়। আমারও ভবিষ্যতের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না।

ওরা যদি পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার এ বিয়েতে মোটেও আপত্তি নেই।

রাজার কথা শুনে রাণী বেশ খুশীই হন।

কিন্তু ঘটনা প্রবাহতো কারও ইচ্ছাধীন নয়। উল্টো দিকে ঘুরে যেতেই বা কতক্ষণ ?

রাজা সিমবেলিনের রাজসভায় এক বীর ও সাহসী যুবক বেশ উঁচু পদে ছিলেন। যুবকটির নাম হোল—পোসথুমাস লেওনটাস। এই যুবকটির বাবা ছিলেন রাজা সিমবেলিনের ভূতপূর্ব সেনাপতি।

দীর্ঘদিন আগে এক যুদ্ধে পোসথুমাসের বাবা মারা যান। পোসথুমাসের মার মৃত্যু আগেই হয়েছে। তাই যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি মাতৃহারা শিশুটিকে রাজা সিমবেলিনের আশ্রয়ে রেখে যান।

রাজা সিমবেলিন পিতৃ-মাতৃহারা শিশুটিকে নিজের কাছে রেখে সযত্নে লালন-পালন করতে থাকেন। বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে—ছেলেটি পিতার নানা গুণ ও কর্তব্যবোধের অধিকারী হয়ে ওঠে। পোসথুমাস যেমন বীর, তেমনি মহৎ ও দেশ-প্রেমিক আর দেখতেও সুন্দর।

যেহেতু পোসথুমাস রাজবাড়িতেই ছোটোবেলা থেকে মানুষ তাই রাজকন্যা আইমোজেনের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝেই দেখা সাক্ষাৎ হোত। পোসথুমাস ধীরে ধীরে রাজকন্যা আইমোজেনের প্রতি অনুরক্ত, আইমোজেনও তাঁর ভালোবাসাকে দূরে সরিয়ে দেন নি। অতএব তাঁরা উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত।

ইতিমধ্যে ক্লোটেনরূপী এক ঝড়ের উদয় হলো, সেই ক্লোটেনের পক্ষে আবার রাজা ও রাণী। অতএব আইমোজেন আর পোসথুমাস গোপনেই বিয়ের কাজটা সেরে ফেললেন।

প্রথমে এভাবে বিয়ে করতে আইমোজেন কিছুটা আপত্তি জানিয়ে ছিলেন : জানা-জানি হ'লে কি হবে তাই ভাবছি।

আর বিয়েটা না হ'লে যে তোমার নতুন মা ক্লোটেনের সঙ্গে তোমাব বিয়ে দিয়ে দেবেন, তখন ?

ক্লোটেনের ভয়েই শেষ পর্যন্ত আইমোজেন গোপনে পোসথুমাসকে বিয়ে করতে রাজী হলেন এবং বিয়েটাও গোপনে সংঘটিত হয়ে গেল !

বিয়ের মতো এতো বড়ো একটা ব্যাপারতো আর দীর্ঘদিন চেপে রাখা যায় না, একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

রাণী জানতে পেরে প্রথমে আইমোজেনকে ধিক্কার জানাতে লাগলেন : ছি ! ছি ! গোপনে কিনা তুমি পোসথুমাসকে বিয়ে করলে ! আমার কথা ভাবলে না, তোমার বাবার কথা ভাবলে না, একবার ক্লোটেনের কথাও ভাবলে না— ? ঠিক আছে, আমি

পোসথ্‌মাসকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব। এ বিয়েও আমি ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

রাণীর আশার গুড়ে ছাই পড়ায় তিনি ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: হ'লোতো ব্যাপারটা। আমি আগে ভাগেই এর জন্যে ক্লোটেনের সঙ্গে আইমোজেনের বিয়েটা দিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম। এখন হ'লোতো—

আমায় তুমি কি করতে বলো?

পোসথ্‌মাসের আস্পর্ধা আর ঔদ্ধত্যের কথাই ভাবছি আমি। আপনার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে বেইমানটা আইমোজেনকে ফুসলিসে কিনা গোপনে বিয়ে করে ফেলল। একবার আপনাকে জিগ্যেস করার প্রয়োজনও বোধ করল না। ছি! ছি! আর আপনি তাঁকে কি ক'রে সহ্য করছেন?

রাণী রাজাকে সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত করে তুললেন। রাজা পোসথ্‌মাসকে ডেকে বললেন: তোমার এতোবড়ো সাহস যে, আমার অমতে তুমি গোপনে আইমোজেনকে বিয়ে করেছো। একবার আমাকে জিগ্যেস করার প্রয়োজনবোধ করলে না।

রাণী বললেন: তোমার মুখ দেখাও পাপ।

রাজা উত্তেজিত হয়ে বললেন: শোনো পোসথ্‌মাস, তুমি আগামীকালের মধ্যে আমার রাজ্যের সীমা ত্যাগ করে যাবে, আর যদি না যাও—তোমার গর্দান যাবে।

পোসথ্‌মাস কি যেন বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আগেই রাণী বললেন: আর কোনো কথা নয়, তুমি এক্ষুনি রাজপ্রাসাদ থেকে চলে যাও। আমরা কেউ তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না।

পোসথ্‌মাস দু'চোখ ভরা জল নিয়ে আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করলেন, বিদায়লগ্নে আইমোজেনের হাতে একজোড়া কঙ্কণ দিয়ে বললেন: এই কঙ্কনজোড়া আমার মৃতা মায়ের, এতে আমার মায়ের স্নেহ মাখানো আছে, এটি হারালে আমার বিশেষ অমঙ্গল হবে।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো পেসথ্‌মাস, যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, এই কঙ্কণ আমার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আরও শুনে যাও—তুমি দূরেই থাকো বা কাছেই থাকো—আমি তোমারই আছি, তোমারই থাকব। এ বিয়ে কেউ ভাঙতে পারবে না। একমাত্র মৃত্যুই আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

আইমোজেন তাঁর নিজের হাতের হীরার আংটিটি স্বামীর হাতে পরিয়ে দিয়ে বললেন: এই আমার চিহ্ন তোমার সঙ্গে রইল। এই অংটিটি দেখলে—আর ভাববে —আমি তোমার সঙ্গেই আছি।

দু'চোখ ভরা জল নিয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

আর ক্লোটেন যখন জানতে পারল যে, আইমোজেনের সঙ্গে পোসথ্‌মাসের গোপনে বিয়ে হয়ে গেছে তখন সে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল: আমি দেখে নেব। এতো বড়ো চালাকি! কোথায় ভেবেছিলাম আইমোজেনকে বিয়ে করে ভবিষ্যতে ব্রিটেনের

সিংহাসনে বসব, সে সাধে বাদ পড়ল। তাইতো মা, তোমায় বলেছিলাম—যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করতে। দরকার হ'লে জোর জবরদস্তি করেই করতে হবে। এই যে সব কিছুই হাতের বাইরে চলে গেল।

রাণী বললেন : এখনও সব কিছুই হাতের বাইরে চলে যায়নি। স্বয়ং রাজামশায় আমার হাতের মুঠোয়। আমি ভাবছি রাজার মৃত্যুর পরে তোকে কি করে ব্রিটেনের সিংহাসনে বসানো যায়।

তুমি আর আমায় সিংহাসনে বসিয়েছ! সিংহাসনে বসবে আইমোজেন আর পোসথুমাস। আমার ভাগ্যে সেই ফক্কা।

না-রে না। রাজামশাই অইমোজেনের এই বিয়েতে মোটেই সন্তুষ্ট হননি। আমি তাঁর মনকে পোসথুমাসের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছি। পোসথুমাসকে আগামী-কালই এই রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে—রাজামশায়ের নির্দেশে। এবার আমি ভাবছি কি করে তোকে সিংহাসনে বসানো যায়।

কি করে বসাবে? আইমোজেনের যে বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের আগেই যদি বুদ্ধি করে পোসথুমাসকে তাড়াতে পারত, তবে আর এখন এই ঝামেলায় পড়তে হতো না।

এখনও উপায় আছে, আমি ভেবেচিন্তে একটা উপায়ও ঠিক করে রেখেছি।

উপায়টা কি শুনি?

আইমোজেনও পোসথুমাসের এই গোপন বিয়ে আইমোজেনকে অস্বীকার করতে হবে এবং তোকে বিয়ে করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজামশাই আর আমি আইমোজেনের ওপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করব।

কিন্তু আইমোজেন যদি ও'র গোপন বিয়েটা কিছুতেই অস্বীকার করতে না চায় তখন কি করবে?

তখন আইমোজেনকে বিষ খাইয়ে গোপনে হত্যা করতে হবে। সিধে আঙুলে ঘি উঠলো ভালোই না উঠলে ওকে মারতে হবে। আমি ঐ শয়তানী মেয়েটাকে ছেড়ে দেব না।

বিষ পাবে কোথায়?

বিষ যোগাড় করতে আমার পক্ষে কোনো অসুবিধেই হবে না।

তারপর নতুন রাণী আইমোজেন যাতে তাঁর গোপন বিয়েটা অস্বীকার করে সে ব্যাপারে রাজা যাতে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করেন, তার জন্য তাকে নানাভাবে উত্তেজিত করতে লাগলেন। পোসথুমাসের প্রতি রাজার মন আগেই বিষিয়ে তুলেছিলেন।

রাণীর চাপে পড়ে রাজা মনে মনে চেয়েছিলেন আইমোজেনের সঙ্গে ক্লোটেনের বিয়ে হোক।

রাণীর পরামর্শে রাজা মেয়েকে ডেকে বলল : আমি চাই পোসথুমাসের সঙ্গে যে গোপন বিয়েটা হয়েছে—সেটা তোমাকে অস্বীকার করতে হবে।

এ আপনি কি বলছেন, বাবা ?

ঠিকই বলছি, তোমার নতুন মা'র তাই ইচ্ছে।

ও বিয়েটা আমি অস্বীকার করতে পারব না। আর পারলেও করব না।

এই তোমার শেষ কথা ?

তা শেষ কথা বলেই ধরে নিতে পারো বাবা।

রাণী বললেন : অবুঝ হয়ো না, এ বিয়ে অস্বীকার না করলে—তোমার ভবিষ্যৎ কি হবে একবার ভেবে দেখেছো ? পোসথুমাস এ রাজ্য থেকে চির নির্বাসিত হয়েছে—তার পক্ষে এ রাজ্যে কখনই ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

আইমোজেন বিরক্ত হয়ে বললে : তবুও আমি বিয়ে কিছুতেই অস্বীকার করব না। পোসথুমাসকেই আমি ভালোবাসি।

রাণী বললেন : তা'হলে তুমি আমাদের পরামর্শ কিছুতেই নেবে না ?

না—না।

আইমোজেন তাঁর গোপন বিয়েটা ভাঙতে চায়নি বলে, ক্লোটেন আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে তার মা'কে বলল : ঐ হারামজাদী মেয়েটাকে আমি চাবকে সিধে করব। রাজী হবে না মানে, রাজী তাকে হ'তেই হবে।

রাণী বললেন : এভাবে আইমোজেনের ওপর জোর-জবরদস্তি করলে ব্যাপারটা জানাজানি হলে, কাজ তো হবেই না, বরং এ নিয়ে বিরাট ঝামেলা হবে। তার থেকে তুই বরং মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা করে ওর মন গলাতে চেষ্টা কর। পোসথুমাসতো এ রাজ্যে আর ফিরতেই পারছে না, দীর্ঘ অদর্শনে পোসথুমাসের প্রতি আইমোজেনের ভালোবাসা উবে যাবে। ওর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার কর—যাতে তোর প্রতি ওর মন ক্রমশ আকৃষ্ট হয়, সেই চেষ্টা কর।

যদিও ন্যাকাপনা আমার মোটেও ভালো লাগে না। তবু তুমি যখন বলছ—একবার চেষ্টা করে দেখি।

হ্যাঁ, বাবা তাই কর। মেলামেশা করতে করতে দেখবি, পোসথুমাসের কথা ও একদম ভুলে গেছে। তখন তোকে স্বামী বলে মেনে নিতে ওর আর কোনো আপত্তি থাকবে না।

* * *

পোসথুমাস রাজার হুকুমে ব্রিটেন থেকে বিতাড়িত হয়ে—তাঁর বাবার এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে রোমে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। ওর বাবার রোমান বন্ধুটি ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক এবং ধনী। পোসথুমাসের পিতৃপরিচয় পেয়ে তিনি বললেন : তোমার বাবা আমার পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুমি আমার বাড়িকে নিজের বাড়ি বলেই মনে করবে, যতদিন খুশি এখানে থাকবে। তাছাড়া রোম সম্রাটের অধীনে তোমার একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করব।

অতএব পোসথুমাস রোমে এসে বেশ সুখেই সময় কাটাতে লাগল। আর অভিজাত

শ্রেণীর তরুণ যুবকেরাও পোসথুমাসের ব্যবহারে ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভালবেসে ফেলল। তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। তারা সকলেই অভিজাত শ্রেণীর এবং ধনী।

একদিন বন্ধু-বান্ধবদের বৈঠকে নারীর ভালবাসা নিয়ে আলোচনা চলছিল।

পোসথুমাসের এক তরুণ বন্ধু, নাম তার আয়াকিমো, সে আলোচনা প্রসঙ্গে বলল: ফুঃ, নারীর প্রেম? ইচ্ছে করলে আমি বিবাহিতা-অবিবাহিতা যে-কোনো নারীর সঙ্গেই অনায়াসে প্রেম করতে পারি।

একজন জিগ্যেস করল: কোনো রাজকন্যার সঙ্গেও প্রেম করতে পারবি?

নিশ্চয়ই। শুধু রাজকন্যা কেন, বললাম তো যে-কোনো মেয়েকেই আমি আমার প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পারি। এ ব্যাপারে আমি যে কোনো বাজী ধরতেও রাজী আছি।

বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই জানতো যে, পোসথুমাসের স্ত্রী আইমোজেন ব্রিটেনের রাজকন্যা।

এই ব্যাপার? এতো আমার বায়ে হাতকা খেল্। আমি ব্রিটেনে গিয়ে রাজকন্য আইমোজেনের সঙ্গে প্রেম করব, আর প্রমাণ নিয়ে এসে পোসথুমাসকেও দেখাব।

পোসথুমাস বলল: আমার স্ত্রীর ব্যাপারে—তুমি কিন্তু ব্যর্থ হবে, বন্ধু।

বাজী।

কতো?

বন্ধু-বান্ধবেরা বলল: এক হাজার সোনার মোহর।

আমি রাজী।

আয়াকিমো ছিল বুদ্ধিমান, স্ফূর্তিবাজ আর ছটফটে ধরনের। কিন্তু আইমোজেনের ওপর পোসথুমাসের অগাধ বিশ্বাস, আয়াকিমো কিছুতেই তাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পারবে না।

আয়াকিমোর কিন্তু যে কথা, সেই কাজ। পরদিনই সে ব্রিটেনে রওনা হয়ে গেল এবং ব্রিটেনে পেঁাছে সে রাজা সিমবেলিনের সঙ্গেও দেখা করল। ব্রিটেনের রাজা তখন রোমে নিয়মিত রাজকর পাঠাতেন এবং অভিজাত শ্রেণীর রোমানদের ব্রিটেনের রাজা বা প্রজা সকলেই সেই সমসাময়িককালে বিশেষ সমাদর করতেন। তখনকার দিনে রাজার জাত বলতে রোমানদেরই বোঝায়, কারণ ইউরোপের অনেক দেশই ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন।

আয়াকিমো কিন্তু বলল না, সে পোসথুমাসের বিশেষ বন্ধু। সে রাজপ্রাসাদে অতিথিরূপে বসবাস করতে লাগল।

কেবলমাত্র আইমোজেনের বিশেষ সহানুভূতি উদ্রেক করার জন্য কেবল তাঁকে গোপনে বলল: আমি পোসথুমাসের বিশেষ বন্ধু। আপনার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে পোসথুমাস আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

আইমোজেন বলল: সে ভালো আছে তো?

খুবই ভালো আছে, তবে আপনার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত বলেই তাঁর দুঃখ।

তবে আইমোজেনের সঙ্গে দু'চারদিন কথা বলেই আয়াকিমো বুঝতে পারল এ মেয়ে সে মেয়ে নয়। এক পটানো আয়াকিমোর কর্ম নয়, তখন ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করল—রোমে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মুখ দেখাতে হ'লে—যে-কোনো ভাবে বাজী তাকে জিততে হবেই। নইলে তাঁর সকল অহংকার ধুলোয় লুটিয়ে যাবে।

আর আইমোজেন এমন এক আদর্শবতী নারী যে, তাঁকে পটানো কোনো পর-পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বাজী জিততে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো উপায়ও নেই। রোমে ফিরে গিয়ে সে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে উপহাসাস্পদ হ'তে পারবে না। অতএব—

বেশ কয়েকদিন ভেবেচিন্তে আয়াকিমো একটি নতুন উপায় বের করে ফেলল, যাতে সে সহজেই আইমোজেনকে ফাঁদে ফেলে কার্যোদ্ধার করতে পারে।

তাই আয়াকিমো রোমে ফিরে যাওয়ার কয়েক দিন আগে আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে বলল ঃ আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয়, আমি একটা বিরাট বাক্স আপনার শয়নকক্ষে এক রাতের জন্য গচ্ছিত রাখতে চাই।

ওতে কি আছে ?

বেশ কিছু অমূল্য ধন-সম্পদ আছে, এখানকার কেউ তা জানুক তা আমি চাই না, কেবলমাত্র নিরাপত্তার খাতিরেই বাক্সটা এক রাতের জন্য আপনার শয়ন কক্ষে গচ্ছিত রাখতে চাই মাত্র।

আয়াকিমো একে স্বামীর বন্ধু, তাছাড়া তাঁর প্রস্তাব বা অনুরোধ রাখা এমন কিছু ঝামেলার নয়।

তাই আইমোজেন এক কথায় আয়াকিমোর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল, আর আয়াকিমো যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেল।

যথাসময়ে লোকেরা বয়ে নিয়ে এল এক বিরাট বাক্স এবং সেই বিরাট বাক্সটা রাজকন্যা আইমোজেনের শয়নকক্ষে রেখে গেল।

গভীর রাতে আইমোজেন যখন তাঁর শয্যায় গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন চুপে চুপে ঐ বাক্সের ডালা খুলে বাক্স থেকে বেরিয়ে এল—স্বয়ং আয়াকিমো। কোন শব্দ হ'লো না। চুপি চুপি বাইরে বেরিয়ে এসে সে আইমোজেনের শোবার ঘরটি ভালো-ভাবে পরখ করল—কোথায় কি আছে দেখে নিল। কি ধরনের আসবাব রয়েছে ঘরে, দরজা বা জানলার পর্দার রং-ই বা কেমন, খাটখানা দেখতে কেমন—ইত্যাদি ইত্যাদি সে ভালোভাবে দেখে নিল—যাতে রোমে ফিরে গিয়ে সে পোসথুমাসের কাছে ভালোভাবেই আইমোজেনের শয়নকক্ষে পুরো বিবরণ সহজেই দিতে পারে।

তারপর সে ভাবল, শুধু এতেই হবে না, বিশেষ কোনো প্রমাণ নিয়ে যাওয়া দরকার—যা দেখে পোসথুমাস ভয়ানকভাবে চমকে উঠবে।

হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল ঘুমন্ত আইমোজেনের হাতের কঙ্কণ জোড়ার দিকে।

আয়াকিমো পোসথ্‌মাসের কাছে শ্‌নেছিল যে, ঐ কঙ্কণজোড়া পোসথ্‌মাসেরই মায়ের স্মারক চিহ্ন। অতএব এর থেকে আর ভালো প্রমাণ কি হ'তে পারে ?

অতএব ধীরপদে সে আইমোজেনের শয্যার পাশে এগিয়ে গেল। আইমোজেন তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন—স্‌যোগ ব্‌ঝে ধীরে ধীরে আয়াকিমো তাঁর হাতের কঙ্কণ জোড়া খ্‌লে নিল। হাতে অনেক চুড়ি ছিল, সেগ্‌লো নিলে হয়তো বা আইমোজেন টের পেয়ে যেত। আর কঙ্কণজোড়া ছিল এমনিতেই বেশ ঢিলেঢালা। অতএব কঙ্কণজোড়া খ্‌লে নিতে আয়াকিমোর বেশি বেগ পেতে হলো না। তাছাড়া আইমোজেন মোটে টেরও পেল না।

আয়াকিমো আবার ধীরে ধীরে বাক্সের ভেতরে ঢুকে চুপচাপ বসে রইল। আর সকালবেলা আয়াকিমোর চাকররা যথারীতি আইমোজেনের শয়নকক্ষ থেকে বাক্সটি নিয়ে চলে গেল।

তারপর একটু বেলায় আয়াকিমো আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলল ঃ রাতের বেলা বাক্সটি আপনার শয়নকক্ষে রাখতে দিয়ে আমার বিশেষ উপকার করেছেন। ব্রিটেন থেকেই আমি একবাক্স বহ্‌ম্‌ল্য রত্নাদি ক্রয় করেছি—ঐ গ্‌লির ঐতিহাসিক ম্‌ল্যও অনেক। আপনার শয়নকক্ষে কাল রাতে ছিল বলেই—আমি সারারাত ঘ্‌ম্‌তে পেরেছি।

আইমোজেন হেসে বলল ঃ সামান্য এটুকু কাজকে আপনি বিশেষ উপকার বলেই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ? এটুকু যে কেউ আপনার জন্য করত।

আয়াকিমো বিদায় নিয়ে চলে গেল। আইমোজেন টেরও পেল না—স্বামীর ঐ বন্ধ্‌টি তাঁর কত বড়ো এক সর্বনাশ করে গেল। কার্যোদ্ধার করে আয়াকিমো রোমে ফিরে গেল। আর বন্ধ্‌-বান্ধব তখন পোসথ্‌মাসের সামনে গর্ব ভরে বলল ঃ যে কোনো মেয়েকে যে কোনো সময় আমি আমার প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পারি। আসলে কোনো মেয়েই সতী নয়।

বন্ধ্‌-বান্ধবেরা বলল ঃ আমরা গালগল্প শ্‌নতে চাইনে, প্রমাণ চাই।

আয়াকিমো বলল ঃ আমি প্রমাণ ছাড়া এত বড়ো বড়ো কথাই বা বলব কেন। আমি একেবারে জবর প্রমাণই সঙ্গে নিয়ে এসেছি এবং পোসথ্‌মাস আমার কাছে বাজীতে হেরে ভূত হয়ে গেছে।

পোসথ্‌মাস তব্‌ দৃঢ় স্বরে বলল ঃ অসম্ভব। আমি তোমার কোনো কথাই বিশ্বাস করি না, আমার স্ত্রী আইমোজেন সেই ধরনের মেয়েই নয়।

আয়াকিমো ঠাট্টা করে বলল ঃ শাল্‌ক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। মেয়েদের আমি যতটা ব্‌ঝি বা চিনি—আর কোনো প্‌র্‌ষের পক্ষেই তাঁদের অতোটা বোঝা বা চেনা সম্ভব নয়।

বন্ধ্‌রা চেঁচিয়ে বলল। অতো গাল-গল্প শ্‌নতে চাই না, আমার প্রমাণ চাই।

আয়াকিমো তখন প্রথমেই আইমোজেনের শয়নকক্ষের প্‌র্ণ বিবরণ দিল, সেই

বিবরণ শুনে পোসথুমাস হতভম্ব হয়ে গেল। তাঁর বুকে যেন শেলের আঘাত দ্বার প্রতিমুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

তারপর আয়াকিমো একজোড়া কঙ্কণ বের করে পোসথুমাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: দেখোতো বন্ধু এই কঙ্কণজোড়া চিনতে পারো কিনা? এই কঙ্কণজোড়াই তো তোমার মায়ের স্মারক চিহ্ন—যা তুমি কিনা আইমোজেনকে নিজ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলে—এর থেকে আর ভালো প্রমাণ কি দেব?

কঙ্কণজোড়া দেখে পোসথুমাস একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। এতবড়ো আঘাত সে পাবে বলে কখনও কল্পনাও করতে পারে নি। আইমোজেনকে সে আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছিল, সেই আইমোজেনের কাছ থেকে সে এরূপ মর্মান্তিক আঘাত পাবে কোনো দিনই ভাবতে পারে নি। এই আঘাত তাঁর জীবনবোধকেই পুরোপুরি পাল্টে দিল।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল পোসথুমাসের মাথায়। আয়াকিমোর সব বিবরণই পুরোপুরি সত্যি। কোনো কথাই মিথ্যে নয়—আইমোজেনের শয়নকক্ষের আসবাবপত্র, জানালা দরজার কাপড়ের রং, খাটের ধরণ—সব কি রকম—সব কিছুর বর্ণনাই আয়াকিমো একেবারে হুবহু দিয়েছেন। তারপর এ কঙ্কণজোড়া।

অতএব বিশ্বাসঘাতিনী আইমোজেনকে চরম শাস্তি পেতেই হবে। আর সে শাস্তি সে-নিজেই দেবে।

*　　　*　　　*

অপর দিকে রোমের ঘরোয়া বিবাদ মিটে যাওয়ার ফলে—জুলিয়াস সীজারের ভাগ্নে অগস্টাস রোমের সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন এবং তিনি সিংহাসনে বসেই অধিকৃত দেশসমূহে রোমের শাসন পাকাপাকিভাবে কায়েম করতে বদ্ধ পরিকর হলেন।

তিনি জানতে পারলেন যে, ব্রিটেন দীর্ঘদিন ধরে রাজকর দিচ্ছে না, তাই অগস্টাস গলদেশের রোমান সেনাপতি কাইয়াস লুসিয়াসকে রাজদূত হিসাবে ব্রিটেনে পাঠালেন। লুসিয়াস রোম থেকে ব্রিটেনে এলে—রাজা সিমবেলিন তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করলেন।

লুসিয়াস বললেন: আপনি যদি রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত না হতে চান—তবে আপনাকে অবশ্যই নিয়মিত রাজকর দিতে হবে।

রাজা সিমবেলিন বললেন: ঠিক আছে, শুধু একদিন ভাববার সময় দিন।

ঠিক আছে।

রাতের বেলা রাজা সিমবেলিন রাণী ও ক্লোটেনের সঙ্গে রোমকে রাজকর দেওয়ার ব্যাপারে পরমার্শ করতে বসলেন।

রাণী বললেন: আগে আমরা রাজকর দিতাম, তখন রোম সাম্রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সীজারের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ছে তাই আমরা রাজকর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। অগস্টাস সিংহাসনে বসলেও শক্তিশালী

হয়েছে তেমন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি—অতএব রোমকে রাজকর দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

ক্লোটেন বলল : আমার মনে হয় রোমকে রাজকর দেওয়ার কোনো মানে হয় না, আর এত ধনসম্পদ আমরা রোমকে রাজকর হিসেবে কেনই বা দেব ?

রাজা বললেন : ঠিক কথা। আগামীকাল আমি লুসিয়াসকে বলব—ব্রিটেন রোমকে কোনো রাজকর দেবে না।

অতএব পরদিন রাজদরবারে লুসিয়াস উপস্থিত হ'তেই ব্রিটেনে রাজা সিমবেলিন বললেন : আমি দুঃখিত। সম্রাট অগস্টাসকে বলবেন—ব্রিটেন রোমকে কোনো রাজকর দিতে প্রস্তুত নয়।

লুসিয়াস বললেন : তবে আর কি। আমি বর্তমানে গলদেশে (বর্তমানের ফরাসীদেশে) ফিরে যাচ্ছি। তবে যাওয়ার আগে আপনাকে বিনা সংকোচে বলে যাচ্ছি যে—অচিরেই যুদ্ধের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকুন। রোম সম্রাট অগস্টাস আপনার ঔদ্ধত্যের উচিত শিক্ষা যুদ্ধের মাধ্যমেই দেবেন।

রাজা চুপ করে রইলেন, রাজার হয়ে ক্লোটেন বলল : আমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েই রয়েছি। মহামান্য অগস্টাসকে বলবেন—ব্রিটেন যুদ্ধ করতে ভয় পায় না।

অতএব লুসিয়াস গলদেশে ফিরে গেলেন ?

* * *

ঠিক ঐ সময়ে রোম থেকে ব্রিটেনে একটি চিঠি পাঠালেন পোসথুমাস তাঁর ভৃত্য পিসানিওর উদ্দেশ্যে। পিসানিও পোসথুমসের খাস ভৃত্য ছিল, বর্তমানে সে রাজবাড়িতেই পরিচারকের কাজ করে। এবং রাজবাড়ি থেকে মাইনে, আবার পোসথুমাসের কাছ থেকেও গোপনে মাইনে পেয়ে থাকে। পিসানিও কিন্তু পোসথুমাসকেই নিজের মনিব বলেই ভাবে।

পিসানিও তো পোসথুমাসের চিঠি পেয়ে অবাক, চিঠিতে তার মনিব পোসথুমাস লিখেছে :

প্রিয় পিসানিও,

আমার এতদিনের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত রূপে জানতে পেরেছি আইমোজেন সতী নয়। কেবলমাত্র আমার প্রতিই সে অনুরক্ত নয়। তাঁর জঘন্য আচরণের দ্বারা সে আমাকে এমন নিদারুণ আঘাত দিয়েছে—যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। অতএব তাঁর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এ চিঠির সঙ্গে আইমোজেনের উদ্দেশ্যও একটি আলাদা চিঠি দেওয়া হলো। সেই চিঠিতে তাকে ওয়েলসের জঙ্গলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। সেই চিঠি তাঁকে দিলেই—সে তোমার সঙ্গে ওয়েলসের জঙ্গলে চলে আসবে। আমি সত্যি সত্যিই ওয়েলসের জঙ্গলে যাচ্ছি। আইমোজেন যাতে ওয়েলসের জঙ্গলে আসে—সেই কারণেই তাঁকে চিঠি দেওয়া হ'লো। তুমি আইমোজেনকে ওয়েলসের জঙ্গলে নিয়ে আসবে—জঙ্গলে

এসে অত্যন্ত গোপনে তাঁকে হত্যা করবে। এটি আমার নির্দেশ বা একান্ত অনুরোধ।

ঐ চিঠির সঙ্গে ছোটো এক টুকরো আলাদা চিঠিও পাওয়া গেল, ঐ চিঠিটি আইমোজেনের উদ্দেশ্যে লেখা পোসথুমাসের চিঠি ঃ

সুচরিতাষু,

তোমার অদর্শন আমার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমি আর এই নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করতে পারছি না। ওয়েল্‌সের কাছে মিলফোর্ডে আমি তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে রইলাম। তুমি অবশ্যই এসে আমার সঙ্গে দেখা করো—অবশ্য অবশ্য। পিসানিও তোমাকে ওখানে নিয়ে আসবে। প্রীতি নিও।

ইতি

হতভাগ্য

পোসথুমাস

মনিব পোসথুমাসের চিঠি পেয়ে পিসানিওর মনে বিশেষ আলোড়ন উঠল।

এক কথা! আইমোজেন সতী-সাধ্বী নয়। তা'ও কি কখনও হতে পারে? মনিব দেশান্তরিত হওয়ার পর পিসানিও সব সময়ই বলতে গেলে আইমোজেনকে নজরে নজরে রেখেছে—কিন্তু একদিনের জন্যেও বেচাল কিছু তাঁর নজরে পড়েনি।

তিনি রাজা ও রাণীর চাপের কাছেও নতি স্বীকার করেন নি। ইচ্ছে করলে সে'তো ক্লোটেনকে বিয়ে করে—বেশ সুখী হতে পারত। কারণ পিসানিও জানে ক্লোটেন শত চেষ্টা করেও তাঁর নাগাল পায় নি। তিনি কি করে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হলেন —বরং পোসথুমাস দূরে চলে যাওয়ার পর তাঁর ভালোবাসা আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। আর রোমে বসে তাঁর মনিব জানলেনই বা কি করে? পিসানিও এখান থেকে জানতে পারলেও রোমে বসে থেকে তাঁর মনিবের পক্ষে একথা কি জানা সম্ভব? নিশ্চয়ই মনিবের কোথায়ও কোনো ভুল হয়েছে। কেউ রোমে গিয়ে হয়তো বা আইমোজেনের নামে যা তা লাগিয়েছে। লোকটি ক্লোটেনেরও কোনো দূত হতে পারে। মনিব হয়তো জানেননা, যে, লোকটি ক্লোটেনের লোক। অথবা যে ভদ্রলোক রোম থেকে এখানে এসেছিলেন—ক্লোটেনের বন্ধুবান্ধব বা রাণী তাঁর কাছে হয়তো বা আইমো-জেনের নামে যা তা লাগিয়েছে। আর লোকটিও যে সব কথা বিশ্বাস করে রোমে ফিরে গিয়ে মনিবের কাছে সব কথা লাগিয়েছে। ফলে তাঁর মনিব রাগে অন্ধ হয়ে আইমোজেনকে হত্যা করার জন্য তাঁকে হুকুম দিয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এমনটি হয়েছে।

তবু মনিব যখন তাঁকে হুকুম দিয়েছেন, তখন তাঁকে যাহোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। যাতে হুকুমও তামিল হয়, অথচ আইমোজেনও যেন না মারা যায়। অর্থাৎ সাপও মরবে—অথচ লাঠি মোটেই ভাঙবে না। এদিকে রাণী একান্তে তাঁর ছেলে ক্লোটেনকে ডেকে জিগ্যেস করলেন ঃ বেশ কিছুদিন তো আইমোজনের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখলি, কোনো লাভ হ'লো?

ও মেয়ে, মহা ধড়ীবাজ, ওকে সহজে পটানো যাবে না। ভাঙে তো মচকায় না।

তুমি বরং ওকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলারই চেষ্টা করো, এক সঙ্গে সব ল্যাটা চুকে যাবে—।

সে ব্যবস্থা করেছি, ডাঃ কর্ণোওয়ালিস এলেই তাঁর কাছ থেকে তীব্র বিষ যোগাড়ের চেষ্টা করব।

দয়া করে আর দেরী করো না, যা করার তাড়াতাড়ি করো—আর আমার তর সইছে না।

রাণী নিজের শরীরের অসুখের অজুহাতে ডাক্তার কর্ণোওয়ালিসকে ডেকে পাঠালেন। রাণীর তলব পেয়ে ডাক্তার কর্ণোওয়ালিস সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এলেন, রাণীমা বলে কথা, আর ডাক্তার হ'লো রাজবাড়ির মাইনে করা, অতএব তলব পেয়ে তাঁকে ছুটে যেতেই হবে।

ডাক্তার এসে জিগ্যেস করলেন : আবার কি হ'লো রাণীমা ?

শরীরটা কদিন থেকেই কিরকম ম্যাজ ম্যাজ করছে, কোনো কিছুই ভালো লাগছে না।

ডাক্তার রাণীকে পরীক্ষা করে বললেন : বাইরে থেকে দেখেতো কিছু রোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

ঐ তো আপনাদের দোষ, বাইরে থেকে কিছু না দেখতে পেলেই ভাবেন যে, ভেতরে কোনো রোগ নেই।

অতএব ডাক্তার রাণীকে পরীক্ষা করে—কটা বড়ি খেতে দিলেন।

রাণী বললেন : ডাক্তারবাবু আমার একটা উপকার করতে পারেন ?

বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি ?

আমাকে কিছু তীব্র বিষ দিতে পারেন ?

বিষ নিয়ে কি করবেন রাণীমা ?

আমার প্রিয় কুকুরটা, ভয়ানক ক্ষেপে গেছে, যদিও ওটাকে আটকে রাখা হয়েছে, তবুও কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছে না। তবে বিষটা মারাত্মক হওয়া চাই, যাতে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে সামান্য একটু খাওয়ালেই সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়।

ঠিক আছে। আপনার চাকরকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তাঁর হাতে বিষের পুরিয়াটা পাঠিয়ে দেব।

ডাক্তার কর্ণোওয়ালিশ ফিরে গেলেন, রাণীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাস ঝিকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যেন শুভ কাজে আর তর সয় না।

ডাক্তার কর্ণোওয়ালিস কিন্তু রাণীকে ঠিক বিশ্বাস করেন না, রাণীর হাবভাবও তাঁর মোটেও ভালো লাগে না। তবে তিনি রাজবাড়ির মাইনে করা ডাক্তার, রাণীর হুকুম তাঁকে তামিল করতেই হবে। এ ব্যাপারে তিনি নিরুপায়। তবু তাঁর বার বার মনে হলো—রাণী কোনো অসৎ উদ্দেশ্যেই বিষ সংগ্রহ করেছেন।

অতএব তিনি পুরিয়াতে বিষ দিলেন ঠিকই, তবে তা কোনো মারাত্মক বিষ নয়—ঐ

বিষ কোন মানুষ বা কুকুরকে খাওয়ালে বড়জোর সাত/আট ঘণ্টা সেই মানুষ বা কুকুর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। আর যদি রাণীর উদ্দেশ্য কুকুর মারাই হয়ে থাকে—তবে পরে না হয় তীব্র বিষ দেওয়া হবে—

ধরা পড়ে গেলে রাণীকে বলবেন : নেহাৎ ভুল করেই তীব্র বিষের বদলে—সাধারণ বিষ দিয়ে ফেলেছেন। আর যদি কোনো মানুষকে হত্যা করাই রাণীমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে ঐ বিষ খাওয়ানোর ৬/৭ ঘণ্টার মধ্যেই একটা বিরাট হই-চই পড়ে যাবে—অবশ্য যাকে খাওয়ানো হবে, সে মোটেই মারা যাবে না।

এই ডাক্তার কর্ণোওয়ালিস তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করলেন। রাণীর খাস ঝি'র হাতে ঐ বিষের পুরিয়াটা তিনি তুলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন : রাণীমাকে বলো, তিনি এটা যেন খুব সাবধানে রাখেন।

খাস ঝি বিষের পুরিয়াটা যখন রাণীমার হাতে দিল, তখন ওঘরে ক্লোটেনও ছিল। রাণী খাস ঝি'কে ইচ্ছে করেই বাইরে চলে যেতে বললেন।

কারণ তখন মা ও ছেলের মধ্যে গোপন আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

ক্লোটেন : ওটা কি এনে দিল।

রাণী : তীব্র বিষ, খাবারের সঙ্গে সামান্য মিশিয়ে খাওয়ালেই আর দেখতে হবে না, একেবারে শেষ।

তাই নাকি। তবে আমাকে দাও, রাজবাড়ির হেড পাচকের সঙ্গে আমি ভাব জমিয়ে ফেলেছি, আমি বললে আইমোজেনের খাবারের সঙ্গে লোকটা বিষ মিশিয়ে দেবে ঠিকই।

না। তোর দেওয়া ঠিক হবে না। যদি বিষ খেয়ে আইমোজেন মারা যায়—তখন হেড পাচককে নিয়ে টানাটানি হবেই আর তখন যদি লোকটা তোর নাম বলে দেয়—তখন একুলও যাবে, ওকুলও যাবে। তার চেয়ে আমি অন্যের হাত দিয়ে এমনভাবে কাজ উদ্ধার করব যাতে আইমোজেনও মারা যাবে—অথচ আমরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকব। মারা গেলে আমরা কেঁদে-কেটে বুক ভাসিয়ে দেব।

এমন সময় রাণীমার খাস চাকরাণী এসে বলল : রাণীমা আপনি কি কারণে যেন পিসানিও'র খোঁজ করেছিলেন, পিসানিও দেখছি এদিকেই আসছে—আমি ওকে ডাকব কি?

হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়—আমার বিশেষ দরকার।

অতএব রাণীমার খাস চাকরানী পিসানিওকে একেবারে পাকড়াও করে নিয়ে এল। রাণীমা জানতেন—পোসথুমাসের চাকর ছিল বলেও পিসানিও আইমোজেনের বিশেষ আস্থাভাজন।

পিসানিও বলল : রাণীমা, হঠাৎ আমায় জরুরী তলব করছেন কেন?

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, অবশ্য দরকারটা সরাসরি যদিও তোমার সঙ্গে নয়!

তবে!

আইমোজেনের সঙ্গে। কিন্তু মেয়েটা যেন কেমন হয়ে গেছে। আর আমার কাছে আসেও না, আমার সঙ্গে কথাও বলে না। অথচ মেয়েটার জন্য—আমার যে কত দুঃখ্যু ও কি করে বুঝবে। এদিকে পোসথুমাসকে বিয়ে করায় ওর বাবা ভয়ানক চটে গেছেন ওর ওপর। আমার বারণ সত্ত্বেও রাজামশায় তোমার আগেকার মনিব পোসথুমাসকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েটার দুঃখ্যু আমি বুঝি, কিন্তু কি করব বলো? রাণী হ'লেও আমার হাত-পা বাঁধা, আমার এককভাবে কিছু করার ক্ষমতা নেই, পিসানিও।

আমায় কি করতে হবে বলুন?

শুনেছি, মেয়েটার নাকি ক'দিন থেকে শরীর খারাপ যাচ্ছে আমায় কেউ কোনো খবরও দেয় না। এটা একটা ওষুধের পুরিয়া। তেমন শরীর খারাপ লাগলে এই ওষুধটা আইমোজেনকে খেতে বলো। এতে ওর শরীরের কষ্ট অনেকটা কমে যাবে। আর তাছাড়া ভালো ঘুমও হবে।

ঠিক আছে, আমি ঠিক দিয়ে দেব। একেই বলে মায়ের মন, বিমাতা হ'লেও মা-তো বটে।

বাইরের লোকেরা বোঝে বটে, কিন্তু আমার মেয়ে বোঝে কই? এই ওষুধটা ডাক্তার কর্ণোওয়ালিস আমায় দিয়েছিলেন, এখন মেয়ের রাতে ঘুম হচ্ছে না, শরীরটাও খারাপ। তাই তোমার হাত দিয়ে মেয়েকে পাঠালাম। মনে করে তাকে খেতে বলো, আমার কথা নাই বা বললে। তবু আমি চাই ও নীরোগ এবং সুস্থ থাকুক।

ঠিক আছে রাণীমা, আমি ওষুধ ওনাকে দিয়ে খেতেও বলব।

অতঃপর বিষের পুরিয়াটি নিয়ে পিসানিও চলে গেল। রাণী জানালা দিয়ে দেখলেন পিসানিও সত্যি সত্যি রাজকন্যা আইমোজেনের মহলের দিকেই যাচ্ছে।

পিসানিও দূরে চলে যেতেই, ক্লোটেন হাতে তালি দিয়ে বলল: সত্যিই তোমার জবাব নেই, মা-জননী।

কি রকম?

তুমি রাণী না হ'লেও অনায়াসে পাকা অভিনেত্রী হতে পারতে। বেচারা পিসানিও জানতেও পারল না—কি জিনিস নিয়ে সে রাজকন্যা আইমোজেনের মহলে ঢুকছে।

আর রাজকন্যাও খাওয়ার আগে জানতে পারবে কি জিনিস সে খেল, আর খাওয়ার পর, তার কিছু বালর মতো অবস্থা থাকবে না।

রাজকন্যার মৃত্যু হ'লে—তা নিয়ে যদি বিরাট হই-চই পড়ে যায় তখন?

আমাদের কি? পিসানিও নিজেই ফেঁসে যাবে।

কিন্তু পিসানিও যদি তোমার কথা বলে দেয়, তখন?

বলে দিলেই হলো, কে আর পিসানিওর কথা বিশ্বাস করবে? আমি জোর গলায় বলব—আমি পিসানিওকে কিছু দিই নি'তো।

সত্যি মা, তোমার জবাব নেই।

তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে জেনে—মা ও ছেলে দু'জনেই খুব খুশী হলো। আইমোজেন মারা গেলে—সিংহাসনের আর উত্তরাধিকারী কেউ রইল না। রাজা বুড়ো হয়েছেন, আইমোজেন মারা গেলে, তিনি শোক পেয়ে আরও বেশি কাবু হয়ে পড়বেন। তখন ক্লোটেনই ব্রিটেনের সিংহাসনে পাকা হয়ে বসতে পারবে—আর কোনো ঝুট ঝামেলাই থাকবে না।

কিন্তু মা ও ছেলে কেউ জানতে পারল না যে, পিসানিও তাঁর মনিবের চিঠি পেয়েই রাজকন্যা আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, রাণীমার নির্দেশে ওষুধের পুরিয়াটি দিতে নয়।

পিসানিও আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে পোসথুমাসের লেখা চিঠিখানি চুপে চুপে তার হাতে তুলে দিল।

চিঠি পেয়ে এবং চিঠির বক্তব্য পাঠ করে আইমোজেনতো আনন্দে আত্মহারা। পোসথুমাস দীর্ঘদিন ধরে রোমের বাসিন্দা। এতোদিন বাদে সে আসছে—দীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের লগ্ন আসন্ন—আইমোজেনতো আনন্দে আত্মহারা হবেই। বাঁধ-ভাঙা নদীর মতোই তাঁর অবস্থা। বাঁধ-ভাঙা নদী যেমন উত্তাল তরঙ্গ তুলে সাগরের দিকে ধাবিত হয়—আইমোজেনেরও তখন সেই অবস্থা।

আইমোজেন চুপে চুপে পিসানিওকে বলল: পিসানিও, তুমি মাঝরাতে এসো আজ, আমি চুপি চুপি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ব। রক্ষীরা কেউ টের পাবে না। আমি এমনভাবে যাব—রক্ষীরা ভাববে রাজবাড়ির কোনো পরিচারিকা বুঝি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছে।

ঠিক আছে, আমি যথাসময়েই যথাস্থানে হাজির থাকব, ম্যাডাম।

পিসানিও কিন্তু তার নিজের কাজের তাগাদায় রাণীমার দেওয়া সেই পুরিয়াটা আইমোজেনের হাতে দিতে ভুলে গেল।

গভীর রাতে আইমোজেন মিলফোর্ডের উদ্দেশ্যে পিসানিওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, রাজবাড়ির কেউ কিছু জানতে পারল না। স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দে আইমোজেন বলতে গেলে খুশী হয়েই পথ চলতে লাগল।

তারপর তাঁরা দুজনে মিলফোর্ডের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু গভীর বনে ঢোকার পর পিসানিওর হাবভাব কেমন যেন বদলে গেল। সে আর কোনো কথা বলছে না, চুপচাপ মাথা নীচু করে চলেছে সে।

পিসানিওর হাবভাব লক্ষ্য করতে আইমোজেন বলল: কি ব্যাপার পিসানিও? তুমি হঠাৎ এমন চুপচাপ যে। তোমার মতো স্ফূর্তিবাজ লোকের এমন চুপচাপ থাকা শোভা পায় না। কি ব্যাপার আমাকে খুলে বলো পিসানিও। আমি কিছু মনে করব না।

পিসানিও তখন তার উদ্দেশ্যে লেখা পোসথুমাসের চিঠিখানি রাজকন্যার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: এই চিঠিখানি পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমার মন এতে বিষণ্ণ

কেন? আমি এতো চুপচাপ কেন?

ঐ চিঠিখানাতেই পোসথুমাস পিসানিওকে লিখেছিলেন: আইমোজেনকে ওয়েল্‌সের জঙ্গলে এনে হত্যা করার জন্য। কারণ আইমোজেন চরিত্রহীনা, ব্যভিচারিণী তথা বিশ্বাসঘাতিনী।

স্বামীর চিঠিখানি পড়ে আইমোজেনের পায়ের নীচের মাটি যেন কেঁপে উঠল। হায়, কি কপাল—যিনি সর্বদাই স্বামীর জন্যে আকুল। স্বামীর দীর্ঘ বিরহ কত না কষ্ট করে সহ্য করছেন, কোনো প্রলোভনের ফাঁদে পা দেননি—ক্লোটেন বহু চেষ্টা করেও তাঁকে একচুলও নাড়াতে পারেনি। সারা রাত যার কাঁদতে কাঁদতে মাথার বালিশ ভিজে যায়, সেই স্বামী বিরোহিণী সতী আইমোজেন কিনা তাঁর স্বামীর চোখে—অসতী, ব্যভিচারিণী। একথা যে কল্পনাও করা যায় না। কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আইমোজেন অস্থির হয়ে পিসানিওকে বললেন: স্বামীই যখন আমাকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে করেছেন, তখন আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? কোন্ মুখেই বা আমি আমার রাজবাড়িতে ফিরে যাব? আর তাছাড়া এখন আমার বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছেও নেই। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। পিসানিও তুমি তোমার মনিবের হুকুম পালন করো। আমায় হত্যা করো।

রাজকন্যার দুচোখ জলে ভরে এল, পিসানিও সেদিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বলল: রাজকুমারী—আমি বুঝতে পারছি এ চিঠি পড়ে আপনার মনের কি অবস্থা হতে পারে। আমার মনে হয় আমার মনিব কোথায়ও সাংঘাতিক একটা ভুল করেছেন। রোম থেকে আয়াকিমো নামে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন—আমার মনে হয় ঐ লোকটিই কারো পরামর্শে রোমে ফিরে গিয়ে আপনার নামে সাংঘাতিক কোনো বদনাম দিয়েছে।

কিন্তু পিসানিও আমি তো ঐ লোকটির সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করিনি—বরং স্বামীর বন্ধু জেনে—যতটা সম্ভব ভালো ব্যবহারই করেছি।

আপনি যতই মিষ্টি ব্যবহার করুন না কেন? মন্দ লোকের স্বভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বার বার ধুলেও অঙ্গার কালোই থাকে। আমার মনে হয় ঐ লোকটি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। আপনার ও আমার মনিবের জীবন বিষময় করে তোলার জন্যই—তাঁর এই অপচেষ্টা। হয় সে কারো পরামর্শে এই জঘন্য কাজ করেছে, নয়তো বা ইচ্ছাকৃতভাবেই আপনার এই ক্ষতি করেছে। দুষ্টলোক সর্বদাই দুষ্ট। তাদের স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। দুধ দিয়ে কালসাপ পুষে দেখুন—সুযোগ পেলে সে আপনাকেই দংশন করবে।

এ অবস্থায়, তুমি আমায় কি করতে বলো, পিসানিও?

আমি বলি আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করে সব দিক বিচার-বিবেচনা করা সংগত। ঐ লোকটা আমার মনিবের মন আপাততঃ বিষিয়ে দিয়েছে বটে—কিন্তু প্রকৃত সত্য একদিন প্রকাশ হবেই রাজকুমারী। আপনি যদি পুরুষের বেশ ধারণ করে মিলফোর্ড

থেকে জাহাজে করে রোমে চলে যান—তা'হলে আপনি ছদ্মবেশে স্বামীর অজান্তেই তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারবেন। তাছাড়া তাঁর হাবভাব দেখে—তাঁর মানসিক অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত হতে পারবেন। তাঁর মন কে, কিভাবে বিষিয়ে দিয়েছে—তা জানাও আপনার পক্ষে মোটেও অসম্ভব হবে না।

পিসানিও পরামর্শ রাজকন্যা আইমোজেনের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল। সে বলল : মিলফোর্ড থেকে জাহাজে করে যদি রোমেই যাই—আমায় তো ছদ্মবেশ ধারণ করতে হ'লে পুরুষের পোষাক পরতে হবে। তা পুরুষের পোষাক আমি এখন কোথায় পাবো ?

পিসানিও তাঁর সঙ্গের পুটলিটা, খুলল, তাতে পুরুষের পোষাক, আয়না, গাম পরচুলা—ছদ্মবেশ ধারণের সবকিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, তাই পিসানিও ঐগুলো রাজকন্যাকে দিয়ে বলল : আপনার এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে ভেবে—আমি সঙ্গে করেই এনেছিলাম। আপনি ঝোপের আড়ালে গিয়ে পোষাক পাল্টে নিন—বাদবাকি মেকাপের কাজ আমি ঠিক করে দেব। আপনাকে বাইয়ের কেউ মেয়ে বলে ধারণাই করতে পারবে না একদম।

অতএব রাজকন্যা ঝোপের আড়ালে গিয়ে পোষাক পাল্টে নিলেন। বাদবাকি মেকাপের কাজ পিসানিও শেষ করে রাজকন্যাকে বলল : এবার আপনি নিজেই আয়নায় মুখ দেখুন, আর পেষোকের দিকে তাকান—আপনার নিজেরই মনে হবে না আপনি মেয়ে।

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এবং পিসানিওর কথা শুনে অতি দুঃখের মধ্যেও আইমোজেন হেসে ফেললেন।

পিসানিও বলল : আপনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা রয়েছেই। এই বনটা পেরিয়ে বাঁ দিকে যাবেন। বাঁ দিকে কিছুটা গেলেই মিলফোর্ড। ওখানকার জাহাজঘাটায় গেলে আজ বিকালে বা কাল সকালেই রোমগামীজাহাজ পাবেন—তারযে কোনো একটা জাহাজে উঠে পড়বেন। অতএব সহজেই আপনি রোম যেতে পারছেন। ওখানে গিয়ে একটা ভালো সরাইখানায় উঠে আমার মনিবের নজর রাখবেন এবং তাঁর ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করবেন। পরম করুণাময় ঈশ্বর আপনার প্রতি সদয়হবেনই। আমার জন্যে কিস্যু ভাববেন না—আমি ব্রিটেন ফিরে গিয়ে যা-হোক গুলতাপ্পি দেব।

তোমায় আমি কোনোদিন, ভুলব না পিসানিও।

রাজকন্যা মিলফোর্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে পিসানিও তাঁর হাতে সেই পুরিয়াটা দিয়ে বললেন : পথে যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবে এই ওষুধটা খেয়ে নেবেন এতে গা ম্যাজ ম্যাজ ভাবটা চলে যাবে, শরীরও ঠিক থাকবে, আর ঘুমও ভালো হবে।

বিদায়, পিসানিও।

রাজকন্যা আইমেজেন মিলফোর্ডের দিকে রওনা হলেন, আর পিসানিও রওনা হলো রাজবাড়ির দিকে।

পুরুষবেশী আইমোজেন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। নিবিড় জঙ্গল—জঙ্গল পথে পথে চিনে এগিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। তবু অনুমান করে আইমোজেন বন পথ দিয়ে এগিয়ে চলল—মনে তাঁর আশা। একবার রোমে যেতে পারলে—স্বামীর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে এবং দেখা হওয়ার পরই সবকিছু বোঝাপড়া হবে।

আইমোজেন কিন্তু বনপথে চলতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললেন।

পথ যেন আর শেষ হয় না, শুধু বন আর বন। কোথায় মিলফোর্ড? কোথারই বা পথের শেষ। সঙ্গে আইমোজেন যে সামান্য খাবার ও পানীয় এনেছিলেন তা কখন শেষ হয়ে গেছে। জঙ্গল পথে লোকজনের দেখা মিলছে না, কাকে লিমফোর্ড যাওয়ার পথের হদিশ জিগ্যেস করবেন।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পুরুষবেশী রাজকন্যা আইমোজেন বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথায় বা খাবার? কোথায়ই বা পানীয়? চিরকাল আরামে-বিলাসে মানুষ হয়েছেন রাজকন্যা। পথ চলতে তাঁর তো কষ্ট হবেই—সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রবল ক্ষুধা আর তৃষ্ণা।

বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ায় তিনি পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা দেখতে পেলেন রাজকন্যা আইমোজেন ঐ গুহাটা দেখে ভাবলেন, ওখানে যদি মানুষজন থাকে ভালোই বাঘ-ভালুক থাকলেও ক্ষতি নেই—যা কষ্ট হচ্ছে, এর থেকে প্রাণ যাওয়াও ভালো।

তিনি সাহসে ভর করে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়লেন, আর গুহার ভেতরে ঢুকে সবকিছু দেখে শুনে অবাক হয়ে গেলেন। গুহাতে বর্তমানে কোনো মানুষজন না থাকলেও এ গুহাতে মানুষ থাকে। রান্না খাবার রয়েছে, তাছাড়া পানীয়জলের ব্যবস্থাও রয়েছে। শোয়ার জন্য খড়ের গাদার ওপরে বেশ ভালো বিছানাও রয়েছে। পুরুষবেশী আইমোজেন অনেক ডেকেও কারো সাড়া পেলেন না। এদিকে তিনি ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অধীর হয়ে পড়েছেন। অতএব নিজেই নিয়ে পেট পুরে খাবার খেলেন, পানীয় জলও খেলেন। ভাগ্যিস এ গুহাটায় এসেছিলেন—নইলে যে কি হোত—কিছু বলা যায় না।

খেয়ে-দেয়ে পুরুষবেশী আইমোজেন তৃপ্ত হয়ে ভাবলেন, যাকগে গুহার মালিক এলে তাঁর কাছে বিনীত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ পর গুহাবাসীরা ফিরে এলেন, একজন বৃদ্ধ লোক আর তার সঙ্গে দু'জন যুবা পুরুষ। আইমোজেনকে দেখে, তাঁরা জিজ্ঞেস করল: আপনি।

আইমোজেন নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বলল: আমার নাম ফাইডেল। মিলফোর্ড থেকে জাহাজে চড়ে রোম যাব ভাবলুম, কিন্তু বনের পথে—আসল পথই হারিয়ে ফেললুম।

একজন যুবা বলল: আপনি বনপথে ভুল করে—মিলফোর্ড থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছেন। অবিশ্যি বনপথে পথের হদিশ ঠিক রাখা অনেকের পক্ষে মুসকিল। আমরা দীর্ঘদিন বনে বাস করছি বলেই আমাদের এখানকার সব পথ চেনা।

পুরুষবেশী আইমোজেন লজ্জিত হয়ে বলিল: জানেন, আমি একটা সংঘাতিক অন্যায় করে ফেলেছি।

কি রকম ?

পথ চলতে চলতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড়ই কাতর হয়ে পড়ি। তারপর আপনাদের এই গুহাটি দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি।

তারপর ?

চোখের সামনে খাবার দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি, ক্ষিধের জ্বালায় আপনাদের অনেক খাবার খেয়ে ফেলেছি। অবশ্য আপনারা রেগে যাবেন না, খাবারের জন্য আমি যথাযোগ্য দাম দিতে রাজী আছি।

আইমোজেনের কথা শুনে একটি যুবক হেসে উঠে বুড়ো লোকটিকে বলল: শোনো বাবা, ভদ্রলোকের কথা! উনি খাবার খেয়ে এখন দাম দিতে চাইছেন।

পুরুষবেশী আইমোজেন ওরফে ফাইডেলকে ওদের তিনজনেরই খুব ভালো লেগেছে, মুখখানা কি সুন্দর, যেন স্বর্গীয় সুষমা মাখানো, তাই বুড়ো লোকটি বলল: তোমাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তোমাকে খাবারের কোনো দামই দিতে হবে না, তুমি যত ইচ্ছে খাবার খাও না, যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকো না কেন। আমরা বন থেকে যে হরিণ মেরে আনি, আমরা বনকে কি হরিণের দাম দিই—অতএব দামের কথা তুলো না।

পুরুষবেশী আইমোজেন বলল: আপনাদেরও আমার খুব ভালো লেগেছে —পথশ্রমে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

তা তো তোমায় দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

তাই ভাবছি, এখানে দু-তিন দিন বিশ্রাম নেবো, তারপর আপনাদের কেউ মিলফোর্ডের পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেই আমি চলে যাব।

বুড়ো লোকটি বলল: দু-তিন দিন কেন—তুমি আরও কিছুদিন এখানে থাকো, তারপর আমার ছেলেরা তোমাকে একেবারে মিলফোর্ডের জাহাজঘাটা পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে আসবে।

যুবক দুটিকে পুরুষবেশী আইমোজেনের খুবই ভালো লাগলো, আর যুবক দু'টিরও আইমোজেনকে খুবই ভালো লাগল। পরস্পর তাঁরা যেন কিসের একটা আন্তরিক টান অনুভব করতে লাগল। অবশ্য এরূপ টান অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক। রক্তের টান সহসা তো অস্বীকার করা যায় না। না জানলেও মনে মনে সেই টান অনুভব করা যায়।

ঐ যুবক দু'টি হ'লো সিডেরিয়াস ও আরভিরেসাস, রাজা সিম্বেলিনের হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলে, অর্থাৎ আইমোজেনের আপন সহোদর ভাই। আর আইমোজেন হ'লো ওদেরই সহোদর বোন। অতএব ওরা কেউ কারও প্রকৃত পরিচয় না জানলেও —চুম্বকের মতো একটা টানতো বোধ করবেই।

আর ঐ বুড়ো ভদ্রলোক হ'লেন—অতীতের সেই বিখ্যাত যোদ্ধা এবং সেনাপতি, যিনি রাজা সিম্বেলিন কর্তৃক বিনাদোষে বিতাড়িত হয়েছিলেন। অবশ্য উনি আর এখন বেলেরিয়াস বলে পরিচিত নয়, এ অঞ্চলের সবার কাছেই অর্থাৎ শিকারী মর্গান বলেই

পরিচিত।

রাজার ছেলেরা কিন্তু শিকারী মর্গানকেই তাঁদের বাবা বলেই জানে এবং মর্গানকে তাঁরা ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধাও করে যথেষ্ট। আর মর্গানও ছেলে দু'টিকে আন্তরিক-ভাবে ভালবেসে ফেলেছেন।

রাজা সিমবেলিনের প্রতি তাঁর রাগ যথেষ্টই, কিন্তু রাজার ছেলে হয়েও যুবক দু'টি শিকারী মর্গানকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। বেলোরিয়াসের আপনজন বলতে কেউ নেই—এখন ছেলে দু'টিই তাঁর দু'চোখের মণি।

পরদিন সকালে ওরা তিনজন আবার শিকারে বেরিয়ে পড়ল। আইমোজেনের শরীর ভালো লাগছিল না বলে সে আর কোথাও গেল না। আইমোজেনের পথশ্রমের ক্লান্তি তো ছিলই, সেই সঙ্গে হাত পাও টন্ টন্ করছিল। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল—পিসানিও তো এক পুরিয়া ওষুধ দিয়েছে, আর শরীর খারাপ হ'লে খেতেও বলেছে। ওষুধটা খেলে নাকি—হাত-পার টনটনানি চলে যাবে তাছাড়া ঘুমটাও ভালো হবে—অতএব সেই পুরিয়ার ওষুধটা খেয়ে ফেলল।

আসলে এটাতো কোনো ওষুধ নয়। মারাত্মক না হ'লেও বিষ তো বটেই। আর ওটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইমোজেন অচেতন হয়ে পড়ল। তাঁর দেহে মৃত্যুর চিহ্ন-গুলিও প্রকট হয়ে উঠল।

সিডেরিয়া ও আরভিরেসাস শিকার শেষে গুহায় ফিরে এসে দেখল আইমোজেনের দেহে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই। আইমোজেন মারা গেছে—দু'ভাই খুব কান্নাকাটি করল।

একজন আর একজনকে বলল : অতিথিকে এভাবে ফেলে রেখে তাঁদের দুজনেরই এভাবে শিকারে যাওয়া ঠিক হয়নি।

ছোটো ভাইটি বলল : ওকে নিশ্চয়ই সাপে কেটেছে, নইলে এভাবেই বা মারা যাবে কেন? কি সুন্দর ব্যবহার। কি সুন্দর মিষ্টি কথা। হায়! হায়!

দুই

অন্যদিকে আইমোজেন পালিয়ে গেছে—শুনে ক্লোটেন একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ছুটে এসে রাণীকে বলল : নাও, হয়ে গেল। ওদিকে যে পাখি পালিয়ে গেছে।

কে পালিয়েছে?

রাজকন্যা আইমোজেন পালিয়ে গেছে, অতএব সে বেঁচে থাকতে আর আমার রাজা হওয়া হচ্ছে না। আর আমি চুপচাপ থাকব না—এবার সাংঘাতিক খেলা খেলব।

কিন্তু পিসানিও কি ওকে বিষ দেয়নি?

বোধহয় না, ব্যাটাই সম্ভবতঃ চক্রান্ত করে আইমোজেনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ওকে আমি লোক দিয়ে আমার মহলে বেঁধে আনাচ্ছি—চাবুক মারলেই ওর পেট থেকে সব কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। না বলে ও রেহাই পাবে না কিছুতেই। অ্যাদ্দিনে বুঝতে পারছি সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, এবার আমিই আমার পথ বেছে নেব।

যা করিস একটু ভেবেচিন্তে করিস ক্লোটেন।

অতএব ক্লোটেনের লোকেরা পিসানিওকে একরকম বেঁধেই ক্লোটেনের ঘরে হাজির করল। চোখ লাল করে ক্লোটেন পিসানিকে জিগ্যেস করল, আর সে হাতের চাবুক দোলাতে লাগল ঃ বল শয়তান, আইমোজেন কোথায়? ঠিক ঠিক উত্তর দিবি—বাজে কথা বললে চাবুকে একদম সিধে করব।

পিসানিও জানত যে তাঁকে এরূপ বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে, এখন আর সত্যি কথা বললেও দোষ নাই—কারণ আইমোজেন এতক্ষণ জাহাজে এবং সেই জাহাজ এতক্ষণে রোমের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে।

তাই পিসানিও বলল ঃ রাজকন্যা আইমোজেন মিলফোর্ডে গেছেন।

কেন গেছেন?

ওর স্বামী পোসথুমাসের ওখানে আসার কথা, রাজকন্যা তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।

রাজকন্যা জানলেন কি করে যে তাঁর স্বামী ওখানে আসছেন?

পিসানিও রাজকন্যার উদ্দেশ্যে পোসথুমাসের লেখা চিঠিখানি ক্লোটেনকে দিয়ে বলল ঃ এইচিঠির মাধ্যমে।

কে তাঁকে ওখানে পৌঁছে দিয়েছে?

আমি।

কেন?

আমার মনিবের যে ঐ রকমই নির্দেশ ছিল, হুজুর।

পিসানিওর কথা শুনে ক্লোটেন উল্লেসিত হয়ে বলল ঃ যাক্‌গে, ঐ দুটোকে এক সঙ্গে ওখানেই খতম করব। দেখি আমার সিংহাসনে বসা কে আটকায়। তারপর এসে তোর ব্যবস্থা করব।

এমন সময়ে স্বয়ং রাণী এলেন ক্লোটেনের ঘরে, তিনি পিসানিওকে জিগ্যেস করলেন ঃ আমার দেওয়া পুরিয়াটি কি করেছিস?

ধর্মের দোহাই, রাণীমা! ঐ পুরিয়াটা আমি সত্যিসত্যিই রাজকন্যাকে দিয়েছি, আর বলেছি শরীর খারাপ করলে পুরিয়ার ওষুধটা খেয়ে নিতে।

সেকথা শুনে ক্লোটেন হেসে বলল ঃ থাক্‌গে তুই একটা ভালো কাজ করেছিস—এর জন্য ফিরে এসে তোকে ক্ষমা করলেও করতে পারি, তবে রাজামশায় তোকে ক্ষমা করবেন

কিনা সন্দেহ !

কেন হুজুর ?

ওতে তীব্র বিষ আছে—ঐ পুরিয়ার ওষুধ খেয়ে রাজকন্যা আইমোজেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। আমায় আর কষ্ট করে তাঁকে মারতে হবে না।

ক্লোটেনের কথা শুনে পিসানিওর মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। এত করেও বুঝি বা শেষ রক্ষা করা গেল না। রাজকন্যা ঐ ওষুধ খেলে—রোমে পৌঁছানোর আগেই মারা যাবেন।

রাণীমা পিসানিও বললেন ঃ রাজকন্যা মারা গেলেও ব্যাপারটা ফাঁস করিসনে পিসানিও। আমার কিছু হবে না—কিন্তু তোরই গর্দানটি যাবে।

পিসানিও এতক্ষণে বুঝতে পারল—এই নতুন রাণীমা কি ধাতুতে গড়া।

ক্লোটেন চালাকি করে পোসথুমাসের একটা পোষাক পরে নিল, যাতে আইমোজেন তাঁকে পোসথুমাস বলে ভুল করে। পিসানিওকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করে ক্লোটেন তারপর দুরন্তগতিতে ঘোড়াছুটিয়ে দিলওয়েসের জঙ্গলের দিকে। কিন্তু ওয়েল্‌সের জঙ্গল বা মিলফোর্ডে সে পোসথুমাস বাইমোজেনের দেখা পেল না।

বরং জঙ্গলের পথে যেতে যেতে সেই গুহার কাছাকাছি সিডেরিয়াস আর আরভিসাসের সঙ্গে ক্লোটেনের দেখা হলো। ক্লোটেন চিরদিনই অহংকারী, অভদ্র আর উদ্ধত প্রকৃতির। কথাবার্তা ভালো নয়, ব্যবহারও ভালো নয়।

বেলোরিয়সও সিডেরিয়াস ও আরভিসাসের সঙ্গে ছিলেন ?

ক্লোটেন তাদের দেখতে পেয়ে বললঃ এই উল্লুকের বাচ্চাগুলি শোন্।

সিডেরিয়াস রেগে বলল ঃ ভদ্রভাবে কথা বল্—বেটা জানোয়ার। নইলে তোর থোতা মুখ আরও ভোঁতা করে দেব।

সেকথা শুনে ক্লোটেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল। আমি কে জানিস ?

কোথাকার হনুরে ?

আমি হচ্ছি বিটেনের রাজা সিম্‌বেলিনের নতুন রাণীর ছেলে, বুঝলি ? আমি যাকে ইচ্ছে তাঁকে উল্লুক, বাঁদর—যা খুশী তাই বলতে পারি !

কথাটা শুনে বেলোরিয়াস প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেন। তবে কি তাঁকে ধরার জন্যেই এই ছেলেটা এক গদা সৈন্য নিয়ে এখানে এসেছে। কিন্তু তিনি পাহাড়ে উঠে দেখলেন —পেছনে কোনো সৈন্য নেই। অভদ্র ছেলেটা একাই এসেছে।

সিডেরিয়াস বেলেরিয়াসের দিকে চেয়ে বলল ঃ এই বাঁদরটার কি করি বাবা ?

বেলোরিয়াস বলবেন ঃ এটা নেহাৎই বাঁদর। এটাকে নিয়ে তোরা যা খুশী তাই করতে পারিস।

সেকথা শুনে ক্লোটেন ঘোড়া থেকে নেমে বেলোরিয়াসকে হত্যা করতে এগুলো অবশ্য তাঁকে আর এগুতে হলো না, সিডেরিয়াস ক্লোটেনের মাথা কেটে ফেলল। আর মাথাটি কেটে—বহু দূরের নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এদিকে ঘরে এক অতিথি মরে পড়ে রয়েছে, তারপর বাইরের এক উটকো ব্যাপার দু'ভাই বেলেরিয়াসকে নিয়ে দূরে গেল—যদি অতিথির কোনো উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করা যায়—তা দেখার জন্য।

রাণী তীব্র বিষ ভেবে পিসানিওকে যা দিয়েছিলেন তা আসলে কোনো মারাত্মক বিষ নয়—সাত আট ঘণ্টা পরে আইমোজেন তাঁর চেতনা ফিরে পেল। তার শরীর বেশ ভালোই লাগছে, তাছাড়া ঘুমটাবেশ ভালোই হয়েছে। গুহায় সে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল—একটি মুণ্ডুহীন মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। একী পরণে যে তাঁর—পোসথুমাসের পোষাক। আইমোজেনের নিশ্চিন্ত ধারণা হলো—তাঁর স্বামী পোসথুমাসই তাঁর খোঁজে এখানে এসেছিলেন—কোনো গুপ্ত শত্রু সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা করেছেন। কাউকে যে জিগ্যেস করবেন, এমন কেউ ধারে কাছে নেই। গুহার সেই ছেলে দু'টি বা তাঁদের বুড়ো বাপেরই বা কি হোল? পুরুষ-বেশী আইমোজেন সেই মুণ্ডুহীন দেহ আঁকড়ে ধরে উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে লাগল। দূর থেকে তাঁর করুণ আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল।

দূর থেকেই সেই আর্তকান্না শুনতে পেলেন রোমান সেনাপতি লুসিয়াস, তিনি বহুসৈন্য নিয়ে ব্রিটেন আক্রমণ করতে চলেছেন। পথে তিনি ভাবলেন, একদিন তাঁবু ফেলে সেখানে অবস্থান করবেন, তারপর অতর্কিতে ব্রিটেন আক্রমণ করবেন।

এমন সময় পুরুষবেশী আইমোজেনের আর্তকান্না শুনে তিনি সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, রোমান সৈন্যগণও যথারীতি তাঁকে অনুসরণ করল। আর ওদিকে বেলেরিয়াস, সিডেরিয়াস ও আরভিরেসাস তাঁদের গুহার দিকে যাচ্ছিল—কিন্তু উঁচু টিলা থেকে তারা দেখল—তাঁদের গুহার দিকেই সৈন্যদল ছুটে যাচ্ছে।

অতদূর থেকে বেলেরিয়াস বুঝতে পারলেন না, ওরা রোমান সৈনা বা ব্রিটেনের সেনা। বেলেরিয়াস ভাবলেন ও ব্রিটেনেরই সেনা। হয়তো বা তাঁকে ধরার জন্যেই এসেছে। তাই তিনি যুবক দু'টিকে বললেন: ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না, আজ আমরা আর কেউ গুহায় ফিরব না, দরকার হ'লে দু'টো রাত আমরা অন্য কোথাও কাটাব।

সিডেরিয়াস জিগ্যেস করল: কেন বাবা?

—দেখছ না, তোমরা রাণীর ছেলেকে হত্যা করেছ বলে, ব্রিটেনের সৈন্যরা আমাদের গুহায় ঢোকার মুখ ঘিরে রয়েছে। অতএব আমরা দূরের গুহায় গিয়ে বাস করব।

আরভিরেসাস বলল: সেই ভালো দাদা, এতগুলো সৈন্যের সঙ্গে তো আর সামনা-সামনি যুদ্ধ করে পারব না পরে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে।

লুসিয়াস গুহার কাছে এসে দেখলেন—একটি যুবক মুণ্ডহীন এক যুবকের মৃতদেহ ধরে হাউ মাউ করে কাঁদছে।

লুসিয়াস পুরুষবেশী আইমোজেনকে জিগ্যেস করলেন: তুমি কে? আর

এভাবে কাঁদছ কেন ? আর এই মৃতদেহটিই বা কার ?

আইমোজেন তখন কিছুটা নিজেকে সামলে নিয়েছেন, তিনি ভাবলেন রোমান সেনাপতির কথায় সত্য বলা ঠিক হবে না, পরে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে। আর প্রিয়তম স্বামীই যখন মারা গেছেন, তখন আর লুকোচুরির কিছু রইল না, বরং পিতার কাছেই ফিরে যাওয়া উত্তম। আর রোমান সেনাপতির কাছে নিজের বা পিতার পরিচয় দেওয়া উচিত হবে না।

পুরুষবেশী আইমোজেন সেনাপতি লুসিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে বলল ঃ আমার নাম ফাইডেল।

আর ইনি ?

ইনি আমার মনিব, ডাকাতরা আমার মনিবের গলা কেটে ফেলে গেছে হুজুর, তাই দুঃখে আমি কাঁদছি।

মনিবের প্রতি ফাইডেল ওরফে আইমোজেনের ভক্তি দেখে সেনাপতি লুসিয়াস খুবই অবাক হয়ে গেলেন। মনিব মারা গেলে চাকরেরা সচরাচর বলে ঃ যাক্‌গে, আপদ চুকেছে, অন্ততঃ কয়েকদিন শান্তিতে থাকা যাবে। এর বেলা দেখছি—ব্যাপরটা একেবারে উলটো। মনিবের শোকে আর্ত চিৎকার করে কাঁদছে সেই কখন থেকে। যদি চাকর রাখতে হয় তবে এমন প্রভুভক্ত চাকর রাখাই উচিত—যে চাকর অন্ততঃ প্রভুর জন্য কেঁদে বুক ভাসাবে।

তাই লুসিয়াস ফাইডেল ওরফে আইমোজেনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ যে গেছে —তাঁর জন্যে আর কেঁদে লাভ কি ? তবে তোমার প্রভুভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি আমার পরিচারক হিসাবে কাজ করতে পারো।

আইমোজেন মনে মনে ভাবলেন তাঁর স্বামী, যার জন্যে এত কষ্ট করা, তিনি তো মারা গেছেন। আর পোসথুমাসেরই গুপ্তশত্রুরা নিশ্চয়ই সির্ভোরিয়াস, তাঁর ভাই ও বাবাকে হত্যা করেছে। নইলে ওরা তিনজন অনেকক্ষণ আগেই ফিরে আসত। আমি আর এই গভীর বনে থেকেই বা কি করব ? পথও চিনি না যে ব্রিটেনে একা একা ফিরে যাব। অতএব রোমান সেনাপতি লুসিয়াসের পরিচারক হয়ে তার সঙ্গে থাকাই বরং আপাততঃ নিরাপদ। আর পুরুষের পোষাক পরে থাকায় লোকে পুরুষ বলে ভাবলেও—সেতো আর আসলে পুরুষ নয়।

তাই আইমোজেন ওরফে ফাইডেল রোম সেনাপতি লুসিয়াসকে বলল ঃ হুজুর আপনার পরিচারক হ'তে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ভূতপূর্ব মনিবের এই মৃতদেহ যদি সৎকার করা অর্থাৎ কবরের ব্যবস্থা করে দেন তবে খুবই ভালো হয়—আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ফাইডেল ওরফে আইমোজেনের কথা শুনে লুসিয়াস অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন, তিনি বললেন ঃ তোমার মনিব মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর মৃতদেহের প্রতি তোমার কি অসামান্য শ্রদ্ধা—একথা আমি কখনও ভুলব না, ফাইডেল।

অতএব লুসিয়াসের সৈন্যেরাই ক্লোটেনের শবদেহ—কবরস্থ করল। আইমোজেন অবশ্য জানত না ওটা ক্লোটেনের কবন্ধ। পোষাক দেখে সে তাঁর স্বামীর দেহ বলেই ভেবে নিয়েছিল। কবর দেওয়ার কিছু পূর্বে ফাইডেল ঐ মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদল। সে দৃশ্য দেখে রোমান সেনাপতি লুসিয়াসের দু'চোখও জলে ভরে এল।

*　　　*　　　*

পরদিন থেকেই ব্রিটেন ও রোমান সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল।

ব্রিটেনের রাজা সিমবেলিনের একমাত্র ভরসা ছিল ক্লোটেন—কিন্তু সেই ক্লোটেন যুদ্ধের আগে থেকেই বেপাত্তা। তাঁর কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না, রাণীও ক্লোটেনের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। যা বদরাগী ছেলে কোথায় গিয়ে কি তুলাকালাম কাণ্ড বাধিয়েছে কে জানে? অতএব এমন বিপদের দিনে ক্লোটেনকে পাশে নেই দেখে রাজা সিমবেলিন খুবই মুষড়ে পড়লেন। বৃথা যুদ্ধ, ব্রিটেনকে হারতেই হবে।

কিন্তু ক্লোটেনের অভাব আকস্মিকভাবেই পূরণ করল রাজারই হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলে—বেলেরিয়াস ও তাঁরা নিজেরা এসে বললেন। শত্রুগণ দেশ আক্রমণ করেছে। এখন দেশের সব মানুষকে একজোট হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এতে কোনো কিন্তু নেই। স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে দেশের সকল লোককেই অংশগ্রহণ করতে হবে—এরূপ ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের কথা ভাবলে চলবে না।

কিন্তু সিডেরিয়াস বলল: বাবা, রাজামশায় যদি জানতে পারেন আমরা রাণী-মার ছেলেকে হত্যা করেছি—তখন যে আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

এখন তো দেশের জন্য যুদ্ধ করো পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

অতএব সিডেরিয়াস আর আরভিরেসাস প্রাণপণে রোমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগল। ওদিকে রোমানসৈন্যদের সঙ্গে যারা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে—তাদের সঙ্গে পোসথুমাস আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেই আয়াকিমোও ছিল।

পোসথুমাস আর আগের মতো প্রাণবন্ত যুবা নেই। যেন সে এক নিভন্ত প্রদীপ। সামান্য আলো আছে বটে—তবে তার মধ্যে আগেকার সেই দাহ বা দীপ্তি নেই। আইমোজেনকে যে তাঁরই নির্দেশে পিসানিও হত্যা করেছে পোসথুমাস তা জানেও। এতদিনে তার মনে হচ্ছে আইমোজেনের প্রতি তার আচরণ বোধহয় সংগত হয়নি। কোথায়ও একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে।

পোসথুমাস অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল, যে প্রাণপণ লড়াই করবে তবে রোমানদের হয়ে নিজের স্বদেশের বিরুদ্ধে নয়, বরং ব্রিটেনের হয়ে আক্রমণকারী রোমানদের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি দিয়ে লড়াই করবে।

অনেক ভেবেচিন্তে পোসথুমাস রোমান শিবির ত্যাগ করে রাতের গভীরে এক চাষীর ছেলের পোষাক পরে ব্রিটেনের শিবিরে যোগদান করল।

সেনাপতিকে বলল: আমি চাষীর ছেলে বটে, তবে লড়াই খুব ভালো করতে পারি, আমাকে কি আপনি লড়াই করতে সুযোগ দেবেন?

নিশ্চয়ই দেব, তুমি নিজের দেশের হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে—এতো খুব ভালো কথা, আমি আপত্তি করব কেন।

রোমান সেনারা অস্ত্র চালনায় দক্ষ এবং শিক্ষিত' অতএব যুদ্ধে প্রথমে ব্রিটেন হেরে গেল। রাজা সিম্বেলিন স্বয়ং রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন।

ব্রিটেনের সোনাপতি বললেন ঃ আর যুদ্ধ চালিয়ে কি হবে, আমাদের রাজাই যখন রোমানদেরহাতে বন্দী হয়েছেন।

কিন্তু চারজন আপত্তি করল, তারপর বলল ঃ আমরা প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাব, রোমানদের পরাজিত করব, রাজা সিম্বেলিনকেও মুক্ত করব।

সেনাপতি অবাক হয়ে বললেন ঃ বল কি।

চারজন একসঙ্গে বলল ঃ ঠিকই বলছি।

ঐ চারজন সত্যি সত্যি তাঁদের কথা রেখেছিল, পরদিনের তুমুল যুদ্ধে রোমান সেনারা পরাজিত হলো, রোমান সেনাপতি লুসিয়াস হলেন বন্দী—আর রাজা মিস্বেলিন হলেন মুক্ত। লুসিয়াসের সঙ্গে বন্দী হলো উল্লেখযোগ্য আরও দু'জন—একজন ফাইডেল ওরফে আইমোজেন আর একজন হলো আয়োকিমো।

লুসিয়াসকে বন্দী অবস্থায় ব্রিটেনের রাজদরবারে হাজির করা হলো। বন্দী অবস্থায় আয়াকিমো এবং ফাইডেল ওরফে আইমোজেনকে আনা হলো।

আর রাজদরবারে তখন সেই উল্লেখযোগ্য চারজনও উপস্থিত ছিলেন, যারা ব্রিটেনকে জয়ী করেছেন। ঐ উল্লেখযোগ্য চারজন হলেন বেলোরিয়াস, সির্ডোরিয়াস, আরভিরেসাস আর চাষীর পোষাক পরা পোসথুমাস।

লুসিয়াস বন্দী হ'লেও মহান ব্যক্তি।

লুসিয়াসকে রাজদরবারে আনার পর রাজা সিম্বেলিন জিগ্যেস করলেন ঃ মহামান্য লুসিয়াস, আপনি কি নিজের প্রাণ ভিক্ষা চান?

মহৎ লুসিয়াস বললেন ঃ আপনি যদি প্রাণ ভিক্ষাই দিতে চান—তবে আমার জীবনের বিনিময়েও আমার পরিচারক ফাইডেলের প্রাণভিক্ষা দিন মহারাজ।

একথা বলতেই সবার নজরে পড়ল ফাইডেল ওরফে আইমোজেনের ওপর। বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার তো, রোমান সেনাপতি নিজের প্রাণের বিনিময়েও যার প্রাণ ভিক্ষা করছেন—স্বাভাবিকভাবে তাঁর দিকে সকলের নজর আকৃষ্ট হবেই।

ফাইডেলকে দেখে রাজা মিস্বেলিনেরও খুব ভাল লাগল, কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন তিনি। তিনি ফাইডেলকে বললেন ঃ ফাইডেল, আমি তোমায় মুক্তি দিলাম, তোমার আর যদি কোনো প্রার্থনা থাকে বলো। তোমার দু'টি প্রার্থনা আমি অবশ্যই পূরণ করব।

মহারাজ আমার প্রথম প্রার্থনা, আমার বর্তমান মনিব মহামান্য লুসিয়াসকে আমার জীবনের বিনিময়ে মুক্তি দিন।

রাজা সিম্বেলিন বিস্মিত হয়ে বললেনঃ আমি মহামান্য লুসিয়াসকে মুক্তি দিলাম

এবার তোমার দ্বিতীয় প্রার্থনার কথা বলো।

আয়াকিমো নামে ঐ যে রোমান বন্দী হয়ে এখানে এসেছেন—উনি ওর বন্ধু পোসথুমাস লিওনেটাস সম্বন্ধে যা জানে সত্যি কথা বলুক, সে একজন রাজকন্যার জীবনকে কিভাবে বিষময় করে তুলেছে—তা সত্যি করে বলুক। এমনিতে সত্যি কথা বলতে না চাইলে—নিদারুণ কষ্ট দিয়ে ওর মুখ থেকে সত্যি, কথা বের করুন মহারাজ, এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা।

অতএব প্রাণের ভয়ে আয়াকিমো সব কথা স্পষ্ট বলতে বাধ্য হলো। কিভাবে সে রাজকন্যা আইমোজেনের নামে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছিল, সেই কথা আয়া-কিমো পরিশেষে বলতে বাধ্য হলো।

সভায় উপস্থিত সকলেই—ছি! ছি! করতে বাধ্য হ'লো। স্বয়ং লুসিয়াস বললেন: এই যুবকটি রোমের কলঙ্ক!

আয়াকিমো সব কিছু প্রকাশ করতেই পোসথুমাস আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না, তিনি আর্ত চীৎকার করে বললেন: মহারাজ—এই শয়তান রোমান যুবকটির কথায় বিভ্রান্ত হয়ে আমি নিজের পত্নীকে হত্যা করেছি। মহারাজ আমি বাঁচতে চাই না আমায় চরম দণ্ড দিন।

চাষার ছেলের পোষাকে সজ্জিত পোসথুমাসের দিকে তাকিয়ে রাজা সিম্‌বেলিন বললেন: তা হ'লে তুমিই পোসথুমাস, আমার মুক্তিলাভ ও ব্রিটেনের জয়ের জন্য তোমার কাছে আমি ঋণী। আমার উচিত তোমায় পুরস্কৃত করা। এ ব্যাপারে আমার মেয়ে আইমোজেনই হতো তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, কিন্তু আজ কোথায় আইমোজেন? আমার মেয়ে?

পোসথুমাসকে চোখের সামনে দেখে ফাইডেল ওরফে আইমোজেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভাবতে থাকল—একী স্বপ্ন না সত্যি। কিন্তু গুহার সামনে সেদিন যে মুণ্ড-হীন মৃতদেহ সে দেখেছিল, সেটি তবে কার মৃতদেহ? সিডেরিয়াস পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ফাইডেল ওরফে আইমোজেন তাকে জিগ্যেস করল: তোমাদের গুহার সামনে ঐ মৃতদেহটি তবে কার ছিল?

সিডেরিয়াস জোরেই বলল: ওটা হলো রানীর ছেলে ক্লোটেনের লাশ। তাঁর দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আমিই তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি।

রানীর ছেলে ক্লোটেনকে হত্যা করা হয়েছে শুনে রাজা সিম্‌বেলিন প্রচণ্ড রেগে বললেন: রানীর ছেলে ক্লোটেনকে যে হত্যা করেছে—সে কখনই আমার ক্ষমা পাবে না।

বেলেরিয়াস বলল: কিন্তু সে যদি আপনাকে মুক্ত করে থাকে, ব্রিটেনের জয়ের জন্য প্রাণপণে লড়ে থাকে?

রাজা চীৎকার করে বললেন: তবু সে আমার ক্ষমা পাবে না।

কিন্তু সে যদি আপনার নিজের ছেলে হয়?

রাজা চীৎকার করে বললেন ঃ কোথায় আমার ছেলে ? কোথায় সে ? তুমি কে ?

বেলোসিরাস নিজের পরিচয় দিলেন, বললেন কিভাবে রাজা তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলেন, তারপর সিডোরিয়াস আর আরভিরেসাসকে রাজার সামনে এনে বললেন ঃ এই হ'লো আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলে, এতদিন আমি গচ্ছিত রেখেছিলাম এবার আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম।

রাজা আনন্দে অধীর হয়ে তাঁর হারানো দুই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর আবেগভরা কণ্ঠে বললেন ঃ বন্ধু বেলোরিয়াস তুমি আমায় ক্ষমা করো। আজ থেকে তুমি মুক্ত। রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত তোমার সকল ধন সম্পদই তুমি ফেরৎ পাবে।

পরিশেষে আর এক চমক।

আইমোজেন আর নিজেকে গোপন করে রাখতে পারলেন না। রাজা পোসথুমাসের হাতে আইমোজেনকে তুলে দিলেন, তারপর বললেন ঃ আশাকরি পাসথুমাস, তুমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করলে।

পোসথুমাস মাথা নীচু করে রইল। রাজা আইমোজেনের চিবুকধরে উপহাস করে বললেন ঃ তোমার ভাইয়েরা এসে গেছে, তুমি কিন্তু আর রাজ্য পাচ্ছ না, মা।

আইমোজেন হেসে বলল ঃ বাবা, আমি আমার দু' ভাইয়ের স্নেহের রাজ্য অনেক আগেই পেয়েছি। আমি যখন ফাইডেল হয়ে একই গুহায় ছিলাম তখন থেকেই ওদের স্নেহ পেয়েছি! আমি রাজ্য চাই না পিতা।

লুসিয়াসের হস্তক্ষেপে রোমের সঙ্গে ব্রিটেনের সন্ধিও হলো, কিন্তু শেষটুকু আর মধুরেণ হলো কই? পরিপূর্ণ আনন্দময় পরিবেশে রাজবাড়ির প্রধান পরিচারক দুঃসংবাদ জানালে ঃ রানীমা হঠাৎ মারা গেছেন।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ পর রাজা সিমবেলিন বললেন ঃ একদিকে এ'ও ভালোই হ'লো।

অ্যাজ ইউ লাইক ইট

এক

জায়গার নাম ফ্রান্স।

কবে কার ?

জানি না।

জানি না ফ্রান্সের সম্রাট কে। জানি শুধু সামন্ত প্রভুরাই এখানকার সর্বময় কর্তা। নিজের নিজের ভূখণ্ডে তাঁরা অধিপতি। কোন আইন-কানুন তাঁরা মানেন না। একজন আরেকজনের সম্পত্তির ওপরে বাড়িয়ে আছে, চিতাবাঘের থাবা। দরবারে কান পাতলে শোনা যাবে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফিসফাস।

এই ষড়যন্ত্রে হয়তো জড়িয়ে পড়েন কোন হতভাগ্য সামন্ত প্রভু ডিউক! পরিণতি দাঁড়ায় মৃত্যু বা নির্বাসন। নিহত হলে ভাল, ভাবনা যাবে না তো! কিন্তু নির্বাসন হলে কোথায় স্থান হয় তাদের ?

শ্যামলিয়ার স্নিগ্ধছায়ায়' মধ্যযুগের আনয়াকে, যেখানে জীবন অবাধ স্বাধীন। কখনো আবার এখানেই চোখ ওড়ে দুর্দান্ত যোদ্ধাদের। সম্রাট বা ডিউকের অত্যাচার তাদের দিয়েছে নির্বাসন।

তাঁরা চান প্রতিকার। প্রতিশোধ। দাঁড়ান বিদ্রোহী হয়ে, অবহেলিত, বঞ্চিত, মানবাত্মাকে বুকে নিয়ে। এই মধ্যযুগেও তাই রবীনহুডদের দেখা মেলে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সর্বত্রে।

রোল্যান্ড দ্যা বয়, এই রকমই এক মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজ্যের সামন্ত প্রভু!

তিনি ছিলেন তাঁর রাজ্যের সবার প্রিয় মানুষ। বীরত্বের খ্যাতির সঙ্গে মিশেছিল কূটরাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তাঁর নাম।

তাঁর মৃত্যুর পর, বড় ছেলে অলিভার হলো জমিদার।

ছোট অর্ল্যান্ডো হলো সম্পত্তি বঞ্চিত তুচ্ছ মানুষ। তাঁর জীবন বড় কষ্টের।

জমিদার অলিভারের ঘর সংলগ্ন বাগিচা। সেই বাগিচায় থাকতো অর্ল্যান্ডো ও তাদের পুরানো চাকর। চিন্তা অর্ল্যান্ডোকে উত্তেজিত করেছে।

সে বলে, আর সইতে পারছি না য়্যাডাম। উইলে বাবা তাকে দিয়ে গেছেন মাত্র এক হাজার মুদ্রা। অলিভারকে বলে গেছেন, আমাকে লেখাপড়া শেখাতে। কিন্তু তা শোনেনি অলিভার। আমার ভাই জেকস্‌কে সে পাঠালো বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ আমাকে কেমন মূর্খ করে বসিয়ে রেখেছে বাড়ীতে। এই কি ভদ্রলোকের শিক্ষা ?

আমার চেয়েও বরং ভাল আছে ওর ঘোড়াগুলো, শিক্ষাও পাচ্ছে ভাল ? আর আমি ? খাই দাই, চাকরবাকরদের সঙ্গে আছি। ভাইয়ের মর্যাদা পেলাম না। হারিয়েছি ভাইয়ের অধিকার। বড় দুঃখ য়্যাডম, শরীরেই কেবল বেড়েছি, আর কি কোন উন্নতি হয়েছে আমার ? শিক্ষা দূরে থাক, প্রকৃতির দান থেকেও সে আমাকে বঞ্চিত করেছে। সে দেয়নি ভাইয়ের মর্যাদা !

কিন্তু আমারও শরীরে বইছে বাবার রক্ত ! আর সইবো না। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে তাই এবার হবো মহা বিদ্রোহী। কিন্তু কিভাবে ? কি পথে ভাঙ্গতে হয় এই দাসত্ব-শৃঙ্খল ?

নাঃ, তা তো জানি না য়্যাডাম। অল্যার্ন্ডোর দীর্ঘশ্বাসে স্পষ্ট হয় অজ্ঞানতা। সত্যি, কোনও কি পথ নেই ? দাসত্বের এই ঘেরাটোপই কি তার অমোঘ ভবিষ্যৎ গ্রাস করে থাকবে ? এই নিয়তি থেকে মুক্তি কোথায় ?

হতাশা আচ্ছন্ন করলো তাকে। উত্তেজনা তীব্র থেকে তীব্রতর। তুষের মত ধিক্ ধিক্ রাগের আগুন হয়তো বাতাস পেলে জ্বলে উঠতো আরো। কিন্তু তার আগেই অলিভারের আসার সংবাদ দিল য়্যাডাম।

এ খবরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল রাগের আগুন।

সে বললো, আড়ালে সরে যাও তুমি য়্যাডাম। ওখানেই শুনতে পাবে ও কি বলে কিভাবে উত্তেজিত করে আমাকে।

য়্যাডাম গেল আড়ালে অল্যার্ন্ডো পায়চারি করছে। অলিভার ঢুকলো।

অল্যার্ন্ডোর মতই সুঠাম দেহের সুন্দর যুবা সে। অল্যার্ন্ডোর মত তার মুখে নেই কোমলতা। বরং সেখানে ফুটেছে নিঠুর ক্রুরতা। অপরূপ ঈশ্বরের মত বীর্য দীপ্ত অল্যার্ন্ডো। আর অলিভার ? ভাস্করতা শূন্য মলিন। পাপ তার সাবলীলতা চুরি করেছে। চোখ আর ভুরুতে ছায়া ফেলেছে কুটিলতার। মুখেও খারাপ ভাবনার আঁকিবুঁকি।

ভাই ভাই হলেও, মুখোমুখি হতেই শুরু হল ঝগড়া ! ভাইকে দেখেই অলিভার বললো—তুমি ? কি করছ এখানে ?

—কিছু শিখেছি যে করবো ? অল্যার্ন্ডোর উত্তর।

—তাতে ক্ষতি কি ?

—না, ক্ষতি না, 'ভগবান যা দিল, তাও গেলো কুঁড়েমিতে।'

—কুঁড়েমি না করলেই হয়। কাজ করো।

কি করবো ? তোমার শুয়োরের পাল চরাবো ? তাদের খুঁদকুঁড়ো খাব ?—রেগে যায় অল্যার্ন্ডো। বাবার কত টাকা উড়িয়েছি যে এই হাল হল আমার ?

অলিভারেরও রাগ চড়ে যায়। বলে—কার সামনে কথা বলছো জানো ?

—জানি, বড় ভাইয়ের সামনে। যাকে বড় ভাই বলে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমিও একই বাবা-মা'র সন্তান। বড় ভাই বলে যে নিয়মে তুমি হতে পারো বাপের সব

সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, সেই নিয়মেই আমার রক্তের অধিকার তো কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। আমাদের মাঝে ভাই এলেও না। বাবার রক্ত যতটুকু পেয়েছ তুমি, আমিও ঠিক ততটুকুই।

—মানে? চেঁচিয়ে ওঠে অলিভার।

—মানে জানো না তুমি? অর্ল্যাণ্ডোর চোখা প্রশ্ন।

—কি করবি তুই?

—তোমার বদলে অন্য কেউ আমার ভাই হলে কি করতাম, তা তুমিই জান।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। অর্ল্যাণ্ডোকে আঘাত দেয় অলিভার। অর্ল্যাণ্ডোও মুহূর্তে প্রস্তুত। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী। কিন্তু তাতে মোটেই ভয় পেল না অলিভার। সে তাকে জন্ম তুলে খারাপ গালাগাল দিয়ে বসল। চকিতে কি ঘটে গেল।

ক্রুদ্ধ অর্ল্যাণ্ডো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রবল আক্রোশে। চেপে ধরলো তার টুঁটি। অ্যাডাম ছিল আড়ালে। সে দৌড়ে এসে ছাড়িয়ে দিল লড়াই। ছাড়া পেয়ে গেল অলিভার।

অর্ল্যাণ্ডো কিন্তু সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। সে বললো—তোমাকে ছাড়বো না। আর সহ্য করবো না তোমার অন্যায় স্বেচ্ছাচার। বাবার বিপুল শক্তি আমার ভিতর উৎসারিত। শোনো, বাবা যা দিয়েছে আমাকে, তাই নিয়েই কপাল ফেরাতে চলে যাবো।

অলিভারের ঠোঁটে ব্যঙ্গ—তারপর টাকাগুলো ফুকে কি করবে শুনি? ভিক্ষে? বেশ তুমি বাবার উইলসম্মত ভাবে তোমার ভাগ পাবে। তাই নিয়ে তারপর জাহান্নামে যাও। আমি দেখতে যাবো না।

—ভালই হবে। আমিও জ্বালাতে আসবো না।

এবার অলিভারের চোখ পড়ল য়্যাডামের দিকে। বললে—ধাড়ী কুকুর, তুইও দূর হয়ে যাবি ওর সঙ্গে।

য়্যাডাম হল বিশ্বস্ত চাকর। বড় দুঃখ পেল সে।

বললো—ধাড়ী কুকুর—এই এতদিনের বখশিস হল কর্তাবাবু? হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি তো, তোমাদের সেবায় সব কটা দাঁত আমার গেছে। ওহো ঠাকুর, তুমি আমাদের বুড়ো কর্তাবাবুকে শান্তিতে রেখো। আজ তুমি যা বললে, উনি কখ্খনো তা বলতে পারতেন না। য়্যাডামের সঙ্গে চলে গেল অর্ল্যাণ্ডো।

অপমানে, রাগে, উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে অলিভার বললো—চোপ! আমার ওপর তোর মতামত চাপিয়ে দিতে চাস না। তোকে আমি উচিৎ শিক্ষা দেবো। ঐ হাজার টাকা তোকে কিছুতেই দেবো না, কখ্খনো না।

এসময়ে পরিচারিকা এসে জানায়, বিখ্যাত পালোয়ান চার্লস অলিভারের ডাকে এসেছে ডিউকের দরবারে। অলিভার চার্লসকে আসতে বললে চার্লস আসে। একদম

-পালোয়ানী শরীর। ঘাড়ে গর্দানে এক। মুখ ছড়ানো অহঙ্কার।

অলিভার জানতে চাইল ডিউকের দরবারী খবর।

সে জানালো—কিছু নেই, সবই পুরোনো তুচ্ছ খবর। দাদা বুড়ো ডিউককে হটিয়ে ছোট ভাই হয়েছে এখন নতুন ডিউক। বুড়ো ডিউক এদিকে দু'চারজন সদস্য নিয়ে উধাও।

অলিভার প্রশ্ন করে—আর, ডিউকের মেয়ে রোসালিন্ড সেও কি…

—না না, ডিউকের মেয়ে রাজবাড়ীতেই আছেন।

—কাকা, মানে নয়া ডিউকও তাকে ভালবাসেন।

—কিন্তু বুড়ো ডিউক চ্যালা ছুটিয়ে গেল কোথায় ?

—আর কোথায় ? তিনি এখন, লোকে বলে, আর্ডেনের অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইংল্যান্ডের বীর নায়ক রবীনহুডের মতই।

আর বড় বড় অভিজাত বংশের ছেলে ছোকরা তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন আর কি! অনেকটা রূপকথার রাজ্যের মতই—যেখানে—উপচে পড়তো পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-শান্তি। ধনদৌলত।

হঠাৎ চার্লসের কথায় ইতি টেনে অলিভার বললো—তুমি নাকি বলেছ ডিউকের সামনে খেলা দেখাবে ?

—হ্যাঁ, কর্তাবাবু। তাইতো আপনার কাছে এলাম। শুনছি অর্ল্যান্ডো, আপনার ছোট ভাই ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামবে। কাল আমার ইজ্জতের লড়াই। কেউ যদি তার হাড়গোড় না ভেঙে ফিরে যায় কাল, তো জানবেন, সে তার কপাল। ভাইটি আপনার ছোকরা। নরম মানুষ। ইজ্জতের জন্য তার ওপর কসরৎ দেখাতে রাজী নই আমি। তাই বলতে এলাম ওঁকে থামান। ওঁকে কিছুতেই যেতে দেবে না কর্তা।

এই কথা শুনে অলিভার তো বেজায় খুশী। সে চায় এক্ষুনি তার অপমানের বদলা নিতে। চায় তার প্রাপ্য সম্পদ গ্রাস করতে।

তথাপি সে মনের ইচ্ছা চেপে রেখে বলে, ধন্যবাদ, চার্লস। তুমি ভালোবাসো আমায়। তাই বলতে এলে। আমার ভাইটি কিন্তু দারুন একরোখা। এই ফ্রান্সের সবচেয়ে জেদী মানুষ। আমার বারণ সে শুনবে না। তার মনে ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কারো ভাল পছন্দ করে না। আমাকে সে ঈর্ষা করে। তাই বলছি, তুমি ওকে যা খুশী করতে পার। খুব ভাল হয় যদি তুমি ওর আঙুলের বদলে ওর ঘাড়টাকেই মটকে দাও।

এত নীচ ও, এতবড় শয়তান—ওর চরিত্রের কথা বলতে গেলে তো আমরাই লজ্জা জন্মাবে। বিস্ময়ে থ' বনে যাবে তুমি। ওর কীর্তি তোমাকে পাথর করে ছাড়বে।

চার্লস শক্তিতেই বড়। বুদ্ধিতে নয়। সহজে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার গোপন ফন্দি টের পেল না।

বললো—ঐ ছোকরাকে বাগে পেলে একবার দেখে নেবো। ব্যাটা চোট না খেয়ে

ফিরে গেলে আমি ছেড়েই দেবো কুস্তি।

চলে গেল চার্লস।

খুশীতে টগবগ করে অলিভার, কাজ হাসিল। চার্লসকে সে ক্রুদ্ধ করে দিয়েছে—ফলে আর সুস্থ শরীরে ফিরবে না অল্যাণ্ডো।

লড়াই শেষে পড়ে থাকবে তার নিস্তেজ শরীর। ভাই-এর ওপর গোপন হিংসা স্পষ্ট হয়। টের পায় কি অসীম ঘৃণা জমেছে অর্লাণ্ডোকে ঘিরে। কিন্তু কেন? কেন? ধীরে ধীরে সে কারণ মুখী হতে চায়, পারে না।

অল্যাণ্ডো কত বিনয়ী, নম্র, কত সরল ওর মন। বিদ্যালয়ের কড়িকাঠে পা না রেখেও সে শিক্ষিত। সবার প্রিয়, এমন কি প্রজারাও ভালবাসে তাকে। নিজেকে অল্যাণ্ডোর পাশে তুলনা করতে গিয়ে সে দেখল, নিজেকে কেমন হীন অতি তুচ্ছ মনে হয়। যাক গে, কাল তার মৃত্যু দিবস, অলিভারকে এক দহন থেকে মুক্তি দেবে চার্লস। তবে হ্যাঁ, অল্যাণ্ডোর মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে উত্তেজনার সেঁকো বিষ।

ভাবতে ভাবতে অন্তরালে অদৃশ্য হল অলিভার।

দুই

ডিউকের প্রাসাদ অঙ্গন।

সামনে অনুপম সৌন্দর্যে ঢলঢল দুই কিশোরী।

দুইজনের মাঝে বয়সের ফারাক বড় অল্প। ওরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ সাথী। রোসালিণ্ড বড়। তার বিষন্ন সুন্দর মুখে কাঁপছে মেঘমেদুর ছায়া! পিতার নির্বাসন কি আত্মজার মুখে ফেলেছে এই বিষন্নতার ছাপ? সিলিয়া বয়সের ছোট। সাথীর মুখে হাসি ফোটাতে চায় সে। বলে—হাসি খুশী থাকতে চেষ্টা কর না ভাই!

—বেশ হাসি-খুশীই তো আছি। বিষন্ন রোসালিণ্ড বলে, আর কি চাই? আমার উধাও বাবাকে যদি ভুলে যেতে না বলো তাহলে এর চেয়ে আমাকে বেশী আনন্দিত দেখবে না। বাপ যার নির্বাসনে তার মুখে কি করে হাসি ফোটে বল?

বড় অভিমান হল সিলিয়ার।

দুঃখিত স্বরে বললো—যতখানি তোমাকে আমি ভালবাসি, ততখানি তুমি আমায় ভালবাস না। তোমার মত দশা হলে, তোমার বাবা আমার বাবাকে নির্বাসন দিলে, আমি তোমার বাবাকে নিজের বাবার মত মনে করতাম। এর জন্য দরকার গভীর ভালবাসা। তাই বলছি, তোমাকে আমি যতখানি ভালবাসি, তুমি আমায় ততখানি ভালবাস না।

—ঠিক আছে, রো সালিণ্ড জানায়, নিজের কথা ভুলে এবার আমি তোমার আনন্দ

নিয়েই হব আনন্দিতা।

সিলিয়া বললো—দ্যাখো আমার বাবার ছেলে নেই। সন্তানও আর হবে না। তিনি চলে গেলে, উত্তরাধিকারী হবে তুমি। তোমার বাবাকে তিনি সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন, আমি তা ভালবেসে ফিরিয়ে দেবো তোমায়। অঙ্গীকার রইল। যদি ভাঙ্গি এ অঙ্গীকার যেন ডাইনী হই আমি। মিষ্টি রোসা, সাথী, তোর দোহাই, একবার হাস না।

—ভাল, আমি হাসবো! এবার থেকে খুঁজে নেবো নতুন নতুন প্রমোদ। রোসালিণ্ড বললো, আচ্ছা বলতো কোন্ খেলায় আমরা হতে পারি আত্মহারা?

সিলিয়া বললো—আয় না, নিয়তির গিন্নী-বান্নী ঐ দেবীকে নিয়ে বেশ মজা করি আমরা। উনি চাকায় চড়লে, ভাগ্য ঘোরে, চাকাও ঘোরে। ঐ দেবীকে এমন ইয়ার্কি করব যে উনি রথ ছেড়ে পালাবেন। তখন দেখবে আমাদের সবার কপালে একই ভাগ্যরেখা।

—আহ, যদি পারতাম। যোগ্যহীন মানুষই পায় যে ওঁর করুণা। রোসালিণ্ড বলে—যদিও দানের হাতটি দরাজ, তবু দেবী অন্ধ, শুধু মেয়েদের বেলায়।

সিলিয়া বলে উঠল—ঠিক, যাদের সুন্দর করে গড়েন। শুভবুদ্ধি কখনো দেন না তাঁদের। আর যাদের দেন অমন মনের সৌরভ, সৌন্দর্য থেকে তারা বঞ্চিত।

রোসালিণ্ড জানায়—তুমি যে হঠাৎ ভাগ্যের দেবীর থেকে সটান প্রকৃতি ঠাকুরের কাছে চলে গেলে। অপার্থিব সুখ দুঃখের মালমশলা নিয়েই ভাগ্য ঠাকুর তাঁর কারবার ফেঁদেছেন আর প্রকৃতি ঠাকুর? তার কাজ তো মানুষের শরীর গড়বার।

টাচ্‌ষ্টোনকে দেখা গেল এ সময়ে।

রাজারা খুব পছন্দ করেন এইসব বিদূষকদের। এছাড়া আনন্দ জমে না। এরা জমিদারের মন জুগিয়ে কথা বলে, হাসায় এবং হাসে। তবু ভাঁড়ামি আর চাটুবৃত্তিই এদের পেশা আর নেশা নয়।

পৃথিবীর যাবতীয় অভিজ্ঞতা এদের বুদ্ধিমান করেছে। এদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা শুনে সবাই হাসে। ভাবে হাল্কা রসের 'ইয়ার্কি'। জানে না, কোথায় লুকিয়ে আছে গভীর জীবনবোধ। মূর্খরাই বোঝে না। রসিক ঠিক চিনে নেয় মানুষ।

টাচ্‌ষ্টোনের পোষাক যাত্রা দলের কঞ্চুকীর মত।

ঢিলে জোব্বা। দাড়ি গোঁফ ভরা মুখ। চোঙার মত গোল টুপিই মাথা ঢেকেছে।

তাকে দেখে সিলিয়া বলে ওঠে—উঁহু, ঠিক বুঝতে পারছো না, প্রকৃতি ঠাকুর, মনে কর, এক পরমা সুন্দরী নারী গড়লেন, কপাল খারাপ হলে যে কত কষ্টে পড়তে পারে, পুড়তে পারে আগুনে। ঐ দ্যাখো, আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন প্রকৃতি ঠাকুর, ভাগ্যকে

নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারি—শুধু এ সময়েই ভাগ্য ঠাকুর কেন আমার এক মূর্খ ভাঁড়কে পাঠিয়ে ভেস্তে দিলেন আমাদের গল্প-গুজব ?

হাসলো রোসালিণ্ড, সুতরাং প্রকৃতিদেবী ভাগ্যদেবীর চেয়ে বেশী ক্ষমতা রাখেন। ভাঁড়, ঐ যে, মূর্খতা যার স্বভাব, তাকে দিয়েই উনি উড়িয়ে দিতে চান প্রকৃতিদেবীর শ্রেষ্ঠ দান আমাদের এই বুদ্ধিকে !

—হয়তো ভাগ্যদেবীর ব্যাপার নয় এটা, সিলিয়া বললো—হয়তো প্রকৃতিদেবীরই কাজ। তিনি দেখলেন আমাদের বুদ্ধি কত ভোঁতা, তাই শান-পাথর করে পাঠিয়েছেন ওকে। নাম ও পরশ পাথর। আসলে ওই হল শান-পাথর।

—তা এই যে বন্ধু, কোথায় চলেছেন মশাই।

টাচ্‌ষ্টোন জানায়, সিলিয়াকে তার বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তাহলে আপনি দূত বলুন ?

—আরে না-না, টাচ্‌ষ্টোন বললো—নিজের সম্মানের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি দূত-ফুত নই। হুকুম করলে তাই এলাম।

—ওহে মূর্খ, অমন হলাও করা শিখলে কোত্থেকে ?

রোসালিণ্ড প্রশ্ন করতে যেন কথার তুবড়ি ছুটলো টাচ্‌ষ্টোনের ; শিখেছি এক বীরের কাছে। নিজের সম্মানের দোহাই পেড়ে যিনি বলতেন তাঁর পিঠে ভাল আর খুব খারাপ রাই সরষের ঝাল। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, ওর রাই সরষের ঝালই খুব ভাল, পিঠেগুলোই বরং খারাপ। এতে কি আমাদের বীরের কথা মিথ্যে হয়ে গেল ?

সিলিয়া মুখিয়ে ওঠে—এই কথাটা আপনার সত্যি ? প্রমাণ চাই।

সায় দেয় রোসালিণ্ড—হ্যাঁ দেখান তো।

—তাহলে আপনারা আমার সামনে বসে নিজেদের চিবুক ঘষে ঘষে দাড়ি ছুঁয়ে বলুন, আমি ঠিক, প্রবঞ্চক, খারাপ লোক।

—এমা, মেয়েদের আবার দাড়ি কি গো !

এভাবেই ওরা যখন গল্পে মশগুল তখনই লে বো নামের এক সভাসদ এসে জানায় মল্লভূমিতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। চার্লসের হাতে তিন জন পরাস্ত। বাকী একজনের সঙ্গে এখনই শুরু হবে শেষ লড়াই।

রণ দামামা বাজে। ঢোকে ডিউক ফ্রেডারিকের সঙ্গে কিছু সভাসদ। চোখে পড়ে চার্লস ও অর্ল্যাণ্ডোকে।

দুই বন্ধু দেখলো, বিশাল দেহের চার্লসের প্রতিপক্ষ সুন্দর মুখের এক ছোট্ট কিশোর। চকিতে শিউরে উঠলো ওরা। বোঝাই যায় এ যুদ্ধ অসম।

রোসালিণ্ডের চোখ অর্ল্যাণ্ডোর দিকে ! বললো—উনি যোদ্ধা ?

—উনিই যোদ্ধা। লে বো মাথা ঝাঁকায়।

সিলিয়া বলে—ইস্ বড় ছোকরা বয়েস। তবে ও'র দৃষ্টিতে লেখা আছে এই

যুদ্ধের সফলতা। ও'কে একবার ডাকলেন?

লে বো ডাকলেন। এলো অর্ল্যাণ্ডো, রোসালিণ্ড বললো—লড়াই আপনি ডেকেছেন?

—না, অর্ল্যাণ্ডোর উত্তর, ঐ মল্লবীরই সবাইকে ডেকেছে। ওর ডাকে আর সবার মত আমিও এসেছি।

—আপনার সাহস বেশী, বয়স কম, আমাদের অনুরোধ, সিলিয়া বলে, এই অসম যুদ্ধে নামবেন না। দেখছেন তো অসুরটার বিক্রম।

রোসালিণ্ড জানায়—ডিউককে বলে যুদ্ধ বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা, তাহলে কাপুরুষতা স্পর্শ করবে না আপনাকে।

অর্ল্যাণ্ডো কিশোরীদের দিকে তাকালো—রাগ করবেন না, এত সুন্দর মুখের অনুরোধ রাখতে পারছি না। আপনাদের ঐ অসম চোখ আর শুভেচ্ছা এই যুদ্ধে আমার পাথেয় হয়ে রইল। হারি যদি হারবে সেই লোক, জীবনে যে কখনো ভালো-বাসার মুখ দেখেনি। মরবে সেই মানুষ, মৃত্যু যার কাঙ্ক্ষিত। আমার মৃত্যু কাউকে না দেবে বিন্দুমাত্র শোক। এতটুকু ক্ষতি হবে না পৃথিবীর। অথচ, যে জায়গাটুকু অধিকার করে আছি, সেটুকু পাবে কোন যোগ্য মানুষ।

অর্ল্যাণ্ডো বিদায় চাইল।

ঠিক তখনই ওদিকে, চেঁচিয়ে ওঠে চার্লস, কে আছে বীর, কে চাও মৃত্যু তিলক, কাছে এসো।

লড়াই শুরু হল।

সিলিয়ার ভয়, কিশোর নায়ক যেন আহত না হয়।

রোসালিণ্ডের স্বপ্ন ওকে ঘিরে থাকে।

ঐ বান্ধবহীন-মৃত্যুকামী প্রেমহীন-কিশোর, আহা, সে বুঝি আমারই মত। প্রতি মুহূর্তের বিপদ আশংকায় দুরু দুরু কাঁপে ভীরু কিশোরী হৃদয়।

ওদিকে যুদ্ধরত তরুণের বুকে কিশোরী দৃষ্টি দিচ্ছে অপরিমেয় শক্তি।

এই শক্তি নিয়ে সে হল অপরাজেয়, পরাজিত করল তুচ্ছ চার্লসকে।

কিশোরের সাহস-ও শক্তি খুশী করলো ডিউককে।

তিনি ওর নাম জিজ্ঞাসা করতে, অর্ল্যাণ্ডো জানলো, মৃত সামন্ত প্রভু রোলাণ্ডের ছোট ছেলে সে।

আজ রোলাণ্ড নেই।

কিন্তু একদিন ছিলেন নির্বাসিত ডিউকের ঘনিষ্ট মানুষ। তাই তরুণ বীরের ফ্রেডরিকের চোখ পড়ল আক্রোশ নিয়ে।

—হায়রে, অন্য কারো ছেলে হলে না কেন তুমি! বলেই দ্রুত চলে গেলেন। সঙ্গে গেল সভাসদগণও।

কিশোরীরা এল অর্ল্যাণ্ডোর কাছে। ক্ষমা চাইল নতুন ডিউকের খারাপ

ব্যবহারের জন্যে।

গলার হার খুলে রোসালিণ্ড বললো—আমার কথা ভেবে পরবেন এই হার। ভাগ্য ভাল থাকলে আরো দিতে পারতাম। কিন্তু আজ আমি অসহায় অক্ষম।

বিদায় জানিয়ে চলে গেল ওরা।

একা একা দাঁড়িয়ে অর্ল্যাণ্ডো কি ভাবছিল। সে তো ফিরে এল এমন সময়। বন্ধুর মত পরামর্শ দিল, বললো, ডিউক ক্রুদ্ধ। সে যেন এখান থেকে পালায়।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে জেনে নিল অর্ল্যাণ্ডো, রোসালিণ্ড নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে। আর সিলিয়া? নতুন ডিউকের।

লে বো চলে গেছে কখন। অর্ল্যাণ্ডো ভাবছে, একদিকে কুচক্রী ভাই, অন্য দিকে নিষ্ঠুর ডিউক, মাঝে শুধু একবিন্দু সান্ত্বনার মত স্বর্গের দেবদূত, ঐ রোসালিণ্ড।

তিন

ডিউকের রাজপ্রাসাদের ঘর।

নিভৃতে আলাপচারী সিলিয়া ও রোসালিণ্ড। অর্ল্যাণ্ডো নেই। এক কুমারী মনে সে রেখে গেছে কালবৈশাখী ঝড়।

সিলিয়া বললো—একটা কথাও কি বলবি না সই? কার জন্যে এত ভাবনা তোর? বাবা? শুধু কি বাবা? রোসালিণ্ডের মুখে বাসি ফুলের মলিন হাসিঃ যে আমার স্বামী হবে, তার জন্যেও কিছুটা ভাবনা তো আনন্দের যম।

সিলিয়া বললো—উড়িয়ে দে তাকে।

—শুধু কি ভাবনা? তার চেয়েও গভীর······

—হেঁয়ালী রাখ সই। ব্যাপারটা কি বলতো? রোলাণ্ডের ছোট ছেলেকে মনে ধরেছে বুঝি?

—আমার বাবা তো স্যার রোলাণ্ডকে ভালবাসতেন।

—তবে আর কি, তুমি আর ছেলেকে ভালবাস। আমার বাপ তো তাকে ঘৃণা করতেন। সুতরাং আমিও তার ছেলেকে ঘৃণা করবো। কিন্তু আমি তো ঘৃণা করি না অর্ল্যাণ্ডোকে।

—না, ওকে ঘৃণা করতে পারবে না।

—কেন? ওকি ভালবার লোক?

এভাবেই ওরা যখন বিভোর তখনই ডিউক ঢোকে। সঙ্গে সহাচরবৃন্দ। রাঙা চোখের ক্রুদ্ধ ডিউক ঢুকেই জানায়—রোসালিণ্ড তোমায় নির্বাসন দিলাম।

বিস্ময়ে রোসালিণ্ড চেয়ে রইল অপলক।

—হুম, তোমাকে বিশ মাইল দূরে যেতে হবে দশ দিনের ভেতর। রাজ্যের কাছে এলেই মৃত্যু হবে তোমার।

দৃঢ়কণ্ঠে রোসালিণ্ড বলে—আমার অপরাধ? সজ্ঞানে কখনো আপনার বিরুদ্ধে-চরণ কি খারাপ চিন্তা করেছি কি? স্বপ্নের কথা আলাদা—বিশ্বাসঘাতকদের সেই একই কথা। রাগে চীৎকার করে ওঠে ডিউক, যেন সব নিষ্পাপ অবতার এক একটি। শোন, তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি।

—আপনার অবিশ্বাস আছে বলেই কি আমি বিশ্বাসঘাতক? কি কারণে বিশ্বাস-ঘাতক হলাম সেটাই বলুন? রোসালিণ্ড আরো বলে—আমার বাবার রাজ্য যখন ছিনিয়ে নিলেন আপনি, তখন তো আমার বাবারই মেয়ে ছিলাম। তাঁকে নির্বাসন দিলেন যখন, তখন আমিও তাঁর মেয়ে। বিশ্বাসঘাতকতা কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়?

—তাহলে আমি অপরাধী নই। কেননা আমার বাবা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না।

—বাবা সিলিয়ার কণ্ঠে মিনতি, ওকে নির্বাসন দেবেন না। ও বিশ্বাসঘাতক হলে আমিও বিশ্বাসঘাতক। আমরা তো অভিন্ন, এক, এখনো যে আমরা এক সঙ্গে শুই বসি, খেলতে যাই।

গর্জে ওঠে ডিউক, তোমার জন্যেই ওকে দেখেছিলুম। না হলে কবে ওর সঙ্গে পাঠাতুম নির্বাসনে।

সিলিয়া বলে ওঠে—ওকে নির্বাসন দিলে আমাকেও দিতে হবে।

—ওর কুটিলতার কাছে তুমি হেরে যাবে সিলিয়া! ডিউক মেয়ের মনে বুনে দিতে চায় সন্দেহের বীজ। ওর সহিষ্ণুতা ও নীরবতায় গলে যায় মানুষ। ও কেড়ে নিচ্ছে তোমার যশ। তাই ও চলে গেলে, তুমি লোকের চোখে ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

—তবু আমাকে এ শাস্তি দিন বাবা।

—মূর্খ! মেয়েকে আর কিছু না বলে রোসালিণ্ডের দিকে ডিউক তাকিয়ে বলেন তৈরী হয়ে নাও। আমার আদেশ নড়চড় হয় না।

ডিউক চলে গেলেন।

কি করবে সই? কোথায় যাবে? সিলিয়া কেমন বিভ্রান্ত।

রোসালিণ্ড কেবল বললো—চলে যাবো।

—আমিও সঙ্গে যাবো। আমাকেও নির্বাসন দিয়েছেন বাবা।

—না। দেননি।

—দিয়েছেন। না-না, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—কোথায়?

—কেন? আর্ডেনের বনে।

—কিন্তু সই, আমার যে মেয়ে। যদি বিপদ আসে।

রোসালিণ্ড বলল—আমি লম্বায় বড়, সুতরাং আমি সাজবো পুরুষ। ধরবো হাতে বর্শা। বুকে থাকবে তোর মতই দুরু দুরু কুমারী ভাব। আমার বাইরেটা হবে দুরন্ত যোদ্ধার মত, ভেতরে থাকবে ভীরু পুরুষের কোমলতা, কেমন?

—কিন্তু পুরুষ হলে কি নামে ডাকবো তোমায়?

—নাম হবে গানিমেড। আর তুই। কি নাম হবে তোর?

—সিলিয়ার বদলে আলিয়েনা। যেমন দশা তেমন নাম। আর হ্যাঁ ঐ ভাঁড়টাকেও নিয়ে চল না। পথের ক্লান্তি দূর হবে আমাদের।

এসব ভাবনায় খুশী হয়ে উঠল সিলিয়াও। গেল গয়নাগাঁটি—টাকাকড়ি গুছিয়ে তৈরী হতে। মনে তাদের প্রশান্ত উল্লাস। এ যেন নির্বাসন নয়—যেন মুক্ত প্রকৃতির অধীর শ্যামলিমার ভিতর হারিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা।

চার

আর্ডেনের অরণ্যানী।

এ অরণ্যের মাথায় ঝুঁকে থাকে বিশাল নীলিমা।

নীচে বিস্তৃত শ্যামলিমার কোলে মানুষ। সঙ্গী সাথী নিয়ে নির্বাসিত ডিউকও এখানের অধিবাসী। উদ্বেগ নেই।

দুশ্চিন্তা উধাও। নিলিমা আকাশের নীচে আনন্দে কাটায় দিন। বড় ভাল লাগে ডিউকের।

সঙ্গীদের বলেন—রাজদরবারের ঈর্ষা-দ্বেষ কুটিলতা এখানে নেই। তবু মানুষ যে কষ্ট ভোগ করে তাঁদের সেই কষ্ট এখানেও। মানুষের আদি পিতা আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে যে ভুল করেছিলেন, জন্ম দিয়েছিলেন পৃথিবীর সব দুঃখ কষ্ট, সে দুঃখ নেই এখানে।

দ্যাখো, এখানে শীতের হাওয়া আসে, বয়ে যায়, দংশনে বিক্ষত করে শরীর।

তবু কত আনন্দ। নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে; অরণ্য শিক্ষা দেয় দারিদ্র্য শুধু অভিশাপ নয়। সে এক বিষাক্ত সাপ—ভয়ঙ্কর—তার মাথার মানিক। আমি সন্ধান পেয়েছি সে রত্নের।

বর পেয়েছি দারিদ্র্যের। শিক্ষা পেয়েছি বৃক্ষ ও নদী, পাথর ও আকাশ থেকে। সবকিছু ভাল, বড় ভাল লাগে।

জীবন এখানে মন্থর। এই মন্থরতা বদলাতে চান না ডিউক ও তাঁর সঙ্গীরা।

এসব শুনে সাথীদের মধ্যে আনিয়েনস্ বলে—আপনি ধন্য ডিউক, আমি সুখী। ভাগ্যের পরিহাসে এভাবেই আপনি মানিয়ে নিচ্ছেন। এ ভাবেই বার থেকে নিঙড়ে নিচ্ছেন শিক্ষা।

কেবল উপদেশ নয়, এই অরণ্য জীবনের উল্লাস ডিউককে শিকারী করেছে, খেলুড়ে করেছে আবার আদিবাসী পশুদের জন্য তাঁকে করেছে ব্যথিত। তাই হরিণ শিকারে তিনি হন বিষন্ন।

তাঁরই ব্যথিত চিত্তের সঙ্গী ছিল জেক্স। সেও তাঁর সহচর।

তাঁর মতই বিষন্ন।

এ সময়ে ডিউক সাথীদের সঙ্গে মৃগয়ায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবার পরক্ষণেই অরণ্যবাসী পশুদের ওপর তাঁর মমতা উথলে উঠে।

তিনি বলেন—ওরা থাক ওদের নিভৃত বনচ্ছায়ে। দূর থেকে তীর ছুঁড়ে কেন রক্তাক্ত করবো ওদের।

বিষণ্ন জেক্‌সও নাকি ওই কথা বললেন। এক সভাসদ জানান, জেক্‌স বলে অত্যাচারী ডিউকের চেয়ে নির্বাসিত ডিউক কম নিষ্ঠুর নন। একদা সে এক বুড়ো ওক গাছের নিচে শুয়েছিল, হঠাৎ শরবিদ্ধ এক হরিণ সেই গাছের নিচে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখের জল মিশল নদীর স্রোতে।

জেক্‌সের মনে হল, যার বিস্তর থাকে, মানুষ তাকেই দেয় বেশী। হরিণও তাই পূর্ণ নদীর জল খাড়িয়ে দিল ক'ফোঁটা কান্নায়।

জেক্‌স আরো বললো—ওই রকমই নিয়তির বিচার। দুর্ভাগ্য সঙ্গে আনে বন্ধু-বিচ্ছেদ। জেক্‌স যখন এইসব ভাবে বিভোর, তখনই তার পাশ দিয়ে চলে যায় একদল হরিণ। সে ওদের দেখে বললো—তোমরা ফিরেও তাকাও না বন্ধুর দিকে। যাও, চলে যাও অকৃতজ্ঞের দল, তোমরা সমৃদ্ধে উজ্জ্বল। কেন বন্ধুর দিকে তাকাবে? কেন জানাবে সমবেদনা?

জেক্‌সের মুখে বিদ্রূপের ঝিলিক। দেশ-রাজ্য-নগর জীবন নিয়েই চলে তার দর্শন তত্ত্ব।

বলে—আমরা জঘন্য দস্যু, পশুদের হত্যা করেছি তাদেরই বাসভূমে। ডিউক বলে—তারপর? ওখানেই রেখে এলে তাকে?

—হ্যাঁ। সভাসদ জানায়। সে তখন কাঁদছে। দর্শন কপচাচ্ছে।

—নিয়ে চল আমাকে ডিউক জানায়। ও বিষণ্ন হলে দর্শনের কথা বলে, তখন ওকে দেখতে ভাল লাগে আমার।

তখন জেক্‌সকে আসতে দেখে চলে যায় সভাসদ।

পাঁচ

ডিউকের প্রাসাদ।

রোসালিণ্ড ও সিলিয়া চলে যাওয়ায় তিনি উত্তেজিত। ভাবছেন, কারো অভিসন্ধি আছে এর পেছনে। সত্যি এ অসম্ভব! দারুণ অসম্ভব। কেউ সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই!

এক সভাসদ বলেন—কেউ জানে না কখন গেছেন রাজকুমারী। পরিচারিকা দেখেছে, রাত্রে তিনি শয্যায়। সকালে নেই।

আরেক জন বলেন—ঐ ভাঁড়, আপনাকে যে হাসাতো, খুশি রাখত, সেও গেছে।

রাজকুমারীর প্রিয় সহচরী হিস্‌পাপিয়া শুনেছে ওর প্রশংসা করেছিলেন ঐ কিশোর যোদ্ধার। তার মতে, নির্ঘাত ওদের সঙ্গে আছে ওই কিশোর!

ডিউকের আদেশ হল—ঐ কিশোরের ভাইকে ডেকে আন, যদি না পাওয়া যায়, ওরা ভাইকে নিয়ে এস। আমি তাকে টোপ ফেলেই ওকে ধরবো। তাড়াতাড়ি যাও, ফিরে না আসা পর্যন্ত কারো মুক্তি নেই।

এই আদেশে সৈন্য ছুটলো দিকবিদিকে। পলাতক কিশোরীদ্বয়ের জন্য ডিউক উদ্‌গ্রীব। ওদিকে সিলিয়া আর রোসালিণ্ড তো আর্ডেনের বনে। অর্ল্যাণ্ডোর কি সঙ্গী হল তাদের?

ছয়

বিজয়ী অর্ল্যান্ডো ফিরছেন ঘরের পথে।

দরজার সামনে দেখল, য়্যাডাম।

সে আঁতকে উঠে বললো—ছোট কর্তা না? এখানে এলে কেন গো, কেন সৎ হলে, কেন মানুষ ভালবাসে তোমাকে, কর্তা গো, কেন ফিরে এলে বিজয়ী হয়ে? অনেক মানুষের কাছে তাঁদের গুণেই যে তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়? আহা ছোটকর্তা, তোমারও সেই দশা।

—কি হয়েছে য়্যাডাম? অর্ল্যাণ্ডোর বিস্মিত স্বর!

—খবরদার বাড়ীতে ঢুকো না! এক বাপের হয়েও তোমার ভাই তোমার শত্রু। তুমি ঘরে ঢুকলে, সে আজ রাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। তাতেও মরণ না হলে, কেটে ফেলবে টুকরো টুকরো করে।

—কিন্তু কোথায় যাব আমি?

—যেখানে হোক, এখান থেকে দূরে।

অর্ল্যাণ্ডো ডুবে গেল হতাশায়। আপন বাড়ীর অধিকার হারালো সে। আর স্থান হবে না এখানে। তাহলে জীবন চলবে কোন্ পথে। ভিক্ষুক হবো? কিংবা দস্যু? চকিতে তরবারি হানবো নিরপরাধ পথিকের মাথায়?

না-না, যা হয় হোক, বাড়ীই আমার ভাল। এখানে না হয় স্বীকার করে নেবো ভাইয়ের অত্যাচার।

এই নাও পাঁচশো টাকা। সঙ্গী নাও তোমার এই বুড়ো চাকর য়্যাডামকে। চলো অর্ল্যাণ্ডো মনে মনে বললো, হায় বন্ধু কি প্রতিদান পাবে তুমি? কিছু না। তথাপি ঘুরবো একসঙ্গে। সফর শেষে কোথাও বাঁধবো শান্তির নীড়। হয়তো সুখী হবো, মুখে বললো, চল, ঢের দেরী হয়ে গেছে।

সাত

আর্ডেনের বনে তিন পথিক।

এক অপরূপ তরুণ, এক তরুণী ও সঙ্গী তাদের এক বৃদ্ধ। কাছে আসতে চেনা গেল বৃদ্ধকে। এই ডিউক-প্রাসদের বিদূষক টাচ্‌ষ্টোন।

তবে কি ঐ তরুণ ছদ্মবেশী রোসালিন্ড ?

ঐ মেয়েটি সিলিয়া ?

চুপ, এখন ওর নাম বদলে দুই ভাই-বোন, গ্যানিমেড ও আলিয়ানা।

বহুপথ ভেঙে আর্ডেনে এসেছে ওরা ঘর বাঁধবে বলে। পেশা ওদের মেষপালক।

—চলতে পাচ্ছি না, উফ্! সিলিয়া শ্রান্ত! বলে—আর তো বইতে পারি না শরীর।

সঙ্গে সঙ্গেই টাচ্‌ষ্টোন বলে ওঠে—যদি আমার কথা বলেন, বলবো—সইতে পারি আপনাকে, বইতে পারবো না। যদি বইতেই হয়, তাতেও লাভ নেই। কেননা, আপনার টাকার থলি তো শূন্য।

পথশ্রমেও ক্লান্ত নয় বিদূষক। এখনো সজীবতা তাকে ঘিরে।

রোসালিন্ড বললো—ঐ দেখুন কারা আসছে।

এক বৃদ্ধ আর এক সুপুরুষ যুবা গভীর আলাপে মগ্ন।

ওরা কাছে এল। ওরা মেষ-পালক।

যুবকটি সিলভিয়াস। বৃদ্ধ হল করিণ। বৃদ্ধের কাছে যুবক শোনাচ্ছে তার ভালবাসার খেয়ালীপনা, ওরা গল্পে এত মশগুল, কাউকে দেখতে পেল না। চলে গেল উদ্‌ভ্রান্তের মত। রোসালিন্ডের কানে এল ওদের টুকরো টুকরো কথা। সে বললো—হায়রে মেষ-পালক। তোমার বুকের ক্ষতে টের পেলাম আমার বেদনা।

ওদিকে সিলিয়া খিদেয় অস্থির। পিপাসায় কাতর, বললো—ঐ বুড়োকে জিজ্ঞেস করো যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়। নইলে নির্ঘাত মারা পড়ব। টাচ্‌ষ্টোন ওদের ডাকলো।

ক্ষুধা পিপাসায় মূর্ছিত সিলিয়ার দিকে চেয়ে করিণ বললে দুঃখ হচ্ছে আপনার সঙ্গীনীর জন্য, আমার মনিব জানেন, রুক্ষ স্বভাবের বড় কৃপণ মানুষ। সব বেচে দিচ্ছে সে। সে এখানে নেই, তবুও আসুন, কিছু পেতে চেষ্টা করা যাক।

রোসালিন্ড জানায়—তোমার মনিবের সবকিছু কিনে নেবো আমরা। তোমাকে সঙ্গে নেব। সিলিয়া আশ্বাস দেয়, ভাল মাইনে পাবে। ওরা এগিয়ে চললো, সঙ্গে করিণ।

আট

—আর্ডেনের ঘন অরণ্য।

খাবার প্রস্তুত।

দেখা যায় আমিয়েনস জেক্‌স আর নির্বাসিত সঙ্গী সাথীদের। নির্বাসিত ডিউককে দেখা যায় না। আমিয়েনসের গলায় গান—এইখানে বনে বনান্তরে, এই বৃক্ষ ছায়ায় অলসভাবে শুয়ে কোথাও দিন কাটবে। আমার সাথে চাও যদি চলে এসো, কুজনে কুজনে পাখীর গুঞ্জনে তোমার সুর দাও মিলিয়ে, চাও যদি চলে এসো এই গানে—

শত্রু উধাও, এখানে আছে শুধু শীত, কিছু ঝড়।

জেক্‌স ওকে উৎসাহিত করে—গেয়ে যাও অ্যামিয়েনস, গাও—

—কিন্তু গান, সে তো আমাকে দহন দেয় জ্যাক।

—তাই তো চাই, গান থেকে নিঙড়ে নেবো ব্যথা। গাও—

—আমার স্বর বেসুরো—আমিয়েনসের গলা।

—তবু গাও, জেক্‌স বলে, আনন্দ নয়, ব্যথা চাই।

—বেশ গাইছি। খাবার সাজান আপনারা।

—আসছেন তিনি, তোমাকে জেক্‌স সারাদিন খুঁজছেন।

জেক্‌স জানায়—ওরে তর্ক আমার ভালো লাগে না। আমার বুদ্ধি নিয়ে আমি বড়াই করতে চাই না—যাক্‌গে তুমি গাও। ফের গান শুরু হয়—

যার চোখে স্বপ্ন উধাও।
সে জীবন হোক অরণ্যের গহনে স্বাধীনতা
শ্রম দিয়ে কিনে নেয় খাদ্যের প্রশস্ত ভাঁড়ার।
সে, সে, শুধু সেই এসো এখানে।
এই শীত, ঝড় ভরা আর্ডেনের বৃক্ষছায়ে।

*　　　*　　　*

জেক্‌স বলে, এবার আমি গান গাই? আমার কবিত্ব নেই, তবু এটা আমারই রচনা—

ধন দৌলত আর যদি সুখের জীবন ছাড়ে কেউ স্বেচ্ছায়
মূর্খের মত এখানে এলে, দেখা পাবে কত মূর্খের
অন্ততঃ এলে আমার কাছে, আমি দেখিয়ে দেবো তাকে।

*　　　*　　　*

এখনো ডিউক নিপাত্তা। গান স্তব্ধ। আমিয়েনস ছুটলো ডিউকের উদ্দেশ্যে

নয়

শান্তির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজে।

আর্ডেনের বনে এসেছে য়্যাডাম অর্ল্যাণ্ডো। য়্যাডাম পথশ্রমে ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত। মুমূর্ষু। সে লুটিয়ে পড়েছে বনের মধ্যে।

শুয়ে শুয়েই বলল—য়্যাডাম, কর্তাগো, এখানেই কবর হোক আমার। তুমি যাও।

তথাপি অর্ল্যাণ্ডো আশ্বাস দেয়, এ বনে কোথাও খাবার পেলে আনবো। মৃত্যুকে আরেকটু ঠেকিয়ে রাখো, এখুনি আসছি। শূন্য হাতে যদি ফিরি, মৃত্যু দেবো তোমায়। আর, আমার আসার আগেই তুমি মরলে, ব্যর্থ হবে আমার সব পরিশ্রম। আরেকটু বেঁচে থাক বন্ধু, একটুক্ষণ, আমি আসছি।

য়্যাডামকে ওক গাছের নিচে রেখে চলে গেল অর্ল্যাণ্ডো।

দশ

খোলা আকাশের নিচে সামান্য ফলমূল সজ্জিত টেবিল।

সভাসদেরা অপেক্ষারত, নির্বাসিত ডিউক এলে শুরু হবে ভোজ। ডিউককে আসতে দেখা যায় এ সময়। সঙ্গে আমিয়েনস।

ডিউক জেক্‌সকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করেন—সে কোথায়? একটু আগে ছুটে চলে গেল। এক সভাসদ জানায়, গান তাকে পাগল করেছে।

ডিউক যখন তাদের খোঁজের জন্য পাঠাবেন, ঠিক তখনই আসে জেক্‌স। বলে—বনের মধ্যে রঙচঙে পোষাক পরা বোকা, পেশাদার এক ভাঁড়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে সুপ্রভাত জানাতেই, সে পকেট থেকে বার করলো এক ঘড়ি। বললো—দেখুন এখন দশটা। এক ঘণ্টা আগে ছিল নটা, এক ঘণ্টা কাটলে হবে এগারটা। এমনি করেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুড়ো হব, নষ্ট হব। এই নিয়ে তার নীতি কথা শোনালো। আমি তো হেসেই খুন। বাব্বাঃ মূর্খ ভাঁড় এতো জ্ঞানী হয়?

—কেমন ভাঁড় ও? জানতে চান ডিউক।

—চমৎকার এককালে রাজদরবারে ছিল। মচমচে বিস্কুট বোঝাই জাহাজের মত মগজ ভর্তি উদ্ভট কল্পনা। হঠাৎ হঠাৎ সেগুলো আগোছালে বেরিয়ে আসে, আহ্ আমি কেন বোকা হলাম না? ঐ রকম পোশাকে নিজেকে সাজাতে বড় সাধ আমার। দেবেন আমাকে?

ডিউক বলে—দেব।

—শুধু একটি শর্ত, ভুলে যেতে হবে আপনাকে যে আমি জ্ঞানী। স্বাধীনতা পাব

অবাধ বলার। বিদ্রূপ নির্মম আঘাত হানবো হঠাৎ কাউকে। ভাঁড়ের কথায় যারা আমূল বিদ্ধ হয় তারাই হাসে বেশী।

বিদূষকের বর্ণালী পোষাক দাও আমাকে। দাও অবাধ স্বাধীনতা, আমি মুছে দেবো পৃথিবীর সমস্ত পাপ। অবশ্যই মানুষ যদি মেনে নেয় আমার ব্যবস্থা-পন্থা।

ডিউক বলে ওঠেন, হয়তো তুমি অন্যের পাপের কথা বলতে গিয়ে নিজেই করে বসবে চরম অপরাধ। যদি একবার তুমি সবাইকে বিদ্রূপ করার অধিকার পাও, তাহলে নিজের সমস্ত সঞ্চিত হলাহল ঢেলে বিষাক্ত করবে সমস্ত পৃথিবীটাকেই।

—আমার বিদ্রূপ-বর্ষণে ব্যক্তি বিশেষ নয়, সব মানুষই হবে আসল শিকার। ফলে ক্ষতি হবে না কারোর। উপকার হবে সবার। কথা শেষ হয় নি জেক্‌সের, সহসা ঢোকে খোলা তলোয়ার হাতে অর্ল্যাণ্ডো।

চীৎকার করে বলে—আমার আদেশ, খাওয়া বন্ধ কর! থাম!

জেক্‌স জানালে, সে এখনো স্পর্শই করেনি খাদ্য।

ডিউক দেখেছিলেন, সুন্দর, সুদেহী কিশোর, পরিশ্রমে ক্লান্ত ও উন্মাদনা চোখে-মুখে। বললেন, দুর্দশাই কি তোমাকে সাহসী করেছে? নাকি তোমার স্বভাবেই আছে এই অভদ্রতা?

—আমি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ভদ্রতা জানি। তবু বারণ করছি, আমার প্রয়োজন না শেষ হলে কেউ-ই খাবার ছোঁবে না।

—তবে এসো, এক সঙ্গে বসে খাও।

—এতো ভদ্রভাবে কথা বলছেন। ক্ষমা করুন আমাকে। ভেবেছিলাম, আর্ডেনের জঙ্গলে সবকিছু বন্য। তাইতো হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম, কণ্ঠে বেজে উঠেছিল কঠিন আদেশের স্বর। যাই হোক, আপনি সমৃদ্ধির সুখ যদি কোনোদিন দেখে থাকেন, যদি গীর্জার ঘণ্টা ধ্বনি শুনে থাকেন কোনদিন, অন্যের আতিথ্য যদি পেয়ে থাকেন, করে থাকেন আতিথেয়তা, যদি ঝরে থাকে সমবেদনার অশ্রু তাহলে আপনার কাছে আমি ভদ্র। এই লুকিয়ে রাখলাম আমার তলোয়ার।

ডিউক তখন ডাকলেন, এসো, তাহলে দেরী না করে খেতে বসে যাও।

অর্ল্যাণ্ডো জানালো—মৃগের যেমন শিশু, আমারও তেমন আছে এক ভালবাসার বৃদ্ধ, ক্ষুধায় মুমূর্ষু, তার খিদে আগে মেটাতে হবে।

—ঠিক আছে। তুমি যাও, তাকে না দিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা কেউই খাদ্য স্পর্শ করবো না।

আশ্বস্ত অর্ল্যাণ্ডো ছুটে চলে গেল। তার দিকে চোখ রেখে ডিউক বলে উঠলেন—দেখলে তো, একা আমরাই দুঃখী নই, আমরা যে দৃশ্যের নটনটী এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে, তার চেয়েও শোকাপ্লুত দৃশ্যও আছে।

সুযোগটা পেয়ে গেল জেক্‌স। সেও শুরু করে দিল—এই দুনিয়া এক রঙ্গমঞ্চ। পুরুষ আর নারী তো এখানে শুধুই অভিনেতা-অভিনেত্রী।

ওরা নেপথ্যে চলে যায়, আবার আসে।

একজন মানুষই বিভিন্ন ভূমিকায় এসে দাঁড়ায় মঞ্চে।

তার জীবন-নাটক তো সপ্তম অঙ্কে সমাপ্ত।

প্রথমে যে শিশু, দাই-মার কোলে শুয়ে যে কাঁদে, মুখ দিয়ে তোলে দুধ—

তারপর সে বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাততাড়ি বগলে, মুখে প্রভাতের ঝলোমলো দীপ্তি শামুকের মত গুটি গুটি চলে আর গজগজ করে—বিদ্যালয়ে যেতে নারাজ।

তারপর এল প্রেমিক—হাপরের মতো তার দীর্ঘশ্বাস, প্রিয়ার চোখ নিয়ে রচনা করে বিষাদ গাথা।

তারপর সৈনিক। মুখে বিদেশী গান—ঝাঁকড়া দাড়িতে চিতাবাঘের মত দেখায়, আত্মসম্মান সম্পর্কে হুঁশিয়ার, ঝগড়ার জন্য মুখিয়ে আছে, চট করে বাধায়ও বটে! তুচ্ছ যশের জন্য কামানের মুখেও জীবন ডালি দিতে সে পারে।

তারপরে এলেন বিচারপতি। সুগোল তাঁর ভুঁড়িটি, তাঁর জোব্বার চারিধারে ঘুষের টাকা দিয়ে মোড়া—চোখের দৃষ্টি কঠোর, কাট ছাঁট দাড়ি—যখন তখন আওড়ান সুভাষিতবলী আর মামুলি উপদেশ। এমনি করেই হাকিম তাঁর অভিনয় শেষ করেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক হল এবার। মানুষ তখন বদলে গেছে। জরাজীর্ণ সে, পায়ে চটি, ঢিলেঢালা পাতলুনে মোড়া মানুষটি, নাকে চশমা, একপাশে ঝোলে মস্ত থলে। বহু যতনে রক্ষিত, যৌবনে ব্যবহার করা মোজা তার পায়ে, অস্থিসার পায়ে সে মোজা ঢিলে হয়। তার সেই পুরুষের জোরালো সুর শিশুর দুর্বল কণ্ঠে পরিণত। কথা কয় না যেন শুস দেয়।

তারপরে সর্বশেষ দৃশ্য। ওই অদ্ভুত ঘটনা বহুল ইতিহাসের এই তো ইতি, এই তো যবনিকা। এ যেন দ্বিতীয় শৈশব। তার সঙ্গে আছে অতীতের বিস্মৃতি। দাঁত নেই, চোখ নেই, রুচি নেই—আর কিছুই নেই।

আর সেই কথা শেষ হতেই য়্যাডামকে নিয়ে ঢোকে অর্ল্যাণ্ডো তারপর শুরু হয় ভোজন। ডিউকের অনুরোধে গান গায় অ্যানিয়েনস—

বয়ে যাও ওগো, হিমের বাতাস
তুমি তো নিষ্ঠুর নও মানুষের কৃতঘ্নতার মত
তোমার দাঁত তো নয় বাঘের নখর
তোমায় দেখি না, কেবল প্রবল ঝাপটা
তোমায় কাঁপন দিয়ে যায়।
ওগো আকাশ তুমিও জমতো পাবে শীতে
তোমার নির্মমতা কি অকৃতজ্ঞের মত তীব্র অতো?
জলকে কেন বরফ করো!
তোমার ঘাতকটা কি তেমন, যেমন
বন্ধুকে বন্ধু বেভুল ভুলে হারায়—

এতক্ষণ অর্ল্যাণ্ডোর পরিচয় পেলেন ডিউক। স্যার রোল্যাণ্ডোর কনিষ্ঠপুত্র সে তিনি গুহায় আমন্ত্রণ করলেন তাকে। সেখানে বসে শুনবেন তার জীবন কাহিনী।

এগারো

ডিউকের রাজপ্রাসাদ

আর্ডেন অরণ্যানীর মুক্ত অবাধ জীবনের বদলে এখানে জমেছে অঢেল নিষ্ঠুরতা। জমেছে কত ক্রুর ষড়যন্ত্র.

ডিউকের আদেশে এসেছে অলিভার।

সে জানায়—অর্ল্যাণ্ডো'কে সে দেখেনি।

বিশ্বাস হয় না ডিউকের। তিনি শুধালেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পর তাকে দেখেনি?

—না। অলিভার ঘাড় নাড়ে।

—অসম্ভব। আমি ভদ্র মানুষ। দয়া আছে বলেই খুঁজছি তোমার ভাইকে। নইলে প্রতিশোধ নিতাম তোমার উপরেই। তাকে কিন্তু খুঁজে বার করতেই হবে। যাও, তাকে খুঁজে আন এক বছরের মধ্যে। জীবিত অথবা মৃত, তাকে না পেলে, তোমার এ রাজ্যে ঠাঁই নেই, আর ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে তোমার।

আদেশ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল অলিভার। বললো—ভাইয়ের ওপর এতটুকুও মায়া মমতা নেই আমার।

—তাহলে তো ভারী খারাপ লোক তুমি। এই কে আছো এখানে, দূর করে দাও ঐ দুর্জনকে। বাজেয়াপ্ত কর ওর সম্পত্তি। পাঠাও নির্বাসনে। হতভাগ্য অলিভার চলে যায় ধীর পায়ে—

ডিউকের কাছে আসার পিছনে ছিল লাভের প্রত্যাশা।

লাভ দূরে থাক যা ছিল তাও গেল। সে এখন নির্বাসিত, ভূমিহীন সর্বহারা।

বারো

আর্ডেনের অরণ্যপ্রান্তে দেখা গেল অর্ল্যাণ্ডোকে।

গহীন বনে রাত মোহনায় উদাস হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্ল্যাণ্ডো।

মুখ তার বিশীর্ণ, চোখের কোণে কালি। তলোয়ার নেই হাতে।

গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় সে রেখে যাচ্ছে তার ভালবাসার স্বাক্ষর!

বলছে, কবিতা, এখানে তুমি থাক আমার ভালবাসার সাক্ষী হয়ে। চাঁদ বিবর্ণ আকাশে থেকে জোছনা ছড়াও। নাম বলে দাও তোমার মৃগয়া সঙ্গিনী রোসালিণ্ডের।

সে যে আমার জীবন-ধাত্রী।

ছুটে গেল অর্ল্যাণ্ডো। প্রেম তাকে পাগল করেছে। এদিকে আসছিল বৃদ্ধ করিণ ও টাচ্‌ষ্টোন।

—মেষপালকের জীবন কেমন লাগছে? প্রশ্ন করলো করিণ।

টাচ্‌ষ্টোন বললো—মেষপালকের জীবন বিচ্ছিরি। তবু আমার ভাল লাগে এ নিঃসঙ্গ জীবন। আবার সমাজ-জীবন নেই বলে খারাপও লাগে। এই খোলা-মেলা জীবন আমার প্রিয়, আবার রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে আছি, অসহ্য একঘেয়ে লাগে। আসলে, এই মিতাচারী জীবন ভাল লাগলেও প্রাচুর্যহীনতা আমার পেটে ঠিক সহ্য হয় না। তা, তোমায় কেমন লাগে বললে না তো?

তখন করিণ বললে—অসুখ হলে মানুষের মনে সুখ থাকে না। অসুখ মানেই অভাব। অর্থ-বিত্তের অভাব, সঙ্গতি ও আনন্দের অভাব। এই তিনটি অভাবই ডেকে আনে অসুখ। বৃষ্টি আসে মাটি ভিজিয়ে। আগুন আসে পুড়িয়ে। ভাল মাঠে পুষ্ট হয়ে ওঠে ভেড়ারা। সূর্যের অভাবে রাত নামে। প্রকৃতির কাছে কত কিছু শেখা যায়।

—বাঃ, তুমি তো জন্ম দার্শনিক। টাচ্‌ষ্টোন শুধায়—দরবারে গেছ কখনো?

—না।

—তাহলে আর আশা নেই।

—কেন?

—সহবৎ-ই শিখলে না এখনো।

—দরবারে যাইনি বলে?

দরবারে জায়গা না পেলে সহবৎ শিখবে কি করে? সহবৎ না শিখলে ভদ্র হবে কি করে? অভদ্রতা মানে পাপ। আর পাপে নরক বাস।

এইবার ওরা যখন পরস্পরকে বৃদ্ধ করেছে প্রশ্নবাণে, তখন একখণ্ড চিরকুট পড়তে পড়তে আসে রোসালিণ্ড।

চিরকুট লেখা—পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে খুঁজে বেড়াও আরেক প্রান্ত। কোথাও পাবে না রোসালিণ্ডের মত অরূপ-রতন। তার নাম হাওয়ার ডানায় ভর করে উড়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে। কোন সুন্দর ছবিও তার সমকক্ষ নয়। আমার স্মৃতিতে আর কোন মুখ নয়, যেন থাকে শুধু তার মুখচ্ছবি।

লেখা শুনে টাচ্‌ষ্টোন ফোড়ন কাটে, আরে, এ গান তো গয়লা বৌদের বাজারে চলার ঢঙে। সুষমা নেই। গতি নেই—

—চোপ মূর্খ দূর হও। ধমক দেয় রোসালিণ্ড।

ধমকে দমে টাচ্‌ষ্টোন। বলে—বহুত আচ্ছা, এখুনি শুনিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা নমুনা।

বিহঙ্গ বিহঙ্গী খোঁজে
খুঁজি আমি রোসালিন্ড,
ম্যাও চাও ম্যাও গিন্নী
আমি চাই রোসা
ফসল যারা কাটে, বাঁধে আঁটি
রোসা নিয়ে গাড়ি চলে গুটি গুটি
মিষ্টি ফলের বাইরেটা টক
রোসাও তেমন বাইরেটা টক।
ভেতরে মিষ্টি

ইস্, অমন কাব্যি করে নিজের রুচি নষ্ট করছেন।

—চুপ, এগুলো আমি গাছে পেয়েছি। গাছে গাছে ফল ধরেছে।

সিলিয়া কি পড়তে পড়তে এদিকে আসছে। তার হাতেও অনুরূপ চিরকুট। সে পড়ে যায়—তিলে তিলে রোসা তিলোত্তমা, ঈশ্বরের আশীর্বাদে হেলেনার রূপ আর মন তো সেই নয় ক্লিওপেট্রার মহিমা যেন। আতালান্তার ভঙ্গী এবং বাকী যা কিছু নম্রতার লুক্রেশিয়ার।

এবার সিলিয়া টার্চস্টোন আর করিণের দিকে তাকালেন—এখন তোমরা যাও।

চলে গেল ওরা।

মুখোমুখি হল দুই সঙ্গী।

—শুনলে তো? সিলিয়া শুধায়। তোমার নাম এখন গাছে গাছে, বাকলে বাকলে খোদিত। অবাক হওনি?

—লোকটা কে বলতো?

—ওমা, তুমি এখনো জান না?

—বল না, কে সে!

—চার্লসকে হারিয়ে যে পালোয়ান জিতে নিল তোমার হৃদয় আর গলার হার।

—অল্যার্ন্ডো?

—হ্যাঁ, অল্যার্ন্ডো।

—এখানে কোথায় সে, কেমন আছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কিছু বললো?

—আরে, আগে বলতে দাও আমাকে।

—বেশ, বলো তবে।

—এক গাছের নীচে খসে পড়া ফলের মত পড়েছিল সে।

—সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের গাছ। রোসালিন্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—চুপ, সিলিয়া দেখালো। ঐ তো ও আসছে।

—তাইতো কি আশ্চর্য! চল আমরা সরে যাই।

ওরা সরে যায়। জায়গাটা অধিকার করে নেয়—জেক্‌স আর অর্ল্যাণ্ডো।

জেক্‌স বলে—সঙ্গ দিয়ে আপনি আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে, নিঃসঙ্গতা আমার ভাল লাগে।

আমারও একই অনুভব, অল্যাণ্ডো জানায় ভদ্রতার খাতিরেই ভালো লাগে আপনার সঙ্গ।

—অতএব বিদায় বন্ধু যত কম দেখা হবে, ততই ভাল।

—বরং অচেনা থাকলেই ভালো হত।

—একটা অনুরোধ, গাছের ডালে, পাতায়-ফুলে থাকলে যা তা গান কবিতা লিখে ওগুলো নষ্ট করবেন না।

—একটা প্রার্থনা, আমার কবিতা এনে অমন বিচ্ছিরি করে পড়বেন না।

—মশাই-এর একটাই খুঁত, মশাই প্রেমে পড়েছেন।

—সেই খুঁতই মশাইয়ের মহৎ গুণ।

—আমি একটা বোকা লোক খুঁজছিলাম, হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা।

—খুঁজে দেখুন সে জলেডুবে মরেছে।

জেক্‌স তো থ। আরে সেখানে নিজের ছায়া ছাড়া আর কিছুই যে দেখতে পাবো না।

—সেই ছায়াই তো গণ্ডমুর্খ বোকার।

—দূরে মশাই, আর বাতচিত না আপনার সঙ্গে। চলি, শ্রীযুক্ত প্রেম।

যাক্, আমিও রেহাই পেয়েই বাঁচি, আমি শ্রীযুক্ত বিষাদ।

জেক্‌স চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের আলাপন শুনতে থাকা দুই সখী এসে হাজির।

সিলিয়াকে কানে কানে রোসালিণ্ড বললে—বদমাইস চাকরকে যে ভাবে কথা বলে, আমরাও সে ভাবে কথা বলবো কেমন ?

তারপর ডাকল—ওহে বনচারী।

—বল, কি চাই ? অল্যাণ্ডো জবাব দেয়।

—তোমার ঘড়িতে এখন ক'টা ?

—উঁহু, বলা উচিত "বেলা কত,, বনে তো ঘড়ি সেই !

—খাঁটি প্রেমিকও নেই। রোসালিণ্ড বলে—খাঁটি প্রেমিক থাকবে প্রতি মুহূর্তের হাহাকারে প্রতি ঘণ্টার দীর্ঘশ্বাসে ধরা যেত সময়ের মৃদু পদক্ষেপ।

—মৃদু ? সময়ের পদক্ষেপ মৃদু কেন ?

—সময় ? হাসল রোসা, বিভিন্ন মানুষের কাছে সময় চলে বিভিন্ন রকম। কারো চলে হেলে দুলে দুলকি চালে, কারো চলে হোঁচট খেতে খেতে, কারো লাফিয়ে ছাপিয়ে। আবার কারো সময় একদম অচল, থুরথুরি বুড়ি।

—যেমন ? উদাহরণ চাই।

রোসালিন্ড বোঝাতে থাকে—বিয়ে ও বাগদানের মাসে কিশোরীদের সময় কাটে বড় ঢিমে তালে। সাতদিন যেন সাত বছর মনে হয়।

—কার সময় কাটে দুলকি চালে?

—যে শাস্ত্র পড়েনি, লাতিন জানে না যে পাদ্রী এবং বুড়োর গেঁটে বাত নেই—তাদের। কেন জানেন? পাদ্রীটিকে নড়তে হয় না তাই ঘুমেতে বিভোর হয়ে। বুড়ো মানুষটি ব্যথা পান না বলেই স্বচ্ছন্দে কাটান সময়। ব্যর্থ জ্ঞানের বোঝা চাপেনি একজনের মাথায়, অন্যজনের মাথায় নেই দারিদ্র্যের কশাঘাত। তাদের সময় তাই চলে দুলকি চালে।

—লাফিয়ে চলে কার সময়?

—ফাঁসি যাবে যে। সময় যত আস্তেই চলুক, সে তো জানে, কত দ্রুত পৌঁছে যাবে ফাঁসি কাঠে।

—সময় কার অচল অনড়?

—উকিলের। কাছারি বন্ধ যাবে যখন, কাজ কারবার থাকে না কিছুই, তখন সে ভুলেই যায়, ঘড়িটা বন্ধ হ'ল কিনা।

—বাহ, বেশ তো। 'তা মশাইয়ের নিবাস কোথায়?

—এই বনের ধারেই। সঙ্গে আছে রাখাল বোনটি।

—আশ্চর্য এই বনেই থাকেন। অথচ উচ্চারণ এত স্পষ্ট মার্জিত যেন অনেক দূরে থাকেন।

—অনেকেই এই ভুল করে। আসলে আমার শহুরে কাকাই শিখিয়ে ছিলেন। প্রেমে পাকা-পোক্ত মানুষ। তবু পড়েও ছিলেন। তবু কত বক্তৃতা দিতেন প্রেমের বিরুদ্ধে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মেয়ে নই যে বোকামি করবো মেয়েদের মত।

—মেয়েদের মস্ত কি বোকামির কথা বলেছিলেন মনে পড়ে?

—বোকামির বড় ছোট নেই মেয়েদের—সব ডাবল পয়সার মত অবিকল একরকম।

—বল না, দু'একটা শোনা যাক, কি রকম।

—উঁহু, প্রেম-পাগল মানুষদের বলে কেন বৃথা সময় অপচয় করবো? বরং বনে যে মানুষটা গাছ প্রান্তরে ফুলে পাতায় রোসার নাম খোদাই করে বেড়াচ্ছে তাকে পেলে কিছু বলা যেত।

—আমি সেই পাগল প্রেমিক অর্ল্যান্ডো। ওই দাওয়াই বাতলে দেবে তোমাকে?

ওর দিকে তাকিয়ে ছদ্মবেশী রোসালিন্ড মাথা নাড়ে—উঁহু, কাকা যে লক্ষণগুলো বলেছিলেন সেগুলো তো ঠিকঠাক মিলছে না। যে প্রেমিক হবে তার পোষাক, শরীর ও চারপাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হবে; হবে খেয়ালী, আত্মমগ্ন, এলোমেলো ভাব-ভঙ্গীর হেলাফেলা পোষাকের বিষণ্ন মানুষ। তুমি সেরকম নও। তুমি নিজেকেই ভালবাস। অন্যকে নয়।

অর্ল্যান্ডো শত চেষ্টা করে বোঝাতে চায় যে সে রোসাকেই ভালবাসে।

রোসা শুধোয়—তুমি কবিতার মত ভালবাস ?

—হায় নারী। কবিতা বা কোন যুক্তি দিয়ে কি তা বোঝান যায় ?

অবশেষে রোসা জানায়—এ রোগের দাওয়াই সে জানে।

তক্ষুনি বলে ওঠে অর্ল্যাণ্ডো—দরকার নেই আরামের।

বেশ তবে, রোসালিণ্ড মুচকে হেসে বলল, রোজ যদি আমাদের কাছে আসতে, আমাকে রোসালিণ্ড বলে ডাকতে রাজী থাক, তাহলে তোমাকে সুখ দিতে পারি। তুমি এসে কেবল প্রেম করবে আমার সঙ্গে।

অর্ল্যাণ্ডো তাতেই রাজী। এই খেয়ালী প্রেম প্রেম খেলায় যে তার রোগ মুক্তি নয়, নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে প্রিয়তমার।

তের

আর্ডেনের বনাঞ্চলে আজ কি মধুমাস।

জানি না। গাছে গাছে, ডালে ডালে ফুল ফুটুক, না ফুটুক, বসন্ত এসেছে আজ নর-নারীর মনে।

প্রেম প্রেম খেলায় বিভোর অর্ল্যাণ্ডো ও রোসালিণ্ড।

আর এই বনেরই অন্য প্রান্তে নির্বোধ টাচ্‌ষ্টোনের বুকেও ঝরছে মধুমাসের বসন্ত নির্ঝর।

রাখালিয়া অড্রেকে সে বেঁধেছে ভালবাসার শপথে।

অড্রে বোঝে না কবিতা।

তবু তাকে কাব্য শোনায় টাচ্‌ষ্টোন। অদূরে অন্তরালে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলে জেক্‌স।

এ যেন বেণু বনে মুক্তা ছড়ানো। এতে দুঃখ পায় টাচ্‌ষ্টোনও।

বলে, কাব্যে কারো যদি তারিফ না পেলে, যদি সমজদার না জুটলো চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত কথার, তবে সেটা সরাইখানায় আমার হাজার টাকা থাকার মত হবে না ? ইস্‌ অড্রে, তুমি যদি একটু কাব্যময়ী হতে ?

—কাব্যময়ী ? অবাক হয়ে অড্রে বলে—সেটা কি গো ? কথায় কাজে ভাল হওয়া না কি······

—যাঃ, টাচ্‌ষ্টোন বলে, কবিতা হল কল্পনা, বুঝলে ? প্রেমিকারা কবিতার ভাষায় প্রেম নিবেদন করে—আসলে তাদের কোনো অনুভূতি নেই।

—তবু কাব্যময়ী হতে বলছো আমাকে ?

—তবু বলছি।

—আর আমি যে দেবতাদের কত বলি, আমাকে, ভাল মেয়ে করে দাও······

—তা ঠিক—তবে…তবে কি জান, কোন খারাপ কুশ্রী মেয়েকে সৎ স্বভাব করা যা, নোংরা প্লেটে ভাল মাংস পরিবেশন করাও অনেকটা সেরকম।

—আমি সুচ্ছিরি না হতে পারি ! নোংরা নয়। অড্রে ক্ষেপে ওঠে।

তাকে শান্ত করে টাচ্‌ষ্টোন্—জান, পাদ্রীর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই এখানে আসতে বলেছেন। আমি তোমাকে বিয়ে করবো অড্রে।

পাদ্রীর নাম স্যার অলিভার মাকেটসট।

তাকে দেখে বলে ওঠে টাচ্‌ষ্টোন. আসুন আসুন, এই গাছ তলায় বিয়ে হবে নাকি গীর্জায় যেতে হবে আমাদের ?

—কিন্তু এখানে মেয়েকে কে সম্প্রদান করবে ?

পাদ্রীর প্রশ্ন শুনে নারাজ হয় টাচ্‌ষ্টোন, না না মশাই, কারো হাত থেকে ওকে দান হিসাবে নিতে পারবো না।

—কি মুশকিল ! দান হিসাবেই তো নিতে হয়।

—নইলে বিবাহ সিদ্ধ হবে কি করে ?

ঠিক সময়েই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জেক্‌স বলে, আমিই সম্প্রদান করবো কনেকে। তবে বিয়ে হবে গীর্জায়। এখানে ভিখারীর মত নয়। ভাল পাদ্রি ডাকি, তিনি বুঝিয়ে দেবেন বিয়ে কত পবিত্র। এই পাদ্রীকে দিয়ে হবে না।

খুশী ছিল টাচ্‌ষ্টোন।

এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়—অন্য পাদ্রী কেমন হবে কে জানে।

এই পাদ্রীটা বোধহয় ডাল। ব্যাটা কিছু জানে না। ভাল বিয়ে দিতে পারবে না। ফলে বনিবনা না হলে, পরে বিচ্ছেদটা সোজা হবে।

এই ফাঁকে জেক্‌স তার স্বগতোক্তি শুনে ফেলল। বললো—ঠিক হ্যায়, তোমাকে দারুণ বুদ্ধি বাতলে দেবো, চলো।

অগত্যা টাচ্‌ষ্টোন ডাকে, এসো অড্রে। আমরা বিয়ে করতে যাই গীর্জায়। চলি পাদ্রী সাহেব।

তুমিও কেটে পড়, পাদ্রী তো চটে লাল।—বয়েই গেল ! হুঁ, তোমরা বিয়ে না করলে কি ঘুচে যাবে আমার পাদ্রীগিরি ?

চৌদ্দ

আর্ডেনের অরণ্য প্রান্তরে পর্ণ কুটিরে আলাপে বিভোর সিলিয়া ও রোসালিন্ড।

এখনো দেখা নেই অর্ল্যান্ডোর।

রোসালিন্ড অধীর প্রতিক্ষায় স্তব্ধ।

—এমন পবিত্র মানুষটি ! রোসো বলে ভোরে আসবে বলে এখনো এল না কেন ?

তোর কি মনে হয়, ওর ভালবাসা সৎ নয় ?

সিলিয়া হাসলো—ভালোবাসা সৎ, তবে আমার মনে হয়, ভালই বাসেনি।

—তবে যে শপথ করলো।

—ও তো মাতালের প্রলাপ। প্রেমিক ও মাতাল দুজনেই ভুল কথা নিয়ে লড়ে।

রোসার তো প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

বিদ্রূপে সিলিয়া হাসে।

বলে—চমৎকার পুরুষ। চমৎকার শপথ করেন, চমৎকার ভাবেন, প্রিয়ার হৃদয় নিয়ে ভাবেন না—

শিলিয়ার কথার শেষে বৃদ্ধ করিণ আসে।

সে বলে, যদি তোমারা প্রেমে পাগল মেষপালক ও তার প্রেমিকাকে দেখতে ইচ্ছা করো, তবে চলো আমার সঙ্গে। সে এক সুন্দর ছবি। একদিকে গনগনে রাঙা ঘৃণার আগুন, অন্যদিকে অপার্থিব প্রেমের মলিন ইশারা।

লাফিয়ে ওঠে রোসা। সে রাজী। বলে—চলো, আমরা দেখতে যাই। প্রেমের নাটক আমাকে কি ভূমিকায় রেখেছে।

পনের

সিলভিয়াস, তরুণ মেষপালককে ; পাঠক, আমরা আগেই চিনেছি। এবার আর্ডেন প্রমোদোদ্যানে দেখবো তার প্রিয়ংবদা ফিবিকে।

সিলভিয়াস স্বভাব কবি। নাগরিক নয় সে, জানে না ছলাকলা। তাই তার ব্যাকুল আত্মনিবেদনে সরল সহজে কবিতা দুলে ওঠে।

ফিবির হাতে ধরে সে বলছে—বলতে পার, ভালবাসো না ঘৃণা করো আমাকে। তবু মিষ্টি করে বল, যায় যদি প্রাণ যাক না। আঘাত করতে ক্ষমা চেয়ে নেয় জল্লাদও। তুমি কি নির্মম হবে তার চেয়েও ?

এ সময়ে ঢোকে রোসালিণ্ড, সিলিয়া এবং করিণ। ওরা দেখতে পায় না।

—এ মা, তোমার জল্লাদ হবো কেন ? ব্যথা দেবো না বলেই তো ভুলতে চাই তোমাকে। তুমি না বলতে, আমার নয়ন মানুষ খুন করতে পারে ? কি মিথ্যে ! চোখ ফুলের পাপড়ির মত এত কোমল—আবার সেই চোখ কিনা কসাইয়ের মতো খুন করে মানুষ।

এই তো চোখ কোঁচকালাম—কই, তুমি তো মরে গেলে না। অন্ততঃ মরার মত চিৎ হয়ে পড়ে যাও—কই পড়লে না তো ? তাহলে দোষ দিও না এই চোখের দুয়ো দিয়ো না। মিথ্যুক। আমার চোখ তোমার বুকে চোট দেয় না, চোখের সে তেজ আমার নেই।

অলক্ষ্যে, এই নিষ্ঠুর কথা শুনে নিশ্চুপ থাকতে পারলে না রোসালিণ্ড।

বেরিয়ে এসে বললো—কে তুমি ? কার আত্মজা যে এমন অহংকারে কথা বল ? ঘৃণা কর নিষ্পাপ ফুলকে ? নিজে তো নয় সুন্দরী, তবে কেন, কিসের গর্ব তোমার ? উঁহু, অমন দৃষ্টিতে তাকিয়ো না, ভেবো না, তোমার ঐ কালো ভুরু, কুঞ্চিত চুল, বিবর্ণ নরম গাল ঐ কালো চোখের তারা মন ভোলাবে আমার।

আহারে নির্বোধ রাখাল, কেন যে তুমি, ওর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছো।

রোসালিণ্ড আরো অনেক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। ফিবি শুনছিল না। অর্ল্যাণ্ডোকে ঘিরে তার নয়ন মুগ্ধতায় স্থির।

সে খানিক পরে, আস্তে আস্তে বলে, ওগো মিষ্টি মানুষ, যতই গালাগাল দাও, তবু জেনো, ওর ভালবাসার চেয়ে আমার বেশী পছন্দ তোমার ঐ সুবর্ণ গালটিকে।

রোসা তৎক্ষণাৎ রেগে বলে, ওহে জানোতো, মাতাল ভুল বকে, আমিও কি তার চেয়েও বেশী। আর সত্যি, তোমাকে ভাল লাগবে না আমার। তার চেয়ে রাখালকে চটপট বিয়ে করে ফেল।

এরপর সিলিয়ার দিকে চেয়ে বললো—রোসা, চল এবার যাই আমরা।

ওরা চলে যেতে ফিবি বলে উঠল, এতক্ষণে মনে বাজল ঐ কথাটি, প্রথম দর্শনেই জন্ম নেয় ভালবাসা।

—ফিবি, কেঁদে ফেললো সিলভিয়াস।

—কি বলছো ?

—দয়া কর আমায় প্লিজ ফিবি।

—দয়া ? তোমার জন্য দুঃখ হয় আমার। চলে যাক, আমার দুঃখ, যত হতাশা।

—আমি কিন্তু বন্ধুত্ব চাই না। চাই স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে।

—সেই তো তোমাব লাভ। ভেবে দ্যাখ্যো, আগে ঘৃণা করতাম, এখনো তোমাকে ভালবাসি না, তথাপি তুমি কাছে আছ আমার, এইটুকুই সুখ।

—ঐ চ্যাংড়াটিকে চেন নাকি। ফিবির প্রশ্ন।

—চিনি না। এ বনে জায়গা, বসতবাড়ি কিনেছে—প্রায়ই দেখতে পাই।

—তুমি ভেবো না ওর প্রেমে পড়েছি। ফিবি বলে যায়। ছোকরাকে না দেখলে যে কোন মেয়েই প্রেমে পড়তে পারে। তবে আমি তেমন নই। আমি ওকে ঘেন্না করবো, একটুও ভালোবাসবো না।

—দেখ না, আচ্ছা করে একটা চিঠি লিখব অনেক অনেক গালাগাল দিয়ে, হ্যাঁ ভাল কথা, চিঠিটা তুমি ওকে পৌঁছে দেবে তো ?

—নিশ্চয়ই খুশী হয় সিলভিয়াস।

—চল, সিলভিয়াস চল, এক্ষুনি লিখে ফেলতে হবে চিঠিটা, মাথার মধ্যে কিলবিল করছে কথাটা।

চৌদ্দ

শহুরে কোলাহল ছেড়ে দূরে গড়ে উঠেছে সহজ স্বচ্ছন্দ গতিবাহিত এক সামাজিক পরিবেশ।

যেখানে কুটিলতা হানেনি আঘাত। কৃত্রিমতা দেয়নি স্পর্শ অভিশাপ।

সেই পরিবেশ, রোসালিণ্ডের কুটিরে এসেছে আজ জেক্‌স।

এসেই সে বললে—সুন্দর যুবক, এলাম ভাল করে আলাপ জমাতে।

—মশাই তো শুনেছি ভাবুক। মুখ খোলেন না। ছদ্মবেশী রোসালিণ্ড মসকরা করে।

—ঠিক বলেছ। হাসির বদলে ওটাই আমার পছন্দ।

—বেশী হাসি কিংবা বেশী বিষণ্ণতা দুটোরই পরিণাম খারাপ।

—আমার ভাল লাগে ভাল গম্ভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আর নিজস্ব বিষণ্ণতা? বহু উৎস থেকে জন্ম তার। আমার বহু ভ্রমণ ও ভূয়োদর্শনের ফসল। চোখ বুজলেই আমার মন ভরে যায় ঐ সব খেয়ালী বিষণ্ণতার যাদুস্পর্শে।

রোসালিণ্ড বললে— মশাই তবে ভ্রমণবিলাসী। তা আমার মশাই এক কথা, বোকা হয়ে হাসবো, কদাচ অভিজ্ঞ হয়ে মুখ ঢাকবো না বিষাদে।

হঠাৎ ছেদ পড়ল আলাপে ঢুকলো অল্যাণ্ডো ঢুকেই বললো—রোসা, এদিন শুভ হোক প্রিয়া।

জেক্‌স উঠে পড়ল—কাব্য করে কথা বললে আমি থাকি না।

জেক্‌স যেন পালিয়ে বাঁচল।

—তারপর আর্ল্যাণ্ডো, অভিমানী মুখে রোসা বলে উঠলো—নিজেকে তো প্রেমিক ভাবা হয়। এত দেরী করলে আর এসো না এখানে।

—রোসা প্রিয়া, প্লিজ ক্ষমা কর। আর্তনাদ করে ওঠে অল্যাণ্ডো।

—বেশ এসো। শুরু করা যাক প্রেমালাপ। ধর, আমি রোসালিণ্ড তোমাকে চাইছি না, তুমি কি করবে?

—মরবো।

—না না, মরতে হলে অন্য কেউ মরুক, তুমি নও। এ পৃথিবীর বয়স হাজার বছর, এখনো কেই মরেনি প্রেমের বিষে। প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন ট্রেজান বীর টয়লাস।

কিন্তু মরলো শেষে এক গ্রীকের দণ্ডাঘাতে। একরাতে স্নান করতে গিয়ে শেষে মরেছেন আদর্শ প্রেমিক আথিন্দোস। যিনি হৃদয় দিয়েছেন রাজা লিয়াদার দেবদাসী হেরাকে। যদিও ঐতিহাসিকরা বলেন, হেরার প্রত্যাখ্যানই তাকে ঠেলে দিয়েছে

মৃত্যু পথে।

তাহলে দেখ, মানুষ মরে, তাদের শরীর কুরে খায় কীটে, কেউ মরে না ভালবাসায়।

অল্যার্ণ্ডো শুধায়—আমার আসল রোসা এই কথা বললে ভাল লাগতো কি আমার ? তার নিষ্ঠুর কথাতেই কত সহজে ঘটতে পারে আমার মৃত্যু।

হাসলো রোসালিণ্ড—এই হাত সাক্ষী, একটি মাছিও হত্যা করবো না আমি। এখন এসো, আমি হবো তোমার রোসালিণ্ড। যা চাও, তাই পাবে।

—রোসা, আমায় দাও ভালবাসা। অল্যার্ণ্ডো কেমন গদগদ হয়ে যায়। সপ্তাহের প্রতিটি দিন তোমায় দেব আমার উষ্ণ ভালবাসা। আমাকে তুমি স্বামী হিসাবে চাও না ?

—চাই—তোমাকে চাই, তোমার মত হাজারটাকে চাই।

মানে ? অল্যার্ন্ডোর চোখ ছানাবড়া।

—তোমার কি স্বামীত্বের যোগ্যতাও নেই ?

—কেন থাকবে না ?

—তবে ? ভাল জিনিস যত পাব ততই ভাল। এই বোনটি, আয়না, পাদ্রী, সেজে বিয়ে দে আমাদের।

তক্ষুণি রাজী সিলিয়া। কিন্তু বিয়ের মন্ত্র যে তার অজানা। কি হবে ?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, রোসালিন্ড বলে, শিখিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ তুমি কি অলার্ন্ডো পত্নী বলে গ্রহণ করতে চাও রোসালিন্ডকে।

—চাই অল্যার্ন্ডোর উদ্‌গ্রীব জবাব।

—কখন ?

—যত দ্রুত পদ্রী বিয়ে দেবে আমাদের।

—তবে বল, আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করলাম রোসালিন্ডকে।

—রোসালিন্ড, স্ত্রী রূপে তোমাকে গ্রহণ করলাম।

—আমি অল্যার্ণ্ডো, তোমাকে পতিরূপে বরণ করলাম।

মেয়েটি পাদ্রীর চেয়ে কাজ সারল দ্রুত। বললো, অল্যার্ণ্ডো, এখন বলো তুমি কতদিন ভালবাসতে রোসালিণ্ডকে ?

—চিরকার—চিরকাল !

উঁহু অল্যার্ণ্ডো, চির বলো না, বলো একদিন। বলে যায় রোসালিণ্ড। এসব ভাবালুতা ক্ষণস্থায়ী। সত্যিও নয় পুরোপুরি, মিথ্যেও নয়। বোঝাতে চায় কথাটার ভিতর কতখানি শূন্যতা ঢক্ ঢক্ করে বাজছে। অল্যার্ণ্ডো মানতে রাজী হয় না। চলে যুক্তি গড়া, যুক্তি-ভাঙা খেলা। সময় বয়ে যায়, এক সময় উঠতে হয় অল্যার্ণ্ডোকে।

—ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে, ডিউক ডেকেছেন ভোজে, যেতেই হবে। ফিরবো

ঘণ্টার সময়।

—হায়, ঘণ্টা দুই যে কত দীর্ঘ সময়। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রোসালিণ্ড। যা খুশী কর, যাও যেখানে খুশী। ইস আমার কেন মরণ হয় না?

—লক্ষ্মীটি এখন আসি।

চলে যায় অর্ল্যাণ্ডো। সিলিয়া ছিল এতক্ষণের নির্বাক দর্শক।

এবার সে বললো—সই, এতক্ষণ ধরে মেয়ে হয়ে মেয়েদের কাঁধে কি দারুণ অপবাদ চাপালে বলতো।

—তুই জানিস না সিলিয়া। ভালবাসায় আমি তলিয়ে গেছি কোথায়। ভেনাসের ঐ প্রেমের দেবতা ঐ কিউপিডই বলুক, কত গভীর এই প্রেম। যাই, আলিয়েনা—ছায়ার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি ওর কথা। চলে যায় পুরুষবেশিনী রোসালিণ্ড।

একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে সিলিয়াও চলে যায়। মেঘ-মেদুর শূন্যতা যেন তাকেও গ্রাস করেছে।

সতের

অরণ্যপ্রান্তে নির্বাসিত ডিউকের সভাসদ আজ উল্লসিত।

কেন না, ভোজন টেবিলে আজ পরিবেশিত হবে ফল-মূলের বদলে মৃগ-মাংস!

ডিউককে পরিচিত করানো হবে শিকারীর সঙ্গে। মুক্ত প্রকৃতির সন্তান বনবাসীরা এত তুচ্ছ উৎসবকে আন্তরিকতায় ভরিয়ে নেবে গানে গানে।

গম্ভীর মুখের জেক্স এসে দাঁড়ালো এই উৎসবে। মৃত হরিণ দেখে বললো—কে হত্যা করেছে একে?

—আমি, কে এক সভাসদ বলে ওঠেন।

—এসো, ওকে বিজয়ী রোমান বীরের সম্মানে নিয়ে যাই ডিউকের কাছে। ওর মাথায় পরিয়ে দিই মৃত হরিণের দুই শিং। ওহে বনবাসী, তোমাদের গান বাঁধা হয়েছে উৎসবের?

—হয়েছে, সবাই চেঁচিয়ে বলে।

বিদ্রূপে মুখর হয় জেক্স—তাহলে শুরু করে দাও, সুর থাক না থাক, সোরগোল উঠুক।

শুরু হলো গান। কবিত্বহীন। ছন্দ তার যেমন, অভাব তেমনি।

হরিণ শিকারী কি চায় পুরস্কার?

হরিণের চামড়া পরতে চায় কি? আর শিং মাথায় দিতে?

এই তো শিরোপা-উপহার—তোমার জন্মের আগে।

তোমার পূর্বপুরুষ পরতেন যা।

তোমার বাবাও পরেছেন—ঐ শিং শিং শিং।

শিং নিয়ে কোরো না কোন ঠাট্টা।
ওর গলা মিলিয়ে উদ্দাম হয়।
গান চলতে থাকে।

আঠারো

কথা দিয়েছিল, দুটোর সময় আসবে অল্যা'ন্ডো।

দুটো বেজে গেছে দেখা নেই তার। উতল আবেগে অধীরা রোসালিণ্ড।

ফুট কাটে সিলিয়া—আমার কি মনে হয় জান, দুরন্ত হৃদয় ও অগ্নিশুদ্ধ প্রেম নিয়ে তিনি এখন হয়তো তীর ধনুক ফেলে গভীর ঘুমে অচেতন। রোসা কে যেন এদিকে আসছে।

রোসালিণ্ডের মুখে মুহূর্তের জন্য আলো জ্বলেই নিভিয়ে দিল আকাঙ্ক্ষিত সিলভিয়াস। সে সঙ্গে এনেচে ফিবির চিঠি।

ওকে চিঠি দিয়ে বললো—ফিবি দিয়েছে। জানি না ভিতরে কি আছে। অনুমান করি হয়তো উষ্মা। লেখার সময় ফিবির মুখ ছিল আষাঢ়ের মেঘের মত। আমি পত্রবাহক মাত্র। কোন দোষ নেই আমার।

চিঠি পড়ে জ্বলে উঠল রোসালিণ্ড। উফ্! এ চিঠি পড়লে ধৈর্যের সীমা থাকে মানুষের কি? আমি কুচ্ছিত! অভদ্র! পৃথিবীতে আমি একমাত্র পুরুষ হলেও ও আমাকে রিফুউজ করতো? আমি কি ওর প্রেমপ্রার্থী? কেন লিখেছে ও এ চিঠি? রাখাল, এ চিঠি তোমার লেখা নয় তো?

—সত্যি, লিখিনি আমি, কি লেখা তাও জানি না। সিলভিয়াস জানালো।

—তুমি যে কি করে ওর সঙ্গে প্রেম কর? ক্রোধে বলে যায় রোসা। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখছো—ত্বক যেন পশুর চামড়া, রঙ ইটের মত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি দস্তানা পরিহিত। কিন্তু না, ওই তার আসল রং। সে যাকগে, এটা নিশ্চয়ই ওর জবানে কোন পুরুষের লেখা।

—উঁহুঁ, সিলভিয়াস প্রতিবাদ করে, ফিবিরই লেখা। শুনেছি ফিবি বড় নিষ্ঠুর, কি লিখেছে সে।

রোসালিণ্ড শোনাতে থাকে—

রাখাল বেশে তুমি এলে কোন দেবতা
কেন অহেতুক কুমারী মনে জ্বাল তপ্ত জ্বালা
সুষমা ভেঙে হে দেবতা, কেন মানুষ হলে
কিশোরী হৃদয়ে এতো দুঃসহ কান্না দিলে।

—এ তো ভর্ৎসনা নয়। সিলভিয়াস বলে ওঠে। কে দিয়েছে এমন গালাগাল?

সরোষে রোসালিণ্ড বলে—কি ভেবেছে ও? আমি কি জানোয়ার? মানুষ নই

তুমি গাল দিলে, ভালবাসা হয়
চোখের ঘৃণায় ঘুম ভাঙে প্রেম
এলে তোমার চিঠি, হায়, কি যে করতো,
কি যে করতো আমার।
তুমি কথা বললে, হেসে, আহা, না জানি
ঘটতো কী যে আমার।
চোখের ঘৃণায় ঘুম ভাঙে প্রেম
তুমি গাল দিলে, ভালবাসা হয়···

—এই কি গান ? বলে ওঠে সিলভিয়াস

সিলিয়া বলে ওঠে আচম্বিতে—বেচারী রাখাল।

রুষে ওঠে রোসা, এমন মেয়েকে ভালবাসলে বোন পুতুলের মত তোমায় খেলতে হবে। ঠকতে হবে। যা খুশী করগে যাও, ভালবাসা আমার পুরুষত্ব নষ্ট করে দিয়েছে।

কথা শেষ হয় না। ঢোকে অলিভার। স্বেচ্ছাচারী ডিউকের আত্যাচার সে এখন সম্পত্তিহীন, ঐশ্বর্যহীন, নির্বাসিত আর্ডেন বনবাসী।

সে শুধায়—বনপ্রান্তে জলপ্রান্তে গাছের রাজ্যে এক কুটিরে থাকে কিশোর ও এক কিশোরী। বলতে পারো কোথায় পাবো তাদের ? এখানে তো তোমরা দুজন, আচ্ছা, তোমারাই কি সেই···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সিলিয়া আশ্বাস দেয়, আমরাই।

রোসা নামের কিশোরের জন্য অল্যার্ণ্ডো পাঠিয়েছে এই রক্ত-মাখা রুমাল।

কেমন ভয় পেয়ে যায় রোসালিণ্ড। এর মানে ?

অলিভার বললো—আমার লজ্জা। আমার পরিচয়ই আমার লজ্জায় কারণ উন্মোচন করবে।

অলিভার তার ঘটনা শুনিয়ে গেল—বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অল্যার্ণ্ডো। হঠাৎ চোখের এল কে এক হতভাগ্য মানুষ ঘুমুচ্ছে! ওক গাছের শেওলা ধরা গুঁড়ির ওপর তার মাথা। এক বিষধর সাপ গলা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে। সে দংশনে উদ্যত।

অল্যার্ণ্ডোকে দেখে সাপ পালালো। ওৎ পেতে ছিল এক সিংহী। মরা মানুষ তারা মানুষ ছোঁয় না। ঘুমন্ত মানুষটি সামান্য নড়লেই হিংস্র থাবা ঝাপিয়ে পড়বে। কাছে এসে দেখল অল্যার্ণ্ডো ঘুমন্ত মানুষটি আর কেউ নয়, তারই বড় ভাই অলিভার।

কাহিনীর মাঝে ঘৃণায় ফুসে ওঠে সিলিয়া—তার সেই প্রবঞ্চক ভাই, অলিভার।

অস্থির রোসালিণ্ড বলে—তারপর। সে কি ফিরে গেল? সিংহীর শিকার হল তার ভাই?

ঘাড় নাড়লো অলিভার। দু'বার সে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তবু দয়া, বড় মমতা নিভিয়ে দিল প্রতিশোধের আগুন। সিংহকে হত্যা করলো সে। আর তখনই জেগে উঠলাম আমি।

—আ-প-নি? তার ভাই? সিলিয়া বিস্মিত।

—সে উদ্ধার করেছে আপনাকে? রোসার কণ্ঠ।

—হ্যাঁ যে ভাইকে প্রতিশোধ চেয়েছিল হত্যা করতে তাকেই সিংহীর হিংস্র থাবা থেকে বাঁচালো পরম মুহূর্তে।

অল্যাণ্ডো, রক্তাক্ত, দুর্বল, এতক্ষণ পরে অলিভার বললো—অল্যাণ্ডো জ্ঞানহীন জ্ঞান হতে তার রোসার কাছে পাঠিয়েছে ঐ লোহিত-উষ্ণ ভালবাসা, ঐ রুমাল।

মুহূর্তের মধ্যে খবর শুনে রোসালিণ্ড চেতনা হারালো, বোঝাতে চাইল অলিভার রক্ত দেখে অনেকেই অচেতন হতে পারে। ভয় নেই। সিলিয়া তথাপি বিমূঢ়—এ যে তার চেয়েও ঢের বেশী।

অবশেষে চোখ মেললো রোসালিণ্ড—আমাকে বাড়ীতে দিয়ে এসো।

অলিভারের দিকে সিলিয়া তাকালো—ওকে প্লিজ, একটু হাত ধরে নিয়ে চল।

—আর তুমি রোসালিণ্ড, পুরুষ হয়েও তোমার অভাব পুরুষত্বের।

হ্যাঁ, রোসালিণ্ডের গলাখানি এটারই অভাব। মশাই আপনার ভাইটিকে বলবেন কেমন নিখুঁত অভিনয় করেছি মূর্চ্ছা যাবার।

—এ কি ভান? অলিভার তো অবাক। তোমার চোখ মুখের বিবর্ণতা এখনো বলে দিচ্ছে এ ভান নয়, মূর্চ্ছা।

—না না মশাই, অভিনয়, এ ভান সত্যি বলছি।

—তবে চল পুরুষের মত।

—হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো যাচ্ছি।

—এ কি? সিলিয়া ফিসফিসিয়ে জানায়, তোর মুখে কিন্তু সখী এখনো বিশীর্ণতার ছাপ। এই যে মশাই, একটু আমাদের সঙ্গে আসবেন তো।

—আলবাৎ। যেতে যেতে অলিভার বললো, রোসালিণ্ড, তুমি চিঠি দেবে তো? ওর আর্জি মেনে নিলে কিনা, উত্তর আশা করে সে।

—পরে ধীরেসুস্থে দেওয়া যাবে, এখন গিয়ে বলবেন, আমি কিরকম অভিনয় করেছিলাম, কেমন?

রোসাকে ধরে নিয়ে যায় সিলিয়া।

উনিশ

আবার অরণ্য।

আর অরণ্যানী মানুষ।

বিয়ের বাঁধনে সরলা অড্রেকে বাঁধেনি নাগরিক বিদূষক টাচ্‌ষ্টোন।

বাধা দিয়েছিল নিজেই। আজও বিয়ের জন্য উন্মুখ অড্রে। টাচ্‌ষ্টোন নিত্যদিনের মত আজও ভোলাচ্ছে তাকে—ওসব পরে হবে ঢের অবসর পাওয়া যাবে বিয়ের।

অড্রে বললো—বুড়ো ভদ্রলোকটা যাই বলুক, ঐ পাদ্রীটা ভালই ছিল।

—দূর বেটা, একনম্বর পাজী, নচ্ছার, কিন্তু অড্রে, এ বনের এক যুবক জানায়, তোমাকে সে চায়।

—জানি, আমার ওপর কোন দাবী তার থাকতে পারে না। ঐ তো, ঐ আসছে সে।

উইলিয়াম এলো, অতি সাধারণ রাখাল। সে সম্ভাষণ জানাতেই ঠাট্টা শুরু হয় টাচ্‌ষ্টোনের।

—আহা, করছো কি, টুপী খুলতে হবে না। তা বন্ধু তোমার বয়স কত বলতো?

—পঁচিশ হল। উইলিয়ামের হাবাগোবা উত্তর।

—ভরা বয়স। উইলিয়াম তোমার নাম?

—আজ্ঞে, ঐ নামেই সবাই ডাকে।

—বাহ, চমৎকার নাম তো! এই বনের মানুষ তুমি?

—হুম। ভগবানকে ধন্যবাদ, এখানকার অধিবাসী আমি।

—আহা, বেশ বলেছো, বেশ। খুব ধনী বুঝি?

—না না, কোন রকমে চলে যায়।

—ভাল ভাল, তবে বেশী ভাল নয়, মোটামুটি ভাল? তুমি কি বুদ্ধিমান?

—ভাণ্ডারে অল্প অল্প কিছু আছে বৈকি।

—এইতো বুদ্ধিমানের মত কথা, এবার বলতো হে, এই কুমারীকে কি ভালবাসো তুমি?

—তা বাসি।

—তবে হাতে রাখো হাত। তুমি বিদ্বান তো?

আজ্ঞে না।

—তবে জেনে রাখ, একজনের প্রাপ্য অন্য কেউ পায় না। এর আশা ত্যাগ কর

এক্ষুণি বুঝলে। নইলে, সোজা কথায় মরতে হবে সাবাড় হয়ে যাবে। মানে, আমিই সাবড়ে দেবো, । বিষ দেবো, পেটানো কিংবা গুম খুন করবো।

নয়তো লড়াইয়ে ভেবে চোরা গোপ্তা চালাবো। খুব সাবধান, আগে ভাগে কেটে পড় প্রাণ নিয়ে।

অড্রে চোখ বড় করে বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেটে পড়।

মুহূর্তে সব দাবী ছেড়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালায় উইলিয়াম এবং সেই পথে বুড়ো করিণ রাখাল এসে ঢোকে। খবর দেয় তার মনিব ওদের নাকি খোঁজাখুঁজি করছে। তবে তো জরুরী তলব!

টাচ্‌স্টোন বলে ওঠে—চল যাই।

কুড়ি

অলিভার বললো—আমি আলিয়েনাকে ভালবাসি। কত সামান্য পরিচয়, তার দরিদ্র, এইসব আকস্মিক ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন আলোচনা থাক।

তুমি শুধু রাজী হয়ে যাও। বাবার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে এখানে কাটিয়ে দেব আমরা সারাজীবন। বল তুমি রাজী?

—রাজী। অর্ল্যাণ্ডো বললে, ঠিক আছে, কালই বিয়ে হোক। আলিয়েনাকে প্রস্তুত হতে বলো। অনুচরসহ ডিউক সবাইকে নিমন্ত্রণ করবো আমরা।

খুশী মনে চলে গেল অলিভার।

রোসালিণ্ড অস্থিরতা নিয়ে ছুটে এল—আঘাত লেগেছে কোথায়? উফ, বড় দুঃখ পেলাম ঐ ঝোলানো হাত দেখে। ভেবে ছিলাম, হয়তো সিংহী ক্ষত দিয়েছে হৃদয়ে।

রোসালিণ্ড হঠাৎ শুধায়—হ্যাঁগো, তোমার দাদা আমার অভিনয়ের কথা কিছু বলে নি?

—হ্যাঁ, তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা বলেছেন।

লাজুক নত মুখে সে হাসলো—জানি, তবে কাল আমি স্থান নেবো তোমার রোসালিণ্ডের।

—কেমন? তুমি যদি আন্তরিক ভালবাসায় চেয়ে থাক, তবে পাবে তোমার রোসাকে। আমি তার অবস্থা জানি। তাই বলছি, কাল যখন তোমার দাদা আলিয়েনার সঙ্গে। বসবে বিবাহ বাসরে তখন তোমার বিয়ের সানাইও বেজে উঠবে। আমি হাজির করবো রোসাকে।

অর্ল্যাণ্ডো বিস্ময়ে স্তব্ধ—তুমি পাগল হয়ে যাও নি তো গানিমেড?

—দোহাই, যাদুকর হতে পারি আমি, তবু আমার জীবন আমার প্রিয়। কাল একটু সাজ-গোজ কোরো। বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কোরো। জেনো কাল তোমারও বিয়ে

এবং রোসালিণ্ডের সঙ্গেই। ঐ দ্যাখো আরেক কাপল আসছে।

ঢুকলো সিলভিয়াস এবং ফিবি।

ফিবির কণ্ঠে ঝগড়ার সুর। শুরু হয় ভালবাসার খুনসুটি। চলে প্রেমের হা-হুতাশ, চাওয়া এবং না পাওয়ার দীর্ঘ আলোচনা। অনেক সময় জোটে।

শেষে রোসালিণ্ড বললো—ঢের হয়েছে, আর না। জ্যোৎস্নায় আমরা ঢের ডেকেছি নেকড়ের ডাক। সিলভিয়াস, সম্ভব হলে সাহায্য করবো তোমায়। সম্ভব হলে, তোমাকেও ফিবি, ফিবিয়ে দিতাম ভালবাসার প্রতিদান। যদি কোন মেয়েকে বিয়ে করি, তোমাকেই করবো।

কালই আমার বিয়ে। অর্ল্যাণ্ডো, খুশী করবো তোমাকে—হ্যাঁ, কাল তোমারও বিয়ে কাল অবশ্যই দেখা করবে আমার সঙ্গে, কেননা তোমার চাই রোসালিণ্ডকে।

সিলভিয়াস তুমি আসবে, কেননা, তুমি ভালবাস ফিবিকে। শুধু আমি কোন মেয়েকে ভালবাসি না তাই আসবো এখানে। আজ আসি।

একুশ

সবার প্রতীক্ষিত কাল মিলেছে আগামীকালে। কার কপালে কে আছে কে জানে?

ছদ্মবেশীনি রোসালিণ্ড কি খেলা দেখাবে সেদিন? টাচ্‌ষ্টোনের কণ্ঠে মিশেছে আনন্দ উদ্দাম—কাল আমাদের মধুমাস, অড্রে, আমাদের বিয়ে। আমরা তো সংসার করতে চাই।

অড্রে বললো—চেয়েছি দুজনা মিলে বাঁধবো সুখের নীড়। ঐ দ্যাখো কারা যেন এদিকে আসছে।

দুজন ডিউকের অনুচরের প্রবেশ মাত্রই বলে ওঠে টাচ্‌ষ্টোন—আরে আসুন আসুন।

ওরা বসলো, সম্বোধন বিনিময় শেষ হলে বললো—এবার গান শুরু হোক, আনন্দ চলুক। উৎসবকে স্বাগত জানাই ঐক্যতানে।

দুজনে শুরু করে গান—

প্রেমের কিশোর ছিল এক,
আর তার প্রেমের কিশোরী
আহা, মরে যাই! মরে যাই!
মধুমাস এল ঐ
সবুজ ক্ষেত পেরিয়ে
চলে যায় তারা চলে যায়।
আসে মধুমাস
আংটি বদলের সুসময়
পাখি গান গায়।

টুং টাং, টুং টাং
রাই সরষের হলুদ মাঠ
ওরা গো ঢেলে গেয়ে যায় গান
জীবনে তো ক্ষণিক ফুল,
বসন্ত মুকুল
ভালবাসার এই তো
পূর্ণতার বয়স।
ভালবাসে ওরা
যে মধুমাস
আহা, মরে যাই!
মরে যাই!

গান ভাল লাগে না টাচ্‌ষ্টোনের।

ওদের বলে, কি জানেন মশাই। এমন বেসুরো এবং বাজে বিষয়বস্তুর গান শুনে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। যাকগে, ঠাকুর আপনাদের দিন সুকণ্ঠ, মঙ্গল করুন। এখন আমরা যাই। এসো অড্রে।

বাইশ

আজ সেই মধুমাস।

অরণ্য সেজেছে অপরূপ সুষমাময়, ফুলে-ফলে।

দক্ষিণা বাতাস বড় উন্মনা।

আজ উৎসব মিলনের। সুখের। সমাপ্তির।

অনেকে আর্ডেনের অরণ্যে উপস্থিত। আলাপ চলছে গভীর। এ সময়ে আসে ফিবি, সিলভিয়াস এবং রোসালিণ্ড।

ডিউকের দিকে চেয়ে রোসালিণ্ড বলে—আপনি বলেছেন রোসালিণ্ডকে আনলে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন অর্ল্যাণ্ডোর।

—স্বেচ্ছায় দেব, রাজ্য থাকলে মেয়ের সঙ্গে রাজ্য দিতাম। ডিউক বললেন।

এবার সে অর্ল্যাণ্ডোর দিকে ফিরলো—তুমি বলছো, তাকে তুমি গ্রহণ করবে তাই তো?

এবার রোসালিণ্ডের চোখ ফিবির দিকে—আর তুমি? আমি রাজী হলে বিয়ে করবে আমাকেই।

—তাতে যদি মরণ হয় তবু, ফিবির উত্তর।

—আমি কিন্তু রাজী না হলে বিয়ে করতে হবে এই রাখালকেই।

—আমি রাজী।

সিলভিয়াসের দিকে ঘুরল রোসালিণ্ড—তারপর তুমি? ফিবি রাজী হলে তাকে বরণ করে নেবে, তাই না?

সিলভিয়াস নিরাসক্ত হয়ে বলে—ওকে গ্রহণ করা অথবা মরণ বরণ করা আমার কাছে দুই-ই সমান। তবু আমি বিয়ে করবো ওকেই।

—এখন এই বাধাগুলি ভেঙে, কথা রাখবে আমার। রোসালিণ্ড বলে যায় আপনি, মহামান্য ডিউক, কন্যা সম্প্রদান করার জন্যে তৈরী থাকুন। ডিউকের কন্যাকে বধূ-বরণের জন্য প্রস্তুত হও, অর্ল্যাণ্ডো সিলভিয়াস ফিবি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি ভুলো না। আমি একটু অন্তরালে যাই, সব সন্দেহের মেঘ কেটে যাবে এক্ষুণি।

রোসালিণ্ড আর সিলিয়া চলে গেল আড়ালে।

ডিউক ওদের গমন পথে চেয়ে রইলেন মগ্ন-দৃষ্টিতে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মেয়ের কথা। ঐ রাখাল বালকের মুখের আদলের সঙ্গে কি কোথাও মিল আছে তার?

নির্ভয়ে অর্ল্যাণ্ডো জানালো, প্রথমে রাখাল বালককে দেখে তাই-ই মনে হয়েছে। কিন্তু ও তো বন্য। জঙ্গলের অধিবাসী। ওর বাবা ছিলেন মস্ত যাদুকর। তাই তাঁর কাছে নিষিদ্ধ বিদ্যা শিখেছে ও।

অর্ল্যাণ্ডো হয়তো আরও বলত। কিন্তু তার আগেই সবার চোখ নিবদ্ধ করে বলে ওঠে জেক্‌স—ঐ আর এক যুগল দম্পতি। অতি মূর্খ, আহা ওরা এসেছে। বাইবেলের গোপীর পতির ভেলায় ও যেন সেই প্রলয় তাড়িত জনস্রোতে ঠাঁই নিয়ে এসেছে।

এস অড্রে ও টাচ্‌ষ্টোন। ওরা সবাইকে নমস্কার জানালো।

ডিউককে জেক্‌স জানালো—বহুরূপ পোষাক পরা এই ভাঁড়, ভেতরটাও এর বর্ণালী রঙে থৈ থৈ করছে। বনে হামেশাই দেখা মেলে ওর। এককালে, ইনি নাকি কোন ডিউকের সভাসদ ছিলেন, অন্ততঃ ইনি তাই বলেন।

তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে টাচ্‌ষ্টোন—বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করে দেখুন। আমি দারুণ কৌশলী বন্ধুর কাছে, শত্রুর কাছে ভদ্র। নাচতে পারি। লিখেছি এক দীর্ঘ নারী স্তুতি। ফতুর করেছি তিনটে দর্জিকে। চার চারটে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, একটায় প্রায় নেমেও পড়েছিলাম।

—কি করে বিবাদ মিটলো? জেক্‌স প্রশ্ন করে।

—আমরা মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে—হঠাৎ খুঁজে বার করা হল। বিবাদটার বীজ লুকিয়ে আছে সাত নম্বর কারণে।

—সাত নম্বর কারণ! ফের বলে ওঠে জেকস্‌—সেটা আবার কি?

ডিউক ওকে বললেন—তোমাকে বেশ ভাল লাগছে।

অমনি টাচ্‌ষ্টোন বললে—আমরাও ভাল লাগছে আপনাকে। এখন আমি এই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে হারিয়ে গেলাম। এখন ওদের মতই দিব্যি করবো পরক্ষণেই ভাঙবো। বিধান মেনে বিয়ে করবো, আবেগে উত্তেজনায় বিয়ে ভাঙবো।

মশাইরা, আমার বাগদত্তা বউ এই অড্রে। বিচ্ছিরি দেখতে। কেউ যাকে পছন্দ করবে না তাকেই গ্রহণ করছি—কেন না, সতীত্ব এবং একনিষ্ঠতা গরীবের মত বাসা বেঁধেছে ঐ কুশ্রী দেহে।

ঠিক যেমনটি বিশ্রী ঝিনুকের ভিতর গোপনে জন্ম নেয় দুর্লভ মুক্তা।

এরকম বুদ্ধিদীপ্ত কথায় সবাই বাহবা দিল। হেসে লুটোপুটি অনেকেই।

কিন্তু ভাঁড়মশাই, তোমার সাত নম্বর সেই কারণটা? জেকস খেই ধরিয়ে দিল।

প্রতি উত্তরে টাচস্টোন জানালো—পরোক্ষ মিথ্যে ভাষণের চেয়ে খুব বেশী আমি এগোই নি। আর উনিও প্রত্যক্ষ পর্যন্ত এসে থমকে গেছে। শেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভান করে সরে পড়লাম।

এভাবেই কথায় কথায়, কখন আসে মিলনেরা। পুষ্প শোভিত আর্ডেনের অরণ্যে উতলা বাতাস চিঠি বিলি করে বসন্তের।

এল সেই মিলনের অনাঘ্রাত মধুমাস।

গ্রীক বিবাহ দেবতা হাইমেমকে এখন, এই বিবাহ লগ্নে বড় প্রয়োজন।

সেই হাইমেম-বেশধারী বনচরকে সঙ্গী করে আসে রোসালিন্ড ও সিলিয়া। এ রোসালিন্ড, পুরুষ নয়, ছদ্মবেশধারী নারী।

হাইমেম বেশে গাইতে গাইতে ঢোকে বনচর। মাদল বাজে।

> পৃথিবী দুরন্ত, যখন শান্ত হয় প্রকৃতি
> দেখা দেয় ছন্দ যখন স্বর্গে
> তখন আনন্দের কল্লোল
> কন্যাকে তোমার গ্রহণ কর ডিউক
> তাকে নিয়ে এসেছেন বিবাহ-ঠাকুর হাইমেম
> যাতে, তার হৃদয় বদল হয়েছে যার সাথে
> তার হাতে সমর্পণ করতে পারো তাকে।

ডিউকের কাছে ছুটে এল রোসালিন্ড—বাবা, বাবা, আমিই তোমার মেয়ে।

তাকালো অর্ল্যান্ডোর দিকে—তোমাকে ভালবাসি। তাইতো নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম।

—যদি আমায় ঠিক বলে, ডিউক বললেন, তবে, এই আমার মেয়ে।

অর্ল্যান্ডো বললো—আমার চোখ যদি ভুল না দেখে তো, এই-ই আমার রোসা।

শেষে রোসা বলে—ডিউক যদি আমার বাবা না হয়, আমার বাবা নেই। অর্ল্যান্ডো যদি স্বামী না হয়। বিয়ে করবো না। আর কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হলে ফিবি, তোমাকেই করবো।

স্তব্ধ হও, শান্ত হও, গোলমাল আর চলবে না, অদ্ভুত ঘটনা জাল ভেঙ্গে আমি দেবো সহজ উপসংহার? চারজোড়া চারজোড়া নিয়ে মিলিয়ে দাও বিবাহ বন্ধনে। অবশ্য

তারা এরই মধ্যে যদি না ভাঙে অঙ্গীকার।

(অর্ল্যাণ্ডো ও রোসালিণ্ডকে) এস, এস—হাত মিলিয়ে দিই হাতে—কোন বিঘ্ন যেন ছিন্ন না করতে পারে এ বন্ধন।

(অলিভার ও সিলিয়াকে) এস, এস—হাতে রাখ হাত। তোমাদের হৃদয় হোক অভেদ।

(ফিবিকে)—তোমাকে বিয়ে করতে হবে ঐ রাখালকেই। নচেৎ এক নারী হবে তোমার স্বামী।

(অড্রে ও টাচ্‌স্টোনকে)—এই মিলন হল তোমাদের যেমন মিলন হয় শীত ও ঝড়ে।

গাই বিবাহের গান।
তোলো মধুর গুঞ্জন
একে অপরকে ডেকে শুধাও।
এমন ঘটনা কি করে ?
যুক্তি এসে ভাঙুক, যত বিস্ময় সাঙ্গ হোক খেলা।
দেবতার রাণী জুনো,
মিলন বিবাহ তাঁর মাথার মুকুট
ঘরে ঘরে এই বন্ধনে
নগরী মানুষে ভরা।
(এসো) গাই বিবাহের গান,
দেবতাদের জানাই শ্রদ্ধা।

সিলিয়াকে ডিউক পরম আন্তরিকতায় ভ্রাতুষ্পুত্রী বলে কাছে টেনে নিলেন।

এমন সময় সংবাদ এলো। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত সবাই আর্ডেন বনবাসী শুনে ডিউক ফ্রেডারিক এক বিশাল সেনাদল নিয়ে আসছিলেন। উদ্দেশ্য ভাইকে বন্দী করে হত্যা করা।

কিন্তু বনপথে দেখা হল এক বৃদ্ধ তপস্বীর সঙ্গে। তাঁর উপদেশ নিতে লেগে গেলেন ফ্রেডারিক।

ত্যাগ করলেন এ পাপ সঙ্কল্প। ঠিক করলেন তিনি হবেন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। জ্যেষ্ঠকে ফিরিয়ে দেবেন রাজ্য এবং নির্বাসিতরাও ফিরে পাবে হারানো সম্পত্তি।

সন্দেশ বাহককে সাদরে অভ্যর্থনা করলো সবাই।

সম্পত্তি ফিরে পেল অলিভার।

রাজ্য পেল অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু বাজনার যে দ্রিমি দ্রিমি রোল কানে আসছে। সুতরাং সংবাদ বাহক মেতে উঠল আনন্দে। সবাই আনন্দে উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত।

কেবল জেক্‌স বিষন্ন, সত্যি মত পরিবর্তন করছেন ডিউক ? রাজ্য ছেড়েছেন ? তাহলে আমি সঙ্গী হবো। অনেক কিছু শেখার থাকে নব-দীক্ষিতের কাছে। আপনারা

আনন্দ করুন ডিউক। বহু দুঃখ করেছেন, এ আনন্দ আপনাদের প্রাপ্য।

অর্ল্যাণ্ডো ? একান্ত বিশ্বাসে পেলে যে প্রেম তাতে স্নান করে শুদ্ধ হও। ডুবে থেকো বন্ধু।

অলিভার ? সম্পদ ও ভালবাসা দুই-ই এখন তোমার মুঠোয় ?

সিলভিয়াস ? সুখের হোক তোমার বিবাহিতা জীবন।

আর টাচ্‌ষ্টোন ? তোমার তো দাম্পত্য কলহময় জীবনের বয়েস বড় জোর মাস দুয়েক। তবু আনন্দে থেকো বন্ধু।

আমার জন্যে এ আনন্দ নয়। তোমরা আনন্দ কর বন্ধু—সেই আমার সুখ। আমি চললাম।

—না, জেক্‌স, তুমি যেও না এই সুখের দিনে—ডিউকের কণ্ঠে অনুরোধ করে যায়।

ঐ পরিত্যক্ত গুহাই আমার স্থান। কিছু বলতে হলে ওখানে যাবেন—প্রতীক্ষায় রইলাম।

চলে গেল জেক্‌স। আনন্দ ঘন মিলনের মধুমাসে কোথাও কি ছায়া পড়ল বিষাদের ?

চীৎকার করে উঠলেন ডিউক—নাচ—বাজাও—গাও। চলুক বিবাহ উৎসব। এই সুখ হোক অনন্তকালের। এই আনন্দ হোক চিরস্থায়ী। বাজাও, তোমরা বাজাও—

বেজে উঠল বাদ্য। বাতাসে মিশল ঐক্যতানের সুর।

শুরু হল যুগল দম্পতির উদ্দাম নৃত্য।

বিষাদ মেঘের ফাঁকে ঝিলিক দিল বর্ষণ শেষের সোনালী রৌদ্র।

সমাপ্ত